BanglaBook.org
নিল গেইম্যান
আমেরিকান গডস
রূপান্তরঃ
মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

'যখন দেবতার উপর বিশ্বাস হারিয়ে যায়...তখন হারিয়ে যান দেবতাও!'

শ্যাডোর স্বপ্ন কেবলমাত্র একটা– জেল থেকে বের হয়ে নতুন একটা জীবন শুরু করা। কিন্তু মুক্তি পাবার মাত্র কয়েকদিন আগে সে জানতে পারে, দুর্ঘটনায় তার স্ত্রী আর সবচেয়ে কাছের বন্ধু মারা গিয়েছে!

বাড়ি ফেরার পথে তার দেখা হলো এক অদ্ভুত লোক, মি. ওয়েডনেসডের সাথে। আশ্চর্য লোকটা ওর ব্যাপারে সবকিছু জানে! মি. ওয়েডনেসডের দেহরক্ষী হিসেবে কাজ করতে রাজি হয় ও।

আর সেই সাথে পুরনো আর নতুন দেবতার যুদ্ধের মাঝে নগণ্য এক ঘুঁটিতে পরিণত হলো সে।

...কে জানে, কার জয় হবে এই যুদ্ধে!

ISBN 978 984 92439 9 1
9 789849 243991

ত্রিশটিরও বেশী নামকরা ও একাধিক পুরস্কার প্রাপ্ত বই এর রচয়িতা নিল গেইম্যান এর জন্ম ১০ই নভেম্বর ১৯৬০ সালে, হ্যাম্পশায়ার, ইংল্যান্ডে।

কি লিখেননি তিনি?

তার লেখা বইগুলোর মাঝে রয়েছে– আমেরিকান গডস, স্টারডাস্ট, আনানসি বয়েজ, নর্স মিথলজি, দ্য গ্রেভ ইয়ার্ড বুক।

নিল গেইম্যানের বইয়ের কাহিনী অবলম্বনে বানানো হয়েছে চলচিত্র, টিভি সিরিজ এমনকি রেডিও নাটক পর্যন্ত।

জর্জ আর আর মার্টিন শুধু শুধু বলেননি- 'নিল গেইম্যানের মতো আর কেউ নেই।'

আমেরিকান গডস

নিল গেইম্যান

রূপান্তরঃ মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ্

ADEE

অনুপস্থিত বন্ধু-ক্যাথি অ্যাকার এবং রজার জিলেনি,
আর এই দুজনের মাঝে যারা যারা বিদায় নিয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যে।

আমার মনে প্রায়শই একটা প্রশ্ন জাগে-অভিবাসীরা যখন নতুন কোন দেশে আসে, তখন পেছনে ফেলে আসা পৌরাণিক চরিত্রদের কী হয়? আইরিশ-আমেরিকানরা সাথে করে নিয়ে এসেছিল ফেয়ারিদের। নরওয়েজিয়ান-আমেরিকানদের সাথে এসেছে নিসার-রা। গ্রিক-আমেরিকানদের হাত ধরে এসেছে ভ্রিকোলাকোস। যখন আমি জানতে চাইলাম, এসব প্রানিদের কেন আমেরিকায় দেখা যায় না, আমার তথ্যদাতা হাসতে হাসতে বলল, 'সম্ভবত, সমুদ্র পার হবার সাহস নেই বলে!' সেই সাথে মনে করিয়ে দিল, যীশু বা তার হাওয়ারিরাও কখনও আমেরিকায় পা রাখেননি।

-রিচার্ড ডরসন, আ থিওরি অফ আমেরিকান ফোকলোর।

লেখকের কথা

যে বইটা এখন আপনারা হাতে ধরে আছেন, সেটার সাথে আগে প্রকাশিত কপিগুলোর কিছুটা পার্থক্য আছে।

আমেরিকান গডস লিখতে দুই বছর সময় লেগেছিল আমার, ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত। এই বইটাকে নিয়ে অনেক আশা ছিল, চেয়েছিলাম এমন একটা বই লিখতে যেটা আকারে বড়, অদ্ভুত আর যার গল্পটা সর্পিল। মনে হয়, পেরেছি কাজটা করতে। সময় লাগলেও, অবশেষে শেষ করতে সক্ষম হয়েছি বইটি। পাণ্ডুলিপি জমা দেবার সময় মাথায় একটা প্রবাদ খেলে যাচ্ছিল–উপন্যাস হলো এমন এক গদ্য, যাতে কোনো না কোনো সমস্যা আছে। সন্তুষ্ট হয়ে ভেবেছিলাম, ওরকম সমস্যা-ওয়ালা একটা উপন্যাস লিখে ফেলেছি! আমার সম্পাদক ভয় পাচ্ছিলেন, লেখাটা সম্ভবত একটু বেশিই বড় হয়ে গিয়েছে, প্যাঁচানোও হয়েছে বেশি (তবে আরেকটু অদ্ভুত হলেও সম্ভবত ভদ্রমহিলা আপত্তি করতেন না)। তিনি অনুরোধ করলেন, একটু যেন কাটছাঁট করি। তাই করেছিলাম। তিনি যে ঠিক ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই...বইটার সফলতাই তার প্রমাণ। অনেক কপি বিক্রি হয়েছে, অনেকগুলো পুরস্কারও পেয়েছি। দ্য নেবুলা আর দ্য হুগো অ্যাওয়ার্ড (যেটা সাধারণত সায়েন্স ফিকশনকে দেয়া হয়), দ্য ব্রাম স্টোকার অ্যাওয়ার্ড (যেটা পায় হরর উপন্যাস), দ্য লোকাস অ্যাওয়ার্ড (ফ্যান্টাসির জন্য) যাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য। তাই বুঝতেই পারছেন, উপন্যাসটা অদ্ভুতই বটে। বইটি জনপ্রিয় হলেও, ঠিক কোন ঘরানায় পড়ে তা কেউ বুঝতে পারেনি। হয়তো সেজন্যই পছন্দ হয়েছে সবার।

এদের মাঝে আছেন পিট অ্যাটকিনস আর পিটার স্নাইডার, হিল হাউসের দুই পার্টনার। বইটির আমেরিকান প্রকাশকের সাথে কথা বলে, তারা লিমিটেড এডিশন ছাপাবার ব্যবস্থা করলেন। আগ্রহ নিয়ে যখন আমাকে তারা তাদের পরিকল্পনা জানালেন, তখন খচখচ করতে শুরু করল মন।

সচরাচর পথের ভিন্ন একটা পথ ধরে জানতে চাইলাম, তারা কি আমার আসল পাণ্ডুলিপিটা ছাপাবেন?

উত্তরে হ্যাঁ জানালেন দুজন!

সমস্যা শুরু হলো তখনই। প্রথমবার কাটছাঁট করার পর, অনেক পরিবর্তন এসেছে বইটির নানা এডিশনে। তাই আমেরিকান গডসের সেরা পাণ্ডুলিপিটা দাঁড় করাতে হলে আমাকে কাটছাঁট না করা সর্বশেষ পাণ্ডুলিপির সাথে কাটছাঁট করা সর্বশেষ পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে দেখতে হবে। তারপর আবার দেখতে হবে ছাপার অক্ষরে থাকা সর্বশেষ বইটি। অতঃপর সবমিলিয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে আমাকে।

লম্বা পরিশ্রমের ব্যাপার। তাই এই পরিস্থিতিতে যেকোন বুঝবান লোক যা করত, আমিও তাই করলাম। কয়েকটা বড় বড় কম্পিউটার ফাইল এবং বইটির দুই কপি (আমেরিকান আর ব্রিটিশ, দুটোই) পাঠিয়ে দিলাম পিট অ্যাটকিনসের কাছে। অনুরোধ করলাম, সবকিছু যেন গুছিয়ে ফেলেন তিনি। মানতেই হয়, দারুণ কাজ করেছেন ভদ্রলোক। সর্বশেষ পাণ্ডুলিপি হাতে পাবার পর কাজে নেমে পড়লাম আমি। ভুলগুলো ঠিক করলাম, কোথাও আবার গুছিয়ে লিখলাম কিছু জিনিস। কিছু জায়গা বাদও পড়ল, তবে ওগুলো বইয়ের আকার কমাবার জন্য বাদ দেইনি। যাই হোক, সবশেষে যেটা পেলাম, সেটা নিয়ে আমি মোটামুটি সন্তুষ্ট। তবে লেখকের কাছে উপন্যাস মানেই হলো এমন এক গদ্য, যাতে কোন না কোন সমস্যা আছে!

হিল হাউস ছাপাল নতুন পাণ্ডুলিপি। দারুণ সেই লিমিটেড এডিশনে (যার দামটাও বেশ দারুণই ছিল) সাড়ে সাতশ কপি বইয়ের জায়গা হলো। ক্রেতা সবাইকে বিনামূল্যে একটা একটা করে 'পাঠকের কপি'ও দেয়া হলো সাথে, যেন লিমিটেড এডিশনের বইটা পড়তে গিয়ে তাতে দাগ না ফেলে দেন!

হেডলাইন যখন সিদ্ধান্ত নিল, আমার সবগুলো উপন্যাস নতুন করে আবার ছাপাবে, তখন জানতে চাইল কোন বইতে কিছু যোগ করতে চাই কিনা। আমেরিকান গডসের ক্ষেত্রে দেখা গেল, নতুন করে বইটা আমি পড়াতে চাইছি পাঠকদের! বইটির এই মুদ্রণে প্রায় বারো হাজার শব্দ বেশি আছে। অন্য মুদ্রণ পুরস্কার জিতেছে বটে, তবে এই মুদ্রণ নিয়ে আমি সর্বাধিক গর্বিত।

এই বর্ধিত উপন্যাস ছাপাবার সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য হেডলাইনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সেই সাথে পাণ্ডুলিপি সাজানোয় সাহায্য করার জন্য পিট অ্যাটকিনসকেও জানাই ধন্যবাদ।

নিল গেইম্যান
সিঙ্গাপুরে যাবার পথে বিমানে, ৩ জুলাই, ২০০৫

পর্ব এক

প্রতিচ্ছায়া

অধ্যায় এক

আমাদের দেশের সীমানা জানতে চাইছেন, স্যার? উত্তরে রয়েছে অরোরা বোরিয়ালিস, পূবে উদীয়মান সূর্য। দক্ষিণে গেলেই পাবেন বিষুবরেখা, আর পশ্চিমে? পশ্চিমে আছে হিসেবের দিন।

–দ্য আমেরিকান জো মিলার'স জেস্ট বুক

জেলে তিন বছর হতে চলছে শ্যাডোর। গায়ে-গতরে যথেষ্ট বড় সে, আর ভাবে-ভঙ্গিমাতেও যথেষ্ট ভয় জাগানিয়া। তাই এখন ঝামেলা বলতে কেবল একটাই-একঘেয়েমি। অবশ্য তা থেকে বের হবার উপায় খুঁজে নিয়েছে ও, দেহকে সুন্দর রাখতে অনেকটা সময় ব্যয় করে; সেই সাথে শেখে পয়সা নিয়ে হাত সাফাইয়ের নানা কাজ। ওহ, আরও একটা কাজ করেঃ স্ত্রীকে কতটা ভালোবাসে, বসে বসে তাই ভাবে!

জেলের থাকার সবচেয়ে ভালো দিক...হয়তো একমাত্র ভালো দিকটা হলো এক ধরনের স্বস্তির মাঝে ডুবে থাকা। এই অনুভূতির জন্ম কিন্তু জেলের পরিবেশে নয়, অন্য কোথাও। কয়েদি হওয়া মানে–পদস্খলন হতে হতে জীবনের একেবারে শেষ ধাপে এসে উপস্থিত হওয়া। পাপ একদিন পাকড়াও করবে, এই ভয় আর নেই শ্যাডোর মনে। কেননা, পাপ পাকড়াও করেই ওকে জেলে পাঠিয়েছে। আগামীকাল আর কতটা নিচে নামতে হবে, সেই আতঙ্কে আর কাঁপে না ও। কেননা যতটুকু নিচে যাওয়া সম্ভব, গতকালই চলে গিয়েছে।

অপরাধ সত্যি না মিথ্যা, তাতে কয়েদির জেল-জীবনে কোন পরিবর্তন আসে না। অভিজ্ঞতা থেকে শ্যাডো জানে, সব কয়েদীরই ধারণা–তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। হয় কর্তৃপক্ষ কোন একটা ভুল করে তাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে, অথবা কর্মপ্রণালীতে আছে গোলমাল! তবে জানা আছে শ্যাডোর, কর্তৃপক্ষ সম্ভবত সব সময় প্রকৃত অপরাধীকেই পাকড়াও করে।

প্রথম প্রথম বাজে স্বাদের খাবার আর গালি-গালাজ, সবকিছুই অপরিচিত বলে মনে হতো তার। কিন্তু ওই যে, স্বস্তির অনুভূতিটুকু...অতটুকুই ছিল শ্যাডোর অনেক বড় পাওয়া।

এমনিতে চুপচাপ থাকতেই ভালোবাসে ও। দ্বিতীয় বছরের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে, লো কী লেস্মিথ, ওর সেলের আরেক কয়েদীকে জানাল নিজের জেল–সংক্রান্ত তত্ত্বের কথা।

লো কী মিনেসোটার এক যাযাবর, ওর কথা শুনে মুখ বিকৃত করে হেসেছিল কেবল। 'হুম,' বলেছিল লোকটা। 'খুব একটা ভুল বলনি। মৃত্যুদণ্ড পেলে ব্যাপারটা আরও ভালো বোঝা যায়।'

'তাই? আচ্ছা, এই রাজ্যে শেষ কবে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল?' জানতে চেয়েছিল শ্যাডো।

'আমি কী জানি?' লেস্মিথের কমলা-সোনালী চুল কখনও বড় হতে দেখেনি শ্যাডো। 'তবে তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। যখন এই দেশে মানুষকে ফাঁসিতে ঝোলান হতো, তখন জায়গাটা ছিল একটা নরক!'

শ্রাগ করেছিল শ্যাডো। মৃত্যুদণ্ড নিয়ে মাতামাতি করার তেমন কোন কারণ দেখে না সে।

তবে মৃত্যুদণ্ড–প্রাপ্ত না হলে, একজন কয়েদীর জেল জীবন খুব একটা খারাপ না। একেঘেয়ে দৈনন্দিন জীবন থেকে খানিকটা বিরতি বললেও অত্যুক্তি হবে না। শ্যাডোর এই ধারণাটার পেছনে কারণও আছে। প্রথম কারণ–জীবন থেমে থাকে না, কেটে যায়। রাজ-প্রাসাদে হলেও কাটে, কাটে জেলের ঘুপচিতেও। আর দুই, দাঁতে দাঁত চেপে টিকে থাকতে পারলে, একদিন না একদিন কয়েদ থেকে মুক্তি মিলবেই।

প্রথম প্রথম মুক্তির দিনটা এতদূরে ছিল যে শ্যাডো ওটা নিয়ে খুব একটা চিন্তা করত না। আস্তে আস্তে সেই দিন কাছে আসতে শুরু করল। জেলের জীবন খুব একটা নিস্তরঙ্গ নয়, তাই ঝামেলা হলে নিজেকে বোঝাত–আর বেশি দিন নেই। একদিন ওই জাদুর দরজা খুলে শ্যাডো ফিরে যাবে আগের দুনিয়ায়। তাই দিন-পঞ্জিকায় হিসাব রাখতে শুরু করল ও। ওখানকার গ্রন্থাগার থেকে অনেক খুঁজে পাওয়া একটা বই পড়ে পড়ে শিখতে শুরু করল হাত সাফাইয়ের খেলা, পুরোটাই পয়সা নিয়ে। সেই সাথে ব্যায়াম করে নিজের স্বাস্থ্য আরও পেটা বানাবার কাজটা তো আছেই। রাতের সময় নিজেকে ব্যস্ত রাখত জেল থেকে বেরোবার পর কী করবে, সেই তালিকা বানানোয়।

দিন যাচ্ছে, আর আস্তে আস্তে ছোট হতে শুরু করেছে শ্যাডোর তালিকা। বছর দুই পরে দেখা গেল, ওতে মাত্র তিনটা কাজ স্থান পেয়েছে।

প্রথম, লম্বা সময় ধরে একটা গোসল করা। পারলে কোন বাথটাবে, সাবানের ফেনার মাঝে নাক ডুবিয়ে। সেসময় ইচ্ছা করলে হয়তো খবরের কাগজ পড়বে, ইচ্ছা না হলে পড়বে না।

দ্বিতীয়ত, একটা তোয়ালে নিয়ে নিজেকে মোছা। এরপর আরামদায়ক রোব গায়ে গলাবে। মাঝে মাঝে চপ্পল পায়ে দিতে ইচ্ছা হয়, আবার মাঝে মাঝে হয় না। ধূমপান করে না বলে পাইপ টানার চিন্তা বাদ দিয়েছে। স্ত্রীকে কোলে তুলে নেবে শ্যাডো, ভয় পেয়ে ওর স্ত্রী চিৎকার করে উঠবে, 'পাপি! কী করছ!'। কিন্তু ছাড়বে না শ্যাডো। শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবে। খিদে যখন অসহনীয় হয়ে যাবে, তখন নাহয় পিজ্জার অর্ডার দেয়া যাবে।

তালিকায় থাকা সর্বশেষ কাজটার কথায় আসা যায়। কয়েকদিন পর যখন ওরা ঘর থেকে বের হবে, তখন মাথা নিচু করে চুপচাপ বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে। কোনদিন কোন ঝামেলায় জড়াবে না।

'এতে সুখী হবে?' লো কী লেস্মিথ জানতে চেয়েছিল একদিন। সেদিন ওরা কাজ করছিল জেলের দোকানে, পাখিদের খাবার ভরছিল বস্তায়।

'মানুষ কেবল তখনই সুখী হয়,' উত্তর দিয়েছিল শ্যাডো। 'যখন সে মাটির নিচে থাকে।'

'হেরোডোটাসের বাণী।' বলেছিল লো কী। 'কিছু শিক্ষা-দীক্ষা হচ্ছে দেখি!'

'এই হেরোডোটাস হারামিটা কে?' ওদের সাথে কর্মরত আইসম্যান জানতে চাইল।

'অনেক আগে মারা যাওয়া এক গ্রিক।' শ্যাডোর জবাব।

'আমার সর্বশেষ প্রেমিকাও গ্রিক ছিল।' বলেছিল আইসম্যান। 'ওরা যে কী বাল-ছাল খায়! তোমরা বিশ্বাসই করবে না।'

আইসম্যান লোকটা আকারে মোটামুটি একটা কোকের মেশিনের সমান, নীল চোখ আর প্রায় সাদা, সোনালী চুল। ওর প্রেমিকা এক বারে নাচত। সেই বারেই বাউন্সার ছিল লোকটা। আরেক অভদ্র প্রেমিকার গায়ে হাত দিয়েছিল বলে আরেকটু হলে তাকে পিটিয়েই মেরে ফেলত আইসম্যান! ফলাফল–পুলিশের আগমন। অনুসন্ধানে বের হলো, আইসম্যান মাত্র আঠারো মাস আগে জেল থেকে বের হয়েছে! কর্মের বিনিময়ে মুক্তি নামক চুক্তির আওতায় ছাড়া হয়েছিল ওকে।

'আমার আর কী করার ছিল, বলো?' আইসম্যান একদিন খেতে খেতে বলেছিল শ্যাডোকে। 'লোকটাকে বললাম, মেয়েটা আমার বান্ধবী। তারপরও হাত দিল সে! অপমান কাকে বলে! আমার কী তাকে ছেঁড়ে দেয়া উচিত ছিল?'

মাথা ঠান্ডা রাখো, দণ্ডটা পার করলেই মুক্তি। শ্যাডো তাই বলেছিল,'তাই তো।' ব্যাস, আর কোন কথা হয়নি এ প্রসঙ্গে। একটা জিনিস আগেই শিখে গিয়েছিল শ্যাডো, জেলে যার যার দণ্ড তাকেই খাটতে হয়। তার হয়ে অন্য কেউ খেটে দেয় না।

কয়েক মাস আগে শ্যাডোকে এক কপি জীর্ণ বই দিয়েছিল লেস্মিথ-হেরোডোটাসের ইতিহাস। 'বিরক্তিকর কিছু না, মজাই পাবে।' শ্যাডো নিতে অস্বীকার করায় বলেছিল। 'একবার পড়েই দেখ।'

বিরক্ত হয়েই শুরু করেছিল শ্যাডো। কিন্তু আর নামিয়ে রাখতে পারেনি।

একদিন আচমকা ট্রান্সফার হয়ে গেল লেস্মিথ! শ্যাডোর জন্য রেখে গেল হেরোডোটাসের বইটা। পাতার মাঝে একটা নিকেলও ছিল। জেলখানায় পয়সা নিষিদ্ধ, পাথর ব্যবহার করে ওটাকে ধারালো করে তোলা যায় বলে। এরপর কারও সাথে হাতাহাতি হলে তার চেহারায় চিরস্থায়ী একটা ক্ষত করে দেয়াটা একদম সহজ! তবে শ্যাডোর কোন অস্ত্রের দরকার নেই। দরকার এমন কিছু, যা ব্যবহার করে নিজের হাতজোড়াকে ব্যস্ত রাখতে পারে।

কুসংস্কার নেই ওর মাঝে। যা দেখে না, তার উপর বিশ্বাসও নেই। তারপরও মুক্তির দিন ঘনিয়ে আসতে ধরলে কেমন যেন এক অশুভ ভয় চেপে বসল ওর উপর। যে ডাকাতিটা করে ধরা খেয়েছে, সেটার আগেও হয়েছিল এই অনুভূতি। পেটের ভেতরটা যেন খামচে ধরেছিল কেউ একজন। এটাকে পুরনো জীবনে ফিরে যাবার আতঙ্ক বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল ও। কিন্তু নিশ্চিত না নিজেই। রশিতে সর্প দেখছে যেন। এমনিতে কয়েদিদের কাছে এই স্বভাবটা গুণ আর বেঁচে থাকার এক অমূল্য উপায় হিসেবেই সমাদরপায়।

আগের চাইতেও চুপ হয়ে গেল শ্যাডো। লক্ষ্য করে দেখল, নিজের অজান্তেই গার্ডদের দেহ-ভঙ্গির উপর নজর রাখছে সে। খেয়াল করছে অন্যান্য কয়েদীদেরও। বাজে একটা কিছু হতে যাচ্ছে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তাই সেই বাজে ব্যাপারটার স্বরূপ জানার জন্য সূত্র খুঁজছে এসবের মাঝে।

মুক্তির দিনটার ঠিক এক মাস আগের কথা। শ্যাডো বসে আছে একটা ঠান্ডা অফিস ঘরে, সামনে ছোট-খাটো এক ভদ্রলোক। ডেস্কের এ পাশে ও, আর ওই পাশে অন্য ভদ্রলোকটা। লোকটার হাতে একটা বলপয়েন্ট কলম, ভোঁতা দিকটা চিবানো।

'ঠান্ডা লাগছে, শ্যাডো?'

'তা একটু লাগছে বটে।'

শ্রাগ করলেন লোকটা। 'নিয়ম।' বললেন তিনি, 'ডিসেম্বরের এক তারিখের আগে ফার্নেস জ্বালানো নিষেধ। আবার বন্ধ করতে হবে মার্চের এক তারিখেই। কী আর করা, আমি তো আর নিয়ম বানাই না।' বলতে বলতেই লোকটা হাতে ধরা কাগজের ফোল্ডারে আঙুল বোলালেন। 'তোমার বয়স বত্রিশ হলো?'

'জি, স্যার।'

'দেখে তো মনে হয় না।'

'বাজে অভ্যাস নেই যে।'

'এখানে লেখা, জেলে থাকা অবস্থায় তুমি কোন ঝামেলায় জড়াওনি।'

'আমার শিক্ষা হয়েছে, স্যার।'

'তাই নাকি?' মন দিয়ে শ্যাডোর দিকে তাকালেন তিনি। একবার সে ভাবল, ভদ্রলোককে সব কথা বলেই দেয়। কিন্তু চুপ করে রইল, মাথা ঝাঁকাল কেবল।

'তুমি বিবাহিত, শ্যাডো?'

'হ্যাঁ। আমার স্ত্রীর নাম লরা।'

'ওদিকে কোন সমস্যা নেই তো?'

'না, স্যার। অনেকদূর থেকে আমাকে মাঝে মাঝে দেখতে আসে মেয়েটা। চিঠিও আদান-প্রদান করি আমরা, সম্ভব হলে দুই-একটা ফোনও।'

'কী করে তোমার স্ত্রী?'

'ও ট্রাভেল এজেন্ট, স্যার।'

'দেখা হলো কীভাবে?'

লোকটার এই আকস্মিক প্রশ্নের কারণ বুঝতে পারল না শ্যাডো। একবার ভাবল, মুখের উপর বলে দেয় যেন তিনি এতে নাক না গলান। কিন্তু তা না বলে বলল, 'আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধুর স্ত্রীর সবচেয়ে কাছের বান্ধবী ও। ওদের মাধ্যমেই পরিচয়।'

'এখান থেকে বেরোবার পর কাজ পাবে?'

'জি, স্যার। আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু রবি, ওর একটা ব্যায়ামাগার আছে। আমি ওখানেই কাজ করতাম। ও বলেছে, চাইলে আমি আবার কাজে যোগ দিতে পারি।'

ভ্রূ কুঁচকে উঠল লোকটার, 'তাই?'

'রবি বলছে, আমি গেলে নাকি পুরনো গ্রাহকরা ফিরে আসবে!'

ভদ্রলোককে সন্তুষ্ট বলে মনে হলো। বল পয়েন্ট কলমটা কামড়ে ধরে উল্টালেন একদম শেষ পাতাটা। 'যে অপরাধ করেছ, সেটার ব্যাপারে এখন তোমার কী মত?'

কাঁধ ঝাঁকাল শ্যাডো। 'আমি বোকার মতো কাজ করেছি।' মন থেকেই বলল সে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা তালিকার কিছু লাইনে টিক দিলেন লোকটা। এরপর কাগজ উল্টিয়ে বললেন, 'বাড়িতে যাবে কী করে?'

'বিমানে, স্যার। স্ত্রী ট্রাভেল এজেন্ট হবার কিছু বাড়তি সুবিধা আছে।'

আবার ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন লোকটা। 'টিকেট পাঠিয়েছে?'

'দরকার হয়নি। নিশ্চিত করার জন্য একটা নাম্বার দিয়েছে-ইলেকট্রনিক টিকেটের নাম্বার। এক মাস পর বিমান বন্দরে গিয়ে আমার পরিচয়পত্রটা দেখালেই হবে।'

নড করল লোকটা, শেষবারের মতো কিছু একটা লিখে নিয়ে নামিয়ে রাখলেন কলম। সাদাটে দুটো হাত নেমে এলো একটা ধূসর ডেস্কে। হাত দুটো একটি আরেকটার মাঝে ঢুকিয়ে স্পর্শ করলেন কপাল। এরপর হালকা বাদামী রঙের চোখজোড়া দিয়ে একদৃষ্টিতে শ্যাডোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি সৌভাগ্যবান। তোমার ফেরার অপেক্ষায় কেউ না কেউ বসে আছে। আরেকটা সুযোগ এসেছে তোমার সামনে। এর সদ্ব্যবহার করো।'

শ্যাডোকে বিদায় দেবার সময় দাঁড়ালেন না তিনি, করমর্দনের জন্য বাড়িয়ে দিলেন না হাতটাও। অবশ্য শ্যাডো ওসব আশাও করেনি।

গত সপ্তাহটা একদম বাজে গিয়েছে। এক হিসেবে সারাটা বছরও এতটা বাজে যায়নি। আবহাওয়া তার একটা কারণ হতে পারে– ঠান্ডা পরিবেশ যে কাউকে হতাশ করে তুলবে। মনে হচ্ছিল যেন ঝড় আসছে! কিন্তু না, আসেনি এখনো। কেমন একটা অদ্ভুত বোধ হচ্ছে ওর।

স্ত্রীকে ফোন দিল ও, বিলটা লরাই দেবে। শ্যাডো জানে, ফোন কোম্পানিরা জেলখানা থেকে করা প্রতিটা ফোনের বিলের সাথে তিন ডলার যোগ করে দেয়। এজন্যই তাদের ব্যবহার এত ভদ্র।

'কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে সব,' লরাকে জানাল সে। তবে একদম প্রথমেই না। প্রথম কথাটা ছিল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' স্ত্রীর সাথে যে কোন বাক্য-বিনিময়ের শুরুতে এর চাইতে দারুণ আর কিছু হয় না! আর যদি সেগুলো অন্তর থেকে আসে, তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

শ্যাডো অন্তর থেকেই বলেছিল কথাগুলো।

'হ্যালো,' বলল লরা। 'আমিও তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু কী অদ্ভুত ঠেকছে?'

'জানি না,' বলল শ্যাডো। 'হয়তো আবহাওয়াটাই অদ্ভুত। আমার ধারণা, ঝড় হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'এখানের আবহাওয়া কিন্তু ভালো।' জানাল মেয়েটা। 'গাছের সব পাতা এখনো ঝরে পড়েনি। ঝড়-টড় না হলে, বাড়িতে এসে তুমিও দেখতে পাবে।'

'আর তো পাঁচ দিন।'

'হ্যাঁ, একশ বিশ ঘণ্টা।'

'তোমার কী অবস্থা, সব ঠিক আছে?'

'সব ঠিকই আছে।' জানাল লরা। 'আজ রাতে রবির সাথে দেখা হবে। তোমার ফিরে আসা উপলক্ষে আমরা একটা সারপ্রাইজ পার্টির আয়োজন করেছি।'

'সারপ্রাইজ পার্টি?'

'অবশ্যই। তুমি কিন্তু ওটার ব্যাপারে কিছু জানো না, বুঝলে তো?'

'বুঝলাম, কিচ্ছু জানি না!'

'এই না হলে আমার স্বামী।' বলল লরা। শ্যাডো বুঝতে পারল, হাসি ফুটেছে ওর মুখে। তিন বছর হয়ে গেল, এখনো ওকে হাসাতে পারে মেয়েটা।

'ভালোবাসি তোমায়।'

'আর আমি তোমায়, পাপি।' ফোন রাখল লরা।

বিয়ের পরপরই লরা বলেছিল শ্যাডোকে, ছোট আকারের একটা বাচ্চা কুকুর বা পাপি ওর চাই-ই চাই। কিন্তু বাড়িওয়ালা দিয়ে বসল বাগড়া। চুক্তিপত্র বের করে দেখাল, পশু পালনের অনুমতি তাদের নেই। 'বাদ দাও,' বলেছিল সেদিন শ্যাডো। 'আমি তোমার পাপি হবো! বলো, কী করলে খুশি হও? তোমার চপ্পলগুলো চিবাবো? ভিজিয়ে দেব রান্নাঘরের দরজা? নাকি নাকটা একটু চেটে দেব? বাজি ধরে বলতে পারি, কোন আসল পাপি যা যা করতে পারবে, তোমার এই নকল পাপিও তাই তাই পারবে!' কোলে তুলে নিয়েছিল সেদিন স্ত্রীকে। নাক আর কানে স্পর্শ করেছিল জিহ্বা, দুষ্টুমি শেষ হয়েছিল বিছানায় গিয়ে।

খাবারের সময় শ্যাডোকে দেখে হাসল স্যাম ফেটিসার। ওর পাশে বসে খেতে শুরু করল ম্যাকারনি আর পনির। 'কথা বলা দরকার আমাদের।' স্যাম ফেটিসার বলল।

লোকটা সম্ভবত শ্যাডোর দেখা সবচেয়ে কালো মানুষ। বয়স ষাট হলেও হতে পারে, আশি হলেও হতে পারে! তবে এমন অনেক ত্রিশ বছর বয়সী মাদকাসক্তকেও দেখেছে শ্যাডো, যাদের বয়স স্যামের চাইতে বেশি বলে ভ্রম হয়।

'উম?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'ঝড় আসছে।'

'তাই তো মনে হয়, তুষারপাত হতে পারে।'

'উহু, ওই ঝড়ের কথা বলছি না। যখন আসল ঝড়টা আসবে, তখন এখানে না থেকে রাস্তায় থাকলেই ভালো করবে।'

'আমার সময় শেষ,' বলল শ্যাডো। 'শুক্রবারে ভাগছি।'

শ্যাডোর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল স্যাম ফেটিসার। 'তুমি কোথাকার লোক?'

'ইণ্ডিয়ানার, ঈগল পয়েন্টে বাড়ি।'

'হায়রে মিথ্যাবাদী,' বলল স্যাম। 'আদি বাড়ি কই?'

'শিকাগো।' শ্যাডোর মা কমবয়সে শিকাগোতে থাকতেন। অনেক আগেই মারা গিয়েছেন।

'যা বলছিলাম, বিশাল এক ঝড় আসছে। মাথা নত করে রাখো, বাছা। ঝড়টা মনে করো...আচ্ছা, ওই যে মহাদেশগুলো যে জিনিসটার উপর বসে আছে, ওটার নাম যেন কী?'

'টেকটনিক প্লেট?' আন্দাজে বলল শ্যাডো।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওটাই। উত্তর আমেরিকার প্লেট যদি দক্ষিণ আমেরিকার উপর চড়ে বসে, তাহলে অবস্থা কী হবে? এই ঝড়টাও তেমনই। বুঝতে পারছ?'

'একদম না।'

ছোট টিপ দিল যেন বাদামী একটা চোখ। 'সাবধান করিনি, পরে আবার এ কথা বলো না।' কমলা জেল-ও নামক জেলি ভর্তি একটা চামচ মুখে দিল স্যাম ফেটিসার।

'বলব না।'

রাতটা আধো-ঘুম, আধো-জাগরণে কেটে গেল শ্যাডোর। নতুন সেলমেট নিচের বাঙ্কে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। কয়েক সেল দূরের এক লোক গুঙিয়ে উঠছে থেকে থেকে, মনে হচ্ছে যেন ও কোন মানুষ নয়, পশু! অন্য কোন সেলের কয়েদী ধমকে উঠছে মাঝে-মধ্যে, চুপ করতে বলছে বেচারাকে। আওয়াজটা না শোনার চেষ্টা করল শ্যাডো, সময়ের হাতে ছেড়ে দিল নিজেকে।

আর মাত্র দুই দিন...আটচল্লিশ ঘণ্টা। নাস্তা খেতে বসেছে ও, মুখে ওটমিল আর হাতে কারাগারের কফি। এমন সময় কারারক্ষী উইলসন এসে প্রয়োজনের চাইতে জোরে চাপড় বসাল শ্যাডোর কাঁধে। 'শ্যাডো, আমার সাথে এসো।'

আচমকা এই ডাকার কারণ কী হতে পারে?নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করল শ্যাডো। চুপ করে রয়েছে বিবেক, মনে হয় না কোন গোলমাল করেছে ও। তবে কারাগারে এই নিস্তব্ধতার কোন অর্থ নেই। হয়তো বড় কোন বিপদে জড়িয়ে পড়তে চলছে। পুরাতন কফির ন্যায় তিক্ত একটা স্বাদ পেল গলা জুড়ে।

খারাপ কিছু একটা আসন্ন...

মস্তিষ্কের ভেতরে বাস করা কণ্ঠটা বলে চলছে, সম্ভবত আরেক বছর বাড়ানো হচ্ছে ওর শাস্তি। তার তা না হলে ওকে সলিটারিতে পাঠানো হচ্ছে। কে জানে, হয়তো হাত-মাথা কেটে ফেলার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শ্যাডোকে। নিজেকে ধমক দিল যুবক, বোকামি করছে যে তা বুঝতে পারছে। কিন্তু হৃদপিণ্ড কি আর মানে? পাগলা ঘোড়ার বেগে ছুটছে বেচারা।

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, শ্যাডো।' হাঁটতে হাঁটতে বলল উইলসন।

'কী বুঝতে পারেন না, স্যার?'

'তোমাকে। তুমি কেন যেন একটু বেশিই চুপচাপ, একটু বেশিই শান্ত। বয়স কত তোমার? পঁচিশ? আটাশ? অথচ চলাফেরায় বুড়োদেরকেও হার মানাও!'

'বত্রিশ, স্যার।'

'তুমি আসলে কী বলো তো? জিপসি? নাকি স্পিক?'

'তা আমার জানা নেই, স্যার। হতে পারি।'

'নাকি নিগ্রোদের রক্তের?'

'তা-ও হতে পারে, স্যার।' সামনের দিকে তাকিয়ে হাঁটছে শ্যাডো, লোকটার কথায় যে রেগে উঠছে তা বুঝতে দিতে চায় না।

'যাই হোক, তোমাকে দেখলেই আমার অস্বস্তি হয়।' উইলসনের মাথার চুল সোনালী, চেহারাতেও তেমন একটা ছাপ। 'জলদিই মুক্তি পাচ্ছ শুনলাম?'

'আমার তাই আশা, স্যার।'

বেশ কয়েকটা চেকপয়েন্ট পড়ল পথে, প্রত্যেকবার নিজের আইডি দেখাতে হলো উইলসনকে। একটা সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা মাত্র দেখা গেল, ওয়ার্ডেনের অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। জি. প্যাটারসন, ওয়ার্ডেনের নাম, কালো অক্ষরে খোদাই করা দরজায়। দরজার পাশেই ঝুলছে একটা ছোট ট্রাফিক লাইট।

এই মুহূর্তে লাল বাতি জ্বলে রয়েছে ওটায়।

ট্রাফিক লাইটের নিচে অবস্থিত একটা বোতাম চাপল উইলসন।

কয়েক মিনিট চুপচাপ ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইল দুজন। শ্যাডো নিজেকে শান্ত রাখার প্রয়াস পেল। বারবার বলল, সব কিছু ঠিক আছে। শুক্রবার সকালে ও ঈগল পয়েন্টগামী বিমানে উঠে বসবে। কিন্তু কেন জানি নিজেকেই বিশ্বাস হলো না।

লাল বাতি বন্ধ হয়ে জ্বলে উঠল সবুজ বাতি, দরজা খুলে ওকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল উইলসন।

গত তিন বছরে হাতে গোণা কয়েকবার ওয়ার্ডেনকে দেখেছে শ্যাডো। একবার ভদ্রলোক এক রাজনীতিবিদকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন সব কিছু। আরেকবার লকডাউনের সময় সবাইকে এক করেবলেছিলেন, কারাগারে কয়েদীর সংখ্যা ধারণ ক্ষমতার চাইতে অনেক বেশি। আর যেহেতু নিকট ভবিষ্যতে অপরাধ বা কয়েদীর সংখ্যা কমার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, তাই আবাসনের এই অবস্থা মেনে নিলেই ওরা ভালো করবে।

কাছ থেকে কেমন যেন অসুস্থ দেখায় প্যাটারসনকে। মুখটা গোলাকার, চুলগুলো সামরিক কায়দায় ছোট ছোট করে কাটা। গা থেকে ওল্ড স্পাইস স্প্রের গন্ধ আসছে। ভদ্রলোকের পেছনে সারি বাঁধা বই। সবগুলোর নামে 'কারাগার' শব্দটা লেখা আছে। ডেস্কটা নিখুঁতভাবে পরিষ্কার রাখা। কেবল একটা টেলিফোন আর ক্যালেণ্ডার দেখতে পেল শ্যাডো। ডান কানে ঝুলছে একটা হেয়ারিং এইড, কানে কম শোনেন ওয়ার্ডেন!

'দয়া করে বসো।'

বসল শ্যাডো, উইলসন ওর পেছনে দাঁড়িয়ে রইল।

ডেস্কের ড্রয়ারগুলো একটা ফাইল বের করে আনলেন ওয়ার্ডেন, রাখলেন নিজের সামনে। 'মারামারি আর ডাকাতির দায়ে তোমাকে ছয় বছরের জেল

দেয়া হয়েছিল। তার মাঝে তিন বছর কয়েদ খেটেছ। শুক্রবারে তোমার ছাড়া পাবার কথা ছিল।'

কথা ছিল?

শ্যাডোর মনে হলো, কেউ যেন ওর পেট খামচে ধরেছে। আরও কয় বছর কারাগারে থাকতে হবে কে জানে! এক বছর? নাকি দুই বছর? তিন বছরই না তো? কিন্তু মুখ দিয়ে কেবল বলল, 'জি, স্যার।'

জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট চাটলেন ওয়ার্ডেন। 'কী বললে?'

'বললাম–জি, স্যার।'

'শ্যাডো, আমরা তোমাকে আজ বিকালেই ছেড়ে দিচ্ছি।' নড করল শ্যাডো, নিজের সৌভাগ্য নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না। ওয়ার্ডেন তার ডেস্কে রাখা ফাইলটার দিকে তাকালেন। একটা কাগজ বের করে বললেন, 'এই কাগজটা ঈগল পয়েন্টের জনসন মেমোরিয়াল হাসপাতাল থেকে এসেছে। তোমার স্ত্রী...আজ সকালে মারা গিয়েছে। গাড়ি দুর্ঘটনায়। আমি দুঃখিত।'

আবারও কেবল নড করল শ্যাডো।

উইলসনের প্রহরায় সেলে ফিরে এলো শ্যাডো, পুরো সময়টায় একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি। প্রহরী দরজা খুলে দিলে ভেতরে প্রবেশ করল সে। আচমকা উইলসন বলে উঠল, 'সুসংবাদ-দুঃসংবাদ একসাথে পেলে, তাই না? আগে আগে ছাড়া পাচ্ছ, এটা সুসংবাদ। আবার স্ত্রী মারা গিয়েছে, এটাকে দুঃসংবাদ না বলে উপায় নেই।' হাসতে শুরু করল লোকটা, যেন এর চাইতে মজার কিছু আর হয় না।

তবুও কিছু বলল না শ্যাডো।

ধীরে সুস্থে নিজের সবকিছু গুছিয়ে নিল যুবক, অবশ্য প্রায় সবই দান করে দিয়েছে। লো কী'র হেরোডোটাস আর হাত সাফাইয়ের বইটাও নিল না। বিবেকের তাড়নায় রেখে গেল ছোট ধাতব একটা চাকতিও, পয়সার জায়গায় ওটা নিয়েই অনুশীলন করত শ্যাডো। বাইরের দুনিয়ায় অবশ্য আসল পয়সার অভাব হবে না কোন। দাড়ি কামিয়ে নিয়ে তিন বছরের মাঝে এই প্রথম গায়ে চড়াল স্বাভাবিক পোশাক। অনেকগুলো দরজা পার হয়ে যেতে হলো ওকে, জানে–আর কখনও ফিরে আসবে না।

হাড় কাঁপানো ঠান্ডা বৃষ্টি ঝরতে শুরু করেছে আসমান থেকে। শ্যাডোর চেহারায় হুল ফুটিয়ে যাচ্ছে যেন, ওর ওভারকোটও রক্ষা পায়নি–ভিজে একশা। আস্তে আস্তে প্রাক্তন স্কুল বাসটার দিকে এগিয়ে গেল ও, কাছের শহর পর্যন্ত ওটাতে করেই যেতে হবে।

আজ মোট আটজন মুক্তি পাচ্ছে জেল থেকে, আটজনই পুরোপুরি ভিজে গিয়েছে বৃষ্টিতে; পেছনে রেখে যাচ্ছে আরও পনের শো কয়েদীকে। হিটার চালু হতে সময় লাগল কিছুক্ষণ। এই কিছুক্ষণ বাসের সিটে বসে কাঁপতে হলো ওদের। শ্যাডোর অবশ্য সেদিকে মন নেই। কী করছে, কোথায় যাবে–এসব নিয়েই ভাবছে।

অপ্রাকৃত কিছু দৃশ্য এসে ভরিয়ে তুলল ওর মন। কল্পনার সেই দৃশ্যতে দেখল–শ্যাডো এখনও কয়েদী! তবে অন্য কোন জেলে...অন্য কোন সময়ে।

সেই জেলে দীর্ঘদিন ধরে অন্ধকারে কয়েদ করে রাখা হয়েছে তাকে। চুল-দাড়িতে বন্য পশুর মতো দেখাচ্ছে ওকে। প্রহরীরা ওকে একটা ধূসর সিঁড়ি দিয়ে একটা প্লাযায় নিয়ে এলো। মানুষ আর জিনিস-পত্রে ভর্তি জায়গাটা। হাটের দিন সেদিন, অনেকদিন পর আচমকা এত শব্দ আর রঙের মাঝখানে উপস্থিত হওয়ায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল বেচারা। তবে কিছুক্ষণের জন্য কেবল, এরপর বুক ভরে নিতে শুরু করল লবণাক্ত বাতাস। চোখ ভরে দেখতে শুরু করল চারপাশের দৃশ্য। ওর বাঁ হাতের দিকে একটা জলাধার দেখা যাচ্ছে, ওটার পানিতে ফুটে আছে সূর্যের প্রতিবিম্ব...

আচমকা থমকে দাঁড়াল বাসটা, সামনের সিগন্যালে লাল বাতি জ্বলছে।

বাতাস চিৎকার করছে বাসটাকে ঘিরে,ওয়াইপারগুলো আপ্রাণ চেষ্টা করেও উইণ্ডশীল্ডটাকে পরিষ্কার রাখতে পারছে না। বিকাল শুরু হয়েছে কেবল, কিন্তু কাঁচের ফাঁকে মনে হচ্ছে যেন রাত নেমেছে।

'এই,' শ্যাডোর পেছনে বসা এক লোক আচমকা কাঁচ ঘষতে ঘষতে বলল, 'মেয়েমানুষ দেখা যায়!'

ঢোক গিলল শ্যাডো। বুঝতে পারল, এখন পর্যন্ত একফোঁটা অশ্রু বেরোয়নি ওর চোখ দিয়ে। আসলে, এখন পর্যন্ত কোন অনুভূতিই খেলা করেনি ওর মনে। না দুঃখ, না অনুতাপ। কিচ্ছু না।

খেয়াল করল, অবচেতন মনে জনি লার্চ নামক এক কয়েদির কথা ভাবছে ও। লোকটা ছিল ওর প্রথম সেলমেট। একদিন সে অদ্ভুত এক গল্প শুনিয়েছিল শ্যাডোকে। বলেছিল, পাঁচ বছর জেল খাটার পর, একশ ডলার আর সিয়াটলের একটা টিকিট হাতে নিয়ে ছাড়া পেয়েছিল সে। ওর বোন থাকত সিয়াটলে। তাই সরাসরি বিমান বন্দরে গিয়ে কাউন্টারে বসা মেয়েটার হাতে টিকিট দিয়েছিল জনি। বিনিময়ে মেয়েটা চেয়েছিল ওর ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখতে।

জিনিসটা সাথেই ছিল জনির, বের করে দেখাল। কিন্তু মেয়েটা জানাল, কয়েক বছর আগে মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় ওটা এখন আর কার্যকর নেই! জনি

উত্তরে বলল, 'মেয়াদোত্তীর্ণ হতে পারে, তবে পরিচয়পত্র হিসেবে তো যথেষ্ট, তাই না?'

আচমকা বলে উঠেছিল মেয়েটা, 'উঁচু গলায় কথা না বলার জন্য ধন্যবাদ।'

খেপে গেল জনি, জানাল-ভালোয় ভালোয় বোর্ডিং পাস না দিলে বেচারি পরে আফসোস করবে।

হঠাত দেখে, বিমান বন্দরের রক্ষীবাহিনি চারদিক থেকে ওকে ঘিরে ধরেছে! মেয়েটা যে কখন তাদের ডেকেছে, তা টেরই পায়নি বেচারা। জনি লার্চকে চুপচাপ বিমান বন্দর ছাড়ার পরামর্শ দিল তারা। কিন্তু সে কি আর মানে? এরপর যা হবার তাই হলো, শুরু হলো হাতাহাতি।

জনি লার্চের আর সিয়াটলে যাওয়া হয়নি। পরবর্তী কয়েকটা দিন বারে বারে মদ খেয়ে কাটিয়ে দিল সে। একশ ডলার ফুরিয়ে যেতে খেলনা একটা বন্দুক নিয়ে চলে গেল এক গ্যাস স্টেশনে ডাকাতি করতে। পুলিশ যখন ওকে ধরে, তখন বেচারা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পেশাব করছে। অচিরেই জেলে ফিরে এলো সে।

এই গল্পের শিক্ষা হলো, অন্তত জনি লার্চের মতে-বিমান বন্দরে যারা কাজ করে, তাদের সাথে পাঙ্গা নিতে যেও না।

স্মৃতিটা মনে পড়ে যেতেই হাসি ফুটে উঠল শ্যাডোর মুখে। ওর নিজের লাইসেন্সের মেয়াদ এখনও বেশ কয়েক মাস আছে।

'বাস স্টেশন! যাত্রীরা নামুন!'

প্রস্রাব আর বিয়ারের গন্ধে ভুরভুর করছে দালানটা। একটা ট্যাক্সিতে চড়ে বিমানবন্দরের দিকে যেতে বলল ও ড্রাইভারকে। সেই সাথে কথা না বলার পুরষ্কার হিসেবে যে পাঁচ ডলার হাতে নিয়ে বসে আছে, তা জানাতেও ভুলল না। বিশ মিনিটের মাঝে ট্যাক্সি পৌঁছে গেল বিমান বন্দরে। পুরোটা সময় চুপ করে বসে ছিল ড্রাইভার।

কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল, বিমান বন্দরের টার্মিনাল ধরে ধাক্কা খেতে খেতে এগোচ্ছে শ্যাডো। ইন্টারনেটে কেনা টিকেটটা কাজ করবে কিনা, সেটা নিয়ে একটু ধন্দে পড়ে গেল বেচারা। তার উপর শুক্রবারের টিকেট কেনা হয়েছে, আজকের না। আসলে যেকোন ইলেকট্রনিক বস্তুই শ্যাডোর কাছে যেন জাদুর আখড়া। কোন সময় যে বাতাসে মিলিয়ে যাবে, কে জানে!

তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম পেছনের পকেটে ওয়ালেটের অস্তিত্ব অনুভব করছে ও। ওতে মেয়াদোত্তীর্ণ কয়েকটা ক্রেডিট কার্ড আর জানুয়ারি পর্যন্ত মেয়াদ থাকা একটা মাত্র ভিসা কার্ড রয়েছে। তবে জিনিসটার উপস্থিতি যেন বাড়তি সাহস যোগাচ্ছে যুবককে। রিজার্ভেশন নাম্বার লেখা কাগজটাও আছে ওতে। একবার কোনক্রমে বাড়ি পৌঁছাতে পারলে হয়! লরা মনে হয় ঠিকই আছে, ওকে

কয়েকদিন আগে বের করার জন্য দুর্ঘটনার নাটক সাজিয়েছে কেবল! অবশ্য সরকার কর্মচারীদের কথা বলা যায় না, অন্য কোন লরা মুনের সাথে ওর স্ত্রীকে গুলিয়েও ফেলেতে পারে।

বিমান বন্দরের বাইরে, আকাশে থেকে থেকে দেখা যাচ্ছে বজ্রের আলো। শ্যাডো বুঝতে পারল, দম বন্ধ করে আছে ও। যেন অপেক্ষা করছে অভাবনীয় কিছুর। দূর থেকে একটা বজ্রপাতের আওয়াজ ভেসে আসতেই দম ছাড়ল সে। টের পেল, কাউন্টারের ওপাশ থেকে এক ক্লান্ত সাদা মহিলা ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

'হ্যালো,' বলল শ্যাডো। গত তিন বছরে আপনিই প্রথম মহিলা যার সাথে আমার কথা হচ্ছে, মনে মনে বলল ও। 'আমার কাছে একটা ই-টিকেট নাম্বার আছে। আমার শুক্রবার বিমানে চড়ার কথা ছিল। কিন্তু আজকেই যেতে হবে, আমার এক আত্মীয়া মারা গিয়েছেন।'

'আহা!' সান্ত্বনার সুরে বলল মহিলা। কী-বোর্ডে খটাখট কী সব টাইপ করে স্ক্রিনের দিকে তাকাল। 'কোন সমস্যা নেই। সাড়ে তিনটার বিমানে আপনার যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তবে ঝড়ের জন্য ছাড়তে দেরি হতে পারে, দয়া করে স্ক্রিনে নজর রাখবেন। কোন মাল-পত্র আছে সাথে?'

কাঁধে ঝোলানো একমাত্র ব্যাগটা তুলে ধরল শ্যাডো। 'এটা বইতে তো কোন অসুবিধা নেই, নাকি?'

'নাহ,' জানাল মহিলা। 'আপনার সাথে ছবিওয়ালা কোন পরিচয় পত্র আছে?'

ড্রাইভিং লাইসেন্সটা বের করে দেখাল শ্যাডো।

বিমান বন্দরটা আকারে খুব একটা বড় না হলেও, মানুষের সংখ্যা খুব একটা কম না। বসে বসে তাদের আনাগোনা দেখল ও। কেউ ব্যাগ নামিয়ে রাখছে, কেউ আবার ওয়ালেটটা সাবধানে ঢুকিয়ে রাখছে পেছনের পকেটে। কেউ কেউ তো একবার যে পার্স মেঝেতে নামিয়ে রাখছে, ওদিকে তারপর আর তাকাচ্ছেই না!

এতক্ষণে শ্যাডো বুঝতে পারল, জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে ও!

বিমানে ওঠার এখনও আধ ঘণ্টা বাকি আছে। এক স্লাইস পিজ্জা কিনে খেতে বসল ও, পনির যে এত গরম হবে তা বুঝতে পারেনি বলে পুড়িয়ে ফেলল জিহ্বা। পকেট হাতড়ে কয়েকটা পয়সা বের করে চলে গেল ফোন বুথের কাছে। রবিকে ব্যায়ামাগারের নাম্বারে ফোন করল ও, কিন্তু উত্তর দিল অ্যানসারিং মেশিন।

'হেই, রবি,' বলল শ্যাডো। 'শুনছি, লরা নাকি মারা গিয়েছে! আমাকে তাই আগে আগেই মুক্তি দিয়েছে জেল থেকে, বাড়ি ফিরছি।'

তারপর, ফোন করল বাড়ির নাম্বারে। এরকম ভুল মানুষই করে, ও নিজেও করতে দেখেছে অনেককে। কিন্তু লরার কণ্ঠ শুনে যেন সব ভুলে গেল।

'হাই,' বলছে মেয়েটা। 'আমি বাড়িতে নেই বা এই মুহূর্তে ধরতে পারছি না। ম্যাসেজ রেখে দিন, আমি পরে ফোন করছি। দিনটা আপনার ভালো কাটুক।'

ম্যাসেজ দিতে পারল না শ্যাডো।

ফিরে এসে গেটের কাছে একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে বসল ও, এত জোড়ে বুকের সাথে আঁকড়ে ধরল ব্যাগটাকে যে ব্যথা করতে শুরু করল হাত।

লরাকে সেই প্রথম দেখার স্মৃতিটা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। তখন অবশ্য ও মেয়েটার নামও জানত না। অড্রি বার্টনের বান্ধবী ছিল লরা। চিচির দোকানে রবির সাথে বসে ছিল শ্যাডো, এমন সময় অড্রির পিছু পিছু ওদের কাছে এসেছিল মেয়েটা। ওর মনে আছে, প্রথম কয়েক মুহূর্ত যেন পলক ফেলতে ভুলতে গিয়েছিল ও! লম্বা বাদামী চুল আরও প্রস্ফুটিত করে তুলেছিল লরার নীলচে চোখজোড়াকে। শ্যাডোর তো মনে হয়েছিল, মেয়েটা বুঝি রঙিলা লেন্স পরে আছে!

সে রাতে চুমো খেয়ে একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল ওরা, তখনই বুঝে গিয়েছিল শ্যাডো-কখনও আর কাউকে চুমো খাবার দরকার নেই ওর।

আমচকা ভেসে আসা একটা নারী কণ্ঠ কেড়ে নিল ওর মনোযোগ, বিমানে চড়ার সময় হয়েছে। একদম পেছনের সারির একটা সিট পেয়েছে শ্যাডো, আশেপাশে প্রায় সবগুলোই খালি। বৃষ্টি ঝরছে তো ঝরছেই, বিমানের পাশেও পানি আছড়ে পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও।

বিমান আকাশে ভাসলে, ঘুমিয়ে পড়ল যুবক।

অন্ধকার এক জায়গায় রয়েছে ও। শ্যাডোর চোখে চোখ রেখে যে প্রানিটা তাকিয়ে আছে, তার মাথাটা মহিষের মতো। বড়, ভেজা চোখ দুটো ভরে আছে ঘৃণা আর রাগে। দেহটা অবশ্য মানুষের, তেল চকচকে।

'আসছে পরিবর্তন,' ঠোঁট না নাড়িয়েই বলল মহিষ। 'খুব দ্রুতই কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে তোমাকে।'

মশালের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে গুহার দেয়ালে।

'আমি কোথায়?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'পৃথিবীতে, আবার পৃথিবীর অভ্যন্তরেও বলতে পারো।' মহিষ-মানব জানাল। 'বিস্মৃতিরা যেখানে অপেক্ষা করে, সেখানে আছ তুমি।' চোখগুলো যেন গলিত মার্বেলের রূপ ধারণ করেছে। কণ্ঠ গমগমে, মনে হয় ভেসে আসছে ভূ-গর্ভস্থ কোন গুহা থেকে। ভেজা গরুর গন্ধ নাকে

পাচ্ছে শ্যাডো। 'বিশ্বাস করো!' গমগমে কণ্ঠে ওকে আদেশ করল ওটা। 'বিশ্বাস করো, নইলে মরবে।'

'কী বিশ্বাস করব?' জানতে চাইল শ্যাডো। 'বিশ্বাস রাখব কীসে?'

এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইল মহিষ-মানব। আস্তে আস্তে ওর চোখের সামনেই বাড়তে শুরু করল তার আকৃতি। চোখে আগুনে দৃষ্টি নিয়ে জবাব দিল। 'সব কিছুতে।'

নড়ে উঠল শ্যাডোর দুনিয়া, স্বপ্ন ভেঙ্গে আবার বিমানে এসে উপস্থিত হলো। কিন্তু না, বিমানটাও নড়ছে! সামনের সারিতে বসা এক মহিলা চিৎকার করতে করতেই আবার থেমে গেল।

বিমানকে ঘিরে নাচছে বজ্রের লকলকে জিহ্বা। ইন্টারকমে ক্যাপ্টেন জানালেন, আরেকটু উঁচুতে ওঠার চেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি। নইলে এই ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না।

থেকে থেকে কেঁপে উঠছে বিমান। শ্যাডো অলস ভঙ্গিতে ভাবল, এখন মারা গেলে কেমন হয়? সেই সম্ভাবনা খুব কম হলেও, একেবারে অসম্ভব না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও, এসব ভাবার চাইতে বজ্র-নৃত্য দেখা ভালো।

আবার ঘুমিয়ে পড়ল যুবক, এবার স্বপ্নে দেখতে পেল-জেলে ফিরে গিয়েছে। খাবার নেবার লাইনে ওর পেছনে দাঁড়িয়ে লো কী ফিসফিস করে জানাচ্ছে, কেউ একজন ওকে হত্যা করার জন্য অনেক টাকা দেবার প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু কে বা কেন, তা জানার আগেই জেগে উঠল ও। এবারে কিন্তু ঝড়ের কোন হদিস নেই, নিরাপদেই ল্যাণ্ড করল বিমান।

হাঁচড়েপাঁচড়ে বিমান থেকে নামল শ্যাডো।

সব বিমান বন্দরই দেখতে এক রকম, ভাবল ও। এটাও তার ব্যতিক্রম নয়। সেই একই টাইলস, সেই একই হাঁটার রাস্তা। তবে সমস্যা হলো, এখানে ওর আসার কথা না। এটা অনেক বড় একটা বন্দর, অনেক বেশি মানুষের ভিড় এখানে। গেটের সংখ্যাও প্রচুর।

'ম্যাম, একটু শুনবেন?'

ক্লিপবোর্ডের উপর দিয়ে ওর দিকে তাকাল মহিলা। 'বলুন।'

'এই বিমান বন্দরের নাম কী?'

অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মহিলা, যেন ও ঠাট্টা করছে কিনা তা বুঝতে পারছে না। বেশ কিছুক্ষণ পর জবাব এলো, 'সেন্ট লুইস।'

'আমার তো ধারণা ছিল, আমার বিমান ঈগল পয়েন্টে নামবে।'

'কথা তো তা-ই ছিল। তবে ঝড়ের জন্য এখানে নামতে বাধ্য হয়েছে। কেন, ক্যাপ্টেন জানাননি?'

'জানিয়েছেন হয়তো। আমি আসলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'তাহলে ওই যে...লাল কোট পরা ভদ্রলোকের সাথে কথা বলুন।'

'লাল কোট পরা ভদ্রলোক' লম্বায় শ্যাডোর প্রায় সমান। কম্পিউটারে কিছু একটা দেখেই সে শ্যাডোকে বলল দৌড়াতে! টার্মিনালের অন্য দিকের একটা গেটে যত দ্রুত সম্ভব চলে যেতে বলল ওকে।

বিমানবন্দরের মাঝখান দিয়ে দৌড়ে গেল শ্যাডো, কিন্তু লাভ হলো না। ও পৌঁছাবার আগেই ওপাশের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বেচারার চোখের সামনেই আস্তে আস্তে উড়াল দিল বিমান।

যাত্রীদের সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করা মহিলা (যে ছোটখাটো আর যার নাকের পাশে একটা আঁচিল আছে) আরেক মহিলার সাথে কথা বলে কোথায় যেন ফোন করল (নাহ, ওই বিমানটা আজ আর ছাড়ছে না)। কীসব দেখে নিয়ে আরেকটা বোর্ডিং কার্ড প্রিন্ট করল সে। 'এটা নিয়ে যান,' শ্যাডোকে জানান হলো। 'আমরা বলে রাখছি যে আপনি যাচ্ছেন।'

শ্যাডোর মনে হলো, ওকে নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। আবার দৌড়ে বিমান বন্দরের অন্য প্রান্তে চলে এলো ও। অথচ এখানেই প্রথম নেমেছিল বিমান থেকে!

গেটে দাঁড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্রাকৃতির এক লোক ওর হাত থেকে বোর্ডিং পাসটা নিল । 'আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম আমরা,' বলে পাস থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশ ছিঁড়ে নিল সে। শ্যাডোর সিট নাম্বার ১৭ডি। তাড়াতাড়ি বিমানে চড়ে বসল ও। সে-ই শেষ যাত্রী, ও ভেতরে পা রাখা মাত্র বন্ধ করে দেয়া হলো দরজা।

ফার্স্ট ক্লাসে পা রাখল শ্যাডো, মাত্র চারটি সিট এখানে। তাদের মাঝে তিনটাতেই কেউ না কেউ বসে আছে। একমাত্র ফাঁকা সীটটার পাশে বসে আছেন দাড়িওয়ালা এক ধূসর স্যুট পরা ভদ্রলোক। ওর চোখে চোখ রেখে হাসলেন তিনি, হাতে পরা ঘড়ির দিকে ইঙ্গিত করলেন।

বুঝেছি তো, আমার জন্য দেরি হয়েছে–ভাবল শ্যাডো। দোয়া করি যেন এরচেয়ে বড় কোন সমস্যায় তোমাকে পড়তে না হয়।

বিমানটা যাত্রী দিয়ে ভর্তি বলেই মনে হলো। তবে পেছনে যেতে যেতে শ্যাডো বুঝতে পারল, আসলে বিমানটা পুরোপুরি ভর্তি। এমনকী ওর সীট, ১৭ডিতেও বসে আছে এক মাঝবয়সী মহিলা! মহিলাকে ওর টিকিট দেখাল শ্যাডো, মহিলাও দেখল। দুটোতেই ১৭ডি লেখা!

'স্যার, দয়া করে আপনার সিটে বসবেন?' বিমানবালা এসে অনুরোধ করল।

'দুঃখিত,' বলল শ্যাডো। 'সেটা মনে হয় সম্ভব হবে না।'

বিরক্তি প্রকাশ করে দুজনের বোর্ডিং কার্ড দেখল বিমানবালা। তারপর শ্যাডোকে সামনে নিয়ে এসে ফার্স্ট ক্লাসের একমাত্র খালি সিটে বসিয়ে দিল। 'আজ মনে হচ্ছে ভাগ্য দেবী আপনার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন।' ওকে বলল মেয়েটা। 'পান করার জন্য কিছু এনে দেব? টেক-অফ করতে এখনও কিছু সময় বাকি আছে।'

'বিয়ার হলে ভালো হয়,' বলল শ্যাডো। 'আপনার কাছে যে ব্র্যাণ্ডের আছে, সেটাই নিয়ে আসুন।'

চলে গেল বিমানবালা।

শ্যাডোর পাশে বসা ধূসর স্যুট পরিহিত লোকটা নখ দিয়ে ঘড়িতে টোকা মেরে বললেন, 'দেরি করে ফেলেছ।' হাসি ফুটেছে বটে তার চেহারায়, কিন্তু তাতে কোন উষ্ণতা নেই।

কালো রোলেক্সটার দিকে একবার তাকাল শ্যাডো। তারপর বলল, 'বুঝতে পারলাম না?'

'বললাম, তুমি দেরি করে ফেলেছ।'

সেই মুহূর্তে বিমানবালা এসে শ্যাডোকে একটা বিয়ার দিয়ে গেল।

পাগল নাকি লোকটা, ভাবল ও। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, ধূসর স্যুটের লোকটা সম্ভবত ওর দেরি করে বিমানে চড়ার কথা বোঝাচ্ছেন। 'আপনাকে দেরি করিয়ে দিয়েছি বলে দুঃখিত।' ভদ্রভাবে বলল ও। 'তাড়া আছে কোন?'

উড়োজাহাজ নড়তে শুরু করলে, বিমানবালা এসে নিয়ে গেল বিয়ারের বোতল। কিন্তু পাশে বসা লোকটার দিকে সে এগোতেই বয়স্ক মানুষটা দেঁতো হাসি হেসে বললেন, 'আরে, চিন্তা করো না। আমি শক্ত করেই ধরে রাখব গ্লাস।' বিমানবালা দুর্বল কণ্ঠে আপত্তি জানাল, বিমান উড্ডয়নের সময় কারও হাতে জ্যাক ড্যানিয়েলসের গ্লাস থাকা উচিত না। কিন্তু মানলেন না ভদ্রলোক।

'সময়ের মূল্য অপরিসীম।' মেয়েটা চলে যেতে শ্যাডোকে জানালেন তিনি। 'তবে আমি সে জন্য বলিনি কথাটা। আমার ভয় হচ্ছিল, তুমি হয়তো বিমানটা ধরতেই পারবে না।'

'আপনার অনেক দয়া।'

কেঁপে উঠছে বিমানটা, উড়াল দেয়ার জন্য যেন তর সইছে না যন্ত্রটার।

'দয়া না ছাই,' ধূসর স্যুটের লোকটা বললেন। 'আমি তোমাকে একটা কাজ দিতে চাই, শ্যাডো।'

গর্জন করে উঠছে বিমানের ইঞ্জিন। ছোট বিমানটা আচমকা সামনে বাড়তেই, সিটের সাথে যেনে মিশে গেল শ্যাডো। এক মুহূর্ত পরেই আকাশে ভাসল ওরা, বন্দরের আলো অনেক নিচে থেকে ওদের দিকে চেয়ে আছে। এতক্ষণে পূর্ণ দৃষ্টিতে পাশের আসনের আরোহীর দিকে তাকাল শ্যাডো।

লোকটার চুল লালচে ধূসর; দাড়িটা থুতনি জুড়ে, তবে ধূসর-লাল। চারকোনা চেহারাটার মাঝখানে দুটো হালকা ধূসর চোখ। স্যুটটা দামী বলেই মনে হচ্ছে। ভ্যানিলা আইসক্রিম গলে গেলে যেমন দেখা যায়, অনেকটা সেই রঙের। গলার কাছে সিল্কের টাই; পিনটা রুপার, গাছের মতো দেখতে।

জ্যাক ডানিয়েলসের গ্লাসটা উঁচু করে ধরলেন তিনি। আশ্চর্য হলেও সত্য, এক ফোঁটা মদ নিচে পড়ল না!

'কেমন কাজ, জানতে চাইলে না?'

'আমাকে চেনেন কী করে?'

মুচকি হাসলেন ভদ্রলোক। 'মানুষ নিজেকে কী নামে ডাকে, সেটা জানার চাইতে দুনিয়ার আর কোন সহজ কাজ আছে নাকি? একটু চিন্তা, একটু সৌভাগ্য আর একটু স্মৃতি খাটালেই তা জানা যায়। তারচেয়ে বরং কাজের ধরন সম্পর্কে জানতে চাও।'

'না,' বলল শ্যাডো। এরইমধ্যে বিমানবালা ওকে আরেক গ্লাস বিয়ার দিয়ে গিয়েছে। সেটায় চুমুক দিল ও।

'কেন?'

'আমি বাড়ি ফিরছি। ওখানে আমার জন্য চাকরি অপেক্ষা করছে। আমার আরেকটার দরকার নেই।'

লোকটার ক্রুর হাসিটা মলিন হলো না এক বিন্দু। তবে এখন যেন কিছুটা প্রাণ এসেছে সেই হাসিতে। 'বাড়ি ফিরে তো তুমি কোন চাকরি পাবে না।' বললেন তিনি। 'আসলে বাড়িতে তোমার ফিরে যাবার কোন কারণই নেই। অথচ আমি তোমাকে একেবারে আইন সিদ্ধ একটা কাজের প্রস্তাব দিচ্ছি। টাকা পাবে, পাবে কিছুটা হলেও নিরাপত্তা, সেই সাথে বাড়তি সুবিধা তো আছেই। যদি টিকে থাকতে পারো, তাহলে যাও-পেনশন পর্যন্ত দেব তোমাকে। চলবে?'

শ্যাডো উত্তর দিল। 'আমার নাম নিশ্চয় ব্যাগে লেখা দেখেছেন?'

উত্তর দিলেন না ভদ্রলোক।

'আপনি যে-ই হন না কেন,' আবারও বলল শ্যাডো। 'আমি যে এই বিমানে উঠব তা আপনার জানার কথা না। আমি নিজেই তো জানতাম না! আর যদি সেন্ট লুইসের আমার বিমান পাল্টাতে না হতো, তাহলে থাকতামও না। আমার ধারণা, আপনি ঠাট্টা করছেন। হয়তো আমাকে কোনভাবে ধোঁকা দিতে চাইছেন! আমার আরও ধারণা, অর্থহীন এই আলোচনা এখানে থামিয়ে দিলেই আমাদের উভয়ের জন্য ভালো হবে।'

শ্রাগ করলেন লোকটা।

সামনে রাখা ম্যাগাজিনটা তুলে নিল ও, কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে যাচ্ছে বিমান। মন দিতে কষ্ট হচ্ছে বেচারার। পড়ছে হয়তো, কিন্তু শব্দগুলোকে মাথায় রাখতে পারছে না।

স্যুট পড়া লোকটা সিটে আয়াসে বসে আছে, থেকে থেকে ঠোঁটে ছোঁয়াচ্ছে জ্যাক ড্যানিয়েলসের গ্লাস। চোখ বন্ধ।

বিমানে কোন কোন গানের চ্যানেল ধরে, সেটার তালিকা পড়ল শ্যাডো, এরপর মন দিলে বিশ্বের একটা ম্যাপে। ওটা যেন-তেন ম্যাপ না, কোথায় কোথায় এই কোম্পানির বিমান যায়, তা লাল দাগ দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। ম্যাগাজিন পড়া শেষ করে, ওটাকে পকেটে পুড়ল বেচারা।

চোখ খুললেন লোকটা। অদ্ভুত কিছু একটা আছে ওই চোখ দুটোয়, ভাবল শ্যাডো। একটার রঙ অন্যটার চাইতে একটা বেশিই ধূসর। ওর দিকে তাকালেন লোকটা। 'ভালো কথা,' বললেন তিনি। 'তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে দুঃখিত। অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেল তোমার।'

আরেকটু হলেই লোকটাকে মেরে বসত শ্যাডো। কিন্তু তা না করে বড় একটা শ্বাস নিল ও। এক...দুই এভাবে পাঁচ পর্যন্ত গুনল। 'আসলেই তাই।'

মাথা নাড়লেন লোকটা। 'যদি অন্য কোন ভাবে...' বলে দীর্ঘ শ্বাস ফেললেন তিনি।

'গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে ও,' বলল শ্যাডো। 'মারা যাবার এরচেয়ে বাজে অনেক উপায়ও আছে।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন লোকটা। শ্যাডোর মনে হলো, যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছেন তার সঙ্গী! কী অদ্ভুত!

'শ্যাডো,' স্যুট পরা ভদ্রলোক বললেন। 'ঠাট্টা করছি না কিন্তু। ধোঁকা দেবার চেষ্টাও করছি না। অন্য যে কোন কাজের চাইতে আমার কাজে বেশি টাকা পাবে। তুমি জেলঘুঘু। নিশ্চয় তোমাকে চাকরি দেবার জন্য লাইন ধরে লোক দাঁড়িয়ে নেই!'

'মি. বাল-ছাল-যেই হোও না কেন,' রেগে গেল শ্যাডো। 'দুনিয়ার সব টাকা দিলেও তোমার হয়ে কাজ করব না।'

হাসিটা বড় হয়ে গেল। শ্যাডোর সেই হাসি দেখে শিম্পাঞ্জিদের নিয়ে করা একটা টেলিভিশন শো-র কথা মনে পড়ে গেল। তাদের মতে, যখন এই প্রানিরা দাঁত খিঁচায়, তখন বুঝতে হবে যে তারা ভয় পাচ্ছে বা ঘৃণা প্রদর্শন করছে। কিন্তু যখন হাসে, তখন ধরে নিতে হবে যে হুমকি দিচ্ছে!

'আমার হয়ে কাজ করো। অবশ্য তাতে কিছুটা ঝুঁকি আছে বটে, কিন্তু বেঁচে থাকলে যা চাবে-তাই পাবে। চাইলে আমেরিকার পরবর্তী রাজাও হতে পারো।' বললেন ভদ্রলোক। 'এই প্রস্তাব আর কে দেবে তোমাকে শুনি?'

'কে আপনি?'

'আহ। তথ্য বিনিময়ের যুগে বাস করছি আমরা, তাই না? এই মেয়ে, আরেক গ্লাস জ্যাক ডানিয়েলস দাও তো।' বিমানবালা চলে যেতে আবার শ্যাডোর দিকে মন দিলেন তিনি। 'একেক সময়ে ছিল একেক যুগের রাজত্ব। কিন্তু তথ্য আর জ্ঞানের দাম ছিল সব সময়।'

'আমি জিজ্ঞাসা করেছি, কে আপনি?'

'বলছি দাঁড়াও। আজ তো আমার দিন, তাই নাহয় আমাকে ওয়েনসডে বলেই ডাকো। মি. ওয়েনসডে। ঠিক আছে?'

'এটা আপনার আসল নাম?'

'আপাতত এতেই চলবে,' উত্তর পেল শ্যাডো। 'যাই হোক, আমার প্রস্তাবটার কথা ভেবে দেখ। এখুনি উত্তর দিতে হবে না। সময় নাও, অসুবিধা নেই।' চোখ বন্ধ করে আসনে হেলান দিলেন তিনি।

'লাগবে না।' বলল শ্যাডো। 'আমার আপনাকে পছন্দ হয়নি। আপনার হয়ে কাজও করতে চাই না।'

'যা বলছিলাম,' চোখ না খুলেই বললেন ওয়েনসডে। 'সময় নিয়ে উত্তর দাও।'

মসৃণ অবতরণ যাকে বলে, সেটা জুটল না বিমানের কপালে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও; দেখতে পেল নির্জন এক বিমানবন্দরে এসে নেমেছে। ঈগল পয়েন্টে যাবার আগে আরও দুটো বন্দরে থামতে হবে। পাশে চাইল ও, মি. ওয়েনডের দিকে। ঘুমাচ্ছেন তিনি।

কেন যেন উঠে দাঁড়াল ও, ব্যাগটাকে তুলে নিয়ে পা রাখল বিমানের বাইরে। ভেজা টারম্যাক ধরে এগিয়ে গেল টার্মিনালের দিকে। এখনও বৃষ্টি হচ্ছে, ফোঁটা এসে স্পর্শ করে যাচ্ছে ওর মুখমণ্ডল।

দালানে প্রবেশের আগ মুহূর্তে থেমে গেল ও, ঘুরে দাঁড়িয়ে একবার বিমানের দিকে তাকাল। নাহ, আর কেউ নামেনি। ওর চোখের সামনেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল ওটার, উড়ালও দিল কিছুক্ষণ পরেই। ভেতরে প্রবেশ করে গাড়ি ভাড়া নিল শ্যাডো। পার্কিং-লটে গিয়ে আবিষ্কার করল, ওটা আসলে একটা ছোট্ট লাল টয়োটা!

রেন্ট-আ-কার থেকে পাওয়া ম্যাপটা খুলল সে, প্যাসেঞ্জার'স সিটে ওটাকে রেখে যাত্রাপথ দেখে নিল। ঈগল পয়েন্ট এখনও আড়াইশ মাইল দূরে!

এত দূর ঝড় আসেনি বলেই মনে হচ্ছে। আর আসলেও, তাণ্ডব চালিয়ে বিদায় নিয়েছে। আবহাওয়া ঠান্ডা, দিনটাও পরিষ্কার। চাদের সামনে ভিড় জমিয়েছে মেঘ।

প্রায় দেড় ঘণ্টা একটানা গাড়ি চালাল শ্যাডো, উত্তর দিকে।

রাত হয়েছে, ক্ষুধাও পেয়েছে শ্যাডোর। হাইওয়ে থেকে নেমে নট্রামুন (জনসংখ্যা ১৩০১) শহরে ঢুকল ও। অ্যামোকো কোম্পানির একটা স্টেশনে তেল ভরে নিয়ে ক্যাশে বসা মহিলার কাছে জানতে চাইল, আশেপাশে খাবারের দোকান-টোকান আছে কিনা।

'জ্যাকের ক্রোকোডাইল বারে দেখতে পারো।' ওকে জানাল বিরক্তিতে প্রায় জমে যেতে বসা মহিলা। 'কাঁচা রাস্তা ধরে পশ্চিমে একটু এগোলেই হবে।'

'ক্রোকোডাইল বার?'

'হুম। জ্যাকের মতে, এই নামে নাকি ওর বারের 'ব্যক্তিত্ব' বোঝা যায়!' এক টুকরা কাগজ বের করে কোন পথে যেতে হবে তা এঁকে দেখাল মহিলা। জানাল, ওখানকার চিকেন রোস্ট খেলে, এক বাচ্চা মেয়ের কিডনি চিকিৎসার ফাণ্ডে টাকা জমা হবে। 'কয়েকটা কুমির, একটা সাপ আর একটা ওই বড়...সাপের মতো প্রানিটা আছে জ্যাকের ওখানে।'

'ইগুয়ানা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওটাই।'

শহর, একটা সেতু আর প্রায় দুই মাইল পার হবার পর বারটাকে খুঁজে পেল শ্যাডো। পার্কিং-লট প্রায় ফাঁকা।

তবে ভেতরটা একেবারে নির্জন নয়। বারে পা রাখা মাত্রে ভারী একটা বাতাস যেন চেপে বসল শ্যাডোর ওপর। জুকবক্সে 'ওয়াকিং আফটার মিডনাইট' গানটা বাজছে। চারপাশে তাকিয়েও কোন কুমিরের দেখা পেল না ও। একবার ভাবল, স্টেশনের মহিলা ওর সাথে ঠাট্টা করেনি তো!

'কী নেবে?' জানতে চাইল বারটেণ্ডার।

'বিয়ার আর হ্যামবার্গার। সাথে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই।'

'শুরুতে চিলি দেব? এই স্টেটে এমন ভালো চিলি আর পাবে না।'

'চলবে।' বলল শ্যাডো। 'আপনাদের এখানে হাত-মুখ ধোবার জায়গাটা কই?'

বারের এক কোনার দিকে ইঙ্গিত করল বারটেণ্ডার। ওদিকে তাকাতেই একটা দরজা দেখতে পেল শ্যাডো। স্টাফ করা একটা অ্যালিগেটরের মাথা দরজার উপরে ঝুলছে। ওদিকে এগোল সে।

ঘরটা তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার, আলোও আছে বেশ। প্রথমেই ঘরটার সব কিছু দেখে নিল শ্যাডো, অভ্যাস। ('মনে রেখ শ্যাডো', লো কী'র ফিসফিসিয়ে বলা কথা মনে পড়ে গেল ওর। 'জলত্যাগের সময় চাইলেও তুমি আত্মরক্ষা করতে পারবে না।') একেবারে বায়ের ইউরিনালটা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিল ও। জিপ খুলে কতক্ষণ ধরে যে প্রস্রাব করল, তা নিজেও বলতে পারল না। চোখের সামনে লাগিয়ে রাখা জ্যাক আর দুই অ্যালিগেটরের ছবিটা মন দিয়ে দেখে নিল।

ডান দিকের ইউরিনাল থেকে মৃদু কাশির আওয়াজ ভেসে এলো, অথচ ওর পরে আর কাউকে ঢুকতে দেখেনি শ্যাডো!

ধূসর স্যুট পরা লোকটাকে বসে থাকা অবস্থায় এতটা লম্বা মনে হয়নি! অথচ প্রায় শ্যাডোর সমান লম্বা তিনি, আর শ্যাডোকে কেউ বিশালদেহি না বলে পারবে না। প্রস্রাব করা শেষ করে জিপার লাগিয়ে নিলেন মি. ওয়েনসডে। হাসলেন তিনি, শেয়াল-মার্কা হাসি। 'সময় তো অনেক পেলে শ্যাডো। কি ঠিক করলে, নিচ্ছ কাজটা?'

আমেরিকার কোথাও
লস অ্যাঞ্জেলস। ১১:২৬ পি.এম.

অন্ধকার একটা রুমে দাঁড়িয়ে আছে এক লম্বাটে মহিলা। অবশ্য পুরোপুরি অন্ধকার বলা যায় না ঘরটাকে, লালচে একটা আভা ছড়িয়ে আছে। দেয়ালের রঙটাকে কাঁচা কলিজার মতো বলা চলে। মহিলার পরনে আঁটসাঁট সিল্কের শর্ট, স্তন দুটো যেন ফুলে আছে। হলদে একটা ব্লাউজ যতটা লুকিয়ে রেখেছে, তার চেয়ে বেশি দেখাচ্ছে! কালো চুলগুলো মাথার উপরে খোঁপার মতো করে সাজানো। মেয়েটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে জলপাই রঙা টি-শার্ট আর দামী নীল জিন্স পরিহিত এক খাটো পুরুষ। ডান হাতে একটা ওয়ালেট আর একটা নোকিয়া মোবাইল ধরে আছে সে।

লালচে ঘরটায় আসবাব বলতে কেবল একটা খাট, তাতে সাদা স্যাটিনের চাদর। ওটার পায়ের কাছে রয়েছে ছোট্ট একটা কাঠের টেবিল। তাতে রাখা আছে একটা মোমদানী, মোটা ঠোঁটের এক মহিলার আদলে বানানো হয়েছে পাথরের আসবাবটাকে।

লোকটার হাতে একটা ছোট লাল মোম ধরিয়ে দিল মেয়েটি। ‘এ-, নাও,’ বলল সে। ‘জ্বালাও মোমটাকে।’

‘আমি?’

‘আমাকে পেতে চাইলে,’ উত্তর দিল মেয়েটা। ‘মোমটা তোমাকেই জ্বালাতে হবে।’

‘আমার উচিত ছিল তোমাকে দিয়ে গাড়িতেই মুখ-মেহন করিয়ে নেয়া।’

‘হয়তো,’ বলল মেয়েটা। ‘ কেন, আমাকে পছন্দ হচ্ছে না?’ এমনভাবে উরু থেকে বুক পর্যন্ত হাত বোলাল যেন নিজেকে প্রদর্শন করছে!

ক্ষুধার্ত চোখে মেয়েটাকে দেখল পুরুষ, এরপর মোমটাকে হাতে নিয়ে গুঁজে দিল মোমদানীতে। ‘আগুন আছে?’

এক বাক্স ম্যাচ এগিয়ে দিল মেয়েটা। পুরুষের যেন আর তর সইছে না, তাড়াহুড়ো করে মোম ধরাল সে।

‘টাকাটা ওই মূর্তির পাশে রাখো।’

‘মোমদানীর পাশে? পঞ্চাশ ডলারই তো?’

‘হ্যাঁ।’ বলল মেয়েটা। ‘এবার এসো, আমাকে নাও।’

নীল জিন্স আর জলপাই টি-শার্টটা খুলে ফেলল পুরুষ। বাদামী আঙুল ছুঁইয়ে তার সাদা কাঁধ মালিশ করে দিল মেয়েটা। এরপর তাকে বিছানায় ফেলে হাত, আঙুল আর জিহ্বা দিয়ে সুখ দিতে শুরু করল।

পুরুষের মনে হলো, লালচে আলো যেন ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। এখন আলো যা আছে, তা কেবল মোমবাতির।

'নাম কী তোমার?' জানতে চাইল সে।

'বিলকীস,' মাথা তুলে একটু টেনে 'কী' উচ্চারণ করল মেয়েটা।

লোকটা শোনার মুডে আছে বলে মনে হয় না, সুখের আতিশায্যে খাবি খাচ্ছে কেবল সে। 'আমাকে প্রবেশ করতে দাও,' বলল ও। 'তোমার ভেতর প্রবেশ করতে চাই।'

'ঠিক আছে, প্রিয়,' বলল বিলকীস। 'তবে ওটা করার সময় আমার জন্য একটা কাজ করবে?'

'ওই,' আচমকা শক্ত হয়ে গেল পুরুষ। 'টাকা তুমি আমাকে দিচ্ছ, না আমি তোমাকে?'

নিখুঁতভাবে নড়ে উঠল মেয়েটা, শিহরণ জাগানো ফিসফিসানো কণ্ঠে বলল, 'তুমি আমাকে। কিন্তু কথা হলো, আমার তোমাকে টাকা দেয়া উচিত। ইস, কি সৌভাগ্যবতী আমি যে...'

গাল ফোলাল পুরুষ, বেশ্যার মিস্টি কথায় যে সে ভুলবার পাত্র না, সেটা বোঝাতে চাইল যেন। এসব খেলায় দক্ষ লোকটা, একেবারে শেষ মুহূর্তে যে এই বেশ্যা বাড়তি টাকা চাইবে, সে ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত ও। কিন্তু না, পয়সা চাইল না বিলকীস। উল্টো বলল, 'আমার ভেতরে প্রবেশ করার সময়, আমার উপাসনা করবে?'

'কী করব?'

এতক্ষণে আগু-পিছু করতে শুরু করেছে মেয়েটা। দুজনের যৌনাঙ্গের স্পর্শে সুখের বান ছুটেছে পুরুষটার দেহে।

'আমাকে তোমার দেবী বলে সম্বোধন করবে? আমার উপাসনা করবে? তোমার দেহ দিয়ে?'

হাসল পুরুষ। এই কেবল চায় মেয়েটা? ওকে দোষ দিয়েই বা লাভ কী? সবার মাঝেই এমন অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা থাকে একটু আধটু।

'অসুবিধা নেই!' বলল লোকটা। মেয়েটা কিন্তু বসে নেই, হাত বাড়িয়ে পুরুষাঙ্গটাকে নিজের ভেতরে নিল সে।

'ভালো লাগছে, দেবী?'

'আমার উপাসনা করো, প্রিয়।' উত্তরে বলল বিলকীস।

'আমি উপাসনা করি,' শুরু করল পুরুষ। 'তোমার স্তনের, তোমার চুলের আর তোমার যোনীর। আমার উপাসনার বস্তু তোমার পা, তোমার চোখ, তোমার পেলব ঠোঁট...'

'আরও বলো...' দ্রুত হতে শুরু করেছে বেশ্যার নড়াচড়া।

'আমি উপাসনা করি তোমার স্তনবৃন্তের, যেখান থেকে নিঃসৃত হয় অমিয়ধারা। তোমার চুম্বনের মিষ্টতা হার মানায় মধুকে, তোমার স্পর্শের উত্তাপের সামনে জ্বলন্ত লাভাও যেন তুচ্ছ। আমি উপাসনা করি তোমার।' দুই দেহের নড়াচড়ার সাথে তাল মিলিয়ে বলছে লোকটা। 'সকালে আমায় দান করো তোমার কামনা, সন্ধ্যায় নিভিয়ে দাও সেই আগুন। যেখানেই থাকি না কেন, বারবার যেন ফিরে এসে তোমার পাশে শুতে পারি, তোমার সান্নিধ্য পেতে পারি–এই আমার প্রার্থনা। আমার সবকিছু দিয়ে আমি তোমার উপাসনা করি, আমার দেহ দিয়ে, আমার মন দিয়ে...আমার স্বপ্ন দিয়ে, আমার কল্পনা দিয়ে...' আচমকা থেমে গেল সে। শ্বাস নেবার জন্য খাবি খেয়ে উঠল প্রায়। 'কী করছ তুমি? এমন ভালো তো আগে কখনও লাগেনি।' নিচের দিকে তাকাবার প্রয়াস পেল বেচারা। কিন্তু মসৃণ একটা আঙুল এসে বাঁধা দিল ওকে।

'বলতে থাক, প্রিয়া।' বলল বিলকীস। 'কেন থামছ? ভালো লাগছে না বুঝি?'

'আরে না, এমন ভালো জীবনে আর কখনও লাগেনি।' ওকে জানাল লোকটা, অন্তর থেকেই কথাটা বলেছে। 'তোমার চোখের উজ্জ্বলতা তারাকে লজ্জা দেয়, তোমার ঠোঁটের পেলবতা হার মানায় গোলাপকে। আমি পূজা করি তোমার।' আস্তে আস্তে জোরাল হতে শুরু করেছে ওর নড়াচড়া।

'আমাকে তোমার আশীর্বাদ দাও,' এখন কী বলছে তা নিজেই জানে না লোকটা। 'তোমার একমাত্র আশীর্বাদটা। আমাকে সবসময় এমন সুখে, এমন আনন্দে রাখো। আমি পূজা করি...আমি...'

ঠিক সেই মুহূর্তে আর সইতে পারল না বেচারার দেহ। রেতঃপাতের আনন্দে যেন ফেটে পড়ল, আরও জোরে জোরে নিজ দেহকে চালাতে শুরু করল ও। সুখের আতিশয্যে চোখ বন্ধ হয়ে এসেছে...তবে বন্ধ হয়নি তৃপ্তির ফুল্লধারা।

আচমকা চোখ খুলে তাকাল ও।

চিন্তা করার ক্ষমতা যেন ফিরে পেয়েছে লোকটা, কিন্তু যা দেখল তাকে ভ্রম বলে মনে হচ্ছে তার!

দেখল, বুক পর্যন্ত পেয়েটার ভেতরে ঢুকে আছে ও। অবাক চোখে তাকাল মেয়েটার দিকে, কিন্তু বিলকীস তখনও ওর কাঁধে হাত রেখে নিচের দিকে আলতো চাপ দিয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটার ভেতরে আরও একটু ঢুকে গেল পুরুষ।

'কী...কীভাবে করছ?' জানতে চাইল সে। কিংবা হয়তো চায়নি, প্রশ্নটা মুখে না করে মাথার ভেতরেই করেছে।

'আমি করছি না, প্রিয়। তুমি নিজেই করছ।' ফিসফিস করে জবাব দিল বিলকীস। লোকটা বুঝতে পারল, যোনীর দুপাশের দেয়াল ওকে আঁকড়ে ধরেছে যেন। এই অবস্থায় কেউ দেখলে কী মনে করবে, ভেবে হাসি পেল ওর। আচ্ছা, ভয় করছে না কেন তার? পরক্ষণেই উপলব্ধি করতে পারল উত্তরটা।

'আমি পূজো করি তোমার...আমার সারা দেহ দিয়ে।' বলল লোকটা, পরমুহূর্তে পুরোপুরি ঢুকে গেল মেয়েটার যোনীর ভেতর।

বিশালাকার এক বিড়ালের মতো আড়মোড়া ভাঙল বিলকীস, হাই তুলে বলল, 'আমি তোমার নৈবদ্য গ্রহণ করলাম।'

আচমকা বেজে উঠল নোকিয়া, ওটা তুলে নিয়ে কানে ধরল বিলকীস। লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে ও, যেনো তার স্বাভাবিক রূপ ধারণ করেছে। এক ফোঁটা লালচে স্বেদ-বিন্দুরে স্নান করে নিয়েছে কপালে।

'হুম,' বলল সে। ওপাশের কথা শুনে যোগ করল। 'না, বাছা। লোকটা এখানে নেই। চলে গিয়েছে।'

ফোন বন্ধ করে আবার আড়মোড়া ভাঙল ও। তারপর চোখ বন্ধ করে হারিয়ে গেলে ঘুমের অতলে।

অধ্যায় দুই

মেয়েটিকে ওরা নিয়ে গেল গোরস্তানে,
ক্যাডিলাকে করে;
নিয়ে গেল তারা তবে,
আনল না ফিরিয়ে।

-পুরাতন গান

'আমি নিজে থেকে,' হাত ধুতে ধুতে বললেন মি. ওয়েনসডে। 'আমার খাবারের অর্ডারটা তোমার টেবিলে দিতে বলেছি। আমাদের অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করতে হবে।'

'আমার তা মনে হয় না।' বলল শ্যাডো, টিস্যু পেপার দিয়ে হাত মুছে সেটাকে ডাস্টবিনে ফেলে দিল ও।

'তোমার একটা চাকরি দরকার,' বললেন ওয়েনসডে। 'মানুষ কখনওই জেলঘুঘুকে ভাড়া করে না। তোমরা ওদেরকে অস্থির করে তোল।'

'আমার জন্য একটা চাকরি অপেক্ষা করছে।'

'কোথায়? তোমার বন্ধুর ব্যায়ামাগারে?'

'হয়তো,' বলল শ্যাডো।

'নাহ। ওখানে চাকরি নেই। রবি বার্টন মারা গিয়েছে। ওকে ছাড়া ব্যায়ামাগারটারও কোন অস্তিত্ব রইবে না।'

'আপনি একজন মিথ্যুক।'

'তা তো বটেই, বেশ দক্ষও। আমার চাইতে ভালো আর মিথ্যুক হাজার খুঁজেও পাবে না তুমি। তবে এই ব্যাপারে মিথ্যা বলছি না।' পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজ বের করলেন তিনি। শ্যাডোর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'সাত নাম্বার পাতা। বারে এসে বসো, আরাম করে পড়তে পারবে।

দরজা খুলে বারে ফিরে এলো শ্যাডো। ধোঁয়ায় বাতাস নীল রঙ ধারণ করেছে, জুক বক্সের গান শুনে আপনমনে হাসল সে।

বারের লোকটা ওকে কোনার একটা টেবিল হাত দিয়ে দেখাল। একটা চিলি ভর্তি পাত্র আর অল্প আঁচে রান্না করা মাংস রাখা আছে ওখানে, সেই সাথে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইও।

শ্যাডো বসে পড়ল টেবিলে, খবরের কাগজটাও নামিয়ে রাখল। 'মুক্ত মানুষ হিসাবে এটাই আমার প্রথম খাবার। আগে খেয়ে নেই, তারপর নাহয় আপনার সাত নাম্বার পাতা পড়ে দেখব।'

চুপচাপ হ্যামবার্গার খেল শ্যাডো। জেলের চাইতে অনেক ভালো। চিলিটাও ভালো, কয়েক চামচ মুখে নিয়ে ভাবল ও, তবে এই স্টেটের সবচেয়ে সেরা কোনদিক দিয়েই না।

লরা দারুণ চিলি বানায়। চর্বি-ছাড়ানো মাংস, কালো বীন, ছোট ছোট করে কাটা গাজর, আধ বোতল বিয়ার আর সদ্য কাটা মরিচ একসাথে রান্না করে কিছুক্ষণ। তারপর তাতে ঢালে রেড ওয়াইন, লেবুর রস আর এক চিমটি সুগন্ধি। একদম শেষে যোগ করে মাপা হাতের চিলি পাউডার। বেশ কয়েকবার লরার রান্না পদ্ধতি দেখেছে শ্যাডো। সবকিছু দেখে দেখে লিখেও নিয়েছিল, প্রতিটা পদক্ষেপ...আর প্রতিটা উপাদান, তাও আবার পরিমাণসহ! কিন্তু না, লরার মতো সুস্বাদু চিলি একবারও রান্না করতে পারেনি।

সাত নাম্বার পাতায় প্রথমেই পড়ে নিল ওর স্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে লেখা খবর। লরা মুন, প্রবন্ধ অনুসারে যার বয়স সাতাশ এবং রবি বার্টন, উনচল্লিশ বছর বয়েসে মৃত্যু বরণ করেছেন। মৃত্যুর সময় তারা ছিলেন রবি বার্টনের গাড়িতে। রাস্তায় আচমকা নড়ে ওঠে সেটা, পেছন থেকে এসে ধাক্কা দেয় বত্রিশ চাকার একটা লরি।

ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রবি আর লরাকে উদ্ধার করে কর্মীরা। হাসপাতালে তাদেরকে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

শ্যাডো খবরের কাগজটা আবার ভাঁজ করে টেবিলে রেখে দিল, তবে এবার এগিয়ে গিল ওয়েনসডের দিকে। ভদ্রলোক স্টেক নিয়ে ব্যস্ত হয়েছে পড়েছেন, মাংসের ওই টুকরা থেকে এমনভাবে রক্ত ঝরছে যে কাঁচাই বলে চলে।

'এই যে, আপনার পত্রিকা।' বলল শ্যাডো।

রবি গাড়ি চালাচ্ছিল, নিশ্চয় মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ছিল ব্যাটা। অবশ্য কাগজে তেমন কিছু লেগেনি। রবির এই মাতাল অবস্থা বুঝতে পেরে লরার চেহারা কেমন হয়েছিল, তা যেন মানসচক্ষে দেখতে পেল ও। শুধু তাই না, পুরো ঘটনাটাই ওর চোখের সামনে ঘটছে। লরা চিৎকার করে বকছে রবিকে,

বলছে রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করাতে। আচমকা কেঁপে উঠল গাড়ি, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাক খেতে লাগল...

...রাস্তার পাশে গিয়ে কিছু একটার সাথে বাড়ি খেয়ে তবে থামল যন্ত্রটা। হেডলাইটের আলোয় উইণ্ডশীল্ডের ভাঙ্গা কাঁচ হীরার মতো ঝিকমিক করছে। রক্তের ফোঁটা যেন রুবির টুকরো। দুটো নিথর দেহ বের করে আনা হলো ধ্বংসাবশেষ থেকে। রাস্তার পাশে শুইয়ে রাখা হলো ওগুলো।

'তাহলে, কী সিদ্ধান্ত নিলে?' জানতে চাইলেন ওয়েনসডে। খাওয়া শেষ তার, অনেকদিনের অভুক্ত কোন মানুষের মতোই গাপুসগুপুস করে খেয়ে ফেলেছেন। এখন তার মুখে স্থান করে নিয়েছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই।

'ঠিক বলেছিলেন আপনি। আমি বেকার।'

পকেট থেকে একটা পয়সা বের করে নিল শ্যাডো, টেলসের দিকটা উপরে রেখে ছুঁড়ে দিল বাতাসে। নিচে নেমে আসার আগেই শূন্য থেকে লুফে নিল ওটা, হাতের চেটোতে রাখল।

'বলুন, হেডস না টেলস?'

'কী দরকার?'

'আমি এমন কারও হয়ে কাজ করতে চাই না, যার কপাল আমার চাইতেও মন্দ। বলুন।'

'হেডস।'

'দুঃখিত।' পয়সার দিকে না তাকিয়েই বলল শ্যাডো। 'টেলস উঠেছে। দুঃখ পাবেন না, আমি চুরি করেছি। ফলাফল আমার আগে থেকেই জানা।'

'আগে থেকে ফলাফল নির্ধারিত–এমন খেলায় জেতাই সবচেয়ে সোজা।' আঙুল নাড়তে নাড়তে বললেন ওয়েনসডে। 'একবার দেখই না।'

কথা মতো কাজ করল শ্যাডো, দেখল–হেডস উঠেছে!

'ভুল করেছি কোন।' অবাক কণ্ঠে বলল।

'নিজেকে ছোট করে দেখছ,' হাসি দেখা গেল ভদ্রলোকের চেহারায়। 'আসলে আমার কপালটাই এমন-খুব...খুব ভালো।' আচমকা চোখ তুলে তাকালেন তিনি। 'আরে, পাগলা সুইনি দেখি! এসো, পান করো আমাদের সাথে।'

'সাউদার্ন কমফোর্ট আর কোক হলে আছি।' শ্যাডোর পেছন থেকে বলে উঠল কেউ।

'ঠিক আছে, বারম্যানকে বলছি।' বলে উঠে দাঁড়ালেন ওয়েনসডে, রওনা দিলেন বারের দিকে।

'আমি কী নেব, তা জানতে চাইলেন না?' জিজ্ঞাসা করল শ্যাডো।

'তুমি কী নেবে, তা আমি আগে থেকেই জানি।' উত্তরে বললেন ভদ্রলোক।

শ্যাডোর পাশে বসে পড়ল 'পাগলা সুইনি', লোকটার থুতনিতে হালকা বাদামী দাড়ি। পরনে ডেনিম জ্যাকেট, অনেকবার রিপু করা হয়েছে। জ্যাকেটের নিচ থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা দাগ পড়া সাদা টি-শার্ট। তাতে লেখা–

যদি না পারো খেতে, গিলতে বা টানতে...
...ছুঁড়ে ফেল জিনিসটা, ঝামেলা এড়াতে!

মাথা ঢেকে রেখেছে একটা বেসবল ক্যাপ। লেখা আছে ওতে–

মাত্র একজন পরস্ত্রীকেই ভালোবেসেছি জীবনে...আমার মাকে!

নোংরা হাতে কমদামী সিগারেটের একটা প্যাকেট খুলল সুইনি, নিজে একটা নিয়ে শ্যাডোর দিকে একটা বাড়িয়ে দিল। অবচেতনমনেই হাত বাড়াচ্ছিল ও; নিজে ধূমপান করে না বটে, তবে জেলে সিগারেটকে টাকার বিকল্প হিসেবেই দেখা হতো। ঠিক তখনই মনে পড়ল তার, আজ থেকে ও পাখির মতোই মুক্ত। মাথা নেড়ে না করল তাই।

'তুমি তাহলে কাজটা নিচ্ছ?' জিজ্ঞাসা করল দাড়িওয়ালা। ঠিক মাতাল মনে হলো না তাকে, আবার ঠিক সুস্থও মনে হলো না।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' উত্তর দিল শ্যাডো। 'তুমি কী করো?'

সিগারেট ধরাল লোকটা। 'আমি লেপ্রিকন।' হাসি মুখে বলল সে।

তবে শ্যাডোর মুখে হাসি নেই। 'তাই নাকি? তাহলে সাউদার্ন কমফোর্ট না পান করে তো আইরিশ মদ, গিনেস পান করা উচিৎ!'

'একেবারে গৎবাঁধা হয়ে গেল না কথাটা? চিন্তা-ভাবনায় পরিবর্তন আনতে হবে তোমার।' উত্তর দিল লোকটা। 'আয়ারল্যাণ্ড মানেই কিন্তু গিনেস না।'

'তোমার কথায় আইরিশ টানও নেই।'

'এই বালের জায়গায় অনেক দিন ধরে আছি যে, তাই।'

'জন্ম আয়ারল্যাণ্ডে?'

'কেবলই তো বললাম, আমি একজন লেপ্রিকন। জীবনে শুনেছ, লেপ্রিকনরা মস্কোতে জন্মায়?'

'তা শুনিনি।'

ওয়েনসডে টেবিলে ফিরে এলেন, থাবার মতো হাতে ধরে আছেন তিনটা গ্লাস। 'পাগলার জন্য সাউদার্ন কমফোর্ট আর কোক, আমার জন্য জ্যাক ড্যানিয়েলস। আর এই গ্লাসটা তোমার জন্য, শ্যাডো।'

'কী আছে এর মধ্যে?'

'খেয়েই দেখ!'

সোনালী রঙ পানীয়টার। ইতস্তত ভঙ্গিতে ছোট্ট একটা চুমুক দিল শ্যাডো, টক আর মিষ্টির অদ্ভুত একটা স্বাদ জড়িয়ে গেল জিহ্বায়। মদ আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেকগুলো স্বাদের এক মজার মিশ্রণ যেন।

'খেলাম,' বলল শ্যাডো। 'এবার বলুন, এটা কী?'

'মধু দিয়ে বানানো মদ,' উত্তর দিলেন ওয়েনসডে। 'মীড বলি আমরা, বীরদের পানীয়। সেই সাথে দেবতাদেরও।'

আরেকটা কৌতূহলী চুমুক দিল শ্যাডো...হুম, মধুর স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। তবে সাথে আরও অনেক কিছু আছে এতে। 'কেমন যেন সিরকার মতো লাগছে। তবে মিষ্টি মেশান।'

'ঠিক,' একমত হলেন ওয়েনসডে। 'ডায়াবেটিক রোগীর প্রস্রাবের মতো স্বাদ। আমার একদম ভালো লাগে না।'

'তাহলে আমার জন্য আনলেন কেন?' যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন শ্যাডোর।

অদ্ভুত চোখ জোড়া দিয়ে শ্যাডোকে কিছুক্ষণ দেখলেন ওয়েনসডে। ওই দুই চোখের একটা কাঁচের, বুঝতে পারল শ্যাডো। কিন্তু কোনটা, তা ধরতে পারল না। 'তোমার জন্য আনলাম কারণ...আনাটাই প্রথা। আমাদের চুক্তি সম্পন্ন হবার শেষ ধাপ এই মদ্যপান। আর এখন প্রথা মানা আমাদের জন্য খুব জরুরী।'

'আমরা তো কোন চুক্তি করিনি!'

'অবশ্যই করেছি। তুমি এখন থেকে আমার হয়ে কাজ করো। আমার সুরক্ষা এখন তোমার হাতে। আমাকে বিভিন্ন জায়গায় আনা-নেয়া করবে, ছোট-খাটো কাজ করে দেবে। দরকার হলে...আবারও বলছি, দরকার হলে অবাধ্য কাউকে পোষও মানাতে হবে তোমার। আমি মারা গেলে, তুমি আমার হয়ে শোক পালন করবে। বিনিময়ে তোমার যেন কোন চাহিদা অপূর্ণ না থাকে, সেদিকে আমি খেয়াল রাখব।'

'ধোঁকা দিচ্ছে কিন্তু,'দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বলল পাগলা সুইনি। 'লোকটা আস্ত ধোঁকাবাজ।'

'নিজেকে কবে ভালোমানুষ দাবী করলাম, শুনি?' জানতে চাইলেন ওয়েনসডে। 'এজন্যই তো আমার শ্যাডোর মতো একজনকে চাই, যে আমার স্বার্থ মাথায় রেখে কাজ করবে।'

হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল জুকবক্সের গান। নীরাবতা নেমে এলো বারে, কেউ কোন কথা বলছে না।

'একজনের মুখে শুনেছিলাম, বারে সবাই একসাথে নীরব হয়ে যায় হয় ঘণ্টা শেষ হবার বিশ মিনিট আগে, নয়তো ঘণ্টা পার হয়ে বিশ মিনিটে।' বলল শ্যাডো।

ঘড়ির দিকে ইঙ্গিত করল সুইনি। কী আশ্চর্য! সময় তখন এগারোটা বেজে বিশ!

'একেবারে ঘড়ি ধরা। কিন্তু কেন এমন হয়, তা কখনও বুঝতে পারিনি!' বলল শ্যাডো।

'আমি জানি কেন,' বললেন ওয়েনসডে। 'যাক গে, মীডটা শেষ করে ফেল।'

এক চুমুকে তাই করল যুবক। 'একটু বরফ মেশালে মনে হয় মন্দ হতো না।'

'কে জানে, হয়তো আরও বাজে হতো।' মন্তব্য করলেন ওয়েনসডে। 'আসলে ওই জিনিসটাই কেমন যেন!'

'তা ঠিক।' পাগলা সুইনিরও সেই মত। 'ক্ষমা করবেন, ভদ্রমহোদয়গণ। একটু হালকা না হয়ে নিলে হচ্ছে না।' প্রস্রাব করার জন্য উঠে দাঁড়াল সে। অস্বাভাবিক লম্বা একটা লোক, ভাবল শ্যাডো। প্রায় সাত ফুট হবে।

টেবিল মুছে, খালি গ্লাসগুলো সরিয়ে নিল এক ওয়েট্রেস। ওয়েনসডে বললেন সবাইকে আরেক প্রস্থ মদ দিতে। তবে এবার শ্যাডোর মীডের সাথে মিশিয়ে দিতে বললেন বরফ আর পানি।

'কাজের কথায় আসি,' বললেন তিনি। 'তোমার কাছে আমার কিছু চাহিদা আছে।'

'আমার চাহিদার কথা শুনবেন না?'

'অবশ্যই। বলে ফেলো, বাছা।'

ফিরে এসেছে ওয়েট্রেস, হাতে ধরে আছে মদের গ্লাস। মীড ভর্তি পাত্রটা হাতে নিয়ে চুমুক দিল শ্যাডো। আসলেই, বরফ দিয়ে কোন লাভই হয়নি। বরং উলটো ফল হয়েছে, টক-টক ভাবটা এখন বেশি করে লাগছে জিহ্বায়। তবে ঠিক মদ বলে মনে হচ্ছে না, নিজেকে সান্ত্বনা দিল ও। এখন মাতাল হওয়া একদম চলবে না।

লম্বা করে শ্বাস নিল যুবক।

'শুনুন তাহলে,' শুরু করল ও। 'আমার জীবন, যার প্রায় তিনটা বছর কেটেছে জেলে, আরও খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে। এখন আমার কয়েকটা কাজ করতে হবে। আমি লরার শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যেতে চাই। শেষ একবার দেখে বিদায় জানাতে চাই মেয়েটাকে। ওর জিনিসপত্রগুলোরও একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আর যদি আমাকে চাকরি দিতেই চান, তাহলে সেজন্য সপ্তাহে আমাকে দিতে হবে পাঁচশ ডলার।' আন্দাজে একটা অঙ্ক বলল ও; কিন্তু সেটা শুনে ওয়েনসডের মনে কী প্রভাব পড়েছে, তা লোকটার চোখ দেখে বোঝা গেল না। 'যদি ভবিষ্যতে একসাথে কাজ করে যাই, তাহলে ছয় মাস পর থেকে আমাকে আপনি সপ্তাহে এক হাজার ডলার করে দেবেন।'

এক নাগাড়ে এত কথা অনেকদিন পর বলল শ্যাডো। তবে পুরোপুরি শেষ করেনি এখনও। 'আপনার কথা থেকে বুঝতে পারছি 'দরকার হলে' মানুষ পিটিয়ে হাত গন্ধ করতে হবে আমাকে। ঠিক আছে, আমার আপত্তি নেই। তবে একটা শর্তে, যারা যারা আপনার ক্ষতি করতে আসবে, কেবল তাদেরকেই বাঁধা দেব আমি। শুধু শুধু মারামারিতে জড়িয়ে পড়ার মাঝে আমি নেই। দ্বিতীয়বার আর জেলে যেতে চাই না। ধরে নিন, আমি ন্যাড়া। আর জেলখানা আমার বেলতলা। একবারই যথেষ্ট।'

'তোমাকে জেলে যেতে হবে না।' বললেন ওয়েনসডে।

'হুম, আমি যাব না।' বলে মীডটুকু শেষ করে ফেলল ও। আচ্ছা, এই পানীয়টা ওর মুখ আলগা করার জন্য দায়ী না তো-ভাবল একবার। কিন্তু শব্দ এমনভাবে ওর মুখ থেকে বের হচ্ছে, যেমন পুরোপুরি খুলে দেয়া কল থেকে পানি বের হয়। চাইলেও এখন আর থামতে পারবে বলে মনে হয় না। 'আমি আপনাকে পছন্দ করি না, মি. ওয়েনসডে। এটা যে আপনার আসল নাম না, তা-ও আমি বুঝতে পেরেছি। আমরা বন্ধু নই। আপনি কীভাবে আমার অলক্ষ্যে ওই বিমান থেকে নেমেছেন, তা আমি জানি না। আমার পিছু পিছু এখানে এসে উপস্থিত হলেন কীভাবে তা-ও না। তবে আমি একটা কথা বলে রাখি, আমাদের কাজ শেষ হওয়া মাত্র আমি বিদায় নেব। আপনি যদি আমাকে রাগিয়ে তোলেন, তাহলে চলে যাব আরও আগেই। তার আগ পর্যন্ত, আপনার হয়ে কাজ করতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

'মেনে নিলাম।' বললেন ওয়েনসডে। 'তাহলে এই সব শর্ত মেনেই চুক্তিবদ্ধ হলাম আমরা।'

'ঠিক আছে,' কিছুই যায় আসে না-এমন ভঙ্গিতে শ্রাগ করল শ্যাডো। ওয়েনসডে হাতে থুথু দিয়ে এগিয়ে দিলেন ওর দিকে। নিজের হাতে থুথু দিল ও

নিজেও। হাত মেলাল দুজন। ওয়েনসডে চাপ দিলেন প্রথমে, উত্তরে চাপ দিল শ্যাডো। কিন্তু অল্পক্ষণের মাঝেই ব্যথা অনুভব করল সে হাতে। আরও কিছুক্ষণ ওভাবেই থেকে করমর্দন শেষ করলেন ওয়েনসডে।

'ভালো,' বললেন তিনি। 'খুব ভালো। আরেক গ্লাস করে ওই বাজে, বদখত আর বিচ্ছিরি মীড খেয়ে আমরা চুক্তি সম্পাদন করে ফেলি।'

'আমার জন্য সাউদার্ন কমফোর্ট আর কোক।' এতক্ষণ জুকবক্সে পয়সা ফেলছিল সুইনি, ফিরে এসে বলল।

দ্য ভেলভেট আণ্ডারগ্রাউণ্ড-এর 'হু লাভস দ্য সান' গানটা বাজতে শুরু করল জুকবক্সে। অবাক হয়ে গেল শ্যাডো, এই গান জুকবক্সে! পরক্ষণেই ভাবল, আসলে পৃথিবীতে সবই সম্ভব।

টস করার জন্য যে পয়সাটা ব্যবহার করেছিল, সেটা হাতে তুলে নিল শ্যাডো। নতুন পয়সার স্পর্শ নেবার মজাই আলাদা, ভাবল ও। ডান হাতের তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলির মাঝখানে ধরে রাখল কিছুক্ষণ, এরপর এরপর ভান ধরল যেন ওটা বাঁ হাতে নিয়ে নিয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ডান হাতেই আছে ওটা, লুকিয়ে ফেলেছে। এরপর বাঁ হাতে মুঠো করে ধরল কল্পিত পয়সাটা, আরেকটা নিল ডান হাতে। ওটাকেও দুই আঙুলের ফাঁকে কিছুক্ষণ ধরে রেখে এমনভাব করল যে ফেলে দিচ্ছে বাঁ হাতে। ডান হাতে লুকিয়ে রাখা প্রথম পয়সাটাকে দিয়ে ধাক্কা দিল দ্বিতীয়টায়। উপস্থিত যে কেউ খেয়াল করলে ভাবত, দুটো পয়সাই এখন শ্যাডোর বাঁ হাতে। ধরতেই পারত না, আওয়াজ হওয়া মাত্র দ্বিতীয়টাকেও ডান হাতে লুকিয়ে ফেলেছে ও।

'পয়সার খেলা দেখাচ্ছ?' জানতে চাইল সুইনি। 'তাহলে আমার খেলা দেখ।'

খালি একটা গ্লাস তুলে নিল ও, এরপর বাতাসে হাত বাড়িয়ে কোত্থেকে যেন একটা বিশাল, উজ্জ্বল, সোনালী পয়সা নিয়ে এলো! গ্লাসের ভেতর ফেলল ওটা, তারপরেই আবার হাত বাড়াল। আরেকটা সোনালী কয়েন নিয়ে ওটাও ফেলল গ্লাসে, প্রথম সাথে লেগে ঝনঝনে আওয়াজ করল দুটো। এরপর একটা বের করল দেয়ালে ঝোলানো মোম থেকে, একটা নিজের দাড়ির ভেতর থেকে আর একটা শ্যাডোর বাঁ হাতের ভেতর থেকে। সবগুলোই জড়ো করল গ্লাসের ভেতর। এরপর আঙুলগুলো দিয়ে গ্লাসের মুখ ঢেকে জোরে ফুঁ দিল। কী আশ্চর্য! সাথে সাথে বৃষ্টির ফোঁটার মতো ঝরতে শুরু করল সোনালী পয়সা! গ্লাস ভর্তি হলে সবগুলো নিয়ে পকেটে পুরল সুইনি। এক সেকেণ্ড পর যখন পকেট উল্টাল...তখন আর একটারও হদিস পাওয়া গেল না!

'একে বলে ভানুমতীর খেল।' স্মিত হেসে বসল সে।

খুব কাছ থেকে দেখেছে এতক্ষণ শ্যাডো। 'আমার শেখা দরকার।'

'কীভাবে করলাম শুনবে?' যেন কোন গোপন কথা বলছে, এমন ভঙ্গিমায় বলল সুইনি। 'আয়াস আর জৌলুশের সাথে।' হাসিতে ফেটে পড়ল বাচ্চা ছেলেদের মতো।

'তা...ভঙ্গিতে জৌলুশ ছিল বটে,' মেনে নিল শ্যাডো। 'তবে আমি খেলাটার কথা বলছি। আমাকে শিখিয়ে দাও, বইতে পড়েছি এরকম একটা খেলা। পয়সাগুলো গ্লাস ধরা হাতে ধরে আছ তুমি, দরকারের সময় অন্য হাতে নিয়ে গ্লাসে ফেলছ। কিন্তু করছটা কীভাবে, তা জানতে চাই।'

'এত কষ্ট করার দরকার কী?' পাগল সুইনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল। 'এরচেয়ে বাতাস থেকে পয়সা তুলে নেয়াই তো সহজ!'

কথাবার্তায় বাঁধা পড়ল ওয়েনসডের আগমনে। 'তোমার জন্য মীড, শ্যাডো। আমার জন্য জ্যাক ড্যানিয়েলস। আর মাগনা মদ-প্রেমী আইরিশের জন্য...?'

'বিয়ার।' বলল সুইনি। 'আমাকে মাগনা মদ-প্রেমী বললে?' মদের গ্লাসটা তুলে ধরল ও, ওয়েনসডের গ্লাসে ঠেকিয়ে টোস্ট করল। 'ঝড় আমাদের উপর দিয়ে যেতে চাইলে যাক, কিন্তু আমাদের যেন কোন ক্ষতি না করে।'

'টোস্টটা তো ভালোই ছিল।' ওয়েনসডে বললেন। 'কিন্তু কাজে আসবে বলে মনে হয় না।'

শ্যাডোর সামনে মীড এনে রাখা হলো। 'খেতেই হবে?'

'তা হবে, এছাড়া আমাদের চুক্তি সম্পূর্ণ হবে না।'

'ধুরো,' বলল বটে, কিন্তু দুই চুমুকে তরলটুকু শেষ করে ফেলল ও।

'এবার,' মন্তব্য করলেন ওয়েনসডে। 'তুমি আমার কর্মচারী হলে।'

'খেলাটা শিখতে চাও?' আচমকা প্রশ্ন করে বসল সুইনি।

'হ্যাঁ।' শ্যাডোর উত্তর। 'হাতায় রেখেছিলে পয়সাগুলো?'

'না। আসলে এই খেলাটা দুনিয়ার সবচেয়ে সোজা খেলার একটা। তবে শিখতে হলে আমার সাথে মারামারি করতে হবে।'

'থাক বাবা,' মাথা নাড়ল শ্যাডো। 'দরকার নেই।'

'কী আজব!' ঘরের অন্যান্যদের দিকে তাকিয়ে বলল সুইনি। 'বুড়ো ওয়েনসডে দেহরক্ষী একটা ভাড়া করেছে বটে! মারামারি করার কথা চিন্তা করেই যার হাঁটু কাঁপে!'

'যত যাই বলো, আমি মারপিটের মাঝে নেই।'

দুলছে আর ঘামছে সুইনি। মাথার বেসবল ক্যাপটা ঠিক করে নিল। এরপর আচমকা বাতাস থেকে একটা পয়সা বের করে এনে রেখে দিল টেবিলের উপর। ‘খাঁটি সোনা,’ বলল সে। ‘আমার সাথে মারামারি করলেই হবে। হার হোক বা জিত, জিনিসটা তোমার। দামড়া একটা শরীর বানিয়েছে, কিন্তু স্বভাবে দেখি একদম কাপুরুষ।’

‘ছেলেটা তো বললই যে তোমার সাথে লড়বে না।’ বললেন ওয়েনসডে। ‘এখন বিয়ার খেয়ে নিয়ে ভাগো।’

ওয়েনসডের দিকে এক পা এগিয়ে এলো সুইনি। ‘আমাকে গালি দিয়ে আবার আদেশ চালানো হচ্ছে? শালা, বুড়ো হাবড়া, হৃদয়হীন পাষণ্ড।’ রাগে লাল হয়ে আছে আইরিশ লোকটার চেহারা।

শান্ত করার ভঙ্গিমায় হাত তুললেন ওয়েনসডে। ‘বোকার মতো কথা বোলো না সুইনি।’

চোখ লাল করে তার দিকে তাকাল পাগলা। মাতালের মতো বলল, ‘ভাড়া করেছ এক কাপুরুষকে। এখন যদি আমি তোমার কিছু করি, ওই শালা ভণ্ড রুখতে পারবে?’

শ্যাডোর দিকে ফিরলেন ওয়েনসডে। ‘যথেষ্ট হয়েছে, একে সামলাও।’

উঠে দাঁড়িয়ে পাগলা সুইনির চোখে চোখ রাখল শ্যাডো, অন্তত রাখার চেষ্টা করল। আইরিশ লোকটা আসলেই অনেক লম্বা। ‘আমাদেরকে বিরক্ত করছে কেন? মাতাল হয়ে পড়েছ তুমি, এবার বিদায় হও।’

আস্তে আস্তে এক টুকরা হাসি সুইনির চেহারায় জায়গা করে নিল। ‘এটাই তো চাই।’ বলেই ঘুষি ছুঁড়ল শ্যাডোকে লক্ষ্য করে। চাবুকের মতো পিছিয়ে এলো শ্যাডোর মাথা, আঘাতটা ওর ডান চোখের নিচে লেগেছে। ব্যথায় কুঁচকে উঠল যুবকের চেহারা।

তারপরই শুরু হলো হাতাহাতি।

মারামারির কায়দাকানুন লোকটার জানা আছে বলে মনে হলো না শ্যাডোর, অবশ্য তাতে তার কিছু যায় আসে বলেও মনে হলো না। লোকটা লড়ছে কেবল লড়ার আনন্দে। ঘুষি ছুঁড়ছে একের পর এক, সেগুলো লক্ষ্যে আঘাত হানছে কিনা-তা নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা নেই।

শ্যাডো লড়ছে সাবধানতার সাথে, সুইনির আঘাতগুলো হয় ঠেকাচ্ছে আর নয়তো এড়িয়ে যাচ্ছে। চারপাশের সবাই যে আগ্রহ নিয়ে দেখছে লড়াই, তা টের পাচ্ছে ও। টেবিল সরিয়ে ওদেরকে লড়ার মতো জায়গা করে দেয়া হয়েছে।

এমনকি নিজের উপর ওয়েনসডের তীক্ষ্ণ নজরও টের পাচ্ছে সে। ওর যে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই শ্যাডোর। কিন্তু প্রশ্নটা কী?

জেলে থাকতে শ্যাডো শিখেছে, লড়াই আসলে দুই ধরনের। একটা বোঝায়, আমায় ঘাঁটিও না। এই ধরনের লড়াইতে দেখাতে হয় দক্ষতা আর নৃশংসতা। আরেকটা হচ্ছে প্রকৃত লড়াই, যেটা শেষ হয়ে যায় কয়েক সেকেণ্ডের মাঝেই।

'এই, সুইনি।' শ্বাস টানতে টানতে বলল শ্যাডো। 'আমরা লড়ছি কেন?'

'লড়াইয়ের আনন্দ পাবার জন্য।' মাতলামি যেন কেটে উঠছে লম্বা লোকটার। 'লড়াইয়ের অশুভ মজা লোটার জন্য। কেন, নিজের মাঝে সেই আনন্দ উপলব্ধি করতে পারছ না?' লোকটার নিচের ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরছে...ঝরছে শ্যাডোর মুষ্টি থেকেও!

'পয়সাগুলা রেখেছিলে কোথায়?' মুখ বরাবর আসা একটা ঘুষি কাঁধে নিয়ে জানতে চাইল শ্যাডো।

'সে তো আগেই বলছি!' ঘোঁত করে উঠল সুইনি। 'কিন্তু যে কান থাকা সত্ত্বেও না শোনার সিদ্ধান্ত নেয়, তার মতো অন্ধ আর কেউ নেই। আউ!'

সুইনির দিকে একটা জ্যাব ছুঁড়ল শ্যাডো, পেছাতে গিয়ে লোকটা বাড়ি খেল একটা টেবিলের সাথে। খালি গ্লাস আর অ্যাশট্রে আছড়ে পড়ল মাটিতে। শ্যাডো চাইলে লড়াই তখনই শেষ করে ফেলতে পারত।

ওয়েনসডের দিকে তাকাল ও, নড করলেন ভদ্রলোক। এবার পাগলা সুইনির দিকে তাকিয়ে বলল, 'খায়েশ মিটেছে?' একটু ইতস্তত করে মাথা নাড়ল সুইনি। কয়েক পা পিছিয়ে এলো ও, এদিকে সুইনিও হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'লড়াইয়ের খায়েশ কি লড়াকুর মেটে!' চিৎকার করে বলল আইরিশ লোকটা। মুচকি হেসে আবার ঘুষি হাঁকাল শ্যাডোকে উদ্দেশ্য করে। কিন্তু মন্দ ভাগ্য বেচারার, এক টুকরা বরফে পা দিয়ে বসেছে। হাসি উধাও হয়ে গেল নিমিষেই, আছড়ে পড়ল ও। মাথার পেছন দিকটা ঠক করে বাড়ি খেল মেঝের সাথে।

সুযোগ বুঝে লোকটার বুকে হাঁটু ঠেকিয়ে বসে পড়ল শ্যাডো। 'আবার জিজ্ঞাসা করছি, খায়েশ মিটেছে?'

'না মিটে উপায় কী?' মাথা তুলে বলল সুইনি। 'এখন আর লড়ে আনন্দ পাচ্ছি না।' থুথু ফেলল ও, সাথে রক্তও বেরিয়ে এলো। এক মুহূর্ত পরেই দেখে গেল, মেঝেতে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে লোকটা!

শ্যাডো কতক্ষণ ওভাবে ছিল, বলতে পারবে না। আচমকা পিঠে আলতো চাপড় টের পেয়ে ঘুরে তাকাল। ওয়েনসডে ওর হাতে একটা বিয়ারের বোতল ধরিয়ে দিলেন।

মীডের তুলনায় হাজার গুণে ভালো!

ঘুম থেকে উঠে শ্যাডো দেখল, একটা সেডানের পেছনের সিটে শুয়ে আছে ও। সকালের সূর্যটা গরম হয়ে উঠতে শুরু করেছে, মাথাও ফেটে পড়বে যেন। অদ্ভুত ভঙ্গিমায় উঠে বসল সে, হাত দিয়ে চোখ ঘষছে।

ওয়েনসডে গাড়ি চালাচ্ছেন, সেই সাথে গানও গাইছেন গুনগুণ করে। গাড়ির কাপ হোল্ডারে কফির কাপ শোভা পাচ্ছে, হাইওয়ে ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। মি. ওয়েনসডের পাশের সীটটা খালি।

'এই সুন্দর সকালে, কেমন বোধ করছ?' মাথা না ঘুরিয়েই জানতে চাইলেন তিনি।

'আমার গাড়ির কী হলো?' শ্যাডো জানতে চাইল। 'ভাড়া নিয়েছিলাম ওটা।'

'পাগলা সুইনি নিয়ে গেছে, ফিরিয়ে দিবে। লড়াইয়ের পর তোমরা এই চুক্তিই করেছিলে।'

মনে পড়ছে না শ্যাডোর, তবে খুব একটা মাথা ঘামাল না। 'কফি আছে আর?'

হাত নামিয়ে একটা পানির বোতল বের করে আনলেন ভদ্রলোক। 'এই নাও, পান-স্বল্পতা ঠিক হয়ে যাবে। কফির চেয়ে এখন এটাই বেশি দরকার তোমার। সামনের গ্যাস স্টেশনে থেমে নাস্তা কিনে দেব তোমাকে। একটু পরিষ্কারও হয়ে নিতে পারবে। দেখে তো মনে হচ্ছে ছাগলের খোঁয়াড়ে রাত কাটিয়েছ!'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তা-ও দুর্গন্ধ ভরা ছাগলের খোঁয়াড়ে।'

বোতল খুলে গলায় পানি ঢালল শ্যাডো। আচমকা জ্যাকেটের পকেট থেকে ভেসে এলো একটা ঝনঝন আওয়াজ! অবাক হয়ে পকেটে হাত ঢোকাল ও, বের করে আনল হাফ ডলার আকারের একটা ভারী, হলদে পয়সা। একটু আঠাল মনে হলো ওটাকে। কিছুক্ষণ দেখে আবার পকেটে রেখে দিল পয়সা।

'কালকে কী খাচ্ছিলাম আমি?' জানতে চাইল শ্যাডো। গতরাতের ঘটনাগুলো আস্তে আস্তে মনে পড়তে শুরু করেছে ওর।

হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে যাবার একটা রাস্তা দেখতে পেয়ে ওদিকেই গাড়ি চালালেন ওয়েনসডে। 'মনে নেই?'

'না।'

'মীড, মীড গিলছিলে।' মুখে ইয়া বড় এক হাসি এনে বললেন ভদ্রলোক।

ওহ্‌, হ্যাঁ। মীড!

গলায় পানি ঠেলে পেছনের সিটে হেলান দিয়ে বসল শ্যাডো। স্মৃতিতে গতরাতের ঘটনাগুলো আনাগোনা শুরু করেছে। চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল সে। কিছু ঘটনা মনে পড়ল, কিছু পড়ল না।

গ্যাস স্টেশনে প্রথমেই ক্লিন-ইউ-আপ কীট কিনল শ্যাডো। ওতে আছে একটা রেজর, শেভিং ক্রিম, চিরুনি, ছোট টিউব ভর্তি টুথপেস্ট আর একটা টুথব্রাশ। ছেলেদের রেস্টরুমে চলে গেল সে ওটা নিয়ে, আয়নায় নিজেকে দেখল।

এক চোখের নিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে, স্পর্শ করা মাত্র চিলিক দিয়ে উঠছে। নিচের ঠোঁটটাও ফুলে গেছে অনেক।

রেস্ট রুমের তরল সাবান ব্যবহার করে মুখ ধুলো শ্যাডো, এরপর ফোম লাগিয়ে পরিষ্কার করল গাল। চুল ভিজিয়ে চুলে চিরুনি বুলিয়ে নিল একবার নাহ, এখনও রুক্ষ দেখাচ্ছে ওকে।

লরা এই অবস্থায় ওকে দেখলে কী মনে করবে? ভাবল একবার। আচমকা মনে পড়ল, লরা আর কখনওই ওকে কিছু বলবে না। আয়নায় আরেকবার নিজের চেহারা দেখল সে, কেঁপে উঠল একটু।

পরক্ষণেই ওয়েনসডের কাছে চলে এলো ও।

'দেখে তো একদম বাজে লাগছে।' বলল শ্যাডো।

'তা লাগছে।' একমত হলেন ওয়েনসডে।

ক্যাশ রেজিস্টার থেকে অনেকগুলো হালকা খাবার তুলে নিলেন তিনি, সব কিছুর দাম চুকিয়ে দিলেন গুণে গুণে। তবে টাকা দিয়ে দিবেন, নাকি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে-সেটা ঠিক করতে কষ্ট হলো তার। এদিকে টাকা বুঝে নেবার জন্য অপেক্ষমাণ কমবয়সী মেয়েটার বিরক্তি বেড়েই চলছে। ওয়েনসডের এই অবস্থার সাথে পরিচিত নয় শ্যাডো, লজ্জা আর অনুতাপে যেন ভেঙে পড়বেন তিনি। বড় বেশি বয়স্ক মনে হচ্ছে তাকে, একবার কার্ড বাড়িয়ে দিচ্ছেন তো আরেকবার নগদ নোট। মেয়েটা তাকে টাকা ফেরত দিয়ে বিলটা কার্ডে চার্জ করল, তারপর কার্ডের রিসিট দিয়ে ওয়েনসডের হাত থেকে টাকা নিল! এরপর আবার টাকাটা ফেরত দিয়ে তুলে নিল আরেকটা কার্ড।

কাজ শেষ করে গ্যাস স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় নামলেন তারা, দুই পাশের ঘাসগুলো বাদামী রঙ ধারণ করেছে। গাছের পাতাগুলো ঝরে

গিয়েছে অনেক আগেই। কালো দুটো পাখিকে টেলিগ্রাফের তারের উপর বসে থাকতে দেখল শ্যাডো।

'আচ্ছা, মি. ওয়েনসডে?'

'কী?'

'আমি যেটা বুঝলাম, ভেতরে তো আপনাকে একটা টাকাও শেষ পর্যন্ত দিতে হলো না!'

'তাই?'

'হুম, আপনার কি মনে হয়, মেয়েটা এই শুভঙ্করের ফাঁকি ধরতে পেরেছে?'

'নাহ, কখনও পারবেও না।'

'তাহলে আপনার পেশাটা কী, বলুন তো? ধান্ধাবাজি?'

নড করলেন ওয়েনসডে। 'হ্যাঁ,' বললেন তিনি। 'তা বলতে পারো।'

একটা ট্রাকটা পেছনে ফেলার জন্য গাড়িটাকে বাঁ লেনে নিয়ে এলেন তিনি, মাথার উপরের আকাশটা যেন আজ ধূসর রঙে সেজেছে।

'তুষারপাত হবে,' মন্তব্য করল শ্যাডো।

'হ্যাঁ।'

'সুইনি কি আমাকে সত্যি সত্যি সোনার পয়সা ব্যবহার করে খেলা দেখিয়েছে?'

'কোন সন্দেহ নেই।'

'আমার মনে পড়ছে না।'

'লম্বাছিল গতরাতটা। সময় দাও, মনে পড়ে যাবে।'

পেঁজা তুলোর মতো তুষার এসে পড়ছে গাড়ির উইণ্ডশীল্ডে, গলেও যাচ্ছে দেরী না করেই।

'তোমার স্ত্রীর মৃতদেহের জন্য শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে ওয়েনডেলের ফিউনারেল পার্লারে।' বললেন ওয়েনসডে। 'লাঞ্চের পর ওখান থেকে গোরস্তানে নিয়ে যাওয়া হবে।'

'আপনি এসব জানেন কী করে?'

'তুমি খালি হচ্ছিলে যখন, তখন ফোন করে জেনে নিয়েছি। ওয়েনডেলের পার্লারটা কোথায়, জানো তো?'

নড করল শ্যাডো, তুষারগুলো বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। 'ওই রাস্তায় নামতে হবে।' দেখিয়ে দিল ও। গাড়িটা হাইওয়ে থেকে নেমে, ঈগল পয়েন্টের রাস্তায় উঠল।

তিন বছর পার হয়ে গিয়েছে। ভাবা যায়! অপরিচিত দোকান, আগে না দেখা ট্রাফিক লাইট-এসবই নজরে পড়ল ওর। জিমের পাশ দিয়ে যাবার সময় গাড়িটার গতি একটু কমাতে বলল সে ওয়েনসডেকে। 'অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ'লেখা সাইনবোর্ড ঝুলছে সামনে।

প্রধান রাস্তা থেকে বাঁয়ে উঠে দেখতে পেল একটা নতুন ট্যাটু পার্লার। এরপর বিমানবাহিনির নিয়োগ কেন্দ্র পার হয়ে বার্গার কিং, ওলসেনের ওষুধের দোকানটা এখনও তেমনি আছে। ওটা পার হলেই ওয়েনডেলের পার্লারের সেই চিরচেনা হলদে-ইটের দালান। অবশ্য এখন উপরে একটা নিয়ন সাইন ঝুলছে-শেষ যাত্রার আগের বিশ্রাম কেন্দ্র! একদম ফাঁকা কয়েকটা ফলক দেখা যাচ্ছে ওই সাইনের নিচেই অবস্থিত জানালার ফাঁক দিয়ে।

পার্কিং-লটে গাড়ি ঢোকালেন ওয়েনসডে। 'আমি আসব সাথে?'

'দরকার নেই।'

'ভালো,' প্রানহীন হাসিটা দেখা গেল আবার। 'তুমি তোমার কাজ সারো, আমি আমার কাজ সারি। যাই হোক, মোটেল আমেরিকায় ঘর ভাড়া করে রাখব। এখান থেকে সরাসরি ওখানেই চলে এসো।'

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল শ্যাডো, ওটা চোখের আড়াল হলে প্রবেশ করল পার্লারে। হালকা আলোয় অন্ধকার পুরোপুরি দূর হয়নি, ফুল আর বার্নিশের গন্ধ ভেসে আসছে। সেই সাথে সম্ভবত একটু ফরমালডিহাইডেরও। করিডরের একদম শেষ মাথায় থাকার কথা লরার কফিন।

আচমকা শ্যাডো টের পেল, সোনার পয়সাটা মুঠ করে ধরে আছে ও। যেন ওটার ওজন স্বস্তি দিচ্ছে ওকে। পয়সার খেলা অনুশীলন করতে করতে এগোল সে।

একদম ওপাশের দরজার পাশে সাঁটিয়ে রাখা কাগজটার একেবারে শেষে লরার নাম। দরজা দিয়ে প্রবেশ করল ও। উপস্থিত প্রায় সবাই পরিচিত–লরার সহকর্মী, তার বন্ধু-বান্ধব।

ওদের কাছেও শ্যাডো পরিচিত একজন। থম মেরে বসে রইল সবাই। কারও মুখে হাসি নেই, এমনকি সম্ভাষণও জানাল না কেউ।

ঘরের এক মাথায় একটা ছোট্ট মঞ্চ, ওতে শোভা পাচ্ছে সর-রঙ্গা একটা কফিন। ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে ওটাকে। এক পা সামনে এগোল শ্যাডো। লরার দেহটা এখান থেকেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আর এগোবার সাহস হচ্ছে না ওর, আবার পিছিয়েও যেতে পারছে না।

কালো স্যুট পরা এক লোক এগিয়ে এলো ওর দিকে, সম্ভবত এখানকার কর্মচারী। চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা একটা বই দেখিয়ে বলল, 'স্যার, আপনি কি বইতে সান্ত্বনা বাণী বা কোন স্মৃতিচারণা লিখে রাখতে চান?'

কেবল শ্যাডো আর আজকের তারিখটা পরিষ্কার অক্ষরে লিখল ও। লিখবে না লিখবে না করেও তার পাশে লিখল-(প্যাপি)। কফিনের কাছে যেতে ইচ্ছে করছে না। ওখানে যে দেহটা শুয়ে আছে সেটা আর যাই হোক, এখন আর লরা নেই!

ছোট-খাটো এক মহিলা দরজা দিয়ে প্রবেশ করল, ইতস্তত ভাবটা পরিষ্কার। মহিলার চুল লালচে, পোশাক কালো হলেও খুব দামী। বিধবার পোশাক, ভাবল শ্যাডো। মহিলাকেও ভালোভাবেই চেনে ও। অড্রি বার্টন, রবির স্ত্রী। হাতে ভায়োলেট ফুলের তোড়া ধরে আছে মেয়েটা। লরার কফিনের দিকে এগিয়ে গেল সে, পিছু পিছু শ্যাডোও।

চোখ বন্ধ করে কফিনে শুয়ে আছে ওর স্ত্রী, বুকের উপর বেঁধে রাখা হাত। পরনের নীল স্যুটটা চিনতে পারল না শ্যাডো। বাদামী চুলগুলো লম্বা। এই ওর লরা...আবার এই লরা ওর নয়। শান্ত ভঙ্গিতে শুয়ে থাকাটা আসলে মেয়েটাকে মানাচ্ছে না, ভাবল শ্যাডো। লরা কখনওই এত আরাম করে ঘুমায় না।

ভায়োলেটের তোড়াটা লরার বুকের উপরে রাখল অড্রি। এরপর...একদম আচমকা...মুখ ভর্তি থুথু ছিটিয়ে দিল মেয়েটার মৃত চেহারায়!

আর দাঁড়াল না সে, রওনা দিল দরজার দিকে। তাড়াতাড়ি পিছু নিল শ্যাডো।

'অড্রি?' বলল ও, কণ্ঠে প্রশ্ন।

'শ্যাডো? জেল পালিয়েছ? নাকি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে?'

মেয়েটার কণ্ঠ কেমন যেন দূরের বলে মনে হলো শ্যাডোর। ঘুমের ওষুধ খেয়ে এসেছে নাকি?

'গতকাল ছেড়েছে, আমি এখন মুক্ত।' উত্তর দিল শ্যাডো। 'কিন্তু তুমি এটা কী করলে?'

আধো অন্ধকার করিডরে পা রাখল অড্রি। 'কেন, ভায়োলেট যে ওর পছন্দের ফুল ছিল, জানো না?'

'ফুলের কথা বলছি না।'

'ওহ, ওটা!' অদৃশ্য কিছু একটা মুখ থেকে মুছতে মুছতে বলল ও। 'ওটার ব্যাখ্যা লাগবে বলে তো মনে হয় না।'

'আমার লাগবে, অড্রি।'

'শোননি তাহলে?' শান্ত, অনুভূতিহীন কণ্ঠে বলল মেয়েটা। 'মৃত্যুর সময় আমার স্বামীকে মুখ-মেহন করে দিচ্ছিল তোমার স্ত্রী।'

কথা না বাড়িয়ে ঘরে ফিরে গেল শ্যাডো।

কেউ একজন থুথুটুকু লরার চেহারা থেকে মুছে ফেলেছে।

বার্গার কিং-এ দুপুরের খাবারটা খেয়ে নিল শ্যাডো। এখন লাশ কবর দেয়া হবে। লরার কফিনটাকে এরইমাঝে গোরস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এখানে ও এসেছে ওয়েনডেলের শবযানে চড়ে, সাথে ছিল লরার মা। মিসেস ম্যাকক্যাব মোটামুটি নিশ্চিত যে তার মেয়ের মৃত্যুর জন্য শ্যাডোই দায়ী। 'তুমি যদি এখানে থাকতে,' বললেন তিনি। 'তাহলে এসব ঘটত না। আসলে আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি যে আমার মেয়েটা তোমাকে বিয়ে করল কেন? আমি নিষেধ করেছিলাম ওকে। একবার না, বারবার। কিন্তু আজকাল কি আর কেউ মায়ের কথা শোনে!' একটুখানি চুপ হয়ে শ্যাডোর চেহারার দিকে তাকালেন তিনি। 'মারামারি করেছ নাকি?'

'জি।' বলল শ্যাডো।

'অসভ্য কোথাকার।' বলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি। থুতনিটা রাগে কাঁপছে।

শ্যাডোকে অবাক করে দিয়ে শেষকৃত্যানুষ্ঠানেও উপস্থিত হলো অড্রি বার্টন, তবে দাঁড়াল সবার পেছনে। যাজকের বক্তব্য শেষ হবার পর, ঠান্ডা মাটিতে শুইয়ে রাখা হলো কফিনটাকে। কিছুক্ষণের মাঝেই বিদায় নিল সবাই।

শ্যাডো কিন্তু গেল না। পকেটে হাত ঢুকিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওখানেই।

মাথার উপর আকাশ এখন ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে, তুষারপাত হচ্ছে এখনও।

লরাকে কিছু একটা বলতে চায় ও, তাই কথাগুলো মুখে আসার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে আপত্তি নেই। আস্তে আস্তে কমতে শুরু করেছে আলো। শ্যাডোর মনে হচ্ছে, পাজোড়া যেন জমে যাচ্ছে। ঠান্ডায় ব্যথা করতে শুরু করেছে হাত আর চেহারা। পকেটে হাত ঢুকিয়ে রেখেও খুব একটা লাভ হচ্ছে না, পয়সাটার স্পর্শ পেয়ে ওটাকে আঁকড়ে ধরল ও।

এগিয়ে গেল কবরের দিকে।

'এটা তোমার জন্য।' বলল ও।

অল্প কিছু মাটি ফেলা হয়েছে কফিনে, কিন্তু গর্তটা পুরো হতে এখনও অনেক বাকি। সোনার পয়সাটা লরার কবরে ছুঁড়ে দিল শ্যাডো। ওটা যেন অন্য কারও নজরে না পড়ে, তাই আরও কিছুটা মাটি ফেলল। হাত থেকে মাটি মুছে বলল, 'শুভ রাত্রি, লরা।' কিছুক্ষণ নীরব থেকে যোগ করল, 'আমাকে মাফ করে দিও।' তারপর ঈগল পয়েন্টের দিকে হাঁটতে শুরু করল ও।

মোটেলটা কম করে হলেও দুই মাইল দূরে হবে। তবে তিন বছর জেলে থাকার পর, চাইলে বছরের পর বছর ধরে হাঁটতেও আপত্তি নেই ওর। দক্ষিণে হাঁটতে থাকলে কেমন হয়? আলাস্কায় গিয়ে নাহয় থামবে? অথবা উত্তরে, মেক্সিকোতে? চাইকি পাতাগোনিয়া বা টিয়েরা ডেল ফুয়েগোতেও চলে যাওয়া যায়!

হঠাত একটা গাড়ি এসে থামল ওর পাশে, নেমে এলো জানালার কাঁচ।

'লিফট লাগবে, শ্যাডো?' জানতে চাইল অড্রি বার্টন।

'না,' উত্তর দিল ও। 'তোমার কাছ থেকে তো একদম না।' হাঁটা শুরু করল আবার।

ঘণ্টায় তিন মাইল বেগে গাড়ি চালিয়ে ওর পাশেই রইল অড্রি, হেডলাইটের আলোয় মনে হচ্ছে যেন তুষারগুলো নাচছে!

'আমি ভেবেছিলাম, লরা আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু।' বলল অড্রি। 'প্রত্যেকদিন আমাদের কথা হতো, জানো? রবির সাথে আমার ঝগড়া হলে, সেটাও ওকেই বলতাম সবার আগে। অথচ তখনও আমার স্বামীকে নিয়ে...আমারই পিঠে ছোরা মেরে...আমারই সবচেয়ে কাছের বন্ধু তখন তার বিছানা গরম করছিল!'

'যাও তো, অড্রি।'

'আমি চাই তুমি বোঝ, যা করেছি, তার কারণ ছিল বলেই করেছি।'

চুপ করে রইল শ্যাডো।

'ওই!' চিৎকার করল মেয়েটা। 'ওই, আমি তোমার সাথে কথা বলছি!'

ঘুরে তাকাল শ্যাডো। 'কী শুনতে চাও আমার মুখ থেকে? লরার মুখে থুত্থু দিয়ে ভালো করেছ, তাই শুনতে চাও? নাকি শুনতে চাও, তোমার এই কথা শুনে আমি এখন লরাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছি? আমি এর কোনটাই বলব না, অড্রি।'

আরেক মিনিট পাশে পাশে চলল মেয়েটা, বলল না কিছুই। তারপর জানতে চাইল, 'জেল কেমন, শ্যাডো?'

'ভালোই,' বলল শ্যাডো। 'তোমার থাকতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হতো না, একদম বাড়ির মতোই বোধ করতে।'

অ্যাক্সিলেটরে যেন উঠে বসল মেয়েটা, গর্জে উঠল গাড়ির ইঞ্জিন।

হেডলাইটটাও দৃষ্টির অলক্ষ্যে চলে গেলে, অন্ধকার হয়ে এলো দুনিয়া। গোধূলিকে হটিয়ে দিয়ে রাত নেমেছে। শ্যাডো ভেবেছিল, হাঁটলে শরীর গরম হবে। কিন্তু না, তা হলো না।

জেলেও ছিল একটা গোরস্তান। লো কী লেস্মিথ ওটার নাম দিয়েছিল 'হাড্ডির বাগান'। শব্দ দুটো এখনও খেলে যাচ্ছে শ্যাডোর মনে। যেদিন প্রথম শুনেছিল ও দুটো শব্দ, সেদিন রাতে স্বপ্ন দেখেছিল সে। দেখেছিল চাঁদের আলোয় একটা বাগানের মাঝ দিয়ে হাঁটছে সে। দুপাশে হাড়ের গাছ, ডালগুলোও হাড়ের। গাছটার শেকড় চলে গিয়েছে কবরের ভেতরে। ওই গাছগুলোতে ফলও ধরেছে। অশুভ কিছু একটা যেন জড়িয়ে আছে ওই ফলগুলোর সাথে। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা মনে পড়ছে না।

একের পর এর গাড়ি চলে যাচ্ছে ওর পাশ দিয়ে, ফুটপাত থাকলে মন্দ হতো না। অন্ধকার দেখতে না পেয়ে হোঁচট খেল শ্যাডো। তাল সামলাতে না পেরে পড়েই গেল রাস্তার ধারে, ডান হাতটা নরম, ঠান্ডা কাদায় কয়েক ইঞ্চি ডুবে গেল যেন। উঠে দাঁড়িয়ে হাত মুছল ও প্যান্টের সাথে। আচমকা...কিছু বুঝে ওঠার আগেই, নরম কিছু একটা ঢেকে দিল ওর নাক-মুখ।

এবার নরম কাদাটাকে বেশ উষ্ণ মনে হলো ওর।

শ্যাডোর মনে হচ্ছিল, কপালটাকে কেউ মাথার সাথে পেরেক ঠুকে গেঁথে দিয়েছে! হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। একটা গাড়িতে বসে আছে ও, সীটগুলো চামড়ায় মোড়ান। প্রথমে মনে হলো, চোখ ভুল দেখছে। পরক্ষণেই বুঝতে পারল যে না, ওপাশের সীটটা অতোটাই দূরে!

ওর দুপাশে মানুষ বসে আছে। কিন্তু সেদিকে তাকাবার সাহস পেল না সে।

অনেক দূরের ওপাশের সিটে বসে আছে এক মোটা তরুণ। ডায়েট কোকের একটা ক্যান হাতে নিল ও। পরনে লম্বা, কালো কোট-রেশম দিয়ে বানানো বলে মনে হচ্ছে। বয়স বিশ-একুশের বেশি হবে না কোন মতেই। এক পাশে গাল ভর্তি ব্রণ। শ্যাডোকে জেগে উঠতে দেখে হাসল সে।

'হ্যালো, শ্যাডো।' বলল ছেলেটা। 'আমার সাথে গোলমাল করো না।'

'আচ্ছা,' উত্তরে বলল শ্যাডো। 'করলাম না। এবার আমাকে মোটেল আমেরিকায় নামিয়ে দাও।'

'ওকে একটা থাবড়া দাও তো।' শ্যাডোর বাঁ পাশে বসা লোকটাকে নির্দেশ দিল ছেলেটা। সোলার প্লেক্সাসের উপর ঘুষি খেয়ে দম হারিয়ে ফেলল শ্যাডো। সোজা হয়ে বসতে বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগল ওর।

'বললাম গোলমাল করো না, আর শুরুতেই করে বসলে? সংক্ষেপে উত্তর দেবে, সঠিক উত্তরটাই দেবে কেবল। রইলে আমি তোমাকে খুন করব। অবশ্য না-ও করতে পারি। তোমার দেহের দুইশ ছয়টা হাড়ের প্রতিটা এক-এক করে ভাঙতেও পারি। তাই আবারও বলছি, আমার সাথে গোলমাল করো না।'

'বুঝতে পারলাম।' বলল শ্যাডো।

লিমোর সিলিঙে থাকা লাইটটা রঙ পরিবর্তন করছে–বেগুনি-নীল-সবুজ-হলুদ।

'তুমি ওয়েনসডের হয়ে কাজ করছ।' বলল ছেলেটা।

'হ্যাঁ।' শ্যাডো।

'কী চায় ও? মানে এখানে কী করছে? কোন না কোন পরিকল্পনা আছে নিশ্চয়। কী সেটা?'

'আমি আজ সকালেই মি. ওয়েনসডের সাথে কাজ করা শুরু করছি।' বলল শ্যাডো। 'ফাই-ফরমাশ খাঁটি।'

'মানে বলতে চাচ্ছ, তুমি জানো না?'

'আমি বলতে চাচ্ছি, আমি জানি না।'

জ্যাকেট থেকে একটা রূপালী সিগারেট কেস বের করে আনল ছেলেটা। শ্যাডোর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নেবে?'

একবার ভাবল, এই সুযোগে হাতের বাঁধন খোলানো যাবে। কিন্তু মত পাল্টাল ও। 'নাহ, ধন্যবাদ।'

ছেলেটা হাতেই বানাল সিগারেট। এরপর যখন একটা কালো জিপ্পো লাইটার দিয়ে আগুন ধরাল, তখন কেমন যেন বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ পোড়ার গন্ধ ছেয়ে গেল গাড়িতে।

লম্বা একটা টান দিল ছেলেটা, এরপর দম বন্ধ করে রইল। মুখের দুপাশ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল একটু, আবার সাথে সাথেই সেটা টেনে নিল নাক দিয়ে। শ্যাডোর সন্দেহ হলো, এই কাজটা জনসম্মুখে করার আগে বহুবার আয়নার সামনে অনুশীলন করেছে সে। 'আমাকে যদি মিথ্যা বলো,' বলল ছেলেটা। 'তাহলে একেবারে খুন করে ফেলব। এতক্ষণে নিশ্চয় তা বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ। তুমি বলেছ আগে।'

সিগারেটে আরেকটা লম্বা টানের পর ছেলেটা বলল, 'মোটেল আমেরিকা বললে না?' এরপর ড্রাইভারের জানালায় টোকা দিল। 'মোটেল আমেরিকায় চলো। আমাদের অতিথিকে নামিয়ে দিতে হবে।'

লিমোর ভেতরের লাইট ক্ষণে ক্ষণে রঙ পরিবর্তন করে চলছে। শ্যাডোর মনে হলো, ছেলেটার চোখও যেন জ্বলজ্বল করছে। অতি প্রাচীন কোন কম্পিউটারের মনিটর যেমন জ্বলজ্বল করে, তেমনি সবুজাভ।

'তুমি ওয়েনসডেকে বলবে-সে এখন এক অতীত স্মৃতি। তাকে কেউ মনে রাখেনি। বুড়ো হাবড়ার বোঝা উচিত, আমরাই ভবিষ্যৎ। ওকে বা ওর মতো প্রাচীনদের আমরা গোণায় ধরি না। ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে তাদের, ওখানেই থাকবে। আর আমার মতো যারা আছে, তারা লিমোয় চড়ে এগিয়ে যাব আগামীর দিকে।'

'অবশ্যই বলব।' বলল শ্যাডো। মাথা ঘুরতে শুরু করেছে ওর, অসুস্থ না হয়ে পড়ে–সেই ভয় পাচ্ছে।

'ওকে বলবে, আমরা বাস্তবতা নতুন করে প্রোগ্রাম করেছি। বলবে, ভাষা হচ্ছে ভাইরাস আর ধর্ম একটা অপারেটিং সিস্টেম। প্রার্থনা আসলে স্প্যাম ছাড়া কিছুই না। সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলবে, আর নয়তো তোমাকে খুন করে ফেলব।' মৃদু স্বরে হুমকি দিল ছেলেটা।

'বুঝতে পেরেছি,' বলল শ্যাডো। 'আমাকে বরং এখানেই নামিয়ে দাও। বাকি পথ আমি হেঁটে যেতে পারব।'

নড করল ছোকরা। 'তোমার সাথে কথা বলে ভালো লাগল। কান খুলে শোন, আমার কথা না শুনলে তোমাকে ডিলিট করে দেয়া হবে। আন-ডিলিট করার আর কোন সুযোগ নেই।' সিগারেটের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'কৃত্রিমভাবে বানানো ব্যাঙের চামড়া এইটা। জানো, আজকাল মানুষ বুফোটেনিনও বানাতে পারে?'

ব্রেক করল গাড়িটা, দরজা খুলে গেলে ইতস্তত ভঙ্গিতে নামল শ্যাডো, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। গাড়ির ভেতরটা এখন ধোঁয়ার রাজ্যে পরিণত হয়েছে। শুধু দুটো লাইট, ব্যাঙের চোখের মতো জ্বলজ্বল করছে। 'ক্ষমতার পালাবদল হচ্ছে, শ্যাডো। এরচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই। ওহ ভালো কথা, তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে শুনে খারাপ লাগছে।'

প্রায় সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে গেল দরজা। চুপচাপ, কোন শব্দ না করেই এগিয়ে গেল লিমো। মোটেলটা আর মাত্র কয়েকশ মাইল দূরে। হেঁটেই রওনা

দিল ও, ঠান্ডা বাতাস বুক ভরে টানছে। আর কোন ঘটনা...অথবা দুর্ঘটনা ছাড়াই পৌঁছে গেল মোটেল আমেরিকায়।

অধ্যায় তিন

প্রতিটা ঘণ্টাই যেন উপহার দেয় প্রাণঘাতী ক্ষত, তবে একেবারে শেষেরটাই কেড়ে নেয় জীবন।

–প্রবচন

মোটেল আমেরিকার পেছনে বসে আছে শুকনো এক যুবতী। শ্যাডো নিজের পরিচয় দেয়া মাত্র সে জানাল, ওর জন্য আগে থেকেই ঘর ভাড়া করা আছে। হালকা সোনালী চুল আর ইঁদুরমুখো চেহারায় সন্দেহ যেন পাকাপাকিভাবে গেঁড়ে বসেছে মেয়েটার। কিন্তু হালকা হাসিতেই সেই কুঞ্চন দূর হয়ে গেল অনেকটা। ওয়েনসডের রুম নাম্বারটা কিছুতেই তার মুখ থেকে বের করতে পারল না শ্যাডো, তবে প্লাস্টিক কার্ডটা ওকে ধরিয়ে দিল যুবতী। জানাল, মোটেলের নাম্বারে ফোন করলে মি. ওয়েনসডেকে জানিয়ে দেয়া হবে যে তার কাছে অতিথি এসেছে। সরাসরি রুম নাম্বার জানাবার নিয়ম নেই।

তাই করল শ্যাডো। হলের শেষ মাথার একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন প্রৌঢ়।

'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কী খবর?' জানতে চাইলেন তিনি।

'শেষ হলো।'

'ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চাও?'

'না,' সাফ মানা করে দিল শ্যাডো।

'খুব ভালো,' দাঁত বের করে হাসলেন ওয়েনসডে। 'আজকাল সবাই শুধু কথাই বলে। কথা...কথা...কথা। অথচ নাগরিকরা মুখ বুজে থাকতে জানলে এই দেশটা আজ অনেক ভালো একটা অবস্থানে থাকত!'

নিজের ঘরের দিকে ওকে নিয়ে গেলেন তিনি, শ্যাডোর ঘরটা ওপাশেই। ঘরে শুধু মানচিত্র আর মানচিত্র, কিছু বিছানার উপর খোলা পড়ে আছে। আবার কিছু দেয়ালে লাগান। উজ্জ্বল কমলা রঙের কলম দিয়ে সবগুলোকে ইচ্ছামতো দাগিয়েছেন ভদ্রলোক। সেই সাথে গোলাপি আর সবুজ রঙও আছে।

'আমাকে একটা মোটা ছেলে অপহরণ করেছিল।' বলল শ্যাডো। 'বলল যে আপনারা নাকি ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে বাস করছেন এখন! ওখানেই থাকতে হবে

আপনাদের। আর ওই হোঁতকার মতো যারা আছে, তারা এগিয়ে যাবে আগামীর দিকে।'

'ইঁচড়ে-পাকা কোথাকার।' বললেন ওয়েনসডে।

'আপনি চেনেন ছেলেটাকে?'

শ্রাগ করলেন প্রৌঢ়। 'চিনি বলব না, তবে জানি।' ঘরের একমাত্র চেয়ারটায় বসে পড়লেন তিনি। 'আমার ব্যাপারে ওদের আসলে কোন ধারণাই নেই। যাক, আর কতোদিন শহরে থাকতে হবে তোমাকে?'

'জানি না। হয়তো আরেক সপ্তাহ। লরার কাজ আর জিনিসপত্রের একটা গতি করতে যতদিন লাগে আরকী। অ্যাপার্টমেন্টটার একটা ব্যবস্থাও করতে হবে।'

বড়সড় মাথাটা নাড়লেন ওয়েনসডে। 'যত তাড়াতাড়ি তোমার কাজ শেষ হবে, তত তাড়াতাড়ি ঈগল পয়েন্ট থেকে বেরোতে পারব। শুভ রাত্রি।'

হলঘর পার হলো শ্যাডো। তার রুমটা অবিকল ওয়েনসডের রুমের মতো। এমনকি বিছানার উপর অস্তগামী সূর্যের ছবিটাও এক! পিজ্জার অর্ডার দিয়ে গোসলে ঢুকল ও। দেহের আকারের জন্য বাথটাবে শোয়াটা সম্ভব হবে না। তাই কাঁচুমাচু হয়ে বসেই পড়ল। ঠিক করেছিল, জেল থেকে বেরিয়ে যথাসম্ভব সময় নিয়ে গোসল সারবে। তাই করছে এখন।

গোসল থেকে বেরোবার কিছুক্ষণের মাঝেই এসে গেল পিজ্জা, আরাম করে খেল শ্যাডো। অন্য হাতে নিল একটা রুট বিয়ার।

বিছানায় শুয়ে পড়ল ও। মুক্ত মানুষ হিসাবে এই প্রথম কোন বিছানায় পিঠ ঠেকাচ্ছি, ভাবতেই দারুণ এক পুলক অনুভব করল মনে। পর্দা সরানোই আছে। রাস্তা দিয়ে ভেসে আসছে চলন্ত গাড়ির আলো। স্বস্তি বোধ করছে ও, চাইলে এখনই ওই রাস্তায় গিয়ে পা রাখতে পারে। বাঁধা দেবার জন্য না রয়েছে কোন রক্ষী, আর না রয়েছে কোন গরাদ।

অবশ্য ওর আর লরার অ্যাপার্টমেন্টটাতে চাইলেই রাতটা কাটিয়ে আসতে পারত শ্যাডো। কিন্তু স্ত্রীকে ছাড়া ওই ঘরে...ওই বিছানায় রাত কাটাবার কথা ভাবতেই পারছে না সে! লরার জামাকাপড়, ওর দেহের গন্ধ...এসবের কথা মনে পড়া মাত্র খচ করে উঠছে বুকের ভেতরটা।

ওভাবে ভেব না, নিজেকেই বকল শ্যাডো। জোর করে মনটাকে পয়সার খেলার দিকে ফিরিয়ে আনল। সে জানে, জাদুকর হবার মতো ব্যক্তিত্ব নেই ওর, ওসব বাচ্চাদের খেলা দেখাবার বা মিথ্যা বলে দর্শকের মন ভরাবার ইচ্ছাও নেই। তবে এই পয়সার ব্যাপারটা আলাদা। এটা কোন ম্যাজিক ট্রিক না, ওর

কাছে এটা শিল্প। আচমকা শ্যাডোর মনে পড়ে গেল, লরার কবরে একটা সোনার পয়সা রেখে এসেছে সে! তারপর মনে পড়ে গেল অড্রির বলা কথাটা, তোমার স্ত্রী...অভিমানের একটা দলা যেন খোঁচাতে শুরু করল ওকে।

প্রতিটা ঘণ্টাই যেন উপহার দেয় প্রাণঘাতী ক্ষত, তবে একেবারে শেষেরটাই কেড়ে নেয় জীবন। কোথায় যেন শুনেছে প্রবচনটা।

ওয়েনসডের কথা মনে পড়তেই আপনমনে হাসল শ্যাডো। অনেকের মুখেই শুনেছে, মনের কথা চেপে না রাখাই ভালো। এতে বুক হালকা হয়। ও কিন্তু মনের কথা চেপে রাখার পক্ষে। দীর্ঘ দিন ধরে কাজটা করলে একসময় অনুভূতিগুলো সব হারিয়ে যেতে শুরু করে।

নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ল শ্যাডো।

এবারের স্বপ্নে ও হাঁটছে...

এমন একটা ঘর ধরে ও হাঁটছে, যেটা আকারে শহরের চাইতে বড়। যেদিকেই চোখ যায়, সেদিকেই শুধু মূর্তি আর দেয়াল ভর্তি খোদাই করা চিত্র। মহিলার মতো দেখতে এক মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে আছে ও। বেলুনের মতো বড় বড় স্তন জোড়া ঝুলছে মহিলার, কোমরের কাছে অনেকগুলো কাঁটা হাত-একটা শিকল তৈরি করেছে যেন। দু হাতেই একটা করে তীক্ষ্ণধার ছুড়ি ধরে আছে মেয়েটা। ঘাড়ের দু পাশ থেকে ফণা উঁচু করে আছে দুটো সাপ, যেন ছোবল বসাবে। পুরো মূর্তিটার মাঝে কেমন যেন অশ্লীল আর অশুভ একটা ব্যাপার আছে। চমকে উঠে পিছিয়ে এলো শ্যাডো।

এরপর হল ধরে এগিয়ে যেতে শুরু করল ও। মূর্তিগুলোর চোখ যেন জীবন্ত, ওর প্রতিটা পদক্ষেপ খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করছে।

স্বপ্নের মাঝেই শ্যাডো টের পেল, প্রতিটা মূর্তির সামনের মেঝেতে তাদের নাম খোদাই করা। সাদা চুল, দাঁতের নেকলেস গলায় নিয়ে ড্রাম হাতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার নাম লিউকোটিয়াস। চওড়া কোমরের মহিলার নাম হোবোর, তার দু পায়ের ফাঁক থেকে ঝরে পড়ছে দৈত্যরা!

তীক্ষ্ণ, তবে নিশ্চিত একটা কণ্ঠ কথা বলে উঠল, অথচ কাউকে দেখতে পেল না শ্যাডো।

'এই দেবতাদেরকে সবাই ভুলে গিয়েছে, তাই তাদেরকে এক অর্থে মৃতই বলা চলে। কেবল ইতিহাসের পাতায় রয়ে গিয়েছেন এরা। সবাই চলে গিয়েছেন, তবে তাদের নাম আর প্রতিকৃতি আমাদের সাথে রয়ে গিয়েছে।'

আরেকটা মোড় ঘুরল শ্যাডো, বুঝতে পারল যে ভিন্ন একটা ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছে। এটা আকারে প্রথমটার চাইতেও বড়, শেষ দেখা যাচ্ছে না। ওর একদম কাছেই একটা ম্যামথের খুলি, বাঁ দিকে আলখাল্লা পরিহিত এক মহিলা। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে তিন-রমণী, প্রত্যেককে একই গ্রানাইটের খণ্ড থেকে খোদাই করা হয়েছে। কোমরের কাছে জোড়া লেগে আছে তিনজনের, চেহারা অসমাপ্ত। তবে তাদের স্তন আর স্ত্রী-জননাঙ্গ খুব যত্নের সাথে খোদাই করা হয়েছে। আরেকটা পাখিও দেখতে পেল ও, উড়ছে না। তবে চিনতে পারল না আকারে ওর চাইতে দ্বিগুণ বড় পাখিটাকে। তার মুখটা শকুনের মতো, কিন্তু হাত মানুষের। এরকম আরও অগণিত মূর্তি পড়ল পথে।

আরেকবার কথা বলে উঠল কণ্ঠটা, যেন কোন ক্লাস রুমে পড়াচ্ছে। 'এই দেবতারা কারো স্মৃতিতেও ঠাঁই করে নিতে পারেননি, এমনকী তাদের নামও আজ আমাদের জানা নেই। যারা এই দেবতাদের পূজা করত, তারাও বিলীন হয়ে গিয়েছে ইতিহাসের পাতা থেকে। তাদের শেষ পূজারিরাও অন্য কাউকে গোপন কথাগুলো শিখিয়ে যেতে পারেননি।

'দেবতারাও মৃত্যু বরণ করেন। তবে প্রকৃত মৃত্যু তো আসে তখন, যখন সবাই ভুলে যায়। মানুষ খুন করার চাইতে আদর্শকে খুন করা কঠিন, তবে একদিন না একদিন মারা যেতে হয় তাকেও।'

আচমকা গা-শিহরানো ফিসফিসানি আওয়াজে ভরে গেল হল ঘর। ভয় এসে বাসা বাঁধল শ্যাডোর মনে। চারদিকে কেবল বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া দেবতারা...কারও চেহারা অক্টোপাসের মতো, কারও কেবল হাতটা মমি করা...

ঝটকা দিয়ে ঘুম থেকে উঠল শ্যাডো, হৃদপিণ্ড যেন পাগলা ঘোড়ার বেগে ছুটছে। কপাল ঠান্ডা হয়ে এসেছে, ঘুমের আর লেশ মাত্র নেই। বিছানার পাশের ঘড়িটা লাল রঙা সময় দেখাচ্ছে-একটা তিন বাজে এখন। মোটেল আমেরিকা লেখা সাইনটার আলো জানালা দিয়ে হালকা ঢুকছে ওর ঘরে। কিছুটা অসংলগ্নভাবেই উঠে দাঁড়িয়ে ছোট্ট বাথরুমে গেল শ্যাডো। আলো না জ্বেলেই প্রস্রাব করল বেশি কিছুক্ষণ ধরে, এরপর আবার ফিরে এলো বিছানায়। স্বপ্নটা বড় জীবন্ত, কিন্তু ওটাকে যে কেন দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে-তা ধরতে পারছে না।

বাইরে থেকে আলো হালকা, তবে আঁধার সয়ে এসেছে শ্যাডোর চোখে। তাই বিছানার পাশে বসে থাকা মেয়েটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল।

একে চেনে ও। হাজারো জনের...নাহ, লাখো মানুষের ভিড়েও চিনতে পারবে। যে নীল স্যুটটা পরিয়ে কবর দেয়া হয়েছিল মেয়েটাকে, এখনও সেটাই পরে আছে।

ফিসফিস করে কথা বলল মেয়েটা, তবে পরিচিত কণ্ঠ। 'নিশ্চয় ভাবছ,' বলল লরা। 'আমি এখানে কী করছি?'

শ্যাডো বলল না কিছুই।

চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইল ঘরটার একমাত্র চেয়ারে। প্রশ্ন করল, 'আসলেই কি তুমি এসেছ?'

'হ্যাঁ,' উত্তর দিল মেয়েটা। 'আমার ঠান্ডা লাগছে, পাপি।'

'তুমি মারা গিয়েছ, সোনামণি।'

'হ্যাঁ।' বলে নিজের পাশে চাপড় দিল লরা। 'এসো, আমার পাশে বসো।'

'নাহ।' অস্বীকৃতি জানাল শ্যাডো। 'আমি যেখানে আছি, সেখানেই থাকি বরং। তোমার সাথে আমার কিছু বোঝা-পড়া আছে।'

'যেমন? মারা গেলাম কেন?'

'তারচেয়ে বড় প্রশ্ন, মারা যাবার সময় কী করছিলে তুমি? তোমার আর রবির কথা বলছি।'

'ওহ, ওই ব্যাপার।'

নাকে গন্ধ আসছে শ্যাডোর, অবশ্য সেটা ওর কল্পনাও হতে পারে। শিকড়, ফুল আর রাসায়নিক তরলের গন্ধ পাচ্ছে সে নাকে। তার স্ত্রী...মানে প্রাক্তন স্ত্রী...নাহ, তা-ও হলো না। ওর মরহুমা স্ত্রী বসে আছে বিছানায়! এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওরই দিকে!

'পাপি,' বলল লরা। 'আমাকে একটা...একটা সিগারেট এনে দিতে পারবে?'

'আমি তো জানতাম তুমি ছেড়ে দিয়েছ।'

'তা দিয়েছিলাম।' বলল মেয়েটা। 'তবে এখন আর স্বাস্থ্য নিয়ে খুব একটা দুশ্চিন্তা করছি না। সিগারেট পেলে স্নায়ু শান্ত হবে বলেই মনে হচ্ছে। লবিতে একটা ভেণ্ডিং মেশিন দেখেছি।'

জিন্স-টি শার্ট পরে খালি পায়েই লবিতে চলে এলো শ্যাডো। রাতের বেলা রিসেপশন সামলাচ্ছে এক মাঝ-বয়সী লোক। জন গ্রিশামের একটা বই একমনে পড়ে চলছে সে। মেশিন থেকে এক প্যাকেট ভার্জিনিয়া স্লিমস কিনল শ্যাডো। রাতের লোকটার কাছে গিয়ে চাইল এক বাক্স ম্যাচ।

'আপনি যে ঘরে উঠেছেন, সেটায় ধূমপান করা নিষিদ্ধ।' বলল লোকটা। 'খেলে তাই জানালা খুলে খাবেন।' বলে ম্যাচের বাক্স আর মোটেল আমেরিকার লোগো আঁকা একটা প্লাস্টিকের অ্যাশট্রে দিল সে।

'বুঝতে পেরেছি।' বলল শ্যাডো।

ঘরে ফিরে এসে দেখে, লরা বিছানার উপর গা এলিয়ে দিয়েছে। জানালা খুলে সিগারেটের প্যাকেটটা ওর হাতে দিল শ্যাডো, সেই সাথে ম্যাচটাও। স্ত্রীর...মরহুমা স্ত্রীর আঙুলগুলোকে ঠান্ডা মনে হলো খুব। সিগারেট ধরিয়ে ম্যাচের আলোয় নিজের নখ দেখল মেয়েটা। সাধারণত নিখুঁত থাকে ওগুলো। কিন্তু এখন ভেঙে গিয়েছে, নিচে স্থান করে নিয়েছে মাটি।

লম্বা একটা টান দিয়ে ম্যাচ নিভিয়ে ফেলল মেয়েটা। এরপর আরেকটা টান দিল। 'বিন্দুমাত্র স্বাদ পাচ্ছি না।' বলল সে। 'কাজ হচ্ছে বলে মনে হয় না।'

'আমি দুঃখিত।' বলল শ্যাডো।

'আমিও।'

সিগারেটে টান দেবার সাথে সাথে আরও বেশি করে জ্বলে উঠছে আগুন, তার আলোয় স্ত্রীর চেহারা দেখতে পাচ্ছে শ্যাডো।

'তোমাকে তাহলে আগেই ছেড়ে দিয়েছে।' বলল মেয়েটা।

'হ্যাঁ।'

সিগারেটের আগুনটাকে কেন যেন কমলা দেখাচ্ছে। 'আমি এখনও তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। আসলে তোমাকে ওই ব্যাপারটার সাথে জড়ানো একদম ঠিক হয়নি।'

'দোষ আমারও আছে। চাইলে মানা করতে পারতাম।' বলতে বলতেই শ্যাডো ভাবল, মেয়েটাকে দেখে কেন পিলে চমকে যাচ্ছে না ওর? স্বপ্নে দেখা একটা জাদুঘর ওকে ভয় পাইয়ে দিতে পারে, অথচ চলতে-ফিরতে থাকা একটা জিন্দা লাশ দেখে বিন্দুমাত্র ভয় পাচ্ছে না!

'তা পারতে,' ধোঁয়ায় ঢেকে আছে লরার চেহারা। আধো আলোয় খুব সুন্দর দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। 'আমার আর রবির ব্যাপারটা জানতে চাও?'

'মন্দ হয় না।'

লরা অ্যাশট্রেতে ঠেসে ধরল সিগারেট। 'তুমি জেলে ছিলে,' বলল সে। 'আমার কথা বলার মতো একজন দরকার ছিল, বিপদে-আপদে যে সান্ত্বনা দেবে। তুমি আমার কাছে ছিলে না। আমি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম।'

'আমি দুঃখিত।' শ্যাডো টের পেল, মেয়েটার কণ্ঠে একটু পরিবর্তন আছে। কিন্তু কী সেই পরিবর্তন, তা ধরতে পারল না ও।

'জানি আমি। যাই হোক, তাই মাঝে-সাঝে রবির সাথে কফি খেতে যেতাম। তুমি জেল থেকে বের হলে কী কী করব, তা নিয়ে গল্প করতাম। রবি কিন্তু তোমাকে খুব পছন্দ করত, তোমাকে আবার কাজে নেয়ার জন্য ওর তর সইছিল না।'

'জানি।'

'একদিন হঠাত বোনের বাড়িতে বেড়াতে গেল অড্রি। তোমার জেলে যাবার প্রায় তেরো মাস পরের কথা।' অনুভূতি-শূন্য কণ্ঠে বলছে লরা। 'রবি দেখা করতে এলো, মদ খেয়ে মাতাল হলাম দুজন। তারপর মেঝেতেই সঙ্গম করলাম। খুব ভালো লেগেছিল, সত্যি বলছি।'

'এই অংশটুকু আমার না শুনলেও চলবে!'

'তাই নাকি? মারা যাবার পর আসলে এসব অনুভূতি ঠিক কাজ করে না। মনে হয় যেন কোন ছবি দেখছি। বাদ দাও এসব অর্থহীন ব্যাপার।'

'ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে অর্থহীন না।'

আরেকটা সিগারেট ধরাল লরা। মেয়েটার চলনভঙ্গিতে কোন জড়তা ঠিক যেন আগের লরা সে। শ্যাডোর তো সন্দেহই হলো, সত্যি সত্যি মে মারা গিয়েছে তো? নাকি কোন ধরনের রসিকতা করা হচ্ছে ওর সাথে। 'হুম,' বুঝতে পারছি। 'পরকীয়া চলতে লাগল আমাদের। অবশ্য এই ব্যাপারটাকে আমরা পরকীয়া বলতাম না, আসলে বলতাম না কিছুই। প্রায় দুই বছর ছিল সম্পর্কটার আয়ুষ্কাল।'

'আমাকে ছেড়ে দিতে?'

'পাগল হয়েছ? আমি তা করতে যাব কেন? তুমি আমার খেলার পুতুল, আমার পাপি। তুমি যা করেছ, তা আমার জন্যই করেছ। আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

আরেকটু হলেই কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত শ্যাডোরও, কোনক্রমে নিজেকে সামলাল। নাহ, এই তিনটা শব্দ ও কিছুতেই উচ্চারণ করবে না। আর কখনই না। 'তারপর কী হলো?'

'মারা গেলাম কীভাবে, তা জানতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার ফেরা উপলক্ষে আমি আর রবি সারপ্রাইজ পার্টি দেয়া নিয়ে কথা বলছিলাম। দারুণ মজা হতো কিন্তু! সেই সাথে এটাও বললাম, আমাদের সম্পর্কের এখানেই শেষ। তুমি ফিরে আসছ, তাই আর এসব চলতে পারে না।'

'উম, ধন্যবাদ, সোনা।'

'ওয়েলকাম, প্রিয়।' ভূতুড়ে একটা হাসি খেলে গেল মেয়েটার চেহারায়। 'মদের বোতল খোলা হলো, আমি মাতাল হয়ে গিয়েছিলাম। অবশ্য রবি এক ফোঁটা মদ ছোঁয়নি, গাড়ি তো ওকেই চালাতে হতো। বাড়ি ফিরছিলাম, এমন সময় পুরনো সম্পর্কের খাতিরে আমি ঠিক করলাম, শেষ একবার সুখ দেব ওকে-মুখ-মেহন করব। রবির প্যান্টের জিপার খুলে তাই করতে লেগে গেলাম।'

'গাড়ি চালানো অবস্থায়! অনেক বড় ভুল করেছ।'

'তা তো এখন বুঝতে পারছি। আমার কাঁধে ধাক্কা লেগে গিয়ারের কী যেন হলো। রবি আমাকে সরিয়ে দিতে চাইছিল, এমন সময় কান ফাটান আওয়াজ হলো একটা। দুনিয়া যখন ঘুরতে শুরু করল, তখন নিজেকেই বললাম, 'আমি মরতে চলেছি।' তেমন কোন অনুভূতি হয়নি তখন আমার, খুব একটা ভয়ও পাচ্ছিলাম না। এরপর আর কিছু মনে নেই।'

আচমকা প্লাস্টিক পোড়ার গন্ধ এলো শ্যাডোর নাকে। সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে ফিল্টার পর্যন্ত চলে এসেছে, বুঝতে পারল ও। কিন্তু লরার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

'এখানে কেন এসেছ তুমি?'

'একজন স্ত্রী কি তার স্বামীকে দেখার জন্য আসতে পারে না?'

'তুমি মৃত। আজ বিকালটা আমার কেটেছে তোমার লাশের সামনে দাঁড়িয়ে!'

'জানি,' বলেই চুপ হয়ে গেল লরা, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। শ্যাডো উঠে, হেঁটে গেল মেয়েটার কাছে। সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরাটা হাতে নিয়ে ফেলে দিল জানালা দিয়ে।

'কেন এসেছ?'

স্বামীর চোখে চোখ রাখার প্রয়াস পেল মেয়েটা। 'বেঁচে থাকতে যা জানতাম, এখনও তার চাইতে বেশি কিছু জানি না। আর যা যা জানি, সেগুলোকে ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব না।'

'সাধারণ মানুষ মারা গেলে নিজের কবরেই থাকে, ওখান থেকে উঠে আসে না।' বলল শ্যাডো।

'তাই নাকি? সত্যি বলছ, পাপি? আমিও জানতাম যে তারা কবরেই থাকে। কিন্তু এখন আর নিশ্চিত হতে পারছি না।' বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে গেল সে। ওর চেহারায় এসে ঠিকরে পড়ছে মোটেল-সাইনের আলো। অপার্থিব এক সৌন্দর্য যেন ভর করেছে মেয়েটার চেহারায়...এর জন্যই জেলে যেতে হয়েছে ওকে।

আচমকা শ্যাডোর মনে হলো, কেউ বুঝি ওর হৃদপিণ্ডটাকে হাতে নিয়ে জোরে পিষছে! 'লরা...?'

ফিরেও তাকাল না মেয়েটা। 'তুমি বাজে কিছু ঝামেলার সাথে জড়িয়ে পড়েছ, শ্যাডো। কেউ তোমার উপর নজর না রাখলে, বিপদে পড়বে। চিন্তা করো না, আমি তোমাকে দেখে রাখব। আর হ্যাঁ, উপহারের জন্য ধন্যবাদ।'

'উপহার মানে?'

ব্লাউজের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সোনার পয়সাটা বের করে আনল লরা, এখনও ওটাতে মাটি লেগে আছে। 'নেকলেস বানিয়ে গলায় ঝুলাতে পারি, অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

'স্বাগতম।'

এমন দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাল লরা, যেন দেখেও আবার দেখছে না। 'আমাদের বিয়ের বেশ কিছু দিক নিয়ে কাজ করতে হবে।'

'সোনামণি,' বলল শ্যাডো। 'তুমি মারা গিয়েছ।'

'এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক,' বলেই একটু থামল মেয়েটা। 'ঠিক আছে, আপাতত আমি যাচ্ছি।' যেন কিছুই হয়নি, এমন ভঙ্গিতে শ্যাডোকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল ও। স্বামী লম্বা বলে আগেও পায়ের উপর ভর দিয়েই চুমু খেতে হতো, আজও তাই হলো।

বিব্রত ভঙ্গিতে নিচু হয়ে লরার গালে চুমু খেতে গেল যুবক। কিন্তু একেবারে শেষ ক্ষণটাতে মুখ ঘুরিয়ে চুমুটাকে ঠোঁটে নিল লরা। জিহ্বা দিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে বেরাল স্বামীর মুখের ভেতরে। ঠান্ডা আর শুকনো মনে হলো জিহ্বাকে। মুখে সিগারেট আর পিত্তের স্বাদ পেল শ্যাডো। স্ত্রী মারা গিয়েছে কিনা, সে ব্যাপারে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না ওর।

পিছিয়ে এলো ও।

'আমি ভালোবাসি তোমাকে,' শান্ত ভঙ্গিতে জানাল মেয়েটা। 'তোমার প্রতি খেয়াল রাখব।' মোটেলের দরজা পর্যন্ত হেঁটে গেল ও। 'ঘুমাও, পাপি। ইচ্ছা করে ঝামেলা তৈরি করো না যেন।'

দরজা খুলল সে, হলওয়ের উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল মেয়েটার আসল রূপ। লরাকে দেখতে জীবন্মৃত বলে মনে হচ্ছে, অবশ্য এই আলোতে সবাইকে তা-ই মনে হয়।

'আমাকে রাতটা থাকতে বলতে পারো কিন্তু।' বলল মেয়েটা।

'পারব বলে মনে হচ্ছে না।' উত্তর দিল শ্যাডো।

'পারবে, সোনামণি। এসব কিছু শেষ হবার আগেই পারতে শিখবে।' বলে করিডরে পা রাখল লরা।

দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল শ্যাডো, রাতের লোকটা এখনও তার জন গ্রিশামে বুঁদ হয়ে আছে। লরার দিকে ফিরেও তাকাল না। মেয়েটার পায়ের সাথে মাটি লেগে আছে, সেটার দাগ পড়ছে মাটিতে। অথচ সেদিকেও যেন লোকটার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই! অল্পক্ষণের মাঝেই দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল লরা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল শ্যাডো, আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ওর হৃদপিণ্ডের দৌড়। হলঘরের অপর পাশে গিয়ে নক করল ওয়েনসডের দরজায়। কেন জানি ওর মনে হলো, বিশাল এক দাঁড় কাক তার রক্তলাল চোখ দিয়ে ওকে দেখছে!

দরজা খুললেন ওয়েনসডে, কোমরের কাছে একটা সাদা তোয়ালে জড়িয়ে রেখেছেন। এছাড়া দেহে আর একটা সুতাও নেই। 'কী চাই?'

'আপনাকে একটা ব্যাপার জানাতে এসেছি।' বলল শ্যাডো। 'হয়তো স্বপ্ন ছিল...নাহ, স্বপ্ন নয়। হয়তো ওই মোটা ছোকরার ছাড়া ধোঁয়ার ফল...আবার আমি পাগলও হয়ে যেতে পারি...'

'বুঝলাম তো। এবার ঝেড়ে কাশো।' বললেন ওয়েনসডে। 'আমি একটা কাজের মাঝখানে আছি।'

ঘরের ভেতরে গেল শ্যাডোর নজর। বিছানায় শুয়ে আছে কেউ একজন, ওকে দেখছে। ছোট ছোট স্তন দুটো চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছে, সোনালী চুল, চেহারাটা ইঁদুরের কথা মনে করিয়ে দেয়। গলা নামিয়ে আনল যুবক। 'আমার স্ত্রীকে দেখলাম কেবল...আমারই ঘরে!'

'ভূত দেখেছ বলতে চাচ্ছ?'

'নাহ। ভূত না। রক্ত-মাংসের মানুষ। মৃত, তবে ভূত না। ওকে স্পর্শ করেছি, চুমু খেয়েছি।'

'বুঝলাম,' ওয়েনসডে ঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে বললেন। 'একটু আসছি।'

একটু পরেই দেখা গেল, শ্যাডোর ঘরে বসে আছেন তারা দুজন। বাতি জ্বালিয়ে দিলেন ওয়েনসডে। অ্যাশট্রেতে পড়ে থাকা সিগারেটের টুকরা দেখে বুক চুলকালেন। লোকটার স্তনবৃন্ত বুড়ো মানুষের মতো, দেহের পাশে একটা সাদা ক্ষতের দাগ। নাক টানলেন তিনি, এরপর শ্রাগ করলেন।

'হুম,' বললেন তিনি। 'তো এখন? ভয় পেয়েছ?'

'একটু।'

'ভয় পাওয়া উচিৎ। মৃতদের দেখলে আমিও ভয় পাই। আর কিছু?'

'আমি ঈগল'স পয়েন্টে আর থাকতে চাই না। লরার সবকিছু ওর মা-ই দেখে-শুনে রাখতে পারবেন। আপনি যখন চান, আমি যেতে প্রস্তুত।'

হাসলেন ওয়েনসডে। 'সুখবর, বাছা। আমরা সকালেই রওনা দেব। এখন একটু ঘুমিয়ে নাও। আমার ঘরে স্কচ আছে, লাগলে খেয়ে দেখতে পারো।'

'নাহ, লাগবে না।'

'তাহলে আর বিরক্ত করো না আমাকে, লম্বা একটা রাত পড়ে আছে সামনে।'

'শুভ রাত্রি।'

'আমার জন্য শুভ বৈকি,' বলে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ওয়েনসডে।

বিছানায় বসে পড়ল শ্যাডো। এখনও ঘর থেকে সিগারেট আর রাসায়নিকের গন্ধ যায়নি। লরার জন্য কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে তার। এটাই হওয়া উচিৎ, নিজেকে বোঝাল ও। অন্তত মরা মানুষ ফিরে এসে ভয় দেখাবার চাইতে বিলাপ করা ভালো। দুঃখ প্রকাশের সময় এখন, বিলাপের সময়। বাতি বন্ধ করে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল ও, লরার কথা ভাবছে মনে মনে। বিয়ের সময় কী সুখী, হাসোজ্জ্বল আর আনন্দিত লাগছিল মেয়েটাকে! একে-অন্যের শরীর ছাড়া একটা সেকেণ্ডও কল্পনা করতে পারত না।

শেষ কবে কেঁদেছে না মনে নেই শ্যাডোর। আসলে কাঁদতে যেন ভুলেই গিয়েছে ও। এমনকী মা'র মৃত্যু সংবাদ শুনেও চোখ দিয়ে পানি পরেনি।

তবে এখন কাঁদতে শুরু করল। তীব্র কষ্টে যেন ভেঙে যাচ্ছে ওর বুক। সেই ছোট্ট বেলার পর, এই প্রথম কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল বেচারা।

আমেরিকায় আগমন
৮১৩ খ্রিষ্টাব্দ

তীর আর আকাশের তারা দেখে সবুজ সাগর পাড়ি দিচ্ছে ওরা, এখন আছে মাঝ-সমুদ্রে। মাটি দেখতে কেমন, সেটা যখন ভুলতে শুরু করেছে, তখন সর্ব-পিতা ওদেরকে নিরাপদে আবার স্থলভূমিতে নিয়ে এলেন। ভাগ্যিস এনেছিলেন, কেননা কেবলমাত্র বিশ্বাসের উপর ভর দিয়ে আর কত ঝড়-ঝঞ্ঝা পার হওয়া যায়?

ভ্রমণটা ঠিক সুবিধের হয়নি। হাতের আঙুলগুলো যেন অসার হয়ে পড়েছে, হাজারো মদে ডুবে গিয়েও হাড় থেকে তাড়ানো যাচ্ছে না শীত। সকালে ঘুম থেকে উঠে নাবিকরা দেখতে পায়, বরফ জমে গিয়েছে দাড়িতে! সূর্য সেটাকে গলিয়ে দেবার আগ পর্যন্ত ওদেরকে দেখায় অল্প বয়সে চুল-দাড়ি পেকে যাওয়া মানুষদের মতো।

পশ্চিমের সবুজ অঞ্চলে পা রাখে যখন, তখন ওদের দাঁত গুলো নড়বড় করছে। চোখ দুটো বসে গিয়েছে গর্তে। সবাই বলাবলি করতে লাগল, 'আমাদের দেশ আর ঘরের আরামদায়ক আগুন থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি আমরা। পেছনে ফেলে এসেছি পরিচিত সমুদ্র আর ভালোবাসার পরিবারকে। এখানে, পৃথিবীর এই প্রান্তে, এমনকী দেবতারাও আমাদেরকে ভুলে যাবেন!'

ওদের নেতা একটা বিশাল পাথরের উপরে উঠে দাঁড়াল। দলের লোকদের বিশ্বাসের দুর্বলতাকে ব্যঙ্গ করে বলল, 'এই পৃথিবীকে সর্ব-পিতা বানাননি? নিজ হাতে য়ীমিরের হাড় আর মাংস ব্যবহার করে এসব সৃজন করেছেন তিনি। য়ীমিরের মস্তিষ্ককে মেঘ রূপে স্থাপন করেছেন আসমানে। তার লবণাক্ত রক্তকে দিয়েছেন উন্মত্ত সাগরের রূপ। যদি তিনি পৃথিবী বানান, তাহলে কেন বুঝতে পারছ না যে এই ভূ-খণ্ডও তিনিই বানিয়েছেন? আমরা যদি এখানে পুরুষের মতো মারা যাই, তাহলে অবশ্যই তার ছায়ায় আশ্রয় পাব!'

আনন্দে চিৎকার করে উঠল তার লোকেরা। তাই গাছকে দেয়াল এবং ছাদ, আর মাটিকে মেঝে হিসেবে ব্যবহার করে একটা হল বানাবার কাজে মন দিল। এই নতুন এলাকায়, ওদের ধারণা, আর কোন মানুষ নেই।

হল বানানো শেষ হলো যেদিন, সেদিন ধেয়ে আসল এক প্রলয়ঙ্করী ঝড়। মধ্য-দুপুরেই আকাশ হয়ে গেল রাতের মতো কালো; আসমানে

যেন দুই দানোর লড়াই বেঁধেছে, থেকে থেকে সাদা আলো আর কান ফাটানো আওয়াজ আসছে ভেসে। শুভ লক্ষণ হিসেবে যে বিড়ালটাকে সাথে এনেছিল নাবিকরা, সেটা যেন কোথায় মুখ লুকিয়েছে! ঝড়টা এমন প্রমত্ত ছিল যে আনন্দে একে-অন্যের পিঠে চাপড় বসাল তারা। 'বজ্র দেব এই অদ্ভুত জায়গাতেও আমাদের সাথে আছেন।' আকণ্ঠ মদ পান করতে শুরু করল সব ভুলে।

হলের ধোঁয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারে ওদেরকে পুরনো সব গান গেয়ে শোনাল চারণ-কবি। সর্ব-পিতা ওডিনের গান শোনাল তাদের, যিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন নিজেরই উদ্দেশ্যে। সে গাইল সেই সময়ের গান, যখন সর্ব-পিতা ঝুলছিলেন মহা-বৃক্ষ থেকে। নিজেকে নিজেই করেছিলেন বর্শা বিদ্ধ, সেই ক্ষত থেকে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছিল রক্ত। সর্ব-পিতার নয়টা নাম গেয়ে শোনাল সে, শোনাল নয় রুন আর ঊনত্রিশটা জাদু-বস্তুর নাম।

পরেরদিন, যেদিনটা আসলে সর্ব-পিতারই দিন, অদ্ভুত এক আগন্তুককে খুঁজে পেল তারা। একেবারে ছোট-খাটো একটা মানুষ সে, লম্বা চুল গুলো এত কালো যে দেখলে দাঁড়কাক লজ্জা পাবে। ত্বক লাল কাদার চাইতেও লালচে। এমন ভাষায় কথা বলল লোকটা, যা নাবিকরা কোনদিন শোনেনি! পরনে তার পালক আর পশুর চামড়া, লম্বা চুলগুলোতে বেণি করে বাঁধা ছোট ছোট হাড়।

হলে নিয়ে এলো নাবিকরা তাকে, খেতে দিল ঝলসানো মাংস। মদ খাইয়ে তৃপ্ত করল লোকটাকে। মাতাল হয়ে সে যখন গান গাইতে আরম্ভ করল, তখন হাসিতে যেন ফেটে পড়ল তারা। আরও পান করতে দিল তারা আগন্তুককে, কিছুক্ষণের মাঝেই মাতাল বেচারা অচেতন হয়ে গেল!

আগন্তুককে তুলে নিল তারা। দুজন ধরল দুটো কাঁধ, দুজন দুটো পা। চারজন নাবিক আর লোকটা মিলে গঠিত হলো যেন আট-পা ওয়ালা একটা ঘোড়া। মিছিলের মতো করে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো একটা অ্যাশ গাছের কাছে। গাছটা একটা পাহাড়ের চুড়ায় অবস্থিত, ওখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায় সমুদ্র। এখানেই, গাছের ডালের সাথে, ফাঁসি দেয়া হলো লোকটাকে। আসলে ফাঁসি না বলে সর্ব-পিতার প্রতি তাদের বলি বলাটাই বেশি যুক্তি-যুক্ত। অপরিচিতের দেহটা দুলতে থাকল বাতাসে, জিহ্বা বেরিয়ে এসেছে, চেহারা কালো হয়ে গিয়েছে; চোখ

দুটো যেন আরেকটু হলেই বেরিয়ে আসবে, উত্থিত যৌনাঙ্গে একটা চামড়ার হেলমেট ঝুলিয়ে দিলেও সেটা মাটিতে পড়বে না।

নাবিকরা আনন্দিত, হাসছে তারা-বলি দিতে পেরে খুশি।

পরের দিন দুটো বিশাল দাঁড়কাক এসে বসল লাশটায়, দুটো দুই কাঁধে। বসেই শুরু হলো গাল আর চোখে ঠোকরানো। নাবিকরা বুঝতে পারল, তাদের উৎসর্গ কবুল করা হয়েছে।

লম্বা সময় ধরে চলছে শীতকাল, ক্ষুধায় কাতর হয়ে আছে তারা। তবে বসন্তের চিন্তায় সেই কাতরতা খুব একটা বেগ দিতে পারছে না তাদের। বসন্ত এলেই নৌকা পাঠান হবে দেশে, সেখান থেকে নতুন নতুন মানুষ আসবে...আসবে মেয়েরাও। তবে আবহাওয়া আরও ঠান্ডা হতে শুরু করলে, অপরিচিত লোকটার গ্রামের খোঁজে নামল কেউ কেউ। খাবার দরকার, সেই সাথে মেয়েমানুষ পেলে তো সোনায় সোহাগা। তবে হায়, কিচ্ছু পেল না তারা। দুই-একটা পরিত্যক্ত অগ্নিকুণ্ড নজরে পড়ল কেবল!

শীতের এক মধ্য-দুপুরে, যখন সূর্য এতটা দূরে যে দেখে রূপালী পয়সা বলে মনে হচ্ছে, অভিযাত্রীরা দেখল-বলির দেহের অবশিষ্টাংশ অ্যাশ গাছ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে! সেদিন বিকালে তুষারপাত হতে শুরু করল।

উত্তর দিক থেকে আসা লোকগুলো তাদের কাঠের দেয়ালে নিজেদেরকে আবদ্ধ করে ফেলল!

সেদিন রাতেই শুরু হলো আক্রমণ, ত্রিশ জন অভিযাত্রীর উপর আছড়ে পড়ল যেন পাঁচশ মানুষ। পরবর্তী সাত দিন ধরে চলল হত্যাকাণ্ড। ত্রিশ সদস্যের কেউ রেহাই পেল না। মারা গেল সবাই, ত্রিশটা আলাদা আলাদা উপায়ে। ভুলে গেল সবাই এই নাবিকদের, ইতিহাসও মনে রাখেনি।

হলঘরটা আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। যে জাহাজে করে এসেছিল নাবিকরা, সেটাও বাদ গেল না। আক্রমণকারীদের আশা-এই অভিযাত্রীরা একাই এসেছিল! আর কখনও কোন সাদা-মুখো এদিকে হবে না।

সৌভাগ্যবান লিফ, লালচে এরিকের পুত্র, জায়গাটা পুনঃআবিষ্কার করারও একশ বছর আগের গল্প এটা। জায়গার নাম সে দিয়েছিল ভাইনল্যান্ড। লোকটার জানা ছিল না, এখানে সে পা রাখার অনেক আগে থেকে দেবতারা ওরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। এক-হাতি টির, ধূসর ওডিন

আর বজ্র দেব থর, সবাই আরও অনেক আগে চলে এসেছেন এখানে...

...দিন গুনছিলেন ওর আগমনের!

অধ্যায় চার

লেট দ্য মিডনাইট স্পেশাল শাইন ইটস লাইট অন মি,
লেট দ্য মিডনাইট স্পেশাল সাহিন ইটস এভার লাভিং লাইট
অন মি।

–'দ্য মিডনাইট স্পেশাল' গান

মোটেল আমেরিকা রাস্তার যে পাশে অবস্থিত, তার উল্টো পাশের কাউন্টি কিচেনে সকালের নাস্তা সেরে নিল শ্যাডো আর ওয়েনসডে। আটটা বাজে ঘড়িতে, দুনিয়া এখনও কুয়াশার চাদরে মোড়া।

'আসলেই ঈগল পয়েন্ট ছাড়তে চাও?' জানতে চাইলেন ওয়েনসডে। 'তাহলে কয়েকটা ফোন সেরে নিতে হবে। আজ শুক্রবার, মেয়েদের দিন, আরামের দিন। আগামীকাল শনিবার, শনিবারে অনেক কাজ করতে হবে।'

'চাই,' উত্তর দিল শ্যাডো। 'এখানে থাকার কোন কারণ দেখছি না।'

বেশ কয়েক পদের মাংসের তরকারী সামনে নিয়ে বসে আছেন ওয়েনসডে। শ্যাডো অবশ্য তরমুজ, একটা বেগল আর পনীর ছাড়া কিছু নেয়নি।

'তোমার গত রাতের স্বপ্নটা খুব অদ্ভুত ছিল!' বললেন প্রৌঢ়।

'তা ছিল,' মেনে নিল শ্যাডো। সকালে উঠে কার্পেটে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে সে লরার কর্দমাক্ত পায়ের ছাপ। সেই ছাপ ঘর ছাড়াও লবি, এমনকি করিডরেও ছিল!

'আচ্ছা,' প্রশ্ন করলেন ওয়েনসডে। 'তোমার নাম শ্যাডো কেন?'

শ্রাগ করল শ্যাডো। 'ওটা একটা নাম ছাড়া আর কিছুই না।' বাইরের দুনিয়াটাকে দেখে যেন কোন পেন্সিলে আঁকা চিত্র বলে মনে হচ্ছে এখন। এখানে সেখানে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে নানা গাঢ়ত্বের ধূসর রঙ। কখনও কখনও হয়তো একটু লাল রঙ, তবে অধিকাংশই এখনও সাদা। 'আপনার চোখ নষ্ট হয়েছে কীভাবে?'

বেকনের আধা-ডজন টুকরা একসাথে গালে পুরলেন ওয়েনসডে। খানিকক্ষণ চেবানোর পর মুখে লেগে থাকা চর্বিটুকু মুছে ফেললেন হাত দিয়ে। 'নষ্ট হয়নি।' বললেন তিনি। 'এমনকী ওটা কোথায় আছে তা-ও জানি।'

'এবার কী করব আমরা?'

চিন্তিত দেখাল ওয়েনসডেকে। শুয়োরের কয়েকটা টুকরো খেতে শুরু করলেন তিনি, একটু পর থেমে দাড়িতে লেগে থাকা একটা টুকরো আবার থালায় রেখে দিলেন। 'বলছি শোন, আগামীকাল আমরা কয়েকজনের সাথে দেখা করতে যাব। এরা সবাই যার যার ক্ষেত্রে সেরা-তাদের আচরণে প্রভাবিত হয়ো না বা ভয় পেও না। এরপর আমরা সবাইকে এক করব এই দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোর একটাতে। ওদেরকে আমরা আপ্যায়ন করব সেখানে। আসলে একটা বিশেষ কাজে ওদের সহায়তা চাই আমার।'

'তা এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা কোথায়?'

'সময় হলেই দেখতে পাবে, বাছা। আর জায়গাটা না, জায়গাগুলোর একটা। যাই হোক, আমি খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। পথে আমরা শিকাগোতে থামব, আমার কিছু টাকা দরকার। যেভাবে আমি তাদের আপ্যায়ন করতে চাই, তাতে অনেক টাকার দরকার। আমার কাছে এতো নেই। এরপর রওনা দেব ম্যাডিসনের দিকে।' বিল চুকিয়ে দিয়ে মোটেলের পার্কিং-লটের দিকে রওনা দিলেন তারা। গাড়ির কাছে এসে শ্যাডোর দিকে চাবি ছুঁড়ে দিলেন তিনি।

গাড়ি চালিয়ে শহরের বাইরে নিয়ে এলো তাকে শ্যাডো।

'জায়গাটার কথা মনে পড়বে খুব?' একগাদা মানচিত্র ঘাটতে ঘাটতে জানতে চাইলেন ওয়েনসডে।

'শহরটার কথা? নাহ, আসলে ওখানে আমার কোন জীবন ছিল না! কমবয়সে আমি কখনও এক শহরে বেশি দিন থাকতাম না। এখানে এসেছি যখন, তখন বিশ শেষ হয়ে ত্রিশের দিকে এগোচ্ছে বয়স। তাই শহরটাকে লরার শহর বলা চলে, আমার না।'

'প্রার্থনা করো যেন মেয়েটা ওই শহরেই থাকে।' বললেন ওয়েনসডে।

'আহ, ভুলে গেলেন? গত রাতের ব্যাপারটা তো স্বপ্ন ছিল!'

'ঠিক বলেছ। ঘটনাটাকে স্বপ্ন বলে ধরে নেয়াই ভালো। যাক গে, তা কাল রাতে কিছু করেছ-টরেছ নাকি?'

লম্বা করে শ্বাস নিল শ্যাডো। 'তা জেনে আপনার কী?' একটু থেমে যোগ করল, 'না।'

'ইচ্ছা হয়েছিল?'

উত্তর দিল না শ্যাডো, চুপচাপ উত্তরে, শিকাগোর দিকে চালাল গাড়ি। মুচকি হাসলেন ওয়েনসডে, মানচিত্রের দিকে মন দিলেন। মাঝে মাঝে হলদে একটা প্যাডে কী সব যেন টুকেও নিলেন তিনি।

একসময় শেষ হলো তার কাজ। কলম সরিয়ে রেখে মানচিত্রগুলো ভরে নিলেন একটা ফাইলে। তারপর সেটা রেখে দিলেন পেছনের সিটে। 'আমরা যেসব রাজ্যে যাচ্ছি, মিনেসোটা, উইসকনসিন ইত্যাদি, সেগুলোর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো-ওসব জায়গায় হাত বাড়ালেই মেলে আমার পছন্দ মতো মেয়ে মানুষ। সাদাটে ত্বক, নীল চোখ, চুলের রঙ হালকা যে প্রায় সাদা বর্ণ; লালচে ঠোঁট, বড় বড় বুক...আহ! কমবয়সে এরকম মেয়ে পেলে আর ছাড়তাম না!'

'বেশি বয়সে বুঝি খুব ছাড়েন?' জানতে চাইল শ্যাডো। 'গতরাতে আপনার ঘরে যে দৃশ্য দেখলাম, তাতে কথাটা মানা কঠিন হয়ে গেল।'

'ওহ, গতরাত।' মুচকি হাসি দেখা গেল ওয়েনসডের চেহারায়। 'আমার সফলতার রহস্য বলব?'

'কী? পয়সা খরচ?'

'ওসব না। রহস্যটা হলো আবেদন। নিখাঁদ আবেদন।'

'তাই নাকি? তবে এই আবেদন হলো এমন এক জিনিস, যা থাকলে আছে...আর না থাকলে নেই।'

'ভুল, অন্য সব কিছুর মতো সেটাও শেখা যায়।' বললেন ওয়েনসডে।

পুরাতন একটা রেডিও চ্যানেল ধরল শ্যাডো। এমন সব গান শোনায় সেগুলো, যা ও জন্মাবার আগেই প্রাচীন তকমা ধারণ করেছে। বব ডিলান শোনালেন নিরেট বৃষ্টির কথা। শ্যাডো ভাবতে শুরু করল, অমন বৃষ্টি কী আসলেই ঝরেছে? নাকি সামনে ঝরবে? রাস্তাটা খালি, অ্যাস্ফল্টের উপর পড়ে থাকা বরফের টুকরাগুলো হীরক খণ্ডের মতো ঝিক-ঝিক করছে।

মাইগ্রেন যেমন ধীরে ধীরে...জানান দিয়ে আসে, তেমনি ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো শিকাগো। হাইওয়েতে ওদের গাড়ির আশেপাশে ছিল গ্রাম্য পরিবেশ। এরপর টুকরা টুকরা মফস্বল শহর আর ইতস্তত বাড়ি-ঘর। আচমকা দেখা গেল, শিকাগো চোখের সামনেই!

কালো একটা বাদামী পাথরের দালানের সামনে পার্ক করা হলো গাড়ি। ফুটপাতে তুষারের নাম-গন্ধ নেই, সম্প্রতি পরিষ্কার করা হয়েছে বোধ হয়। লবিতে এসে প্রবেশ করলেন তারা। ধাতব ইন্টারকম বক্সের একদম উপরের বোতামটা টিপলেন ওয়েনসডে। হলো না কিছুই। তাই আবার চাপলেন, এরপর কী ভেবে সবগুলোই চাপতে শুরু করলেন। তবুও হলো না কিছুই!

'নষ্ট,' সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকা এক বুড়ি মহিলা জবাব দিল। 'কাজ করে না। বাড়ির সুপারকে অনেকবার বলেছি ঠিক করতে। কিন্তু লাভ নেই, গা করে না লোকটা। হিটারের কথাও বলেছি অনেকবার। কিন্তু নিজে শীতে অ্যারিজোনায়

চলে যায় বলে সেটা নিয়েও তার মাথা ব্যথা নেই।' মহিলার কথায় আঞ্চলিক টান। পূর্ব ইউরোপে জন্ম সম্ভবত, ভাবল শ্যাডো।

বাউ করলেন ওয়েনসডে। 'যরিয়া, আমার প্রিয়, দারুণ লাগছে তোমাকে দেখতে। বয়স এক বিন্দু বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে না!'

বুড়ি মহিলা চোখ ছোট ছোট করে তাকাল তার দিকে। 'তোমার সাথে সে দেখা করতে চায় না। আমিও চাই না। তোমার আগমের মাঝে আনন্দের কিছুই নেই।'

'তার কারণ তো জানো-গুরুত্বপূর্ণ কিছু না ঘটলে আমি আসি না।'

ঘোঁত করে উঠল মহিলা। হাতে অনেকগুলো খালি ব্যাগ ধরে আছে, পরনে লাল একটা কোট। একেবারে গলা পর্যন্ত বোতাম বন্ধ করা পুরনো কোটটার। সন্দেহের চোখে শ্যাডোর দিকে তাকাল সে।

'এই বিশালদেহী আবার কে?' প্রশ্ন করল ওয়েনসডের উদ্দেশ্যে। 'তোমার অনেক খুনির একজন না তো?'

'আমাকে ভুল বুঝছ। এই ভদ্রলোকের নাম শ্যাডো। সে আমার হয়ে কাজ করছে, মানলাম। কিন্তু তাতে লাভ হচ্ছে তোমাদের। শ্যাডো, পরিচিত হও। ইনি মিস যরিয়া ভেচেরনেয়া।'

'পরিচিত হয়ে প্রীত হলাম।' বলল শ্যাডো।

পাখির মতো ঘাড় বাঁকিয়ে ওর দিকে তাকাল বৃদ্ধা। 'শ্যাডো...ভালো নাম। যখন ছায়া লম্বা হয়ে মাটিতে পড়ে, তখন শুরু হয় আমার সময়। আর তোমার প্রতিচ্ছায়া আসলেই অনেক লম্বা।' মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার ওকে দেখে নিল সে, তারপর হাসল; ঠান্ডা একটা হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। 'চুমু খাবার অনুমতি দেয়া যাচ্ছে।'

হাঁটু গেড়ে তাই করল শ্যাডো, মহিলার হাতে অ্যাম্বারের বড় একটা আংটি শোভা পাচ্ছে।

'কী ভদ্র একটা ছেলে!' বলল মহিলা। 'আমি এখন মাল-সামান কিনতে দোকানে যাচ্ছি। ভাগ্য গণনা করে আমিই একমাত্র যা একটু কামাই করতে পারি। বাকি দুজন তো একেবারে কিছুই কামাতে পারে না! সব সময় সত্যি কথা বলে যে, তাই। মানুষ আসলে সত্যি কথা শুনতে চায় না। তাই আর ফিরেও আসে না। কিন্তু আমি মিথ্যা বলি; ওদেরকে সে সব কথাই শোনাই, যেগুলো ওরা শুনতে চায়। রাতের খাবার খেয়ে যাবে তো?'

'আমার তো তাই আশা,' মন্তব্য করলেন ওয়েনসডে।

'তাহলে খাবার বেশি করে কিনতে হবে, পয়সা ছাড়।' বলল মহিলা। 'আমি আত্মাভিমানী হতে পারি, তবে নির্বোধ নই। অন্যরা কিন্তু আমার চাইতেও গর্বিত, আর তার গর্ব তো আকাশ-ছোঁয়া। তাই টাকা দাও, তবে অন্যদেরকে বোলো না কিন্তু।'

ওয়ালেট খুলে একটা বিশ ডলারের নোট বের করে আনলেন ওয়েনসডে। ওটা যেন লুফে নিল বৃদ্ধা, কিন্তু তবুও জায়গা ছেড়ে নড়ল না। আরেকটা বিশ ডলারের নোট বের করে সেটা যরিয়া ভেচেরনেয়াকে দিলেন ওয়েনসডে।

'চলবে,' বললেন মহিলা। 'আজ রাতে তোমরা খাবে রাজকুমারদের মতো। যাও, উপরে চলে যাও। যরিয়া উত্রেনেয়া জেগেও আছে, তবে অন্যজন এখনও ঘুমে। তাই সাবধান, আওয়াজ করো না যেন।'

ওয়েনসডেকে সাথে নিয়ে শ্যাডো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। দুইটি তালার ঠিক মাঝখানে সিঁড়ির উপরে কালো প্লাস্টিকের ব্যাগ ভর্তি আবর্জনা রাখা। ওখান থেকে পচে যাওয়া সবজির গন্ধ আসছে।

'এরা কি জিপসি?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'কারা? যরিয়া আর তার পরিবার? একদম না। ওরা রাশিয়ান, আরও ঠিক করে বলতে গেলে স্লাভ।'

'কিন্তু মহিলা নাকি ভাগ্য গণনা করে?'

'সে তো অনেকেই করে, আমি করি মাঝে-সাঝে।' হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিলেন ওয়েনসডে। 'ইস, মোটা হয়ে গিয়েছি।'

সিঁড়ি গিয়ে শেষ হয়েছে লাল রঙা একটা দরজা পর্যন্ত গিয়ে। ওটার ঠিক মধ্যখানে একটা ছোট ফুটো।

দরজায় নক করলেন ওয়েনসডে। উত্তর এলো না কোন। আবার নক করলেন তিনি, এবার আরেকটু জোরে।

'শুনেছি তো! শুনেছি!' তালা খোলার আওয়াজ ছাপিয়ে কণ্ঠটা ভেসে এলো। এরপর চেন ধরে টানা-হ্যাঁচড়ার শব্দ। অবশেষে একটু ফাঁক হলো লাল দরজাটা।

'কে?' কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল কেউ একজন। কিছুটা বুড়োটে আর অপরিমিত ধূমপানের কারণে বসে যাওয়া গলা।

'একজন পুরনো বন্ধু, চেরনোবোগ। সাথে লোক আছে।'

দরজাটা খুলল আরেকটু, চেন লাগান অবস্থায় এর চাইতে বেশি খোলে না। একটা মলিন চেহারা দেখতে পেল শ্যাডো, ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে। 'কী চাই তোমার, ভোটান?'

'আপাতত তোমার সঙ্গ। দেবার মতো কিছু খবরও এনেছি, তোমার কাজে আসবে।'

এবার পুরোপুরি খুলে গেল দরজা। কর্কশ কণ্ঠটার মালিক এক বয়স্ক লোক। পরনের বাথরোবটা ছোট, চুল ইস্পাত-ধূসর; রুক্ষ চেহারাটায় কেমন একটা আকর্ষণ রয়েছে, প্যান্টটাও বেশ বয়সী, পায়ে শোভা পাচ্ছে স্লিপার। হাতে একটা ফিল্টার ছাড়া সিগারেট ধরে আছে। টানছে মাঝে মাঝে, তবে হাত উল্টো করে তালুর ফাঁকে ধরে আছে জ্বলন্ত দেহটা। জেলের কয়েদীরা যেভাবে ধরে, ভাবল শ্যাডো। অথবা কোন যোদ্ধার মতো। বাঁ হাতটা ওয়েনসডের দিকে বাড়িয়ে দিল লোকটা। 'তাহলে স্বাগতম, ভোটান। তোমার সাথে এ কে?'

'আমার পরিচিত একজন। শ্যাডো, মি. চেরনোবোগের সাথে পরিচিত হও।'

'প্রীত হলাম।' শ্যাডোর বাঁ হাতটাকে নিজের বাঁ হাতে নিয়ে বলল সে। কড়ে পড়া হাত, টের পেল শ্যাডো। এমন হলদে যে মনে হয় আয়োডিনের বোতলে এইমাত্র হাত চুবিয়ে এসেছে।

'কেমন আছেন, মি. চেরনোবোগ?'

'বুড়োরা যেমন থাকে। আমার পেট ব্যথা, কোমর সোজা করা কষ্ট। প্রতিদিন সকালে কাশির চোটে ফুসফুস নাক দিয়ে পালাতে চায়!'

'দরজা আটকে আছ কেন?' এক মহিলা আচমকা চেরনোবোগের পেছন থেকে জানতে চাইল। লোকটার কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল শ্যাডো। এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে। বোনের চাইতে আকারে ছোট-খাটো আর রুগ্ন। কিন্তু চুল এখনও সোনালী রঙা। 'আমি যরিয়া উত্রেনেয়া।' বলল বৃদ্ধা। 'হলে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ভেতরে এসে বসো। আমি কফি দিচ্ছি।'

বিড়ালের বিষ্ঠা, পুড়ে যাওয়া ফুলকপি আর বিদেশি সিগারেটের গন্ধের মাঝে পা দিল যেন শ্যাডো। ওদেরকে পথ দেখিয়ে একটা বসার ঘরে নিয়ে আসা হয়েছে। বিশাল একটা সোফায় বসে আছে ওরা, গদি সম্ভবত ঘোড়ার পশম দিয়ে বানানো হয়েছে। ওদেরকে দেখে বিরক্ত হয়ে আড়মোড়া ভাঙল একটা বয়স্ক বিড়াল। উঠে দাঁড়িয়ে কী যেন শুঁকল, তারপর আবার গিয়ে শুয়ে পড়ল সোফার অন্য পাশে; একে একে সবাইকে একনজর দেখে নিয়ে চোখ মুদল। চেরনোবোগ অবশ্য সোফায় না বসে ওদের উল্টো-পাশের একটা আর্মচেয়ারে বসল।

যরিয়া উত্রেনেয়া একটা খালি অ্যাশট্রে খুঁজে বের করে লোকটার পাশে এনে রাখল। 'কফি কি দুধ-চিনিসহ দেব? নাকি ছাড়া?' জানতে চাইল সে। 'আমরা

পান করি রাতের মতো কালো কফি। তবে পাপের মতো মিষ্টি দিতে ভুল হয় না।'

'আমার আপত্তি নেই, ম্যাম।' বলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল শ্যাডো।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল যরিয়া উত্রেনেয়া।

'মেয়েটা ভালো,' বলল চেরনোবোগ, মহিলার গমনপথের দিকে তাকিয়ে আছে। 'ওর অন্য দুই বোনের মতো নয়। ওদের একজন খুনখুনে, আরেকজন তো সারাটা দিন ঘুমিয়েই কাটায়।' লম্বা, কিন্তু নিচু একটা কফি টেবিলের উপর পা তুলে দিল লোকটা। টেবিলের উপরের তলে দাবার ঘুঁটির মতো দাগ কাটা।

'আপনার স্ত্রী?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'ওই মেয়ে কারও স্ত্রী নয়।' বলে চুপচাপ কিছুক্ষণ রুক্ষ হাতের দিকে তাকিয়ে রইল বয়স্ক লোকটা। 'নাহ, আমরা একে অন্যের আত্মীয়। অনেক অনেক বছর আগে একসাথে এখানে এসেছিলাম, তারপর থেকে একত্রেই আছি।'

বাথরোবের পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করল সে। ওয়েনসডে একটা পাতলা, সোনার লাইটার বের করে এনে জ্বালিয়ে দিলেন ওটা। 'প্রথমে পা রেখেছিলাম নিউইয়র্কে,' বলল লোকটা। 'আমাদের মতো সবাই প্রথমে নিউইয়র্কেই যায়। এরপর এখানে এলাম। পরিস্থিতি খুব দ্রুত খারাপের দিকে মোড় নিল। এমনকি আগে যে দেশে ছিলাম, সেখানেও আমাকে সবাই ভুলতে বসেছে। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম, আমি যেন কোন অতীত স্মৃতি মাত্র। শিকাগোতে পা রেখে কী করেছি জানো?'

'না।' উত্তর দিল শ্যাডো।

'মাংস সরবরাহের ব্যবসায় একটা চাকরী জুটিয়ে নিলাম। আমার পদটার নাম ছিল *নকার*, নামটার পেছনের কারণও বলে দেই। কারণ আমার হাতে থাকত একটা স্লেজ হ্যামার, হাতুড়িটার ঘায়ে যে কতো শত গরু-গাভীর ভবলীলা সাঙ্গ করেছি, তার ইয়ত্তা নেয়। একটা মাত্র আঘাত, *ব্যাম!* ব্যাস। আসলে কাজটার জন্য দরকার শক্তির। এরপর আরেকজন এসে প্রানিটার গায়ে শিকল পরিয়ে উঁচু করে ঝোলাত। তারপর গলা কেটে ফেলে রক্ত ঝরিয়ে নিত। আমরা, নকাররা ছিলাম সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী।' বাথরোব গুটিয়ে হাতের শক্তিশালী মাংসপেশি দেখাল ও। 'অবশ্য শুধু শক্তি থাকলেই হয় না, মারতেও জানতে হয়। ঠিকমতো না লাগলে গরুটা তো মরে না-ই, উল্টো ক্ষেপে যেতে পারে। এরপর পঞ্চাশের দশকে আবিষ্কৃত হলো বোল্ট-সিস্টেম বন্দুক। কাজটা আরও সহজ হয়ে গেল। মাথা তাক করে...ব্যাম! ব্যাম! হয়তো ভাবছ, যে কেউ এখন

খুন করতে পারে। কিন্তু না।' হাত দিয়ে বন্দুক তাক করার ভঙ্গি করল সে। 'এখনও এজন্য দক্ষতার বিকল্প নেই।' স্মৃতিচারণটুকু হাসি ফুটিয়ে তুলল ওর ঠোঁটে, দাগ পড়া দাঁত দেখতে পেল শ্যাডো।

'গরু মারার গল্প আর কতো শোনাবে!' যরিয়া উত্রেনেয়া একটা লালচে কাঠের ট্রেতে করে ওদের কফি নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বলল। ছোট ছোট এনামেলের কাপে ঢেলেছে কফি। সবাইকে একটা করে কাপ দিয়ে বসে পড়ল চেরনোবোগের পাশে।

'যরিয়া ভেচেরনেয়া বাজারে গিয়েছে,' বলল সে। 'চলে আসবে।'

'দেখা হয়েছে সিঁড়িতে।' জানাল শ্যাডো। 'শুনলাম, তিনি নাকি ভাগ্য গণনা করেন?'

'হ্যাঁ, গোধূলি বেলায় করে। মিথ্যা বলার সেটাই উপযুক্ত সময়। আমি মন ভোলানো মিথ্যা বলতে পারি না, তাই গণক হিসেবে ব্যর্থ। আমাদের বোন, যরিয়া পলুনোচনেয়া তো একদমই মিথ্যা বলতে পারে না।'

কড়া, কিন্তু মিষ্টি কফিটা শ্যাডোকে একটা ধাক্কা দিয়ে গেল। এমনটা সে একদম আশা করেনি। সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে বাথরুমের দিকে গেল ও, ঘরটা ক্লজিটের চাইতে বড় হবে না। অনেকগুলো পুরনো ফটোগ্রাফ ঝুলছে দেয়ালে, নানা পোজে তাতে দেখা যাচ্ছে একগাদা নারী-পুরুষকে। বিকাল হয়েছে মাত্র, তবে এরইমাঝে মরে যেতে শুরু করেছে আলো। অন্যঘর থেকে উচ্চ কণ্ঠের শব্দ ভেসে এলো কানে। বরফ-ঠান্ডা পানিতে হাত ধুয়ে নিল সে।

শ্যাডো যখন বাইরে বেরিয়েছে, তখন চেরনোবোগ হলে দাঁড়িয়ে।

'তুমি কেবল বিপদ টেনে আনো!' চিৎকার করে বলছে সে। 'ঝামেলা আর বিপদ তোমার সব সময়ের সঙ্গী! নাহ, একটা শব্দও শুনতে চাই না! এখুনি বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে।'

ওয়েনসডে তখন সোফায় চুপচাপ বসে, থেকে থেকে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছেন। যরিয়া উত্রেনেয়া দাঁড়িয়ে আছে, চুল নিয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে খেলছে।

'কোন সমস্যা?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'ওই লোকটা নিজেই এক মূর্তিমান সমস্যা!' চিৎকার করল চেরনোবোগ। 'বলে দাও, আমি কোনভাবেই ওকে সাহায্য করব না! আমি চাই, ভোটান আমার চোখের সামনে থেকে চলে যাক! তোমরা...তোমরা দুজনেই চলে যাও!'

'প্রিয়,' অনুরোধ করল যরিয়া উত্রেনেয়া। 'একটু আস্তে কথা বলো, যরিয়া পলুনোচনেয়া জেগে যাবে!'

'এই পাগলামিতে আমাকে যদি অংশ নিতে বলো, তাহলে তোমার আর ভোটানের মাঝে কোন পার্থক্য নেই!' চিৎকার করে বলল চেরনোবোগ, দেখে মনে হচ্ছিল যেন কেঁদে ফেলবে! সিগারেট থেকে ছাই ঝরতে ঝরতে যে পায়ের কাছে স্তূপ বানিয়ে ফেলেছে, সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই!

উঠে বসলেন ওয়েনসডে। চেরনোবোগের কাছে গিয়ে হাত রাখলেন কাঁধে।

'শোন,' নম্র সুরে বললেন তিনি। 'প্রথমত, আমি পাগলামি করছি না, এছাড়া আসলেই আর কোন উপায় নেই। আর দ্বিতীয়ত, সবাই থাকবে সেখানে। তুমি কি সবার থেকে আলাদা হয়ে থাকতে চাও?'

'তুমি জানো, আমি কে!' বলল চেরনোবোগ। 'তুমি জানো এই হাত জোড়া কী করেছে! আসলে তোমার দরকার আমার ভাইকে। কিন্তু সে তো আর নেই!'

হলওয়ের একটা দরজা খুলে ফেল। ভেতর থেকে ঘুম কাতুরে কণ্ঠে এক মেয়ে বলে উঠল। 'কোন ঝামেলা হয়েছে নাকি?'

'না, না, বোন।' বলল যরিয়া উত্রেনেয়া। 'ঘুমিয়ে পড়ো আবার।' এরপর চেরনোবোগের দিকে ফিরে বলল, 'দেখলে তো, তোমার চেঁচামেচির ফল কী হলো? এখন যাও, গিয়ে সোফায় চুপচাপ বসে পড়!'

শ্যাডোর মনে হলো, চেরনোবোগ বুঝি প্রতিবাদ জানাবে। কিন্তু না, সব প্রতিবাদ বিদায় নিয়েছে ওর ভেতর থেকে। আচমকা লোকটাকে বেশ বয়স্ক মনে হলো যুবকের-বয়স্ক, দুর্বল আর একাকী।

জীর্ণ বসার ঘরে ফিরে গেল তিন পুরুষ।

'তোমার ভাইয়ের ক্ষেত্রে যেটা খাটে, তোমার ক্ষেত্রেও সেটা খাটে।' বললেন ওয়েনসডে। 'তোমরা, দ্বৈত-সত্তার অধিকারীরা, এদিক দিয়ে আমাদের চাইতে বেশি সুবিধা পাও।'

কিছু বলল না চেরনোবোগ।

'ভালো কথা, বিয়েলবোগের কাছ থেকে কোন খবর পেয়েছ?'

মাথা নেড়ে না করল চেরনোবোগ। আচমকা শ্যাডোকে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'তোমার কোন ভাই আছে?'

'আমার জানামতে নেই।'

'আমার একটা আছে। লোকে বলে, আমরা দুইয়ে মিলে একটি অস্তিত্ব, বুঝতে পেরেছ? কমবয়সে ওর চুল ছিল একদম সোনালী, চোখ ছিল নীল। লোকে বলত, দুজনের মাঝে ও ভালো। আমার চুল ছিল ঘন কালো, তোমার চুলও তার সামনে কিছু না। লোকে বলত, আমি অশুভ। সময় বয়ে চলল, আমার চুল এখন ধূসর। যত দূর মনে হয়, ওর চুলও এখন তাই। আমাদের

দুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করাও, কে ভালো আর কে মন্দ তা বুঝতেই পারবে না!'

'খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন বুঝি আপনারা?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'ঘনিষ্ঠ হবো কী করে! আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মাঝে কোন মিলই ছিল না।'

হলের শেষ মাথা থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এলো, ভেতরে প্রবেশ করল যরিয়া ভেচেরনেয়া। 'এক ঘণ্টার মাঝে রাতের খাবার দিচ্ছি।' বলেই বিদায় নিল সে।

দীর্ঘঃশ্বাস ফেলল চেরনোবোগ। 'মেয়েটার ধারণা, সে খুব ভালো রাঁধুনি। আসলে ও যখন বড় হয়েছে, তখন সব কাজ করত চাকররা। এখন আর চাকর-বাকর নেই। আসলে এখন আর...কিছুই অবশিষ্ট নেই।'

'কিছু না কিছু সব সময় থেকেই যায়।' বললেন ওয়েনসডে।

'তোমার কোন কথাই আমি শুনতে চাই না।' শ্যাডোর দিকে ফিরল লোকটা। 'চেকার্স খেল নাকি?' জানতে চাইল।

'খুব ভালো। আমার সাথে খেলবে, এসো।' বলেই ম্যান্টেলপিস থেকে একটা কাঠের বাক্স নামাল লোকটা। ভেতরের ঘুঁটিগুলো বের করে রাখল টেবিলের উপর।

'না চাইলে খেলার দরকার নেই,' শ্যাডোর হাত আলতো করে স্পর্শ করে বললেন ওয়েনসডে।

'আমার অসুবিধা নেই।' বলল শ্যাডো। 'আমি খেলতেই চাই।'

শ্রাগ করে এক কপি রিডার্স ডাইজেস্ট হাতে তুলে নিলেন তিনি। এদিকে চেরনোবোগ তার হলদে হয়ে আসা হাতে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মাঝেই শুরু হলো খেলা।

পরবর্তী দিনগুলোতে বহুবার এই দানটার কথা মনে করেছে শ্যাডো। কয়েক রাতে তো স্বপ্নেও দেখেছে খেলার দৃশ্য! ও খেলছিল সাদা ঘুঁটি নিয়ে, কালের করাল গ্রাসে যেটা জীর্ণ হয়ে গিয়েছে। চেরনোবোগেরগুলো কালো ছিল কোন এক কালে। এখন মলিন হয়ে গিয়েছে। কথা হলো না কেন, শব্দ বলতে শুধু ঘুঁটি চালার আওয়াজ।

প্রথম আধ-ডজন চালে দুজনেই আস্তে আস্তে কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে গেল। পেছনের সারিগুলো স্পর্শও করল না কেউ। দুই চালের মাঝে বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হলো, যেমনটা দাবার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আগ্রহ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর চাল দেখছে তারা। আর ভাবছে, এরপর কীভাবে এগোবে?

জেলে থাকতে চেকার্স খেলেছে শ্যাডো। সময়টা বেশ কেটে যায়। খেলেছে দাবাও, তবে অনেক দূর পর্যন্ত ভেবে ভেবে এগোবার অভ্যাস নেই ওর। ক্ষণেরটা ক্ষণেই ভাবে সে। ওভাবে খেলে চেকার্সে জেতা যায় বটে...কখনও কখনও।

একটা কালো ঘুঁটি তুলে নিয়ে, শ্যাডোর সাদা ঘুঁটি খেল চেরনোবোগ। ওটার স্থান হলো টেবিলের পাশে।

‘প্রথম ঘুঁটি আমার,’ বলল চেরনোবোগ। ‘তুমি শেষ, হেরে গিয়েছ।’

‘আরে না,’ বলল শ্যাডো। ‘এখনও খেলার অনেক বাকি।’

‘তাহলে বাজি ধরবে নাকি? খেলাটা আরেকটু উত্তেজনাকর হোক।

‘নাহ,’ পত্রিকা থেকে নজর না তুলেই বললেন ওয়েনসডে। ‘ও বাজি ধরবে না।’

‘আমি তোমার সাথে খেলছি না, বুড়ো। ওর সাথে খেলছি। তা মিস্টার শ্যাডো, বাজি ধরবে?’

‘আপনারা কী নিয়ে ঝগড়া করছিলেন?’ জানতে চাইল ও।

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল চেরনোবোগ। ‘তোমার প্রভু চায়, আমি ওর সঙ্গে গাঁটছড়া বাধি। তারচেয়ে বরং মরে যাওয়াই ভালো।’

‘বাজি ধরতে চান? ঠিক আছে, ধরলাম। আমি জিতলে আপনাকে আমার সাথে আসতে হবে।’

ঠোঁট টিপল চেরনোবোগ। ‘তাহলে আমারও একটা শর্ত আছে।’

‘কী?’

নিঃস্পৃহ ভঙ্গিতে শর্তটা শোনাল চেরনোবোগ। ‘আমি জিতলে, তোমার মাথায় আঘাত করার সুযোগ দেবে। হাঁটু গেড়ে বসতে হবে তোমাকে। এরপর আমি স্লেজ হ্যামার দিয়ে তোমার মাথায় আঘাত হানব।’

বয়স্ক চেহারাটার দিকে তাকাল শ্যাডো, লোকটার মনের কথা পড়ার চেষ্টা করছে। ঠাট্টা করছে বলে মনে হলো না। কালো চোখ জোড়ায় কীসের এক আকুতি ভিড় করেছে...হয়তো মৃত্যুর...হয়তো প্রতিশোধের।

পত্রিকা বন্ধ করলেন ওয়েনসডে। ‘হাস্যকর কথা বোলো না তো। এখানে আসাই আমার উচিত হয়নি। চলো, শ্যাডো। আমরা চলে যাচ্ছি।’

‘না,’ অস্বীকার করল ও। মরতে সে ভয় পায় না। বেঁচে থাকবেই বা কার জন্য? ‘ঠিক আছে, আমি রাজি। যদি আপনি জিতে যান, তাহলে আপনার স্লেজ হ্যামার দিয়ে আমার মাথায় একটা আঘাত হানার সুযোগ পাবেন।’ বলতে বলতে চাল চালল ও।

আর কথা হলো না কোন, তবে ওয়েনসডে আর পত্রিকা তুলে নিলেন না হাতে। একটা আসল, আর একটা কাঁচের চোখ দিয়ে খেলা দেখতে শুরু করলেন তিনি। মনের ভেতর কী চলছে, তা চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই।

শ্যাডোর আরেকটা ঘুঁটি খেল চেরনোবোগ, শ্যাডো খেল প্রতিপক্ষের দুটি। করিডর ধরে অপরিচিত রান্নার গন্ধ ভেসে আসছে। খুব একটা উপাদেয় না মনে হলেও, খিদে চাগিয়ে উঠল শ্যাডোর।

চুপচাপ চাল দিয়ে চলছে দুজন...সাদা আর কালো...উত্তর আর প্রতি-উত্তর। এ ওর ঘুঁটি তুলে নিচ্ছে তো ও তার। রাজায় পরিণত হলো দুটো ঘুঁটি। এমনিতে ঘুঁটি কেবল সামনে যেতে পারে। কিন্তু রাজার জন্য ডানে-বাঁয়ে-সামনে-পেছনে সব দিকই খোলা। তাই খেলার সবচেয়ে বিপদজনক ঘুঁটি এটি। খেলতে খেলতে দেখা গেল, চেরনোবোগের রাজা তিনটি, আর শ্যাডোর দুটো।

একটা রাজাকে ব্যবহার করে বোর্ড থেকে শ্যাডোর অন্য সব ঘুঁটি তুলে নিল চেরনোবোগ। বাকি দুই রাজা দিয়ে শ্যাডোর রাজাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে।

তারপর আরেকটা ঘুঁটিকে রাজায় পরিণত করল সে। শ্যাডোর দুই রাজাকে নিঃস্পৃহ ভঙ্গিতেই তুলে নিল।

খেলা শেষ।

'আমি জিতেছি,' বলল বৃদ্ধ। 'এবার তোমার মাথা গুঁড়িয়ে দেবার পালা। ইচ্ছাকৃতভাবে হাঁটু গেড়ে বসতে হবে কিন্তু তোমাকে।' শ্যাডোর হাতে আলতো চাপড় দিল সে।

'রান্না শেষ হতে এখনও বাকি আছে।' বলল শ্যাডো। 'আরেক দান হবে নাকি? শর্ত সেই একই থাকুক।'

আরেকটা সিগারেট ধরাল চেরনোবোগ। 'শর্ত একই থাকুক মানে? তোমাকে দুই বার খুন করতে বলছ!'

'আপনি আমার মাথায় একবার আঘাত হানার সুযোগ জিতেছেন মাত্র। নিজেই বলেছেন, শক্তির সাথে দক্ষতা না হলে এক আঘাতে কাজ হয় না সবসময়। যদি এই দান জেতেন, তাহলে দুটো আঘাত করার সুযোগ থাকবে।'

'একটা আঘাত,' কিছুটা ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলল চেরনোবোগ। 'একটা আঘাতই যথেষ্ট আমার জন্য।' ডান হাতটা দেখাল সে।

'আচ্ছা, ওই স্লেজ হ্যামারটা শেষ ব্যবহার করেছেন কবে? ত্রিশ বছর আগে? নাকি চল্লিশ? হয়তো আঘাতে আমার কিছুই হবে না। দক্ষতাতেও কিন্তু মরচে ধরে!'

কিছু বলল না চেরনোবোগ। টেবিলের উপরে টোকা দিতে দিতে কী যেন ভাবল। আচমকা চব্বিশটা ঘুঁটির সবগুলো বসিয়ে দিল যার যার স্থানে।

'শুরু করা যাক,' বলল সে। 'এবারও তুমি সাদা, আমি কালো।'

প্রথম চালটা দিল শ্যাডো, চেরনোবোগও চালল প্রায় সাথে সাথে। শ্যাডোর কেন যেন মনে হলো, এবারেও প্রথমবারের খেলাটা অনুকরণ করার চেষ্টা করবে লোকটা। আর এই সীমাবদ্ধতাকেই কাজে লাগাতে হবে ওকে।

অগোছালোভাবে খেলল এবার ও। একটু সুযোগ পেতেই লুফে নিল, চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই চাল দিতে শুরু করল। তবে এবার, প্রতি চালের সাথে হাসি ফুটল তার চেহারায়। চেরনোবোগ প্রতিটা চাল দেবার পর আরও বড় হলো সেই হাসি।

অতি সত্বর দেখা গেল, চেরনোবোগ যেন ওর প্রতিটা ঘুঁটি প্রবল আক্রোশে বোর্ডের উপর আছড়ে ফেলছে। ওর প্রতিটা চালের সাথে সাথে কেঁপে উঠছে চারপাশের সব ঘুঁটি।

'এই নাও,' শ্যাডোর একটা ঘুঁটি তুলি নিয়ে বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলল সে। 'এর কী উত্তর দেবে, দাও।'

কিছু বলল না শ্যাডো। মুচকি হাসল কেবল। নিজের ঘুঁটি ব্যবহার করে এক চালে তুলে নিল চেরনোবোগের চার-চারটি! বোর্ডের মাঝখানে এখন আর কোন কালো ঘুঁটি নেই। বোর্ডের পাশে জড়ো করে রাখা একটা সাদা ঘুঁটি ব্যবহার করে একটু আগেরটাকে রাজায় রূপ দিল।

খেলা শেষ হতে আর বেশি সময় লাগল না, কয়েকটা চাল মাত্র।

শ্যাডো বলল, 'আরেক দান হবে? তিনের মাঝে দুই?'

একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল চেরনোবোগ। 'সাহস আছে তোমার, ছোকরা।' হাসতে হাসতে বলল সে। 'তোমাকে পছন্দ হয়েছে আমার।'

হঠাৎ যরিয়া উত্রেনেয়া দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে জানাল-খাবার তৈরি! শ্যাডোরা যেন ঘুঁটি সরিয়ে টেবিল ক্লথ বিছিয়ে ফেলে।

'আমাদের কোন ডাইনিং রুম নেই,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে জানাল সে। 'এখানেই খাই সবাই।'

কিছুক্ষণের মাঝেই তরকারীর পাত্র চলে এলো টেবিলে। খেতে বসা সবাইকে দেয়া হলো একটা ছোট, রঙ করা ট্রে। তার উপরে কয়েকটা চামচ, হাতে ধরে বা কোলে রেখে খেতে হবে।

পাঁচটা কাঠের পাত্র নিয়ে তাতে সেদ্ধ করা আলু রাখল যরিয়া ভেচেরনেয়া, কোনটাই চামড়া ছাড়ানো নয়। এর উপর দরাজ হাতে ঢালল খয়েরী রঙা বর্শট।

সাথে যোগ করল এক চামচ সাদা ক্রীম। এরপর সবার হাতে ধরিয়ে দিল একটা করে।

'আমি তো ভেবেছিলাম, মোট ছয়জন আছি বাড়িতে।'

'যরিয়া পলুনোচনেয়া এখনও ঘুমাচ্ছে।' বলল যরিয়া ভেচেরনেয়া। 'আমরা ওর খাবার ফ্রিজে রেখে দেই, ঘুম থেকে উঠলে খেয়ে নেয়।'

বর্শটটা কেমন যেন ভিনেগারের মতো দেখতে, স্বাদে আচার দেয়া বীটসের মতো। তবে সেদ্ধ আলুটা খেতে বেশ মজার।

এরপর এলো গরুর মাংস দিয়ে বানানো পট রোস্ট, সাথে সবুজ কিছু একটা। তবে এত লম্বা সময় ধরে ওগুলো সিদ্ধ করা হয়েছে যে এখন আর সবুজের কোন চিহ্নও নেই! কল্পনাতেও বোধ হয় দেখা সম্ভব না। বাদামী হয়ে আছে প্রত্যেকটাই।

সব শেষে এলো বাঁধাকপির পাতা দিয়ে রান্না করা মাংস আর ভাত। পাতাগুলো এত শক্ত যে ছুরি দিয়েও কাঁটা যাচ্ছে না। আর কাটতে গেলেই, ভাতসহ মাংস ছিটিয়ে পড়ছে কার্পেটে। শ্যাডো চামচ দিয়ে খাবার এদিক-ওদিক নাড়ল কেবল।

'আমরা চেকার্স খেললাম এতক্ষণ,' পট রোস্টের আরেক টুকরার উপর আক্রমণ চালাতে চালাতে বলল চেরনোবগ। 'ছেলেটা এক দান জিতেছে, আমি এক দান। ও জেতায় এখন আমাকে ভোটানের সাথে যেতে হবে, ওদের এই পাগলামির অংশ হতে হবে। আর আমি জিতেছি বলে, এসব ঝামেলা শেষ হলে শ্যাডোকে খুন করতে পারব।'

মাথা নাড়ল দুই যরিয়া। 'কী দুঃখের কথা।' শ্যাডোকে বলল যরিয়া ভেচেরনেয়া। 'তোমার ভাগ্য গণনার সময় আমার বলা উচিৎ ছিলঃ লম্বা একটা জীবন হবে তোমার। বউ থাকবে, হালি-হালি বাচ্চা হবে!'

'এজন্যই তুমি এত ভালো একজন গণক।' ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বলল যরিয়া উত্রেনেয়া, এতক্ষণ জেগে থাকার অভ্যাস নেই যেন। 'তুমি মিথ্যাটা দারুণ বলতে পারো।'

খাবার পর্ব শেষ হলো বটে, কিন্তু শ্যাডোর ক্ষুধা এখনও মেটেনি। জেলের খাবার মুখে তোলা যেত না, তবে তা-ও এরচেয়ে ভালো ছিল।

'দারুণ খাবার খেলাম।' বললেন ওয়েনসডে, প্লেট চেটে-পুটে খেয়েছেন বলে সন্দেহ করতে পারল না শ্যাডো। 'তোমাদের দুই বোনকে ধন্যবাদ। এবার আমাদের বিদায় দাও, আর যদি আশেপাশের কোন ভালো হোটেলের খোঁজ দিতে পারো তো সোনায় সোহাগা।'

যরিয়া ভেচেরনেয়াকে আহত মনে হলো। 'হোটেলে যাবার দরকার কী? তোমরা আমাদেরকে বন্ধু বলে মনে করো না?'

'এমনিই তোমাদের যথেষ্ট ঝামেলায় ফেলেছি, তার উপর...' বললেন ওয়েনসডে।

'ঝামেলা কীসের?' হাই তুলতে তুলতে বলল যরিয়া উত্রেনেয়া।

'তুমি বিয়েলবোগের ঘরে যাও,' ওয়েনসডেকে বলল যরিয়া ভেচেরনেয়া। 'খালিই আছে। আর শ্যাডো, তোমার জন্য সোফা গুছিয়ে দিচ্ছি। যথেষ্ট আরামে ঘুমাতে পারবে।'

'তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।' বললেন ওয়েনসডে।

'আর তাছাড়া, হোটেলে যা দিতে হতো, আমাকে তার চাইতে একটা পয়সাও বেশি দিতে হবে না।' বিজয়ীর সুরে বলল যরিয়া ভেচেরনেয়া। 'মাত্র একশ ডলার।'

'ত্রিশ।' দর কষাকষি শুরু করলেন ওয়েনসডে।

'পঞ্চাশ।'

'পঁয়ত্রিশ।'

'পঁয়তাল্লিশ।'

'চল্লিশ।'

'পঁয়তাল্লিশের চেয়ে এক সেন্টও কম না।' বলে হাত বাড়িয়ে ওয়েনসডের সাথে করমর্দন করল যরিয়া ভেচেরনেয়া। টেবিল পরিষ্কার করার কাজে লেগে গেল সাথে সাথে। এদিকে যরিয়া উত্রেনেয়া এত বড় বড় করে হাই তুলছে যে শ্যাডোর ভয় হলো, মহিলার চোয়াল না খুলে আসে! শুভরাত্রি বলে বিদায় নিল সে, নিজেও অবস্থাটা টের পেয়েছে।

যরিয়া ভেচেরনেয়াকে সাহায্য করল শ্যাডো। অবাক হয়ে লক্ষ করল, সিঙ্কের পাশে একটা ডিশ-ওয়াশিং মেশিন দেখা যাচ্ছে! ওখানে সে সব তৈজসপত্র রাখতেই বাঁধা দিল যরিয়া ভেচেরনেয়া। কাঠের বর্শট-ভর্তি পাত্রগুলোকে দেখিয়ে বলল, 'ওগুলো সিঙ্কে রাখো।'

'দুঃখিত।'

'ব্যাপার না। যাক গে, এদিকে এসো। পাই আছে।'

পাইটা, মানে আপেলের পাইটা কেনা হয়েছে দোকান থেকে। আর গরম করা হয়েছে ওভেনে, তারপরেও বেশ লাগল খেতে। আইসক্রিম আর পাই খেল চারজনে মিলে। এরপর যরিয়া ভেচেরনেয়ার পীড়াপীড়িতে বসার ঘরে যেতে হলো সবাইকে। শ্যাডোর জন্য সোফাটাকে বিছানার রূপ দিল মহিলা।

করিডরে দাঁড়িয়ে শ্যাডোকে বললেন ওয়েনসডে। 'চেকার্স খেললে...'

'হুম। তো?'

'ধন্যবাদ। একদম বোকার মতো কাজ করেছ একটা। তবে ধন্যবাদ। যাই হোক, শুভ রাত্রি।'

দাঁত মেজে ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ ধুল শ্যাডো। এরপর বসার ঘরের বাতি বন্ধ করে শুয়ে পড়ল সোফা-কাম-বিছানায়, মাথা বালিশে রাখার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল।

অদ্ভুত স্বপ্নটা ঘুমাবার কতক্ষণ পর শুরু হলো, জানা নেই শ্যাডোর। স্বপ্নে বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেল ও।

একটা মাইনফিল্ডের ভিতর দিয়ে ট্রাক চালিয়ে যাচ্ছে সে, দুই দিকেই একের পর এক ফুটছে বোমা। উইন্ডশীল্ডটা ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গিয়েছে অনেক আগেই। উষ্ণ রক্ত বেয়ে পড়ছে ওর চেহারা দিয়ে।

কেউ একজন গুলি ছুঁড়ছে!

একটা বুলেট এসে ওর ফুসফুস ছিদ্র করে দিল, আরেকটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলল ওর শিরদাঁড়া। শুধু তাই না, তৃতীয় বুলেটকে আঘাত হানল কাঁধে। প্রতিটা আঘাত আলাদা আলাদা করে টের পেল শ্যাডো, আছড়ে পড়ল স্টিয়ারিং হুইলের উপরে।

একেবারে শেষ বিস্ফোরণের পর অন্ধকার হয়ে গেল সবকিছু।

আমি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছি, একাকী অন্ধকারে বসে বসে ভাবছে শ্যাডো। একেই বোধ হয় মৃত্যু বলে। ছোট বেলায় গল্প শুনত...বিশ্বাসও করত যে স্বপ্নে মারা যাবার অর্থ, আসলেও মারা যাওয়া। কিন্তু এখন নিজেকে মৃত বলে মনে হচ্ছে না। পরীক্ষা করে দেখার জন্যই যেন চোখ খুলল সে।

ছোট্ট বসার ঘরটায় একজন মহিলা এসে উপস্থিত, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পিঠ শ্যাডোর দিকে দেয়া। যুবকের মনে হলো, হৃদপিণ্ড যেন এক সেকেণ্ডের জন্য হলেও স্পন্দিত হতে ভুলে গিয়েছে। 'লরা?'

ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা, চাঁদের আলোয় অবয়ব দেখা যাচ্ছে। 'আমি দুঃখিত,' বলল সে। 'তোমাকে জাগাতে চাইনি।' নরম একটা ইউরোপীয় টান কথায়। 'আমি চলে যাচ্ছি।'

'না, না। অসুবিধা নেই।' তাড়াতাড়ি বলে উঠল শ্যাডো। 'আমি তোমার জন্য জাগিনি। দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম।'

'বুঝতে পেরেছি,' বলল মেয়েটা। 'তুমি কাঁদছিলে আর গুঙিয়ে উঠছিলে। একবার ভাবলাম, ডেকে তুলি। পরে সিদ্ধান্ত নিলাম, থাক।'

মেয়েটার চুলের আসল রঙ জানা নেই শ্যাডোর, তবে চাঁদের আলোয় বর্ণহীন বলে মনে হচ্ছে। পরনে তার একটা সাদা সুতির নাইটগাউন, এতবড় যে মেঝেতে এসে পড়েছে ঝুল। উঠে বসল শ্যাডো, ঘুম ছুটে গিয়েছে। 'তুমি যরিয়া পলু...' উচ্চারণ করতে পারল না ও, তাই ভিন্ন পথ ধরল। '...তুমি তৃতীয় বোন। ঘুমিয়ে ছিলে।'

'আমি যরিয়া পলুনোচনেয়া। আর তুমি নিশ্চয় শ্যাডো? ঘুম থেকে যখন উঠি, তখনও যরিয়া ভেচেরনেয়া তাই বলল।'

'হ্যাঁ। কী দেখছিল জানালা দিয়ে?'

একনজর ওকে দেখে নিল মেয়েটা, তারপর ইশারায় নিজের পাশে এসে দাঁড়াতে বলল। ছোট একটা ঘর, কিন্তু হেঁটে যেতে যেতে শ্যাডোর মনে হলো বুঝি লম্বা পথ পাড়ি দিয়েছে।

মেয়েটার বয়স বোঝা যাচ্ছে না, নিভাঁজ ত্বক। চোখগুলো কালো, পাপড়ি লম্বা। চুল কোমর ছুয়েছে, সাদাটে রঙের। তবে চাঁদের আলোয় পরিষ্কার ধরা পড়ছিল না। দুই বোনের চাইতেই লম্বা ও।

রাতের আকাশের দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা। 'ওটা দেখছিলাম।'

'উরসা মেজর? বিশালাকার ভালুক দেখছিলে?'

'ওভাবেও বলা যায়,' বলল মেয়েটা। 'তবে আমার যেখানে জন্ম, সেখানে কিন্তু ওটাকে ওই নামে ডাকে না। যাক, আমি ছাদে যাচ্ছি। আসবে?'

বলেই জানালা খুলে ফায়ার-এস্কেপে পা রাখল মেয়েটা। জানালা দিয়ে সাথে সাথে ভেতরে প্রবেশ করল গা শিহরানো ঠান্ডা বাতাস। শ্যাডোর অস্বস্তি হচ্ছে, কিন্তু কেন তা বুঝতে পারছে না। সোয়েটার, মোজা আর জুতা পরে নিয়ে মেয়েটার পিছু পিছু সে-ও উঠে পড়ল ফায়ার-এস্কেপে। ওর জন্য অপেক্ষা করছিল মেয়েটা! শ্যাডোর নিঃশ্বাস বাতাসে বাষ্পের সৃষ্টি করছে। অথচ যরিয়া খালি পায়েই উঠে যাচ্ছে ধাতব সিঁড়ি বেয়ে!

ঠান্ডা বাতাস বইল এক দমকা, মেয়েটার দেহের সাথে যেন আরও এঁটে বসল নাইটগাউন। সাথে সাথে শ্যাডো টের পেল, মেয়েটা গাউনের নিচে কিছুই পরেনি।

'ঠান্ডা লাগছে না?' সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে জানতে চাইল শ্যাডো, কিন্তু ওর শেষ শব্দগুলো যেন লুফে নিল বাতাস।

'বুঝতে পারিনি।' ওর মুখের কাছে মুখ এনে বলল মেয়েটা, শ্বাসে মিষ্টি একটা গন্ধ।

'বললাম, ঠান্ডা লাগছে না?'

উত্তর না দিয়ে, আঙুল তুলে ওকে অপেক্ষা করার ইঙ্গিত দিলে যরিয়া। আলতো পায়ে সমতল ছাদে পা রাখল সে। শ্যাডো অবশ্য অতোটা আয়াসে ছাদে উঠতে পারল না। তবে উঠেই মেয়েটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। পানির একটা ট্যাঙ্কির পাশে দাঁড়িয়ে আছে যরিয়া, কাঠের একটা বেঞ্চও আছে সেখানে। নিজে বসে শ্যাডোকে পাশে বসার ইঙ্গিত দিল সে। পানির ট্যাঙ্কির আড়ালে বসে বলে ঠান্ডা বাতাসের হাত থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পেল দুজন।

'নাহ,' এতক্ষণে উত্তর দিল সে। 'ঠান্ডায় আমার অসুবিধা হয় না। এখন আমার সময়। পানিতে যেমন মাছের অসুবিধা হয় না, তেমনি এই সময়ে কোন কিছুই আমাকে সমস্যায় ফেলাতে পারে না।'

'রাত তোমার খুব পছন্দ বলে মনে হচ্ছে।' বলেই আফসোস হলো শ্যাডোর। আরও ভারী...আরও জ্ঞানী কোন কথা বলতে পারলে খুশি হতো ও।

'আমার বোনেরা তাদের সময়ের। যরিয়া উত্রেনেয়ার সময় হচ্ছে ভোর। আগের দেশটায় ও দরজা খুলে দিলে আমাদের পিতা...কী যেন শব্দটা? ঘোড়ায় টানা গাড়ি?'

'রথ?'

'হ্যাঁ, রথ। আমাদের পিতা তার রথ নিয়ে বেরোতেন। আর যরিয়া ভেচেরনেয়া গোধূলি বেলায় দরজা খুলে দিত, তখন তিনি ফিরে আসতেন।'

'আর তুমি?'

চুপ করে রইল মেয়েটা। ভরাট ঠোঁট দুটো কেমন যেন পাণ্ডুর মনে হচ্ছে। 'আমি কখনও আমার পিতাকে দেখিনি। ঘুমিয়ে থাকতাম।'

'কোন ধরনের রোগ আক্রান্ত ছিল নাকি?'

উত্তর দিল না সে। শ্রাগ করল বলে মনে হলো শ্যাডোর, তবে নিশ্চিত হতে পারল না।

'যাই হোক, আমি কী দেখছি তা জানতে চেয়েছিলে?'

'উরসা মেজর দেখছিলে।'

কথা না বলে আঙুল দিয়ে ওটা দেখাল মেয়েটা। বাতাস আবার নাইটগাউনটাকে তার দেহের সাথে সেঁটে রেখেছে। স্তনবৃন্তগুলো পরিষ্কার দেখা গেল এক মুহূর্তের জন্য। শীতে কেঁপে উঠল শ্যাডো।

‘ওডিনের ওয়িন, আমাদের ওখানে এই নামে ডাকা হয় ওটাকে। আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ওটা দেবতা নয়, বরঞ্চ খারাপ কোন কিছু। শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে যাকে। যদি একবার পালাতে পারে, তাহলে সবকিছু খেয়ে ফেলবে। আর তিন বোন আছে, যারা লক্ষ রাখে তার উপর। সারাদিন...সারারাত...ক্ষণিকের জন্যও নজর রাখা বন্ধ করে না। যদি পালায়, তাহলে...পুফ, বিনাশ হবে সব কিছুর!’

‘মানুষ এসব বিশ্বাস করত?’

‘করত, অনেকদিন আগের কথা বলছি।’

‘তুমি কি তারার ফাঁকে সেই ভয়ানক ‘জিনিস’টাকে খুঁজছ?’

‘ওরকমই কিছু একটা।’

হাসল শ্যাডো। ঠান্ডায় হাড় জমে যাচ্ছে, নইলে এই কথোপকথনকে ও স্বপ্ন বলেই ধরে নিত। সবকিছু যে বড় স্বপ্ন-স্বপ্ন লাগছে। ‘তোমার বয়স জানতে চাইলে রাগ করবে? অন্য দুই বোনকে খুব বয়স্ক মনে হয়।’

নড করল মেয়েটা। ‘আমিই সবার ছোট। যরিয়া উত্রেনেয়ার জন্ম হয়েছিল সকালে, যরিয়া ভেচেরনেয়ার গোধূলি বেলায়। আমার জন্ম মাঝরাতে। আচ্ছা, তুমি বিবাহিত?’

‘আমার স্ত্রী মারা গিয়েছে। গত সপ্তাহে, এক গাড়ি দুর্ঘটনায়। গতকাল ওকে কবর দিয়েছি।’

‘শুনে দুঃখ পেলাম।’

‘গতরাতে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল,’ এই অন্ধকারে, রাতের চাঁদের আলোয় বসে কথাটা বলতে একটুও বাঁধল না শ্যাডোর। যদিও দিনের আলোতে এই বাক্যটা নিজের কাছেই বলতে অস্বস্তি হচ্ছিল ওর!

‘কেন এসেছিল, জানতে চেয়েছ?’

‘নাহ, চাইনি।’

‘উচিৎ ছিল হয়তো। মৃত মানুষের কাছে প্রাপ্ত জ্ঞানে কোন খাদ থাকে না। যরিয়া ভেচেরনেয়ার মুখে শুনলাম, তুমি নাকি চেরনোবোগের সাথে চেকার্স খেলেছ?’

‘হ্যাঁ। আমার মাথায় একবার আঘাত করার সুযোগ জিতে নিয়েছে ও।’

‘আগেরকার দিনে মানুষ কী করত জানো? বলির জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিকে নিয়ে যেত অনেক উঁচু কোন স্থানে। তারপর তার মাথার পেছন দিকটা পাথর দিয়ে গুঁড়িয়ে দিত। সব করত চেরনোবোগের জন্য।’

চকিতে পেছনে তাকাল শ্যাডো! নাহ, ছাদে ওরা ছাড়া আর কেউ নেই!

হাসল যরিয়া পলুনোচনেয়া। 'আরে বোকা, ও এখানে নেই। তুমিও তো এক দান জিতেছ। সবকিছু শেষ না হওয়া পর্যন্ত চেরনোবোগ কিছু করবে বলে মনে হয় না। আর তাছাড়া, ও যা করার তা জানিয়ে-শুনিয়েই করবে। ঠিক গরুগুলোর মতো। নইলে আর খুন করে লাভ কী?'

'আমার মনে হচ্ছে,' শ্যাডো বলল ওকে। 'আমি এখন এক দুনিয়ায় এসে উপস্থিত হয়েছি, যেখানে সবকিছু চলে তার নিজের নিয়মে, নিজের যুক্তিতে। স্বপ্নের মতো বলা যায়, ওখানকার নিয়ম আমাদের দৈনন্দিন দুনিয়ার সাথে মেলে না। কিন্তু সেই নিয়ম নিয়ে প্রশ্নও তোলা যায় না। বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ,' বলে ওর হাত ধরল মেয়েটা। একেবারে বরফের মতো ঠান্ডা। 'তোমাকে বিশেষ প্রতিরক্ষা দেয়া হয়েছিল। অথচ সেটা বিলিয়ে দিয়েছ! আমি তোমাকে এখন যে প্রতিরক্ষা দেব, তা ওটার তুলনায় দুর্বল। হাজার হলেও পিতার দেয়া প্রতিরক্ষা তো আর কন্যা দিতে পারবে না। তবে একেবারে ফেলনাও হবে না তা।'

'এজন্য তোমার সাথে লড়তে হবে? নাকি চেকার্স খেলতে হবে?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'কিছুই করতে হবে না, এমনকি একটা চুমু পর্যন্ত দিতে হবে না। শুধু আমার কাছ থেকে চাঁদটাকে নিয়ে নিলেই চলবে।'

'মানে?'

'চাঁদটাকে নিয়ে নাও।'

'আমি বুঝতে পারছি না।'

'দেখাচ্ছি, দাঁড়াও।' বলল যরিয়া পলুনোচনেয়া, বাঁ হাতটাকে তুলে এমনভাবে ধরল যেন বৃদ্ধাঙ্গুলি আর তর্জনীর ফাঁকে চাঁদটাকে দেখা যায়। তারপর...আলতো আয়াসে তুলে নিল চন্দ্রকে! মনে হলো যেন আকাশ থেকে তুলে এনেছে! তবে শ্যাডো পরক্ষণেই দেখতে পেল, নাহ। জায়গা মতোই আছে ওটা। যরিয়া হাত খুলতে দেখা গেল, একটা রূপালি ডলার ওর দুই আঙুলের ফাঁকে শোভা পাচ্ছে!

'দারুণ একটা ভেলকি দেখালে।' বলল শ্যাডো। 'কীভাবে করেছ, তা বুঝতেই পারিনি।'

'ভেলকি দেখাইনি।' বলল মেয়েটা। 'তুলে এনেছি, তোমার জন্য, তোমাকে নিরাপদ রাখার জন্য...এই নাও। এটা কাউকে দিও না।'

পয়সাটা শ্যাডোর হাতে দিয়ে, হাত মুড়ে দিল যরিয়া। ঠান্ডা একটা স্পর্শ পেল ও। পরক্ষণেই সামনে ঝুঁকে এলো যরিয়া পলুনোচনেয়া, আঙুল দিয়ে শ্যাডোর চোখ বন্ধ করে একবার চোখের পাতার উপর চুমু খেল।

ঘুম থেকে উঠে শ্যাডো দেখে, সব জামা-কাপড় পরে বিছানায় শুয়ে আছে! সূর্যালোকের সরু একটা রশ্মি আসছে জানালা দিয়ে। সেই আলোতে নাচছে ধুলো।

বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে চলে গেল সে, দিনের আলোতে ঘরটাকে আরও ক্ষুদ্র দেখাচ্ছে।

যে জিনিসটা গতরাত থেকে ওকে অস্বস্তিতে ভোগাচ্ছিল, এবার দেখতে পেল সেটা। জানালার বাইরে কোন ফায়ার-এস্কেপ নেই! নেই কোন ব্যালকনি, কোন ধাতব সিঁড়ি!

তবে হাতে এখনও ধরে আছে একটা উজ্জ্বল, ১৯২২ সালের রূপালী লিবার্টির চেহারা ছাপা ডলারের কয়েন! যেন এই মাত্র ওটাকে বের করা হয়েছে টাকশাল থেকে!

'ঘুম ভেঙেছে দেখছি,' দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে বললেন ওয়েনসডে। 'ভালো, ভালো। কফি লাগবে? লাগলে খেয়ে নাও। এরপর আমরা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে বেরোব।'

আমেরিকায় আগমন
১৭২১

আমেরিকার ইতিহাস পড়ার সময় যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে তা হলো, মি. **আইবিস তার চামড়ায় বাঁধানো ডায়রিতে লিখলেন।** এই ইতিহাসের পুরোটাই কাল্পনিক। বাচ্চাদের জন্য আর যারা খুব অল্পেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, তাদের জন্য খুব সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সবটা। লেখা হয়েছে দারুণ দক্ষতার সাথে, **কলমটা দোয়াতে চুবিয়ে নেয়ার ফাঁকে মনের ভাষা গুছিয়ে নিলেন তিনি।** তবে আমেরিকার জন্ম হয়েছে অভিবাসীদের জন্য। স্বাধীনতার খোঁজে তারা এসেছিল এখানে। আস্তে আস্তে ভরিয়ে তুলেছে ফাঁকা এই দেশটাকে।

সত্যিকার অর্থে আমেরিকান কলোনিগুলো ছিল বাকিদের জন্য একটা আস্তাকুঁড়। সেখানে সবাই ফেলে দিতে সমাজের যেসব সদস্যকে ভুলে যাওয়া উচিৎ, তাদের। এমনও একদিন ছিল, যখন আড়া পেনি চুরির অপরাধে লন্ডনের গাছে ফাঁসিতে ঝুলতে হতো চোরকে। সেসময় আমেরিকা হয়ে গিয়েছিল ক্ষমা পাবার, আরেকবার নতুন করে সব কিছু শুরু করতে পারার সমার্থক। তবে তার জন্য একটা ভয়ানক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হতো সবাইকে—দ্বীপান্তর। এই পদ্ধতি এতই ভয়াবহ ছিল যে অনেকে তার চাইতে গাছের ডাল থেকে ঝুলে পড়াটাকেই উত্তম বলে মনে করত। কাউকে সাজা হিসেবে দেয়া হতো পাঁচ বছরের দ্বীপান্তর, কাউকে দশ বছরের... আবার কাউকে সারা জীবনের জন্য।

অপরাধীকে বিক্রি করে দেয়া হতো কোন একজন ক্যাপ্টেনের কাছে। জাহাজে করে সে ক্রীতদাস বা দাসীকে নিয়ে যেত কলোনিতে অথবা ওয়েস্ট ইন্ডিজে। দাসবাহী জাহাজগুলো সাধারণত হতো চরম অস্বাস্থ্যকর। যাই হোক, কলোনিতে পৌঁছে ক্যাপ্টেন তাদেরকে বেঁচে দিত। নতুন মালিক রক্ত পানি করা পরিশ্রম করিয়ে তুলে নিত তার বিনিয়োগ। যতদিনের সাজা, ততদিন কাজ করতে হতো সেই ক্রীতদাসকে। তবে অন্তত তাকে ইংল্যান্ডের জেলে পচে মরতে হতো না (তখন জেলে কয়েদ অপরাধীদের তিনটি ভাগ্যের একটি বরণ করে নিতে হতো—হয় মুক্তি পেত, নয়তো দ্বীপান্তর আর নয়তো মৃত্যুদণ্ড। নির্দিষ্ট একটা সময় জেল খেটে মুক্তি পাবে, সে উপায় ছিল না)। শাস্তির সময় শেষ হবার পর, সেই অপরাধীরা হয়ে যেত পাখির মতোই মুক্ত। অবশ্য চাইলে কোন ক্যাপ্টেনকে ঘুষ-টুষ দিয়ে ফিরেও আসা যেত ইংল্যান্ডে। অনেকে

আসতও। কিন্তু যদি কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়ত, তাহলে আর দ্বিতীয়বার কিছু না ভেবে তাকে ঝুলিয়ে দেয়া হতো ফাঁসিতে।

এসি ট্রেগোয়ানের গল্পটাই ধরা যাক, ক্লজিট থেকে কালির একটা বোতল এনে দোয়াতে ভরলেন মি. আইবিস। তারপর আবার শুরু করলেন লেখা। কর্নওয়ালের একটা ছোট্ট গ্রামে জন্মেছিল মেয়েটা। ইংল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত গ্রামটায় অনেক পুরুষ ধরে বাস করে ওদের পরিবার। মেয়েটার বাবা ছিল জেলে, গুজব ছিল—লোকটা খুব একটা ভালো মানুষ ছিল না। ঝড়ের রাতে সে পাহাড়ের চুড়ায় ঝুলিয়ে দিত একটা ল্যাম্প। উদ্দেশ্য ছিল—ওটা দেখে যেসব জাহাজ কাছাকাছি এসে ভেঙ্গে পড়বে, সেগুলো লুটপাট করা। এসি'র মা ছিল রাঁধুনি। বারো বছর বয়সে মায়ের সাথেই গ্রামের জমিদারের বাড়িতে কাজ করতে শুরু করে সে। ওর কাজ ছিল বাসন-কোসন ধোওয়া। একেবারে চিকন-চাকন মেয়ে ছিল এসি, আয়ত বাদামী চোখ আর গাঢ় বাদামী চুল ছিল মাথা ভরা। আলসেই বলা যেত ওকে, প্রায়শই কাজ ফেলে রূপকথার গল্প শুনতে দেখ যেত-পিস্কি আর স্প্রিগানদের গল্প, কালো কুকুর আর পানির সীল-মহিলার গল্প। কে বলছে, তাতে কিছু যেত-আসত না ওর, শুনতে পারলেই হলো। জমিদার অবশ্য এসব গল্প শুনে হাসতেন, তবে রাঁধুনিরা ঠিক দুধের সর-ভর্তি একটা পিরিচ রাতের বেলা রান্নাঘরের দরজার বাইরে রেখে দিত...পিস্কিদের জন্য।

আস্তে আস্তে পার হয়ে গেল অনেকগুলো বছর, এখন আর এসি সেই ছোট্ট মেয়েটি নেই। সবুজ সমুদ্রের মতোই আকর্ষণীয়ভাবে বেড়ে উঠেছে ওর দেহ। চোখের চাহনি আর চুলের দুলুনি কীসের যেন ইঙ্গিত দেয়। বার্থোলোমিউ, জমিদারের আঠারো বছর বয়সী ছেলেটা সেই ইঙ্গিতে মজে গেল। তবুও ঝুঁকি নিল না এসি। জঙ্গলের পাশে একটা পাথর খুঁজে বের করল ও। একটা কাপড়ে মুড়িয়ে সেখানে রাখল ছেলেটার আধ-খাওয়া এক টুকরো রুটি আর নিজের এক গোছা চুল। পরেরদিনই বার্থেলোমিউ নিজে থেকে এসে কথা বলল ওর সাথে, নীল চোখের চাহনিতে অমোঘ আকর্ষণ।

ওই নীল চোখে ডুব দিল এসি।

কিছুদিনের মাঝেই অক্সফোর্ডে পড়তে গেল বার্থোলোমিউ। এসির গর্ভাবস্থা যখন সবার সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেয়া হলো ওকে। তবে বাচ্চাটা জন্মাল মৃত হয়ে। এদিকে ওর মায়ের অনেক অনুরোধে মন গলল জমিদারের স্ত্রীর। তার চাপাচাপিতেই এসিকে আবার ধোলাই ঘরে কাজ করার অনুমতি দিলেন জমিদার।

তবে বার্থেলোমিউ-এর প্রতি মেয়েটার যে ভালোবাসা ছিল, সেটা ততদিনে পরিণত হয়েছে জমিদার পরিবারের প্রতি ঘৃণায়! এক বছরের মাঝে পাশের গ্রামের এক মন্দ লোককে সঙ্গী হিসেবে বেছে নিল সে, লোকটার নাম ছিল জোসাইয়াহ হর্নার। এক রাতে, যখন জমিদার পরিবারের সবাই ঘুমাচ্ছে, উঠে গিয়ে সদর দরজা খুলে দিল এসি। প্রেমিক বাইরেই অপেক্ষা করছিল, ইচ্ছামতো চুরি করে পালিয়ে গেল লোকটা।

সন্দেহ এসির উপর পড়তে দেরী হলো না। কেননা ভেতর থেকে কেউ দরজা না খুললে, বাইরে থেকে চোর ঢুকতে পারার প্রশ্নই ওঠে না। এদিকে জমিদার-পত্নী নিশ্চিত, শোবার সময় তিনি দরজা আটকিয়ে ছিলেন। আর তাছাড়া, জমিদারের রূপার থালা-বাসন কোথায় থাকে, তা জানতে হলে চোরের দলে ভেতরের কাউকে না কাউকে থাকতেই হবে। এমনকি পয়সা-কাড়ি আর সই করা ধারের কাগজ গুলোও বাদ দেয়নি চোর। তবে এসির মুখ থেকে স্বীকারোক্তি বের করা গেল না। সমস্যা হলো জোসাইয়াহ হর্নার ধরা পড়ার পর। আদালতে দাঁড়াতে হলো মেয়েটাকে।

হর্নারের কপাল খারাপ। ফাঁসিতে ঝোলানো ছিল তখনকার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, তখন জন্মেছিল বেচারা। তবে বিচারক এসির প্রতি নরম হলেন। বয়স আর বাদামী চুলের কথা বিবেচনা করে সাত বছরের দ্বীপান্তরের সাজা দেয়া হলো ওকে। ক্যাপ্টেন ক্লার্ক নামের একজনের জাহাজ, নেপচুনে করে নিয়ে যাওয়া হবে মেয়েটাকে। পথে সুদর্শন ক্যাপ্টেনের সাথে এক চুক্তি হলো এসির। ঠিক হলো, দাসদের বিক্রি করে ক্যাপ্টেন স্ত্রী হিসেবে এসিকে এনে তুলবে তার মায়ের বাড়িতে। ওখানে কেউ মেয়েটাকে চেনে না, তাই কোন সমস্যাও হবে না। ফিরতি পথটা দুই কপোত-কপোতী কাটাল প্রেম করে।

লন্ডনে পৌঁছাবার পর, এসিকে নিয়ে মায়ের ওখানে উঠল ক্যাপ্টেন ক্লার্ক। ভদ্রমহিলাও ওকে বরণ করে নিলেন নিজের পুত্রবধূ হিসেবে। আট সপ্তাহ পর, আবার পানিতে ভাসার সময় এলো নেপচুনের। পোতাশ্রয়ে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন-স্বামীকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল যুবতী...সুন্দরী স্ত্রী। শাশুড়ির বাড়িতে ফিরে এসে দেখল, মহিলা ঘরে নেই। তাই সিল্কের এক গাদা কাপড়, কিছু সোনার পয়সা আর একটা রূপার পট নিয়ে 'বিদায়' নিল এসি।

পরবর্তী দুই বছরে দক্ষ এক চোরে পরিণত হলো এসি। সবসময় চওড়া একটা স্কার্ট পরত ও। সেটার আড়ালে সিল্ক, লেস এসব লুকাতে কোন কষ্টই হতো না। জীবনকে উপভোগ করল সে প্রান-ভরে। আর

এভাবে অপরাধ করেও ধরা না পড়ার জন্য প্রতি রাতে কৃতজ্ঞতা জানাত ছোট বেলায় গল্প শোনা সেই সব পরীদের। এসি ধরেই নিয়েছিল, পিক্সিদের হাত এই লন্ডনেও ওকে রক্ষা করছে। রাতে এক পাত্র দুধ সে রেখে দিত জানালার কার্নিশে, কোন দিন ভুল হতো না। বন্ধুরা এসব দেখে হাসাহাসি করত। তবে শেষ হাসি হাসত এসিই। ওরা বসন্তে আক্রান্ত হতো, অথবা ধরা পড়ে ঝুলত ফাঁসিতে। কিন্তু এসি না কখনও ধরা পড়েছে, আর না অসুস্থ হতে হয়েছে ওকে।

বিশতম জন্মদিনের এক বছর আগের কথা। ভাগ্য মুখ ফিরিয়ে নিল ওর থেকে। ফ্লিট স্ট্রিটের একটা হোটেল বসে ছিল এসি, এমন সময় এক যুবক প্রবেশ করল ঘরে। তারচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের কথা, ফায়ারপ্লেসের ঠিক পাশে গিয়ে বসল সে। ওহ! একদম আনকোরা মাল মনে হচ্ছে, আপন মনে ভাবল এসি। নতুন শিকার পেয়েছে ধরে নিয়ে বসল ছেলেটার পাশে। এক হাত ছেলেটার হাঁটুতে বোলাতে বোলাতে, অন্য হাত ঢুকিয়ে দিল কোটের পকেটে। ঠিক সেই সময় ফিরে তাকাল ছেলেটি, নীল একজোড়া চোখের মাঝে যেন ডুবে গেল এসি।

যেমন ডুবেছিল সেই বেশ কটা বছর আগে!

বার্থোলোমিউ-এর মুখে শুনতে পেল ও নিজের নাম।

পরদিনই নিউগেট জেলে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে, অভিযোগ আনা হলো দ্বীপান্তর থেকে ফিরে আসার। অপরাধ প্রমাণিত হলো তার। কিন্তু এসি দাবী জানাল, সে গর্ভবতী। এসব দাবী প্রমাণ বা খারিজ করার জন্য নিয়োজিত মহিলারাও মানতে বাধ্য হলো যে আসলেই তাই-এসি সন্তান-সম্ভবা। তবে এই বাচ্চার বাবা কে, তা বলতে অস্বীকৃতি জানাল মেয়েটা।

মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রেহাই পেল মেয়েটা, তবে আজীবনের জন্য দ্বীপান্তরের সাজা শোনাল হলো ওকে।

এবার যে জাহাজটায় ওকে তোলা হলো, তার নাম সী-মেইডেন। দ্বীপান্তরের সাজা পাওয়া দুইশ কয়েদি ছিল সেই জাহাজে। এমনভাবে তাদেরকে ভরা হয়েছিল হোল্ডে, যেন ওরা আসলে শুয়োর, বিক্রি করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জ্বর আর ডায়রিয়ায় প্রায় প্রতিদিন মারা যেত কেউ না কেউ। বসার জায়গা মেলাও মুশকিল, তাই শোবার তো প্রশ্নই ওঠে না। হোল্ডের পেছন দিকে এক মহিলা বাচ্চা প্রসব করতে গিয়ে মারা গেল। কয়েদিরা সেই লাশ আর নবজাতককে ঠেলে ফেলে দিল পোর্টহোল দিয়ে! এসির তখন আট মাস চলে। ওর যে গর্ভপাত হয়নি, সেটাই এক আশ্চর্যের ব্যাপার।

পরবর্তী জীবনটায় বহুবার দুঃস্বপ্নে এই হোল্ডে অবস্থানের দিনগুলো হানা দিয়েছে ওকে। রাতে চিৎকার করতে করতে ঘুম থেকে জেগেছে সে, মুখে পেয়েছে ওই জায়গার স্বাদ।

সী-মেইডেন নোঙর ফেলত ভার্জিনিয়ার নরফোকে। এসিকে কিনে নিল একজন আপাত গরীব কৃষক। জন রিচার্ডসন নামের লোকটা তামাক চাষ করত। বাচ্চা জন্ম দিতে গিয়ে এই এক সপ্তাহ আগে মারা গিয়েছে তার স্ত্রী। তাই একজন দাই-মার খুব দরকার, সেই সাথে যদি ঘরের কাজ করার মতো কাউকে পাওয়া যায় তো আরও ভালো।

ছেলে অ্যান্থনিকে নিয়ে তাই রিচার্ডসনের ঘরে উঠে এলো এসি। সবাইকে বলল, ছেলের নাম রেখেছে তার বাবার নামে। কে জানে, হয়তো আসলেই কোন এক অ্যান্থনিকে শয্যা-সঙ্গী বানিয়েছিল ও। অচিরেই দেখা গেল, এসির এক স্তন থেকে দুধ খাচ্ছে অ্যান্থনি...আর অন্য স্তন থেকে তামাক চাষির কন্যা ফাইলিডা রিচার্ডসন। প্রথমে মেয়েটা খেত বলে হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে বেড়ে উঠল সে। আর অ্যান্থনি দুর্বল হয়ে, অপুষ্টিতে বেঁকে গেল ওর বাম পা।

এসির দুধের পাশাপাশি, ওর বলা গল্প শুনেও বেড়ে উঠল বাচ্চারা। মাইনে বাস করা নকারদের গল্প শোনাল ও, বাদ দিল না দুষ্ট বুকাদের গল্পও। পিক্সিদের কাহিনি তো পারলে প্রতিদিন শোনায়, যাদের জন্য সব সময় প্রথম মাছটা, প্রথম রুটিটা তোলা থাকত। আপেল গাছ-মানবদের গল্পও বাদ দিল না, মন চাইলে মানুষের সাথে কথা বলত তারা। আর খেতে সাইডার ফলাতে চাইলে তাদেরকে তুষ্ট করতেই হতো চাষিদের। কার্নিশ টানে ওদেরকে গান গেয়ে শোনা বিপদজনক গাছদের গল্প–

এলম হলো গম্ভীর,
ঘৃণা ভরা ওক গাছ;
ধরে নেবে উইলো,
যদি বাইরে করো রাত।

এই সব গল্পদারুণ আগ্রহের সাথে শোনাত এসি, বাচ্চারও শুনত সমান আগ্রহ নিয়ে।

ছোট খামার থেকে আস্তে আস্তে বড় হতে শুরু করল ওদের ফার্মটা। প্রতি রাতে এসি ট্রেগোয়ান পিক্সিদের জন্য পাত্র-ভর্তি দুধ রেখে দিত পেছনের দরজায়। প্রায় আট মাস পর, এক রাতে এসির শোবার ঘরের সামনে এসে উপস্থিত হলো জন রিচার্ডসন। যা চাইল, তা কেবল কোন রমণীর পক্ষেই এক পুরুষকে দেয়া সম্ভব। মেয়েটা তাকে জানাল,

সম্মানিত একজন পুরুষের কাছ থেকে এমন প্রস্তাব একদম আশা করেনি ও। হাজার হলেও সে একজন বিধবা...সাজাপ্রাপ্ত মহিলা। তাকে এমন প্রস্তাব দেয়া অত্যাচার করারই নামান্তর। মেয়েটার সজল চোখ দেখে মাফ চাইল রিচার্ডসন। সে রাতেই, সেই করিডরে হাঁটু গেঁড়ে বসল এসির সামনে...প্রস্তাব দিল বিয়ের। সানন্দে রাজি হলো এসি, তবে বিয়ের আগে একরাতের জন্যও শয্যা-সঙ্গিনী হলো না রিচার্ডসনের। বিয়ের পর চিলেকোঠার ছোট ঘরটি ছেড়ে এসে উঠল বড় মাস্টাররুমে। যে-ই দেখত ওকে, সে-ই বলত-রিচার্ডসন দারুণ সৌভাগ্যবান!

এক বছরের মাথায় আরেক ছেলে সন্তান জন্ম নিল ওদের ঘরে। পিতার নামানুসারে নবজাতকের নাম রাখা হলো জন।

প্রতি রবিবার চার্চে যেত তিন বাচ্চা, শুনত ভ্রাম্যমাণ যাজকের বাণী। এরপর যেত লেখাপড়া শিখতে। এসবে আপত্তি নেই এসির; তবে পিক্সিদের রহস্য যেন ভুলে না যায় ওরা, সে ব্যাপারে কড়া নজর রাখত। বাচ্চারা যখন স্কুলে যাবার জন্য বের হতো, সবার এক পকেটে কিছুটা লবণ আর অন্য পকেটে রুটি দিয়ে দেত ও। জীবন আর পৃথিবীর প্রাচীন এই দুই নিদর্শন নিশ্চিত করবে বাচ্চাদের নিরাপদে ঘরে ফেরা।

ভার্জিনিয়ার মনোরম পাহাড়ি এলাকায় আস্তে আস্তে বেড়ে উঠল বাচ্চারা, শক্তিশালী আর লম্বা হয়ে (কেবল অ্যাপ্রিন বাদে। বড় হয়েও কাটেনি ওর দুর্বলতা, প্রায়শই অসুস্থ থাকত বেচারা)। আনন্দে সময় কাটতে লাগল রিচার্ডসন পরিবারের। স্বামীকে সত্যি সত্যি দারুণ ভালোবাসত এসি। বিয়ের প্রায় এক দশক পর আচমকা জন রিচার্ডসনের এমন তীব্র দাঁতে ব্যথা শুরু হলো যে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল চাষি। কাছের শহরে গিয়ে তুলে ফেলা হলো দাঁতটাকে, কিন্তু ততদিনে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। রক্ত দুষিত হয়ে মারা গেল বেচারা। তাকে কবর দেয়া হলো একটা উইলো গাছের নিচে।

রিচার্ডসনের দুই সন্তান বড় হবার আগ পর্যন্ত তাই খামার দেখা-শোনার ভার এসে চাপল সদ্য বিধবা এসির উপর। দক্ষতার সাথে সবকিছু সামলে নিল সে, দাস আর কেনা অপরাধীদের পরিচালনা করতে কোন কষ্ট পোহাতে হলো না! প্রতি বছর বেড়েই চলল তামাকের ফলন। আর প্রতি বছর নিউ ইয়ার'স ইভের সময় আপেল গাছের নিচে সাইডার ঢেলে গেল ও, ফলনের সময় সদ্য বানানো রুটি রাখল ক্ষেতে। প্রতিরাতে পাত্র ভর্তি দুধ দরজার বাইরে রেখে দিতেও ভুল করল না। নাম ছড়িয়ে পড়ল খামারের। সবাই জানত, রিচার্ডসনের বিধবা দাম রাখে বটে, কিন্তু মাল দেয় সেরা।

আরও দশ বছর পার হলো এভাবেই। কিন্তু তারপর এলো বাজে একটা বছর। ওর ছেলে অ্যান্থনি, খুন করে বসল জনিকে। ঝগড়ার সূত্রপাত হয়েছিল খামারের মালিকানা আর ফাইলিডার বিয়ে নিয়ে। অনেকে বলে, ইচ্ছা করে কাজটা করেনি অ্যান্থনি। আবার অনেকের মতই ভিন্ন। যাই হোক, পালিয়ে গেল ছেলেটা। দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে সন্তানকে তার পিতার পাশে কবর দিল এসি।

অনেকেই বলল, অ্যান্থনি বোস্টনে পাড়ি জমিয়েছে। আবার কেউ কেউ জানাল, ওকে দাক্ষিণে যেতে দেখেছে। তবে ছেলেটার মার ধারণা, ইংল্যান্ডের জাহাজে উঠেছে সে। হয়তো রাজা জর্জের হয়ে বিদ্রোহী স্কটদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য নাম লিখিয়েছে।

যাই হোক, দুই ছেলের কেউ নেই বলে ফাঁকা হয়ে গেল খামারটা। এদিকে ফাইলিডার মুখে হাসি নেই। সারাক্ষণ বিলাপ করে সে। সৎ মা যা-ই বলুক বা করুক না কেন, ক্ষণিকের জন্যও তা থামে না।

তবে দুঃখ যতোই গভীর হোক না কেন, খামার চালাতে একজন পুরুষ মানুষ বড় দরকার! তাই হ্যারি সোমসের সাথে বিয়ে হলো ফাইলিডার। ছেলেটা ছিল জাহাজের ছুতার। কিন্তু সাগরে কয়েকদিন ভেসেই তার সমুদ্র-ভ্রমণের সব শখ মিটে গিয়েছে। লিংকনশায়ারের যে খামারে ও বড় হয়েছে, সে রকম একটা খামারে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দিতে চায় এখন। রিচার্ডসনদের খামারের সাথে ওটার খুব বেশি মিল না থাকলেও, যা পেয়েছে তাতেই খুশি ছেলেটা। এই দম্পতির পাঁচজন সন্তান হলো, তবে বেঁচে রইল তাদের মাঝে মোট তিনজন।

বিধবা রিচার্ডসনের খুব মনে পড়ত দুই পুত্রের কথা, স্বামীর অভাবটাও খুব করে বোধ করত সে। এখন অবশ্য অনেক ভেবেও তার সম্পর্কে খুব বেশি কিছু মনে করতে পারে না ও, শুধু এটুকুই যে লোকটা ওর খুব দেখভাল করত। ফাইলিডার সন্তানেরা গল্প শুনতে আসত এসির কাছে। মুরের কালো কুকুর, আপেল বৃক্ষ-মানব আর হাড়-ঝকমকির গল্প শোনাত ও। তবে বাচ্চারা ওসব শুনতে চাইত না। তারা চাইত শুধু জ্যাকের গল্প শুনতে। কীভাবে জ্যাক সিমের বিচি পেল, কীভাবে হত্যা করল দৈত্যকে-এসব। বাচ্চাদেরকে খুব ভালোবাসত এসি, যেন এরা ওর নিজেরই বংশধর।

কোন এক বছরের মে মাসের কথা। রান্নাঘরের পেছনে অবস্থিত বাগানে চেয়ার নিয়ে বসল ও। ভার্জিনিয়ার এই গরমের মাঝেও কেমন করে যেন ঠান্ডা চুপিচুপি প্রবেশ করেছে ওর দেহে। হাড়-মাংস জমিয়ে দিয়েছে। একটু গরম হতে পারলে মন্দ হয় না, সেই সাথে নিয়ে এসেছে পাত্র ভর্তি মটরশুঁটি।

রোদ পোহাতে পোহাতে আর মটরশুঁটি চাবাতে চাবাতে বৃদ্ধা মিসেস রিচার্ডসন ভাবল, একবার কর্নওয়ালে ফিরে যেতে পারলে মন্দ হয় না। ছোট বেলায় কীভাবে পিতার জাহাজ ফেরার অপেক্ষায় বসে রইল পাহাড়ের চূড়ায়, সেই স্মৃতি ভিড় করল ওর মনে। সেই সাথে মনে পড়ল যেন আরেক জীবনের কথা। যে জীবনে চুরি করত ও, সবার অলক্ষ্যে তুলে নিত দোকান থেকে সিল্কের কাপড় আর মানুষের পকেট থেকে ওয়ালেট। নিউগেটের ওয়ার্ডেনের কথাও মনে পড়ল ওর। লোকটা জানিয়েছিল, ওর মামলা আদালতে দাঁড়াতে এখনও বারো সপ্তাহ বাকি আছে। ফাঁসি থেকে বাঁচার উপায় একটাই, এই সময়ের মাঝে গর্ভ-ধারণ করা। লোকটার কর্কশ কণ্ঠে করা ওর রূপের...ওর দেহের প্রশংসা এখনও কানে বাজে এসির। ওয়ার্ডেনের প্রতি তীব্র ঘৃণা নিয়ে দিনের পর দিন স্কার্ট উঠিয়েছে ও। মৃত্যুকে ফাঁকি দেবার জন্য নিজের ভেতরে ধারণ করেছে আরেকটা জীবন।

'এসি ট্রেগোয়ান?' অপরিচিত এক লোকের কথায় স্মৃতির জাল যেন ভেঙ্গে গেল।

মুখ তুলে চাইল ও, হাত দিয়ে সূর্যের আলো বাঁধা দেবার প্রয়াস পেল। 'আমি কি আপনাকে চিনি?' জানতে চাইল এসি। লোকটার আসা একদম টের পায়নি।

সবুজ পোশাকে আপাদ-মস্তক ঘেরা যেন লোকটা-সবুজ প্যান্ট, সবুজ জ্যাকেট আর সবার উপরে সবুজ কোট। চুলগুলো গাজরের মতো লাল, হাসিটা একটু বাঁকানো। লোকটার মাঝে এমন কিছু আছে, যা যে কারও মন ভালো করে দেয়। আবার এমন কিছুও আছে যা চিৎকার করে জানাচ্ছে-এই লোকের সাথে ঝামেলায় যেও না। 'তা বলতে পারো।' উত্তর দিল সে।

চোখ কুঁচকে লোকটার দিকে তাকাল এসি, মনে মনে তার পরিচয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। বয়সে ওর নাতী-নাতনীদের সমান হবে। কিন্তু ডেকেছে আবার প্রায় ভুলে যাওয়া নামটা ধরে। কণ্ঠে কেমন যেন একটা টান, যে টানটা শুনেছে সেই ছোট বেলায়। কর্নওয়ালের সৈকত আর পাথারের ফাঁকে ফাঁকে।

'তুমি কর্নিশ নাকি?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ,' বলল লাল চুলো লোকটা। 'মানে ছিলাম। এখন আমি নতুন দুনিয়ার অধিবাসী। যেখানে কেউ একজন সৎ লোকের জন্য এক পাত্র এল বা এক গ্লাস দুধ পরিবেশন করে না। যেখানে ফসল তোলার সময় কেউ ক্ষেতে রেখে আসে না এক টুকরা রুটি।'

'আমি মনে হয় তোমাকে চিনতে পেরেছি,' জানাল এসি। 'যদি ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে আমার কোন ঝগড়া নেই তোমার সাথে।' কাইলিডার কণ্ঠ শুনতে পেল ও, পরিচারিকাকে বকছে।

'আমারও তোমার সাথে কোন বিবাদ নেই।' একটু মন খারাপ করা কণ্ঠে বলল লোকটা। 'যদিও তুমি আর তোমার মতো কয়েকজন আমাকে নিয়ে এসেছ এখানে। এই জায়গায় নেই কোন জাদু; পিক্সি বা তাদের মতো কারও কোন আশ্রয় নেই।'

'আমার দিকে সব সময় নজর ছিল তোমার।' বলল এসি।

'কখনও ভালো করেছি, কখনও মন্দ। আমরা আসলে বাতাসের মতো, দুই দিকেই যার গমন।'

নড করল এসি।

'আমার হাত ধরবে, এসি ট্রেগোয়ান?' বলে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল লাল-চুলো। বয়স হয়েছে বৃদ্ধার, চোখেও কম দেখে। কিন্তু হাতের কমলা পশম দেখতে ভুল হলো না এসির। বিকালের আলোতে সোনালী দেখাচ্ছে। ঠোঁট কামড়ে ধরল ও, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজের হাত রাখল হাতটায়।

এসি ট্রেগোয়ানের লাশ যখন আবিষ্কৃত হলো, তখনও গরম রয়েছে দেহটা।

তবে প্রাণবায়ু উড়ে গিয়েছে অনেক আগেই।

অথচঅর্ধেক মরটশুঁটি রয়ে গিয়েছে পাত্রে।

অধ্যায় পাঁচ

মেয়েটার জীবন যেন এক প্রস্ফুটিত ফুল,
মৃত্যু ছাড়েনি পিছু, করবে নাকো ভুল;
সে নিজ দেহে বন্দী এক প্রাণ,
স্বর্গে বসে মৃত্যু খেলা করে নিয়ে জান।

–ডব্লিউ. ই. হেনলিঃ ম্যাডামস লাইফ'স আ পিস ইন ব্লুম

একমাত্র যরিয়া উত্রেনেয়া জেগে ছিল শনিবার সকালে। শ্যাডোদেরকেও বিদায় জানাল শুধু সে-ই। তবে তার আগে ওয়েনসডের কাছ থেকে গুণে গুণে পঁয়তাল্লিশ ডলার নিতে ভুল করল না। সকালের আলোতে পুতুলের মতো লাগছে তাকে, বয়স্ক চেহারাটায় মেকআপ দেয়ার জন্যই হয়তো। সোনালী চুলগুলো মাথার উপর বেণী করা।

মহিলার হাতে চুমু খেলেন ওয়েনসডে। 'আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ,' বললেন তিনি। 'আশা করি তুমি আর তোমার বোনেরা আকাশকে বরাবরের মতো উজ্জ্বল রাখবে।'

'তুমি লোকটা একদম ভালো না,' বলল মহিলা। তারপর আচমকা জড়িয়ে ধরল তাকে। 'সাবধানে থেকো। তোমাকে চিরতরে হারাতে চাই না। কষ্ট পাব।'

'আমিও পাব।'

শ্যাডোর সাথে হাত মেলাল যরিয়া। 'যরিয়া পলুনোচনেয়া তোমার খুব প্রশংসা করল।'

'ডিনারের জন্য ধন্যবাদ।' বলল শ্যাডো।

এক ভ্রূ উঁচু করে ওর দিকে তাকাল উত্রেনেয়া। 'তোমার ভালো লেগেছে? তাহলে তো আবার আসতেই হবে বেড়াতে।'

ওয়েনসডেকে সাথে নিয়ে শ্যাডো নিচে নামল। জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকাল সে, রূপালী লিবার্টির চেহারা মুদ্রিত ডলারটা এখনও ঠান্ডা মনে হচ্ছে। এর আগে এমন ভারী আর বড় পয়সা দেখেনি ও।

'আহ, লেডি লিবার্টি,' ওকে পয়সা নিয়ে খেলতে দেখে বললেন ওয়েনসডে। 'দারুণ, তাই না?'

উত্তর দিল না শ্যাডো, পকেটে ঢুকিয়ে রাখল পয়সাটাকে।

'লেডি লিবার্টি,' বলেই চলছেন ওয়েনসডে। 'জানো, আমেরিকাবাসীর পছন্দের আরও অনেক দেবতার মতোই, তিনিও বিদেশী? এই মহিলার জন্ম ফ্রান্সে। তবে আমেরিকানদের মানসিকতার কথা চিন্তা করে ফ্রেঞ্চরা মহিলার বিশাল দুধ দুটো ঢেকে-ঢুকে পাঠিয়েছে।' সিঁড়ির একেবারে নিচের ধাপে ব্যবহৃত কনডমের প্যাকেট দেখে নাক কুঁচকালেন তিনি। 'ওটার উপর পা পড়লে যে কেউ পিছলা খাবে...এমনকি ঘাড়ও ভেঙ্গে যেতে পারে।' বিড় বিড় করে যেন নিজেকেই বললেন তিনি। এরপর দরজা খুলে পা রাখলেন সূর্যালোকে। 'লিবার্টি হচ্ছে এমন এক মহিলা, যার সাথে শুতে হয় লাশের পাহাড়ের উপরে।'

'মানে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল শ্যাডো।

'এক ফ্রেঞ্চ লোকের মন্তব্য শোনালাম তোমাকে।' বললেন ওয়েনসডে। 'নিউইয়র্কের পোতাশ্রয়ে যে মূর্তিটা আছে, তার ক্ষেত্রেও খাটে কথাটা। ওই মহিলা এমন একজন, যে পিঠের নিচে শাস্তিদানের যন্ত্রের স্পর্শ না পেলে শুতেই চায় না! হাতের মশাল যতই উঁচু করে ধরো না কেন প্রিয়, ইঁদুর ঠিক তোমার পোশাকের নিচে আশ্রয় নেয়। তোমার দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে এখনও ঝরে পড়ে রস।' দরজা খুলে শ্যাডোকে প্যাসেঞ্জার সিটে বসার ইঙ্গিত দিলেন তিনি।

'আমার তো তাকে বেশ সুদর্শনা বলে মনে হয়,' পয়সাটা চোখের কাছে এনে বলল শ্যাডো। লিবার্টির চেহারা ওকে যরিয়া পলুনোচনেয়ার কথা মনে করিয়ে দিল।

'ওটাই তো...' গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন ওয়েনসডে। '...পুরুষ মানুষের আজন্ম পাপ। নরম মাংসের পেছনে ছোটে তারা, অথচ ওই মাংস হাড়ের আবরণ ছাড়া আর কিছু না, পোকা-মাকড়ের খাদ্য। মেয়েদের সাথে রাত কাটানো আসলে উষ্ণ খাবারের সাথে গা-ঘষা মাত্র!'

ওয়েনসডেকে আগে এত কথা বলতে দেখেনি শ্যাডো। আমার নতুন বস, ভাবল সে, অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর হঠাত করেই হড়বড়িয়ে কথা বলা শুরু করে। 'আপনি আমেরিকান নন?'

'প্রকৃতপক্ষে,' বললেন ওয়েনসডে। 'কেউ-ই আমেরিকান নয়। সেটাই তো বলতে চাচ্ছি।' ঘড়ি দেখলেন তিনি। 'ব্যাঙ্ক বন্ধ হবার এখনও কয়েক ঘণ্টা দেরী আছে। ভালো কথা, চেরনোবোগের ব্যাপারটা বেশ ভালোভাবেই সামলেছ তুমি। আমি অবশ্য ওকে পটাতে পারতাম। কিন্তু এখন যেরকম আগ্রহ নিয়ে সে রাজি হয়েছে, তখন হতো না।'

'আগ্রহের কারণটা ভেবে দেখুন-এসব শেষ হলে ও আমাকে খুন করতে পারবে!'

'তেমনটা না-ও হতে পারে। নিজেই তো বললে, লোকটার বয়স হয়েছে। এক আঘাতে সে কাজ সারতে সক্ষম না-ও হতে পারে। কে জানে, হয়তো তুমি বাকি জীবনটা পঙ্গু হয়ে কাটিতে দেবে।'

চোখ তুলে লোকটার দিকে চাইল শ্যাডো।

একটা ব্যাঙ্কের পার্কিং-লটে গাড়ি ঢোকালেন ওয়েনসডে। 'এই ব্যাঙ্কে ডাকাতি করব আমি। এখনও কয়েক ঘণ্টা খোলা থাকবে এটা। চলো, ভেতরে গিয়ে হ্যালো বলে আসি।'

লোকটার ইঙ্গিত পেয়ে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও গাড়ি থেকে নামল শ্যাডো। ব্যাঙ্ক ডাকাতিটা বোকার মতো একটা কাজ হতে চলছে, আর তাই ক্যামেরায় নিজের চেহারা দেখাতে চায় না। কিন্তু কৌতূহল ওকে টেনে নিয়ে গেল ব্যাঙ্কের ভেতরে। নজর মেঝের দিকে রাখল সে, কিছুক্ষণ পরপর নাক চুলকাচ্ছে। যতটা সম্ভব চেহারা গোপন রাখা আরকি!

'টাকা জমা দেবার ফর্মগুলো কোথায়, ম্যাম?' এক মহিলা কর্মচারীর কাছে জানতে চাইলেন ওয়েনসডে।

'ওই যে, ওখানে।'

'অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর যদি রাতে, মানে ব্যাঙ্ক বন্ধ হবার পর জমা দিতে চাই, তাহলে কোন ফর্ম ব্যবহার করব?'

'ফর্ম একই।' ওয়েনসডের দিকে তাকিয়ে হাসল মেয়েটা। 'টাকা কোথায় জমা দিতে হবে তা জানো তো? সদর দরজার দিয়ে বের হয়েই বাঁয়ে, দেয়ালের সাথে লাগান আছে যন্ত্রটা।'

'ধন্যবাদ।'

বেশ কয়েকটা ফর্ম তুলে নিলেন ওয়েনসডে। এরপর মেয়েটার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

ব্যাঙ্কের পাশের ফুটপাতে একটু দাঁড়ালেন তিনি, দাড়ি চুলকাচ্ছেন। তারপর এটিএম মেশিন আর টাকা জমা দেবার যন্ত্রের পাশে দাড়িয়ে ভালো মতো দেখে নিলেন সবকিছু। শ্যাডোকে সাথে নিয়ে এরপর রাস্তা পার হয়ে চলে এলেন সুপারমার্কেটে। ওকে এক কাপ হট চকলেট কিনে দিয়ে নিজে নিলেন চকলেট ফাজ আইসক্রিম। ঢোকার পথেই একটা পে-ফোন রয়েছে, ওটার নিচে নানা ধরনের বিজ্ঞাপন সাঁটা বোর্ড। আরও একবার রাস্তা পার হলেন দুজন।

'আমাদের দরকার,' আচমকা বললেন ওয়েনসডে। 'তুষার। বিরক্তিকর, তীব্র তুষারপাত। এক কাজ করো, মনে মনে তুষারপাত ভাবতে থাকো।'

'হাহ?'

'ওই যে পশ্চিমে, মেঘ দেখতে পাচ্ছ? ওগুলোকে মানসিক শক্তি খাঁটিয়ে বড় আর কালো করে তোল। ভাবো, ধূসর আকাশে আর্কটিক থেকে আসা বাতাস বইছে। ভাবো, তুষার নামছে ওই মেঘগুলো থেকে।'

'তাতে এমন কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না।'

'বোকার মতো কথা বলো না। আর কিছু না হলেও, অন্তত তোমার মন তো ব্যস্ত থাকবে।' গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বললেন প্রৌঢ়। 'এবার কিনকোর ওখানে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি ভাবনা শুরু করো।'

তুষার, মনে মনে ভাবল শ্যাডো। প্যাসেঞ্জার সিটে বসে গরম চকলেট ভরা কাপে চুমুক দিচ্ছে থেকে থেকে। বড় বড়, পেঁজা তুলার মতো তুষার ঝরছে আকাশ থেকে। ধূসর আকাশে সাদা মেঘ, আলতো স্পর্শ করেই মিলিয়ে যাচ্ছে সেই তুষার। শীতের অনুভব ছড়িয়ে দিয়েই গলে যাচ্ছে। বারো ইঞ্চি পুরু তুষারে পুরো পৃথিবী যেন সেজেছে এক জাদুময়ী সাজে। দেখা যাচ্ছে সবই, কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সুন্দর...অসাধারণ সুন্দর...

ওয়েনসডের কথায় সম্বিত ফিরল ওর।

'শুনিনি।' বলল শ্যাডো।

'বললাম, এসে পরেছি। কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে?'

'তুষারের কথা ভাবছিলাম।'

কিনকোর দোকানে গিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে আনা জমা দেয়ার ফর্ম ফটোকপি করালেন ওয়েনসডে। সেই সাথে খান বিশেক বিজনেস কার্ডও প্রিন্ট করালেন। শ্যাডোর মাথা ব্যথা করছিল, কেমন যেন এক অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছে দুই কাঁধের মাঝখানটায়। শোয়া ঠিক হয়নি বোধহয়, ভাবল ও। কে জানে, হয়তো গত রাতে সোফায় ঘুমাবার কারণে এখন মাথা ব্যথা হচ্ছে।

ওয়েনসডে কিন্তু বসে নেই। তিনি কম্পিউটারে কী যেন টাইপ করছেন। কাজ শেষ হলে দোকান কর্মচারীর সহায়তায় কয়েকটা বড় বড় অক্ষরে লেখা সাইন প্রিন্ট করালেন।

তুষার, আবার ভাবতে শুরু করল শ্যাডো। আকাশের অনেক উপরে, নিখুঁত, ধূলার চাইতেও ছোট ছোট স্ফটিক তৈরি হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। এরপর একসাথে অনেকগুলো স্ফটিক জড়ো হয়ে ঝরে পড়ছে পৃথিবীর

বুকে। শিকাগোর পুরোটাই সাদাটে চাদরে মোড়া যেন। ইঞ্চি ইঞ্চি করে জমছে...

'এই নাও,' বলে শ্যাডোকে এক কাপ কফি এগিয়ে দিলেন ওয়েনসডে। 'যথেষ্ট হয়েছে। তুমি কি বলো?'

'কী যথেষ্ট হয়েছে?'

'তুষারপাত। শহর যদি অকেজো হয়ে পড়ে, তাহলে আমাদের কাজ হবে কী করে?'

আকাশের দিকে তাকাল শ্যাডো, যুদ্ধতরীর মতো ধূসর হয়ে আছে ওটা। তুষারপাত শুরু হতে আর বেশি দেরী নেই।

'আমি করেছি এসব?' জানতে চাইল শ্যাডো। 'মানে আমি ভেবে ভেবে তুষার নামিয়েছি?'

'কফিটা শেষ করে ফেল।' উত্তর দিলেন না ওয়েনসডে। 'স্বাদ একদম বাজে। কিন্তু মাথা ব্যথাটা কমবে।' একটু থেমে যোগ করলেন তিনি। 'ভালো কাজ দেখালে।'

বিল পরিশোধ করে সবকিছু বুঝে নিলেন ওয়েনসডে। গাড়ির ট্রাঙ্ক খুলে সেগুলো ভরে নিলেন একটা বড়, কালো, ধাতব কেসে। সাধারণত টাকা-পয়সা বহন করা হয় ওসব বাক্সে। শ্যাডোর দিকে একটা বিজনেস কার্ড বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

'এই,' বলল শ্যাডো। 'এ. হ্যাডকটা কে? এ-ওয়ান সিকিউরিটি সার্ভিসের ডিরেক্টর?'

'তুমি।'

'এ. হ্যাডক?'

'হ্যাঁ।'

'এ এর পুরোটা কী?'

'আলফ্রেডো? আলফোন্স? অগাস্টিন? অ্যামব্রোস? তোমার যেটা ইচ্ছা।'

'ওহ, বুঝতে পেরেছি।'

'আমি জেমস ও' গরম্যান।' বললেন ওয়েনসডে। 'বন্ধুরা আমাকে জিমি বলে ডাকে। আমার একটা কার্ডও আছে।'

গাড়িতে উঠে বসল ওরা দুজন। ওয়েনসডে বললেন, 'যেভাবে তুষার নামালে, সেভাবে 'এ. হ্যাডক'-কে নিয়ে চিন্তা করলে আমাদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই। রাত নামার আগেই বড়লোক হয়ে যাব!'

'আমি জেলে ফেরত যেতে চাই না।'

'নিশ্চয়তা দিচ্ছি, যেতে হবে না।'

'আগেই বলেছিলাম, কোন বে-আইনি কাজে আমি নেই!'

'তেমন কিছু করতেও হবে না। একটু সাহায্য করবে আমাকে, এই যা। বিশ্বাস করো, তোমার কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।'

'তাই নাকি? আপনার বয়স্ক স্লাভিক বন্ধু যেন আমার মাথাকে নিয়ে কী করতে চায়?'

'চেরনোবোগের দৃষ্টি শক্তির অবস্থা ভালো না। আমার তো মনে হয় তোমার মাথায় লাগাতেই পারবে না। এখনও আমাদের হাতে বেশ খানিকটা সময় আছে। শনিবার যে আজ, তাই। যাই হোক, দুপুরের খাবার খেয়ে নিলে কেমন হয়?'

'খুব ভালো হয়।' বলল শ্যাডো। 'খুব ক্ষুধা লেগেছে।'

'আমি একটা জায়গা চিনি।' বললেন ওয়েনসডে। গুনগুণ করতে করতে গাড়ি চালালেন তিনি। গানটা চিনতে পারল না শ্যাডো। আস্তে আস্তে শুরু হলো তুষারপাত, ঠিক যেমনটা ও ভেবেছিল। কেমন যেন গর্ব বোধ করল সে। যদিও মস্তিষ্ক বলছে, এই তুষারপাতের পেছনে ওর কোন কৃতিত্ব নেই...যেমন জানে, ওর পকেটের রূপালী লিবার্টি ডলারটা কস্মিনকালেও চাঁদ ছিল না...তারপরও...

কুঁড়েঘরের মতো দেখতে একটা দালানের সামনে এসে থামল ওদের গাড়ি। বাইরের লেখা অনুসারে, মাত্র চার ডলার নিরানব্বই সেন্ট দিয়ে বুফে খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। 'জায়গাটা আমার দারুণ পছন্দ।' বললেন ওয়েনসডে।

'কেন? খাবার ভালো?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'খুব একটা না, তবে পরিবেশটা বেশ।'

ওয়েনসডের 'বেশ' পরিবেশের সাথে পরিচিত হতে বেশি একটা দেরী হলো না শ্যাডোর। ফ্রাইড চিকেন দিয়ে লাঞ্চ শেষ করার পরপরই ও দেখতে পেল, দালানটার পেছনে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া মানুষদের জিনিসপত্র বিক্রি করা হচ্ছে। বুঝতে পার, এই বেচা-কেনাকে ঘিরেই ওয়েনসডের যত আগ্রহ।

প্রৌঢ় লোকটা গাড়ি থেকে একটা ছোট স্যুটকেস নিয়ে এলেন, ওটা নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ছেলেদের বাথরুমে। শ্যাডো বুঝতে পারল, ইচ্ছা হোক আর না হোক, অতি-সত্বর ওয়েনসডের পরিকল্পনা জানতে পারবে ও। তাই লোকটার দিকে নজর না দিয়ে, কী কী বিক্রি হচ্ছে সেদিকে মনোযোগ দিল। অদ্ভুত সব জিনিস জমা হয়েছে এখানে–কেবলমাত্র বিমানে ব্যবহারযোগ্য কফির বাক্স, জিনা আর টিনেজ মিউট্যান্ট নিনজা টার্টেলসের খেলনা, ওয়ারিয়র প্রিন্সেসের পুতুল,

গান শোনান টেডি বিয়ার, প্রক্রিয়াজাত খাবারের টিন, মার্শমেলো, বিল ক্লিনটনের ছবি ওয়ালা হাত-ঘড়ি, ইত্যাদি।

হাঁটতে হাঁটতে ভাবনার অতলে হারিয়ে গেল শ্যাডো। আচ্ছা, মানুষ কীভাবে চাঁদকে আসমান থেকে ফুল তোলার মতো করে তুলে আনে? কীভাবে সেটা রূপ নেয় একটা রুপালী ডলারের? কী করলে মৃত এক নারী কবর থেকে উঠে আসে? অনেকটা পথ হেঁটে স্বামীর সাথে গল্প করে?

'দারুণ না জায়গাটা?' ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন ওয়েনসডে। ভেজা হাত রুমাল দিয়ে মুছছেন তিনি। 'ভেতরে টিস্যু নেই।' শ্যাডো টের পেল, ভেতরে থাকা অবস্থায় পোশাক পরিবর্তন করেছেন তিনি। এখন তার পরনে একটা ঘন নীল জ্যাকেট, এক রঙের ট্রাউজার্স, নীল টাই আর নীল সোয়েটার। সোয়েটারের নিচে একটা সাদা শার্ট আর পায়ে কালো জুতো দেখা যাচ্ছে। ব্যাপারটা মুখ ফুটে বললও সে।

'কী আর বলব বলো,' বললেন ওয়েনসডে। 'কেবল এতটুকু বলি, তোমার নজর খুব কড়া। যাই হোক, এ. তে আর্থার হলে কেমন হয়? নামটা কিন্তু ভালো।'

'একটু বেশিই প্রচলিতনাম।'

'তাহলে ভাবতে থাকো। চলো, শহরে ফেরা যাক। আমাদের ব্যাঙ্ক ডাকাতির পরিকল্পনা কাজে লাগাবার সময় হয়েছে। তারপর কিছু খরচ-টরচ করতে চাই।'

'টাকার দরকার হলে,' বলল শ্যাডো। 'মানুষ সাধারণত তা এটিএম থেকেই নেয়!'

'আমিও তাই করব, তবে একটু ঘুরিয়ে।'

সুপারমার্কেটের পার্কিং-লটে গাড়ি রাখলেন ওয়েনসডে। গাড়ির ট্রাঙ্ক থেকে তিনি বের করে আনলেন ধাতব কেসটা, একটা ক্লিপবোর্ড আর একজোড়া হ্যান্ডকাফ। কেসটাকে নিজের হাতের সাথে বাঁধলেন তিনি। তুষারপাত হচ্ছে পুরোদমে। হয়তো তাই মাথায় নীল ক্যাপটা চড়ালেন, জ্যাকেটের বুক পকেটে লাগিয়ে নিলেন এ-ওয়ান সিকিউরিটিলেখা একটা কাপড়। ক্যাপটাতেও তাই লেখা।

প্রস্তুতি শেষ হয়নি তার, ক্লিপবোর্ডের সাথে লাগিয়ে রাখলেন জমা দেয়ার রশিদগুলো। এরপর সামনের দিকে একটু ঝুঁকে গেলেন তিনি, এখন তাকে দেখতে বয়স্ক আর অবসর-প্রাপ্ত এক পুলিশ বলে মনে হচ্ছে। কীভাবে কীভাবে যেন হাল্কা একটু ভুঁড়িও দেখা গেল তার উদরে!

'এবার,' তৈরি হয়ে বললেন তিনি। 'মার্কেটে চলে যাও। খাবারের দোকানে কিছু কেনাকাটা করে পে-ফোনের পাশে চলে যেও। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে, তোমার প্রেমিকার গাড়ি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ওর ফোনের অপেক্ষা করছ।'

'আমার প্রেমিকা...সুপার মার্কেটে আমাকে ফোন করবে কেন?'

'মেয়েদের মন...বোঝা বড় দায়!'

রঙ ওঠা গোলাপি একজোড়া মাফলার দিয়ে কান ঢাকলেন ওয়েনসডে। ট্রাঙ্কটা বন্ধ করে জানতে চাইলেন, 'কেমন দেখাচ্ছে আমায়?'

'হাস্যকর।' জানাল শ্যাডো।

'হাস্যকর?'

'নির্বোধও বলা যায়।'

'হুম, নির্বোধ আর হাস্যকর। চলবে।' হাসলেন ওয়েনসডে। মাফলার পরিহিত অবস্থায় হাসি দেখে মনে হলো, লোকটা নির্ভরযোগ্য, মজার আর পছন্দ করার মতো একজন। রাস্তা পার হয়ে তিনি সোজা ব্যাঙ্কের দালানের কাছে চলে গেলেন। নির্দেশ মতো কাজ করল শ্যাডো, একটা চোখ ওয়েনসডের দিকে।

এটিএমের সামনে একটা বড় নষ্টলেখা কাগজ লাগিয়ে দিলেন ওয়েনসডে। রাতের বেলা টাকা জমা দেবার যে স্লটটা আছে, সেটার সামনে লাগালেন একটা লাল রিবন। কিনকোর দোকান থেকে আনা সাইনটা ঝোলালেন এরপর। কৌতূহলী শ্যাডো এত দূর থেকেও লেখাগুলো পরিষ্কার পড়তে পারল–

গ্রাহক-সেবার মান বৃদ্ধির জন্য, আমরা বর্তমানে কিছু কাজ করছি। এতে যে সমস্যা হচ্ছে, তার জন্য আমরা দুঃখিত।

এবার ঘুরে রাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলেন ওয়েনসডে, তাকে দেখে মনমরা আর শীতার্ত বলে মনে হচ্ছে।

কম বয়সী এক মহিলা এটিএম ব্যবহার করার জন্য কাছে আসতেই, বাঁধা দিলেন তিনি। তার মাথা নাড়ান দেখে শ্যাডো বুঝতে পারল, ওটা যে নষ্ট তা জানাচ্ছেন। গালি দিয়ে উঠল মেয়েটা, তারপর নিজেই লজ্জা পেয়ে ক্ষমা চাইল। দাঁড়াল না আর বেচারি।

এর কিছুক্ষণ পর, এটিএমের সামনে এসে থামল একটা গাড়ি। ছোট একটা ধূসর থলে আর একটা চাবি হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে নামল এক লোক। ওয়েনসডে ক্ষমা চাইলেন লোকটার কাছে, তারপর এগিয়ে দিলেন ক্লিপবোর্ড। লোকটা তাতে সই করার পর পূরণ করল একটা জমার ফর্ম। ওটা দেখে নিয়ে একটা রশিদ দিলেন ওয়েনসডে, রশিদের কোন অংশ রাখবেন আর কোনটা

ফিরিয়ে দেবেন, সেটা নিয়ে বিভ্রান্ত দেখাল তাকে। অবশেষে ধাতব কেসটা খুলে তাতে রেখে দিলেন লোকটার থলে।

এদিকে লোকটা শীতে কাঁপছে আর বারবার পা ঠুকছে ফুটপাতে। বয়স্ক সিকিউরিটি গার্ডের এই দেরী সহ্য হচ্ছে না যেন তার। রশিদ পাওয়া মাত্র আর দেরী করল না সে, উষ্ণ গাড়িতে উঠে বসে বিদায় নিল।

ধাতব কেসটা সাথে নিয়ে রাস্তা পার হলেন ওয়েনসডে। সুপার মার্কেট থেকে এক কাপ কফি কিনে নিয়ে ফিরে গেলেন আবার। শ্যাডোকে অতিক্রম করার সময় মুচকি হেসে বললেন, 'শুভ সন্ধ্যা, যুবক। ঠান্ডা পড়েছে বেশ, তাই না?'

ব্যাঙ্কের সামনে গিয়ে বসলেন তিনি। শনিবার বিকালে টাকা জমা দিতে আসা নারী-পুরুষদের হাত থেকে ধূসর থলে আর খাম নিতে থাকলেন। বৃদ্ধ, রঙ-জ্বলা মাফলার পরিহিত সিকিউরিটি গার্ডকে কেউ সন্দেহই করল না।

টার্কি হান্টিং, পিপল আর প্রচ্ছদে ইয়েতির ছবি দেখে উইকলি ওয়ার্ল্ড নিউজ পত্রিকা কিনল শ্যাডো। ওগুলো উল্টাতে উল্টাতে তাকাল জানালা দিয়ে বাইরে।

'আমি কোনভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?' মাঝ-বয়সী এক নিগ্রো লোক জানতে চাইল ওর কাছে। ম্যানেজার হবে হয়তো, ভাবল শ্যাডো।

'নাহ, ধন্যবাদ। আমি আসলে একটা ফোন কলের জন্য অপেক্ষা করছি। আমার প্রেমিকার গাড়ি নষ্ট হয়ে পড়ে আছে রাস্তায়।'

'ব্যাটারির গোলমাল মনে হচ্ছে।' বলল সাদা গোঁফের ম্যানেজার। 'মানুষ কেন যেওগুলো পরিবর্তন করার কথা ভুলে যায়! অথচ দাম খুব একটা বেশি না।'

'একদম ঠিক বলেছেন।' বলল শ্যাডো।

'দুশ্চিন্তা করবেন না।' বলে মার্কেটের ভেতরে চলে গেল ম্যানেজার।

তুষারপাত হচ্ছে এখনও, এপাশ থেকে ওপাশের কথা শোনা যাচ্ছে না। শ্যাডোর মনে হচ্ছে যেন কোন নির্বাক চলচ্চিত্র দেখছে ও। এখান থেকে দেখে মনে হচ্ছে, বৃদ্ধ সিকিউরিটি গার্ড একটু অদক্ষ হলেও, সাদা মনের। মানুষ হাসি মুখেই তার হাতে তুলে দিচ্ছে টাকা-পয়সা।

একটু শান্ত হয়ে এসেছে ও, এমন সময় ব্যাঙ্কের সামনে এসে দাঁড়াল পুলিশের গাড়ি। আঁতকে উঠল শ্যাডো। অবশ্য ওয়েনসডের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি এগিয়ে গিয়ে ক্যাপ ধরে সম্ভাষণ জানালেন। গাড়িটার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কী কী যেন বললেন আর নড করলেন কিছুক্ষণ। এরপর পকেট হাতড়ে বের করে আনলেন একটা বিযনেস কার্ড আর একটা চিঠি। জানালা দিয়ে ওগুলো এগিয়ে দিয়ে মন দিলে কফিতে চুমুক দেবার কাজে।

আচমকা বেজে উঠল টেলিফোন। ওটা তুলে নিয়ে কণ্ঠে বিরক্তি ঢেলে শ্যাডো বলল, 'এ-ওয়ান সিকিউরিটিজ।'

'আমি কি এ. হ্যাডকের সাথে কথা বলতে পারি?' রাস্তার ওপাশের গাড়িতে বসে থাকা পুলিশ প্রশ্ন করল।

'অ্যান্ডি হ্যাডক বলছি।'

'মি. হ্যাডক, আমি পুলিশ। আপনার একজন লোক ফার্স্ট ইলিনয় ব্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মার্কেট আর সেকেণ্ডের মোড়ে।'

'ওহ, জিমি ও' গরম্যান নিশ্চয়। কোন সমস্যা অফিসার? জিম কোন বাজে আচরণ করেনি তো? নাকি মাতালামি করছে?'

'কোন সমস্যা না, স্যার। আপনার লোকও ঠিক আছে। শুধু নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম।'

'জিমিকে দয়া করে বলে দিন অফিসার, আরেকবার মদ্যপ অবস্থায় যদি আমার হাতে ধরা পড়ে, তাহলে এবার সোজা বের করে দেব। এ-ওয়ান সিকিউরিটিজে আমরা ওসব সহ্য করি না।'

'আমার ওগুলো বলা ঠিক হবে বলে মনে হয় না, স্যার। আপনার লোক ঠিকমতোই কাজ করছে। তবে এরকম একটা জায়গায় মাত্র একজনকে রাখাটা আসলে ঠিক হচ্ছে না, কমপক্ষে দুজন গার্ড দরকার। ঝুঁকির ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হবে।'

'তা তো বটেই। আসলে এই কথাগুলো ফার্স্ট ইলিনয়ের ওই কিপ্টা ব্যাঙ্কারদের কানে তোলা দরকার। আমার লোকদের ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে বারবার। বুঝলেন অফিসার, এরা সবাই ভালো মানুষ। আপনার মতোই।' শ্যাডোর মনে হলো, ও যেন আসলেই অ্যান্ডি হ্যাডক। মুখে যেন একটা সিগার পোড়া আছে ওর, সামনে পড়ে আছে একগাদা কাগজ। 'আপনার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে, বয়স খুব একটা বেশি না। তা অফিসার...কী যেন নাম বললেন?'

'মেয়ারসন।'

'অফিসার মেয়ারসন। যদি কখনও ছুটির দিনে হালকা কাজ করতে মন চায়, অথবা যদি কখনও চাকরি ছাড়েন, আমাকে ফোন করতে ভুল করবেন না। আমার কার্ডটা তো আছে, তাই না?'

'জি।'

'রেখে দিন,' বলল অ্যান্ডি হ্যাডক। 'আপনার মতো মানুষের আমাদের বড় দরকার।'

কথা শেষে চলে গেল পুলিশের গাড়ি। ওয়েনসডে ফিরে এলেন নিজের জায়গায়। তার হাতে টাকা তুলে দেবার জন্য এরইমাঝে অনেকে লাইন ধরে দাঁড়িয়েছে।

'ঠিক আছে তো?' দরজা দিয়ে মাথা বের করে জানতে চাইল ম্যানেজার। 'আপনার প্রেমিকার কথা জিজ্ঞাসা করছি।'

'হ্যাঁ। ব্যাটারিরই সমস্যা।' বলল শ্যাডো। 'এখন অপেক্ষা করতে হবে আমাকে।'

'মেয়েমানুষ!' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল ম্যানেজার। 'আশা করি আপনার এই অপেক্ষার যোগ্য মেয়েটা।'

শীতের রাত নামতে শুরু করেছে, আস্তে আস্তে গোধূলি রূপ নিচ্ছে রজনীর। রাস্তার বাতি জ্বলে উঠছে এক এক করে। ওয়েনসডে টাকা নিয়ে কুল পাচ্ছেন না। আচমকা, যেন কোন অদৃশ্য ইঙ্গিতে, দেয়ালের কাছে চলে গেলেন তিনি। নষ্টলেখা কাগজটা খুলে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে এগোলেন পার্কিং-লটের দিকে। এক মিনিট অপেক্ষা করে পিছু নিল শ্যাডো।

গাড়ির পেছনের সিটে বসে ছিলেন ওয়েনসডে। ধাতব কেসটা খুলে ভেতরের সবকিছু এরইমধ্যে ঢেলে ফেলেছেন পাশের খালি আসনটায়।

'চালাও,' বললেন তিনি। 'স্টেট স্ট্রিটের ফার্স্ট ইলিনয় ব্যাঙ্কের অফিসে যাও।'

'আবার একই নাটক?' জানতে চাইল শ্যাডো। 'ঝুঁকিটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?'

'আরে না, আবার কেন করব!' বললেন ওয়েনসডে। 'এবার টাকা জমা দিতে যাচ্ছি।'

শ্যাডোর গাড়ি চালানোর সময়টা কাজে লাগালেন ওয়েনসডে। চেক আর ক্রেডিট কার্ডের স্লিপগুলো ফেলে দিয়ে রাখলেন শুধু নগদ টাকা। তা-ও সব না, কয়েকটা এনভেলপ তো স্পর্শই করলেন না। কিছু নোট আলাদা রেখে বাকিগুলো আবার ভরে রাখলেন তিনি কেসে। শ্যাডো ব্যাঙ্কের পঞ্চাশ গজ দূরে এসে গাড়ি থামাল, এখান থেকে ব্যাঙ্কের ক্যামেরা ওদেরকে দেখতে পাবে না। গাড়ি থেকে বেরিয়ে ওয়েনসডে খামগুলো রাতে জমা করার স্লটটায় ঢুকিয়ে দিলেন। এরপর রাতের সেফটা খুলে ভেতরে রাখলেন ধূসর ব্যাগগুলো।

কাজ শেষে ফিরে এলেন গাড়িতে। 'আই-৯০ এর দিকে যাও।' বললেন তিনি। 'সাইন দেখে দেখে পশ্চিমে, ম্যাডিসনের দিকে এগোবে।'

গাড়ি চালাতে শুরু করল শ্যাডো।

একবার পেছন ফিরে ব্যাঙ্কের দিকে তাকালেন ওয়েনসডে। 'সবাই বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। যাই হোক, যদি একদানে অনেক টাকা কামাতে চাও, তাহলে এই কাজটা করতে হবে রবিবার ভোর সাড়ে-চারটার দিকে। তখন নাইট ক্লাব আর বারের ইনকাম জমা দিতে আসে মানুষ। সাথে দুই একজন মাংসল বাউন্সারও আনে অনেকে। তবে আকারে বড় হলেও, বুদ্ধিতে একেবারে খাটো হয় ওরা। সঠিক ব্যাঙ্ক, সঠিক সময় আর সঠিক ক্লাবের টাকা পেলে, একবারে পৌনে মিলিয়ন ডলার কামানোও অসম্ভব না।'

'কাজটা যদি এত সহজই হয়,' বলল শ্যাডো। 'তাহলে সবাই করছে না কেন?'

'একেবারে ঝুঁকি মুক্ত পরিকল্পনা বলব না।' বললেন ওয়েনসডে। 'বিশেষ করে ভোর সাড়ে-চারটায় বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।'

'কী সমস্যা? পুলিশ একটু বেশিই সন্দেহ-প্রবণ থাকে তখন?'

'নাহ, বাউন্সাররা থাকে। মাঝে মাঝে বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীনও হতে হয় আরকি।'

পঞ্চাশ ডলারের অনেকগুলো নোট একসাথে করলেন ওয়েনসডে, এরপর কয়েকটা বিশ ডলারের নোট যোগ করে ওজন আন্দাজ করার চেষ্টা করলেন হাতে নিয়ে। সন্তুষ্ট হয়ে পুরোটা এগিয়ে দিলেন শ্যাডোর দিকে। 'এই নাও, তোমার প্রথম সপ্তাহের বেতন।'

না গুনেই নোটগুলো পকেটে পুরল শ্যাডো। 'এভাবেই তাহলে আপনি টাকা কামাই করেন?'

'খুব বিপদে পড়লে। আর যখন খুব বড় অঙ্কের টাকা খুব দ্রুত প্রয়োজন হয়, তখন। সাধারণত আমি টাকা নেই এমন লোকদের কাছ থেকে, যারা তা বুঝতেই পারে না। কোন ধরনের অভিযোগ করার তো প্রশ্নই ওঠে না। জানো, পরেরবার আমাকে দেখা মাত্র লাইন ধরে দাঁড়িয়ে যায় তারা-টাকা দেবার জন্য।'

'সুইনি বলেছিল, আপনি প্রতারক।'

'ঠিক বলেছে। কিন্তু আমি একদম সাধারণ কোন 'প্রতারক' নই, শ্যাডো।'

অন্ধকারের মাঝ দিয়ে হেডলাইটের আলো জ্বেলে এগিয়ে চলছে শ্যাডো। এই উজ্জ্বল হচ্ছে রাস্তা, আবার এই নেমে আসছে অন্ধকার। সম্মোহিত হয়ে পড়ছে যেন যুবক।

'বিশ্বের একমাত্র দেশ এটা,' বললেন ওয়েনসডে। 'যেটা নিজের পরিচয় নিয়ে এতটা মাথা ঘামায়!'

'বুঝলাম না!'

'অন্য দেশগুলো এমন অস্তিত্বের সংকটে ভোগে না। নরওয়ের হৃদপিণ্ডের খোঁজে কোন নরওয়েজিয়ানকে হন্য হয়ে ঘুরতে দেখেছ? অথবা মোজাম্বিকের আত্মার খোঁজে কোন মোজাম্বিকবাসীকে? ওরা জানে নিজেদের পরিচয়।'

'আর...?'

'আর কিছু না।'

'অনেক দেশ ঘুরেছেন মনে হচ্ছে?'

কিছুই বললেন না ওয়েনসডে, শ্যাডো লোকটার দিকে তাকাল। 'না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন তিনি। 'খুব একটা ঘোরা হয়নি।'

গ্যাস নেবার জন্য পথে একবার থামতে হলো ওদেরকে, সিকিউরিটি গার্ডের উর্দি পরা অবস্থায় স্টেশনের রেস্টরুমে ঢুকলেন ওয়েনসডে; বের হলেন স্যুট, বাদামী জুতা আর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা বাদামী কোট পরে। কোটটা সম্ভবত ইতালিয়ান!

'ম্যাডিসনে যাবার পর আমরা কী করব?'

'থামবে না। চোদ্দ নাম্বার হাইওয়ে ধরে স্প্রিং গ্রিনে চলে যাবে। হাউজ অন দ্য রক নামের একটা জায়গায় আমরা সবার সাথে দেখা করব। আগে গিয়েছ কখনও?'

'না,' জানাল শ্যাডো। 'তবে সাইনবোর্ড দেখেছি বেশ কয়েকবার।'

হাউজ অন দ্য রকের সাইনবোর্ড মনে হয় সারা বিশ্ব জুড়েই ছড়িয়ে আছে। অন্তত ইলিনয়, মিনেসোটা আর উইসকনসিনে তো আছেই, আইওয়াতে থাকলেও শ্যাডো অবাক হবে না। ও নিজেও অনেক জায়গায় দেখেছে ওই সাইন, কিন্তু বাঁকা চিহ্নগুলোর অর্থ ধরতে পারেনি। নামটাও যেন কেমন! রক, মানে পাথরের উপর কী বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাউজ, মানে দালানটা? বেশিক্ষণ অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল না শ্যাডো। চলতি পথে অবস্থিত নানা দর্শনীয় স্থান দেখার ব্যাপারে ওর আগ্রহ নেই কোন।

ম্যাডিসনে এসে ইন্টারস্টেট রাস্তা ছাড়ল ওরা, ক্যাপিটাল বিল্ডিং-এর গম্বুজের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এলো। আচমকা নিজেকে শ্যাডো আবিষ্কার করল অপ্রশস্ত, অনেকটা গ্রাম্য রাস্তায়। প্রায় একঘণ্টা ধরে গাড়ি চালিয়ে, 'কালো মাটি' টাইপ অদ্ভুত নামের একাধিক শহর অতিক্রম করার পর একটা সরু ড্রাইভওয়েতে এসে নামল ওরা। চারপাশে গাছ দিয়ে ঘেরা পার্কিং-লট প্রায় খালি।

'খুব দ্রুতই বন্ধ হয়ে যাবে।' বললেন ওয়েনসডে।

'নাম কী এই জায়গার?' জানতে চাইল শ্যাডো। গাড়ি থেকে নেমে ওরা দুজনেই একটা নিচু, কাঠের দালানের দিকে এগোল।

'এই হচ্ছে যাকে বলে...চলতি পথে অবস্থিত দর্শনীয় স্থান। আমেরিকার অন্যতম সেরা জায়গা এটা। তাই এক হিসেবে একে তুমি ক্ষমতায় পূর্ণ এলাকাও বলতে পারো।'

'মানে?'

'সহজ কথা,' বললেন ওয়েনসডে। 'অন্যান্য দেশের কথা ধরো। মানুষ নানা স্থানকে পুজো করে এসেছে, তারা জানত ওসব এলাকার বিশেষ ক্ষমতা আছে। কখনও কখনও জায়গাটার বিশেষত্ব এসেছে প্রাকৃতিকভাবে, আবার কখনও কখনও ওটা আসলেই বিশেষ কিছু একটা ছিল। তাই ওসব স্থানে তারা বানাত মন্দির বা ক্যাথেড্রাল, অথবা খাড়া করত মূর্তি...বুঝতেই পারছ আমি কী বলতে চাইছি!'

'আমেরিকা জুড়ে চার্চের সংখ্যা কিন্তু কম না।' বলল শ্যাডো।

'হুম, প্রতিটা শহরেই আছে। অনেক শহরে তো প্রতিটা ব্লকেই দেখা যায়। আসলে এই ইউ.এস.এ.তেও মানুষ মাঝে মাঝে ওপাশের ডাক শুনতে পায়। যার ফলশ্রুতিতে জীবনে যায়নি বা দেখেনি, এমন জায়গার প্রতিকৃতি বানায় তারা। কালে সেটাই পরিণত হয়ে দর্শনীয় স্থানে!'

'আপনার তত্ত্বগুলো মাঝে মাঝে বড় অদ্ভুত বলে মনে হয়।' বলল শ্যাডো।

'তত্ত্ব না বাছা,' বললেন ওয়েনসডে। 'এতক্ষণে তো তোমার বুঝে যাওয়া উচিৎ, আমি আন্দাজে কথা বলি না।'

টিকিট বিক্রি হচ্ছে এমন একটা মাত্র বুথ এখনও খোলা আছে। 'আমরা আধ-ঘণ্টা পর টিকিট বিক্রি বন্ধ করে দেব। পুরোটা ঘুরে দেখতে কমসে কম দুই ঘণ্টা সময় লাগে তো, তাই।'

নগদ টাকা দিয়ে টিকিট কিনলেন ওয়েনসডে।

'পাথর কই?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'দালানের নিচে।'

'তা দালানটা কই?'

উত্তর না দিয়ে ওয়েনসডে ওর ঠোঁটে আঙুল রেখে ওকে চুপ করিয়ে দিলেন। কোন কথা না বলে কিছুক্ষণ সামনে এগোল ওরা। পিয়ানোর বাজনা কানে এলো ওদের; শ্যাডোর মনে হচ্ছে, যেন ১৯৬০ সালের কোন ব্যাচেলরের আবাস নকল করে সাজানো হয়েছে। পাথরের কাজ করা, পায়ের নিচে বিছানো কার্পেট আর মাশরুমের মতো দেখতে ল্যাম্প শেডগুলো সেরকমই মনে করাচ্ছে ওকে।

'লোকে বলে, এই জায়গাটা বানিয়েছিলেন ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের দুষ্ট যমজ, ফ্রাঙ্ক লয়েড রং।' নিজের কৌতুকে নিজেই হাসলেন তিনি!

'কোন একটা টি-শার্টে লেখাটা পড়েছি আমি।' বলল শ্যাডো।

বেশ কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা করার পর, একটা বড় ঘরে এসে উপস্থিত হলো ওরা। ঘরটা কাঁচ দিয়ে বানানো, সামনের দিকটা একটা সুইয়ের মতো সরু হয়ে গিয়েছে। শেষ হয়েছে যেখানে, সেখান থেকে সাদা-কালো গ্রাম্য এলাকা দেখা যায়। অথচ ঘরের অনেকটা অংশ হাওয়ার উপরে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিবেশটাকে উপভোগ করল শ্যাডো।

'এই তাহলে হাউজ অন দ্য রক?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল ও।

'মোটামুটি। এই ঘরের নাম অনন্ত ঘর, অনেক পরে বানানো হয়েছে। তবে আমার বন্ধু, এই দালানের আসল রূপের ঝলকটাও তুমি এখন পর্যন্ত অবলোকন করোনি।'

'আপনার তত্ত্ব মতে,' বলল শ্যাডো। 'ডিজনি ওয়ার্ল্ড আমেরিকার সবচেয়ে পবিত্র আর ক্ষমতাশালী জায়গা!'

ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন ওয়েনসডে। 'ওয়াল্ট ডিজনি ফ্লোরিডার মাঝখানে কয়েকটা কমলার বাগান কিনে একটা টুরিস্ট টাউন বানিয়েছে। ওখানে জাদু কই? তবে আমার ধারণা, আসলে ডিজনিল্যান্ডে কিছু থাকলেও থাকতে পারে। যাই হোক, ফ্লোরিডার কিছু জায়গায় কিন্তু সত্যি সত্যি জাদুর অস্তিত্ব আছে। শুধু চোখ খোলা রাখলেই, দেখতে পাবে...আমার সাথে এসো।'

চারপাশে শুধু সুর আর সুর, তবে কেমন যেন ঠিক খাপে খাপ মেলে না...পুরনো বলে মনে হয়। একটা পাঁচ ডলারের নোট বের করে চেঞ্জ মেশিনে ঢোকালেন ওয়েনসডে, বিনিময়ে পেলেন অনেকগুলো তামাটে রঙের পয়সা। শ্যাডোর দিকে একটা ছুঁড়ে দিলেন তিনি, ছোট একটা বাচ্চা ওর দিকে তাকিয়ে আছে টের পেয়ে পয়সা হাপিস করার খেলা দেখাল সে।

ওয়েনসডের পিছু নিয়ে বাইরে চলে এলো শ্যাডো। কিছুক্ষণ একসাথে চলার পর, 'বিগত দিনের রাস্তা'র সাইনগুলো অনুসরণ করতে লাগল ও।

'চল্লিশ বছর আগে, অ্যালেক্স জর্ডান, যার চেহারা তোমার হাতে থাকা পয়সাটায় মুদ্রিত হয়ে আছে, একটা বাড়ি বানাতে শুরু করলেন। যেখানে বাড়ি বানাচ্ছিলেন, সেখানে ছিল উঁচু পাথরের স্তূপ, এমনকি জায়গাটার মালিকও তিনি ছিলেন না। দালানটা কেন ওঠাচ্ছেন, সেটা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিতে পারতেন না! যাই হোক, তার এই বাড়ি বানানো দেখার জন্য লোকে ভিড় করতে শুরু করল। কেন, সেই প্রশ্নের উত্তর তাদের কাছে ছিল না! কেউ কেউ কৌতূহলী

ছিল, কেউ কেউ বিভ্রান্ত। অনেকে দুটোর কোনটাই ছিল না। অ্যালেক্স বুদ্ধিমান আমেরিকানের মতো কাজ করলেন–দর্শনার্থীদের কাছ থেকে টাকা রাখতে শুরু করলেন তিনি, অঙ্কটা শুরুতে ছোটই ছিল। শুরুতে এক নিকেল, অথবা একটা কোয়ার্টার। দালান বানানো কিন্তু বন্ধ হয়নি। বন্ধ হয়নি লোক আসাও।

'টাকাটা নিয়ে তিনি আরও বড় কিছু জিনিস বানালেন। বাড়িটার নিচের জমিতে খাড়া করলেন কিছু গুদাম; ওগুলো ভরলেন মানুষ দেখতে চায় এমন জিনিস দিয়ে। এখন প্রতি বছর লাখ লাখ লোক এখানে আসে।'

'কেন?'

উত্তর না দিয়ে কেবল হাসলেন ওয়েনসডে, বিগত দিনের রাস্তায় আধো আলোতে এগোতে থাকল তারা। দুপাশের ধুলো পড়া দোকানগুলোর জানালা দিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে প্রাচীন আমলের চীনে মাটির পুতুল। ওদের মাথার উপরে অন্ধকার ছাদ, পায়ের নিচে খোয়া বিছান মেঝে; পেছন থেকে ভেসে আসছে বাজনা। ভাঙ্গা পাপেট আর বড় একটা সোনালী মিউজিক বক্সের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল ওরা। অতিক্রম করল দাঁতের ডাক্তার আর ওষুধের দোকানও।

রাস্তার শেষ মাথায় একটা বৃহদায়তন কাঁচের বাক্স দেখা যাচ্ছে, ভেতরে একটা মেয়ে পুতুল। পরনে জিপসি ভবিষ্যদ্বক্তার পোশাক।

'শোন,' বাজনার আওয়াজ ছাপিয়ে গেল ওয়েনসডের কণ্ঠ। 'যেকোন কাজে নামার আগে, নর্নদের সাথে আলোচনা করে নেয়া উচিৎ। তাই এসো, আমরা এই ভবিষ্যদ্বক্তাকে উর্ড বলে ধরে নেই।' স্লটে একটা তামাটে পয়সা ঢুকিয়ে দিলেন তিনি। সাথে সাথে একটা হাত উঁচু করে ধরল জিপসি, আবার নামিয়ে আনল। স্লট থেকে বেরিয়ে এলো এক টুকরা কাগজ।

ওটা ছিঁড়ে নিয়ে পড়লেন ওয়েনসডে, এরপর ঘোঁত করে দলা পাকালেন কাগজটা, এক মুহূর্ত পর ওটার স্থান হলো তার পকেটে।

'আমাকে দেখাবেন না? আমারটা চাইলে দেখতে পারেন।' বলল শ্যাডো।

'যার যার ভাগ্য...তার তার।' শক্ত কণ্ঠে বললেন ওয়েনসডে। 'তোমারটা দেখার কোন ইচ্ছা আমার নেই।'

কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে গেল শ্যাডো, স্লটে পয়সা ঢোকান মাত্র কাগজ বেরিয়ে এলো একটা।

প্রতিটা অন্তের মাঝেই লুকিয়ে আছে নতুন আদি।
তোমার জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে, এমন কোন নাম্বার নেই।
তোমার শুভ রঙ মৃত্যু।

মুখ বিকৃত করল শ্যাডো, কাগজটা ভাঁজ করে কোটের ভেতরের পকেটে রেখে দিল।

আবার এগোতে শুরু করল দুজন। একে একে পার হলো একটা লাল করিডর, ফাঁকা চেয়ার ভর্তি ঘর যেখানে ভায়োলিন আর চেলো আপনাআপনি বাজছে (মানে স্লটে পয়সা দেবার পর আরকি)। কিছুটা অবাক হয়েই লক্ষ্য করল শ্যাডো, ওই যন্ত্রগুলোকে বাজাচ্ছে একটা যান্ত্রিক হাত। অথচ একটা তারও স্পর্শ করছে না ওটা! ভাবল, এই বাজনা হয়তো বাতাসের কাজ। আবার আগে থেকে রেকর্ড করাও হতে পারে।

প্রায় কয়েক মাইল হাঁটার পর, মিকাডো নামে একটা ঘরে এসে উপস্থিত হলো ওরা। ওই ঘরেও বাজছে বাজনা, একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে বেঞ্চের উপর বসে আছে চেরনোবোগ। সুরের তালে তালে নাচছে তার হাতের আঙুলগুলো।

এগিয়ে গিয়ে লোকটার পাশে বসলেন ওয়েনসডে। শ্যাডো দাঁড়িয়েই রইল। বাঁ হাত বাড়িয়ে প্রথমে ওয়েনসডে আর পরে শ্যাডোর সাথে করমর্দন করল সে। তারপর আবার মন দিল গানে।

কৃত্রিম যন্ত্রগুলো কেমন যেন অগোছালোভাবে শেষ করল বাজনা। নতুন আরেকটা গান শুরু হতে অবশ্য দেরী হলো না।

'তোমাদের ব্যাঙ্ক ডাকাতি কেমন গেল?' জানতে চাইল চেরনোবোগ। 'কোন অসুবিধা হয়নি তো?' মিকাডো ছেড়ে যেতে চাইছে বলে মনে হচ্ছে না।

'মাখনের মাঝে গরম ছুরি যেমন মসৃণভাবে যায়, তেমন মসৃণভাবেই কাজ সেরেছি আমরা।'

'আমি কসাইখানা থেকে পেনশন পাই।' বলল চেরনোবোগ। 'এর বেশি কিছু দরকার নেই।'

'একদিন ওই পেনশন আসাও বন্ধ হয়ে যাবে।' বললেন ওয়েনসডে। 'সবকিছুই একদিন না একদিন শেষ হয়ে যায়।'

আরও অনেকগুলো করিডর, অনেকগুলো বাদ্য যন্ত্র পার হতে হলো ওদেরকে। শ্যাডো বুঝতে পারল, পর্যটকদের যে পথ দিয়ে হাঁটিয়ে সব দেখানো হয়, সেই পথ না ধরে ওয়েনসডের দেখানো অন্য পথ দিয়ে চলছে ওরা। এখন একটা ঢাল বেয়ে নামছে ওরা, যুবকের মনে হচ্ছে যেন এই পথে আগেও পা রেখেছে।

আচমকা শ্যাডোর হাত আঁকড়ে ধরল চেরনোবোগ। 'জলদি, এদিকে এসো।' বলে ওকে একটা বিশালাকার কাঁচের বাক্সের কাছে নিয়ে গেল। বাক্সের ভেতরে একটা ত্রি-মাত্রিকভাবে নির্মিত দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। এক ভবঘুরে শুয়ে আছে একটা চার্চের দরজার সামনে অবস্থিত একটা গোরস্তানে। মাতালের স্বপ্ননামটা কাঁচের সাথে লেখা। সেই সাথে এ-ও লেখা, জিনিসটা ঊনবিংশ শতাব্দীর একটা স্লট মেশিন। ইংলিশ ট্রেন স্টেশনে এগুলো বসানো থাকত। এখন এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যে হাউজ অন দ্য রকের পয়সা নিতে পারে।

'পয়সা ঢালো।' বলল চেরনোবোগ।

'কেন?'

'তোমার দেখতেই হবে।'

স্লটে পয়সা ফেলল শ্যাডো। গোরস্তানে শায়িত মাতাল ঠোঁটের কাছে তুলে ধরল মদের বোতল। সেই সাথে উল্টে গেল একটা সমাধিফলক, কবর থেকে উঠে এলো একটা মৃতদেহ। মাথার কাছে দেখা গেল একটা খুলি, দাঁত বের করে হাসছে। আরও একজনকে দেখা গেল, একটা অবয়ব, চার্চের ডান দিকে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে চার্চের বাঁয়ে কিছু একটা এক পলকের জন্য দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে খুলে গেল চার্চের দরজা, বাইরে পা রাখলেন এক যাজক। মরদেহ, অবয়ব সব উধাও হয়ে গেল। বাকি রইল কেবল মাতাল আর যাজক। নাক কুঁচকে মাতালের দিকে তাকালেন তিনি, তারপর পিছিয়ে এসে বন্ধ করে দিলেন দরজা। মাতাল পড়ে রইল মাতালের মতো।

পুরো দৃশ্যটা নাড়া দেবার মতো। এমন গল্প দেখান উচিৎ না, ভাবল শ্যাডো

'কেন দেখালাম, জান?' জিজ্ঞাসা করল চেরনোবোগ।

'না।'

'দুনিয়ার আসল রূপ এটাই। ওখানে, ওই বাক্সে যা দেখলে...পুরো পৃথিবীটাই আসলে সেরকম।'

রক্ত-রঙা একটা ঘরের ভেতর দিয়ে ওরা হাঁটছে এখন, ভেতরে পুরনো দিনের বড় বড় সব অর্গান। তামাটে পাইপগুলো দেখে মনে হচ্ছে, ওগুলোকে কোন মদের কারখানা থেকে খুলে আনা হয়েছে।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'ক্যারোসেলের কাছে।' উত্তর দিল চেরনোবোগ।

'ক্যারোসেলে যাবার পথটা এরইমাঝে না হলেও বারো-চোদ্দবার পার হয়ে এসেছি আমরা।'

'ওয়েনসডে হাঁটে নিজের বেছে নেয়া পথে, বৃত্তাকারে হাঁটা বলতে পারো। কখনও কখনও দ্রুততম পথটা দীর্ঘতম হয়ে থাকে।'

ব্যথা করতে শুরু করেছে শ্যাডোর পা, কথাটা কেন যেন ওর বিশ্বাস হলো না।

একটা উঁচু ঘর পার হলো ওরা, ঘরটার মাঝখানে বড়...কালো একটা তিমির রেপ্লিকা রাখা। ওটার মুখের ভেতর বসে আছে একটা পূর্ণ নৌকার মডেল। সেখান থেকে একটা ট্রাভেল হলে পা রাখল ওরা, ওখানকার গাড়িটা টাইলসে ভর্তি। ওটা এখন পরিণত হয়ে রুব গোল্ডবার্গের ডিজাইন অনুসারে বানানো মুরগি-প্রসেসিং যন্ত্রে। সেই সাথে দেয়ালে লাগাচ্ছে বার্মা শেভ কোম্পানির বিজ্ঞাপন।

জীবন বড় কঠিন,
পদে পদে খেতে হয় হোঁচট আর বাড়ি;
তাই পরিষ্কার রাখো চোয়াল,
থাকে না যেন দাড়ি।

বার্মা শেভ।

আরেকটায় লেখা–

গাড়ি চালাতে গিয়ে, করেছিল সে ওভারটেক,
জানত না যে বাঁক আছে ওপাশে;
তাই এখন শুধু গোরখোদক,
সঙ্গ দেয় ওকে।

বার্মা শেভ।

ঢালের নিচে এসে পৌছাতে বেশিক্ষণ লাগল না ওদের, সামনেই দেখা গেল একটা আইসক্রিমের দোকান। খোলা আছে তবে দোকানের একমাত্র কর্মচারী মেয়েটার চেহারা কেমন যেন ভাবলেশহীন। তাই চলে গেল পিজ্জেরিয়া-ক্যাফেটেরিয়াতে। খালিই বলা চলে, কেবল এক বয়স্ক কালো চামড়ার লোক বসে আছে। তার পরনে চেকের স্যুট আর হাতে ক্যানারির মতো হলুদ গ্লাভস। ছোট-খাটো লোকটা বেশ বয়স্ক, দেখে মনে হয় যেন বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে

আছে। বিশাল একটা আইসক্রিম সানডে তার হাতে, অন্য হাতে তেমনই বিশাল এক মগ ভর্তি কফি। অ্যাশট্রে জ্বলছে একটা কালো সিগার।

'তিন কাপ কফি আনো।' শ্যাডোকে নির্দেশ দিয়ে রেস্টরুমে চলে গেলেন ওয়েনসডে।

কফি এনে কাপগুলো চেরনোবোগের কাছে নিয়ে গেল শ্যাডো। লোকটা তখনও ওই বৃদ্ধের সাথে ছিল, সিগারেট টানছিল চুপিচুপি; যেন কোন তরুণ ভয়ে ভয়ে টানছে। বৃদ্ধের অবশ্য ভ্রূক্ষেপ নেই কোন দিকে, আইসক্রিম সানডে নিয়েই ব্যস্ত সে। সিগারটা অ্যাশট্রেতে এমনি এমনি পড়ে জ্বলছে। তবে শ্যাডোকে আসতে দেখে ওটা তুলে নিল সে। লম্বা একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল, দুটো রিং তৈরি হলো ধোঁয়ায়-একটা বড় আর অন্যটা ছোট। ছোটটা একটুও স্পর্শ না করে চলে গেল বড়টার ভেতর দিয়ে। হাসি ফুটে উঠল বৃদ্ধের মুখে, নিজের কাজে সন্তুষ্ট।

'শ্যাডো, ইনি হচ্ছে মি. ন্যান্সি।' পরিচয় করিয়ে দিল চেরনোবোগ।

উঠে দাঁড়িয়ে গ্লাভস পরা ডান হাত এগিয়ে দিল বৃদ্ধ। 'পরিচিত হয়ে প্রীত হলাম,' চোখ ধাঁধানো হাসি হেসে বলল সে। 'তুমি কে, তা বুঝতে পারছি। নিশ্চয় ওই একচোখা হারামজাদার হয়ে কাজ করছ, তাই না?' উচ্চারণে হালকা ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান টান টের পেল শ্যাডো।

'ঠিক ধরেছেন, আমি মিস্টার ওয়েনসডের হয়ে কাজ করি।' বলল শ্যাডো। 'বসুন না।'

চেরনোবোগ সিগারেট টেনেই যাচ্ছে।

'আমার ধারণা,' হতাশা ভরা কণ্ঠে বলল সে। 'আমাদের জাতটা সিগারেট পছন্দ করে, কারণ এই জিনিসটা আমাদেরকে অতীত স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। একদা আমাদের জন্য এভাবেই আগুন জ্বালিয়ে কত কী উৎসর্গ করা হতো! ধোঁয়া উপরে উঠত আর মানুষ ভাবত, আমাদের কাছে সেগুলো ওদের প্রার্থনা পৌঁছে দিচ্ছে।'

'আমি কখনও অমন কিছু পাইনি।' বলল ন্যান্সি। 'আমার কপালে জুটত একগাদা ফল, কখনও কখনও রান্না করা খাসির মাংস। পান করার মতো ঠান্ডা কোন পানীয় আর মাঝে মাঝে...কপাল ভালো হলে সুন্দরী মেয়ে।' সাদা দাঁত বের হয়ে গেল হাসিতে। শ্যাডোর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল সে।

'আর আজ,' কণ্ঠে এখনও হতাশা চেরনোবোগের। 'আমাদের কপালে কিছুই জোটে না।'

'আগের মতো ফল পাই না, সে কথা সত্যি।' চোখ জ্বলজ্বল করছে মিস্টার ন্যান্সির। 'তবে বড় বড় দুধ-ওয়ালা মেয়েমানুষের অভাবটা বেশি জ্বালায়। অনেকেই বলে, মেয়েমানুষের পেছনটা আগে দেখে নিতে হয়। তবে আমার মতে, বুক-ই আসল।' হাসিতে ফেটে পড়ল বৃদ্ধ, তাকে পছন্দ হয়ে গেল শ্যাডোর।

রেস্টরুম থেকে ফিরে এসেছেন ওয়েনসডে, ন্যান্সির সাথে হাত মেলালেন তিনি। 'শ্যাডো, কিছু খেতে চাও? পিজ্জা বা স্যান্ডউইচ?'

'ক্ষুধা পায়নি।'

'তোমাকে একটা কথা বলি, শোন।' বলল মি. ন্যান্সি। 'পরবর্তী খাবার সুযোগ কখন আসবে তা কেউ জানে না। তাই যখন কেউ তোমাকে খাবার খাওয়াবার প্রস্তাব দেয়, তখন দ্বিতীয়বার না ভেবে খেয়ে নাও। তোমার মতো আর যুবক নেই, কিন্তু অভিজ্ঞতা কম না। তাই বলছি, খাওয়া, প্রস্রাব করা আর ঘুমাবার সুযোগ হেলায় হারানো একদম উচিৎ না। বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমার আসলেই ক্ষুধা লাগেনি।'

'সাইজ তো বেশ ভালোই আছে,' শ্যাডোর হালকা ধূসর চোখে নিজের মেহগনি রঙা চোখ রাখল ন্যান্সি। 'তবে বুদ্ধি-শুদ্ধি খুব একটা আছে বলে মনে হচ্ছে। আমার এক ছেলে আছে, বুঝলে? তোমাকে দেখে ওর কথা মনে পড়ছে। যে কেউ ওকে এক হাটে কিনে দশ হাঁটে বেচতে পারবে!'

'কিছু মনে না করলে, আপনার কথাটাকে আমি প্রশংসা হিসাবেই নেব।'

'কোন কথাটা? তোমাকে বোকা বলা?'

'নাহ, আপনার পরিবারের একজনের সাথে তুলনা করাটা।'

সিগারের আগুন নিভিয়ে ফেলল মি. ন্যান্সি। তারপর হলদে গ্লাভস থেকে কাল্পনিক ছাই ঝাড়ার কাজে মত্ত হলো। 'একচোখার পছন্দ খুব একটা খারাপ না দেখছি।' ওয়েনসডের দিকে তাকাল সে। 'ভালো কথা, আজ রাতে কজন আসবে, জানো?'

'খবর তো সবাইকেই পাঠালাম।' বললেন ওয়েনসডে। 'অনেকেই আসতে পারবে না। আবার অনেকে,' চেরনোবোগের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। 'আসতে চাইবে না। তবে আশা করি কমসে কম কয়েক ডজন আসবে। খবরটা ছড়াতেও বেশি সময় লাগবে না।'

ডিসপ্লেতে রাখা অনেকগুলো বর্মের পাশ দিয়ে এগোল ওরা। কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা দরজা দিয়ে সবাইকে বের করে আনলেন ওয়েনসডে। ('এত হাঁটাহাঁটি করতে পারব না,' বলল ন্যান্সি। 'আমার বয়স কম হয়নি। আর

তাছাড়া, আমার বাড়িও উষ্ণ আবহাওয়ার এলাকায়।') এরপর আরেকটা করিডর, তারপর আরেক দরজা দিয়ে বের হয়ে ওরা উপস্থিত হলো ক্যারোসেল রুমে।

ক্যালিওপি সুর বাজছে–মাঝে মাঝে ভুল হচ্ছে সুর। যে দরজা দিয়ে ওরা ঢুকেছে, তার পাশেই ঝুলছে অনেকগুলো জীর্ণ, ক্যারোসেলে ব্যবহার করার ঘোড়া। কিছু রং-জ্বলা, কিছু ধুলো পড়া। মাথার উপরে, ছাদ থেকে ঝুলছে কয়েক ডজন পাখাওয়ালা দেবদূত। দোকানে ব্যবহৃত মেয়ে পুতুল ব্যবহার করা বানানো হয়েছে ওগুলো। প্রানহীন চোখে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে তারা।

আর আছে ক্যারোসেলটা।

সাইনবোর্ডের লেখা অনুসারে, দুনিয়াতে এর চাইতে বড় ক্যারোসেল আর নেই। ওটার ওজন, কয় হাজার বাল্ব ব্যবহার করা হয়েছে ইত্যাদির পাশাপাশি সাবধান বাণীও আছে ওখানেঃ কেউ যেন ওর পশুগুলোর পিঠে না চড়ে!

ক্যারোসেলের প্ল্যাটফর্মে বসান পশুগুলো দেখে অবাক না হয়ে পারল না শ্যাডো। শত শত সচরাচর আকারের পশু দিয়ে সাজানো হয়েছে ক্যারোসেলটা। কী নেই! আসল প্রাণী, কাল্পনিক প্রাণী, দুটোর সঙ্কর-সব আছে। একই রকম দুটো পশু-মূর্তি বসানো হয়নি ওখানে। মৎস্য-কন্যা আছে, আছে সেন্টর আর ইউনিকর্ন; হাতি, বুলডগ, ফিনিক্স, জেব্রা, বাঘ, ম্যান্টিকোর, ব্যাসিলিস, রাজহাঁস...এমনকী সমুদ্র-দানোও আছে! প্রতিটা উজ্জ্বল রঙে রঙ করা, যেন আসল সবগুলোই। গানের তালে তালে ঘুরছে ক্যারোসেল, একটা শেষ হতেই আরেকটা বেজে উঠল। এক মুহূর্তের জন্যও থামল না ওটা!

'কাহিনিটা কী?' প্রশ্ন করল শ্যাডো। 'বুঝলাম, এটা দুনিয়ার সবচেয়ে বড়, অগণিত প্রাণী আছে এখানে, সবসময় চালু থাকে। কিন্তু কেউ চড়ে না কেন?'

'মানুষের ব্যবহারের জন্য তো বানানো হয়নি এটাকে।' বললেন ওয়েডসেনডে। 'বানানো হয়েছে যেন সবাই দেখে মুগ্ধ হয়।'

'ঠিক যেন কোন প্রার্থনার চাকা-ঘুরতেই থাকে...ঘুরতেই থাকে। শক্তি সঞ্চয় করে।' বলল ন্যান্সি।

'অন্যদের সাথে আমরা কোথায় দেখা করছি।' প্রশ্ন শেষ হয়নি শ্যাডোর। 'আমি তো ভেবেছিলাম, এখানেই দেখা হবে। কিন্তু কেউ তো নেই!'

হাসলেন ওয়েনসডে; যে হাসি দেখলে রক্ত জমে যেতে চায়, সেই হাসি। 'শ্যাডো,' বললেন তিনি। 'অনেক বেশি প্রশ্ন করে ফেলছ। তোমাকে তো প্রশ্ন করার জন্য পয়সা দেয়া হয় না।'

'দুঃখিত।'

'তাহলে চুপ করে আমাদেরকে সাহায্য করায় মন দাও।' বললেন ওয়েনসডে। হেঁটে গেলেন প্ল্যাটফর্মের এক পাশে, যেখানে ক্যারোসেলের বর্ণনা আর সাবধানবাণী টানানো আছে!

কিছু একটা বলবে কিনা, ভাবল শ্যাডো। কিন্তু তা না করে, চুপচাপ একের পর এক সবাইকে তুলে দিল প্ল্যাটফর্মে। ওয়েনসডেকে বেশ ভারী মনে হলো ওর; চেরনোবোগের তেমন সাহায্যের দরকার হলো না, শ্যাডোর কাঁধে হাত রাখল কেবল সে। এদিকে ন্যান্সির ওজন যেন পাখির পালকের সময়। প্ল্যাটফর্মে উঠে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সবাই, এরপর ছোট্ট করে লাফ দিয়ে ঘূর্ণায়মান ক্যারোসেলের উপর উঠে পড়ল।

'দাঁড়িয়ে আছ কেন?' ধমকে উঠলেন ওয়েনসডে। 'আসবে না?'

শ্যাডো, একটু ইতস্তত করে উঠে পড়ল দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ক্যারোসেলে। তবে তার আগে একবার পেছনে তাকিয়ে নিতে ভুলল না, হাউজ অন দ্য রকের কোন কর্মী যদি ওকে নিয়ম ভাঙতে দেখে ফেলে! ক্যারোসেলে ওঠার পর অবাক হয়ে ভাবল ও-ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে গিয়ে যতটা দুশ্চিন্তা করেছে, এখানে নিয়ম ভাঙ্গার ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তা ওর তারচেয়ে বেশি!

তিন বৃদ্ধের সবাই একটা একটা করে পশুর পিঠে চড়ে বসলেন। ওয়েনসডে বেছে নিলেন একটা সোনালী নেকড়ে; চেরনোবোগ একটা সেন্টর আর ন্যান্সি সিংহ। বাজনা বেজে চলছে ওদের চারপাশে, ঘুরছে ক্যারোসেল।

হাসি ফুটেছে ওয়েনসডের মুখে, ন্যান্সি হাসছে প্রাণখুলে, এমনকী চেরনোবোগকে দেখে মনে হচ্ছে যে সে-ও মজা পাচ্ছে খুব। শ্যাডোর মনে হলো, বিশাল এক ভার যেন ওর কাঁধ থেকে নেমে গিয়েছে। তিন বুড়োই উপভোগ করছে সময়টা। ওদেরকে যদি কেউ ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করেও দেয়, তাতে কী? পৃথিবীর বৃহত্তম ক্যারোসেলে চড়া তো হলো! ওঠা হলো এই সব রাজকীয় দানোদের পিঠে!

নিজের জন্যও একটা পশু বেছে নেয়ায় মন দিল শ্যাডো। প্রথমে পছন্দ করল একটা বুলডগ, এরপর সোনালী হাউদাসহ একটা হাতি। কিন্তু চড়ে বসল ঈগলের মাথা আর বাঘের দেহওয়ালা একটা মূর্তির পিঠে।

নীল দানিয়ুবের সুর বাজছে। মাথার উপর জ্বলজ্বল করছে হাজার হাজার বাতি। এক পলকের জন্য যেন আবার বাচ্চা হয়ে গেল শ্যাডো। চুপচাপ, শক্ত করে বসে রইল ঈগল মাথা বাঘের পিঠে, কল্পনা করল যেন দুনিয়ায় ঘুরছে ওকে কেন্দ্র করে।

বাজনা ছাপিয়ে হাসির আওয়াজ ভেসে এলো ওর কানে। এক মুহূর্ত পর বুঝতে পারল, ওটার তারই হাসি। গত ছত্রিশটা ঘণ্টা যেন কোন দূর অতীত...যেন কোন কল্পনা। শুধু এই অল্প সময়ই নয়, বিগত তিনটা বছর যেন কোন বাচ্চার দুঃস্বপ্ন! যেন এখনও সে বসে আছে স্যান ফ্রান্সিসকোর গোল্ডেন গেট পার্কের ক্যারোসেলে। পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন ওর মা, গর্বিত চোখে সন্তানের দিকে তাকিয়ে আছেন। শ্যাডো ছোট্ট ছোট্ট হাতে শক্ত করে ধরে আছে আইসক্রিম, গলে গলে পড়ছে ওটা একটু একটু করে। মনে মনে প্রার্থনা করছে, কখনও যেন বন্ধ না হয় এই ক্যারোসেল... থেমে না যায় বাজনা...চলতেই থাকে...

...চলতেই থাকে।

আচমকা বন্ধ হয়ে গেল বাতি, দেবতাদেরকে দেখতে পেল শ্যাডো।

অধ্যায় ছয়

সোপানের দরজা খোলা,
যা দিয়ে করছে প্রবেশ রঙ-বেরঙা মানুষের মেলা!
ভোলগা থেকে এসেছে কেউ, কেউ এসেছে তাতারের শুষ্ক ভূমি থেকে,
সঙ্গী হয়েছে হোয়াং-হোর মানুষ, প্রাণে বাঁচারআকুতিতে।
দারিদ্র আর দুঃখ রেখে এসেছে পেছনে,
তবে এসেছে সাথে দেবতাদের নিয়ে; যারা চায় এখানেও রাজত্ববিস্তার করতে।

–থমাস বেইলি অ্যালড্রিক, 'দ্য আনগার্ডেড গেটস', ১৯৮২

এই তো কেবল পৃথিবীর বৃহত্তম ক্যারোসেলে ছিল শ্যাডো। দুই পা দিয়ে আঁকড়ে ধরেছিল ঈগল মাথার এক বাঘকে। মাথার উপর উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছিল হাজার হাজার বাতি, কানে ভেসে আসছিল যান্ত্রিক বাজনা।

আচমকা বদলে গেল সুরটা, মনে হচ্ছে যেন কেউ করতাল বাজাচ্ছে মন্দিরে। বাতির জায়গায় এখন কেবল তারার আলো, অথচ দেখতে কষ্ট হচ্ছে না এক বিন্দু। এমনকী পরিবর্তন এসেছে পশু-মূর্তিগুলোর মাঝেও। পায়ের ফাঁকে উষ্ণ দেহের আভাস পেল ও, নরম পালকের স্পর্শ অনুভব করল।

'কেমন লাগল, ভালো না?' পেছন থেকে ভেসে এলো একটা কণ্ঠ। শ্যাডো কানে যেমন শুনতে পেল, তেমনি শুনতে পেল মন দিয়েও।

আস্তে আস্তে ঘুরল ও, প্রতিটা মুহূর্ত...প্রতিটা ক্ষণ যেন আলাদা আলাদা করে দেখতে পেল সে। যেন ছোট ছোট সেকেন্ডগুলো অনন্ত কাল ধরে স্থির হয়ে আছে। কী দেখছে, তা বুঝতে পারল না ওর মন। ভাবল, মাছিরা বোধহয় তাদের অসংখ্য চোখ দিয়ে এভাবেই দেখতে পায় সবকিছু।

মি. ন্যান্সির দিকে তাকিয়ে আছে ও, লোকটা সরু গোঁফ-ওয়ালা এক বৃদ্ধ নিগ্রো। পরনে সেই জ্যাকেট আর সেই হলদে গ্লাভস, একটা সিংহের উপর বসে আছে সে। আবার একই সময়ে...একই জায়গায় একটা মাকড়সাকে দেখতে পাচ্ছে শ্যাডো। ঘোড়ার সমান বড় সেই মাকড়সার চোখ যেন কোন নেবুলা,

অনেক উপর থেকে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। আবার একই সময়...একই জায়গায় সে দেখতে পাচ্ছে এক অস্বাভাবিক লম্বা লোককে, বাদামী-কালো ত্বক আর তিন জোড়া হাত তার, মুখটা লাল রঙে রাঙ্গানো। দেখতে পাচ্ছে এক নিগ্রো বাচ্চাকে, ছেড়া-ফাটা পোশাক যার পরনে; বাঁ পাটা ফুলে আছে, মাছি ভন ভন করছে। এই সবার পেছনে একটা ছোট্ট বাদামী মাকড়সাও দেখতে পাচ্ছে ও, পাতার আড়ালে লুকিয়ে আছে।

এ সবই দেখছে শ্যাডো, বুঝতে পারছে-সবগুলো আসলে একটাই অস্তিত্ব।

'মুখ বন্ধ না করলে,' সবগুলো মি. ন্যান্সি এক সাথে বলে উঠল। 'কিছু একটা ঢুকে যেতে পারে কিন্তু।'

মুখ বন্ধ করে ঢোক গিলল শ্যাডো।

ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার এক মাইল মতো দূরত্বে একটা পাহাড়। পাহাড়ের উপর কাঠ নির্মিত একটা হল। ওটার দিকেই এগোচ্ছে ওরা। ওদের পশুগুলো কোন আওয়াজ না করেই পা ফেলছে।

চেরনোবোগ ওর সেন্টরটাকে সাথে নিয়ে এগিয়ে এলো। শ্যাডোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসব কিছুই সত্যি না। তাই বেশি ভেবে মাথা নষ্ট করো না।'

শ্যাডো লোকটার জায়গায় দেখতে পেল ধূসর চুলের এক বৃদ্ধ পূর্ব-ইউরোপবাসীকে। জীর্ণ রেইনকোট পরে যে আমেরিকার মাটিতে পা রাখছে। তবে সেই সাথে আরেকটা কালো অবয়বও দেখতে পেল, ওদেরকে ঘিরে রাখা অন্ধকারের চাইতেও কালো সেই অবয়ব; চোখ দুটো যেন জ্বলন্ত অঙ্গার। দেখতে পেল এক রাজকুমারকে, কালো চুল বাতাসে উড়ছে, ঠোঁটের উপর ঘন কালো গোঁফ। দুই হাত আর চেহারায় রক্তের ছাপ, নগ্ন অবস্থায় একটা সেন্টরের উপর বসে আছে।

'আপনারা কে?' জানতে চাইল শ্যাডো। 'কী আপনারা?'

এগিয়ে চলছে ওদের পশুগুলো, পাশেই সমুদ্র। রাতের সৈকতে আছড়ে পড়ছে ঢেউ।

ওয়েনসডে তার নেকড়েটাকে ওর দিকে নিয়ে এলেন, প্রানিটা এখন বিশালাকার ধারণ করেছে, সবুজ চোখ দিয়ে তাকিয়ে আছে ওকে লক্ষ করে। শ্যাডোর পশুটা ভয় পেয়ে সরে যেতে চাইল, বেচারার গলায় হাত বুলিয়ে শান্ত করার প্রয়াস পেল সে। কেন যেন ওর মনে হচ্ছে, এই নেকড়ের আরেকটা যমজ আছে। হয়তো চোখের আড়ালে থেকে নজর রাখছে ওটা।

'তুমি জানো, আমি কে?' মাথা উঁচু করে জানতে চাইলেন ওয়েনসডে। চোখ জোড়া যেন ক্ষণিকের জন্য জ্বলে উঠল। নাহ, চোখ জোড়া নয়, শুধু ডান

চোখটা। বাঁ দিকেরটা একদম নিষ্প্রভ। 'তোমাকে আমার নামগুলো বলি শোন। আমাকে ডাকা হয় যুদ্ধের দেবতা বলে; ডাকা হয় গ্রিম, রেইডার আর থার্ড বলেও। আমি এক-চক্ষু। আমি সর্বোচ্চ, সত্য-অন্বেষণকারী। আমি গ্রিমির, আমি আলখাল্লা-আবৃত। আমি সর্ব-পিতা। যত ধরনের বাতাস আছে, তারচেয়েও বেশি আছে আমার নাম। মৃত্যুর যত পন্থা আছে, তারচেয়েও সংখ্যায় অধিক আমার উপাধি। আমার দুই দাঁড়কাকের নাম হুগিন আর মুনিন, চিন্তা আর স্মৃতি। আমার দুই নেকড়ে ফ্রেকি আর গেরি। আমার অশ্ব, গ্যালোস।' দুইটি ভূতুড়ে দাঁড়কাক এসে বসল ওয়েনসডের দুই কাঁধে। এমনভাবে তার কানে নিজেদের চঞ্চু ঠেকাল যেন গ্রহণ করছে প্রৌঢ়ের মননের স্বাদ। আবার ডানা ঝাঁপটিয়ে উড়াল দিল তারা।

'বিশ্বাস রাখব কীসে?' ভাবল শ্যাডো। দুনিয়ার ভেতর থেকে একটা কণ্ঠ স্বর যেন সাথে সাথে জানিয়ে দিল ওকে–সবকিছুতে।

'ওডিন?' শব্দগুলো যেন বাতাসের রূপ নিয়ে আস্তে আস্তে বের হলো ওর গলা দিয়ে।

'ওডিন,' ফিসফিসিয়েই বললেন ওয়েনসডে। 'ওডিন,' এবার একটু জোরালো কণ্ঠে, যেন শব্দটার স্বাদ অনুভব করছেন মুখে। 'ওডিন।' এবার এত জোরে যে দুনিয়াই ভরে উঠল তার গলার স্বরে।

তারপর আচমকা...যেন এতক্ষণ সবকিছু স্বপ্নে দেখছিল...কাঠের দালানটায় আবিষ্কার করল শ্যাডো নিজেকে। বিশাল একটা দালান, তবে প্রাচীন। দেয়ালগুলো...কাঠের অবশ্যই, তবে ছাদটা খড় ছাওয়া। ঠিক মাঝখানে একটা অগ্নিকুণ্ড, ওটার ধোঁয়ায় শ্যাডোর চোখ জ্বলছে!

'আমার মনের ভেতর এসব করা উচিৎ ছিল,' বিড়বিড় করে শ্যাডোকে বললেন মি. ন্যান্সি। 'ওয়েনসডের মনে না। তাহলে অন্তত ঠান্ডায় জমতে হত না।'

'আমরা ওনার মনের ভেতর আছি?'

'অনেকটা সেরকম। এই হলের নাম ভালাস্কজালফ। ওডিনের প্রাচীন হলঘর এটা।'

স্বস্তির সাথে শ্যাডো টের পেল, ন্যান্সি এখন কেবল এক বৃদ্ধ মানুষ, সাথে অন্য কিছু নয়। দেয়ালের সাথে লাগান আছে কাঠের বেঞ্চ। ওতে বসে আছে দশজনের মতো মানুষ। একে অন্যের থেকে বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে বসেছে তারা। নানা ধরনের মানুষ–লাল শাড়ি পড়া কালো ত্বকের এক মহিলা

আছে, আছে কয়েকজন ব্যবসায়ীর মতো দেখতে পুরুষ। বাকিরা আগুনের এতটা কাছে গিয়ে বসেছে যে তাদেরকে ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছে না শ্যাডো।

'অন্যরা কোথায়?' ন্যান্সির দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে জানতে চাইলেন ওয়েনসডে, রাগ ঝরে পড়ছে গলা দিয়ে। 'আমাদের সংখ্যা তো অনেক, তার মাঝে মাত্র দশ জন এসেছে!'

'আমন্ত্রণ তো তুমি জানিয়েছ!' বলল ন্যান্সি। 'তবে দশজন যে এসেছে, তাই তো বেশি! এক কাজ করি, আমি নাহয় একটা গল্প বলে মিটিংটা শুরু করি।'

'অসম্ভব।' নাকচ করে দিলেন ওয়েনসডে।

'দেখে তো মনে হচ্ছে না যে এরা তোমার উপর খুব একটা সন্তুষ্ট,' বললেন ন্যান্সি। 'তাই বলি কী, একটা গল্প শোনাই। মাথাটা একটু ঠান্ডা হবে। তোমার সাথে কোন চারণ কবিও যেহেতু নেই, তাই আমি আর আমার গল্পই ভরসা।'

'গল্প-টল্প বাদ।' বললেন ওয়েনসডে। 'পরে ওসব করার অনেক সময় পাওয়া যাবে। এখন দরকার নেই।'

'ঠিক আছে, গল্প বাদ।' বলে হাসিমুখে অগ্নিকুণ্ডের দিকে এগোতে লাগল বৃদ্ধ লোকটা। 'অন্তত দু-চারটা কথা বলে মিটিং তো শুরু করতে দাও।'

'আমি জানি, তোমরা সবাই কী ভাবছ!' অগ্নিকুণ্ডের আলোতে ঠিকঠাক দেখা যায়, এমনভাবে দাঁড়িয়ে বলল ন্যান্সি। 'ভাবছ, বুড়ো আনানসি এখানে কী করছে? কেন সে-ই কথা শুরু করল? অথচ সর্ব-পিতা সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন! দিচ্ছি এসব প্রশ্নের উত্তর। এখানে পা রেখেই তোমাদেরকে দেখে আমার মনে একটা প্রশ্ন জন্ম নিয়েছে-বাকিরা কই? তবে মুখে ওটা উচ্চারণ করার আগেই মনে উত্তর পেয়ে গেলাম। আমরা সংখ্যায় অনেক অল্প আর দুর্বল, অথচ ওরা শক্তিশালী। কিন্তু তার অর্থ এই না যে আমরা হেরে গিয়েছি।

'একবার এক বাঘকে দেখেছিলাম, একটা ওয়াটার হোলের পাশ বসে ছিল সে। বিশ্বাস করো, আমার জীবনে এরচেয়ে বড় বিচি-ওয়ালা কোন প্রাণী দেখিনি। বাঘটার শরীরও ছিল রাজসিক। সামনের দাঁত দুটো যেন ছুরির সমান, ক্ষুরের চাইতেও ধারাল। সাহস জুগিয়ে ওর কাছে গিয়ে বললাম, বাঘ ভাই আমার, বিনা চিন্তায় গোসলে যেতে পারো। আমি আছি তো, তোমার বিচি দেখে রাখব। বিশ্বাস করল সে আমার কথা, ওয়াটার হোলে নেমে পড়ল। আমি ওই বিচি জোড়া নিয়ে নিজের ছোট ছোট মাকড়সার বিচি সেখানে রেখে দিলাম। তারপর কী করলাম শুনবে? দিলাম ভোঁ-দৌড়।

'পরের শহরে পৌঁছাবার আগে আর থামিনি। সেখানে দেখা হলো বানরের সাথে। তোমাকে দেখতে দারুণ লাগছে আনানসি, বলল বানর। সুযোগ বুঝে

জানতে চাইলাম, আসার পথে অসাধারণ এক গান শুনেছি। অন্যান্য শহরে সবাই খুব গাইছে, তুমি শুনেছ? বানর মাথা নেড়ে না করতেই নাচতে নাচতে শুনিয়ে দিলাম–

মজা করে চিবিয়ে, কোঁৎ করে গিলে,
খেয়েছি আমি বাঘের বিচি; নয় কো মনের ভুলে।
কে আমাকে রুখবে এখন, কে ঠেকাবে দেয়ালে,
খেয়েছি আমি বাঘের বিচি, কোঁৎ করে গিলে।

গান শুনে পেট ধরে হাসিতে ফেটে পড়ল বানর। একটু শান্ত হয়ে নিজেই গাইতে শুরু করল। দারুণ গান, বলল সে। আমার সব বন্ধুকে শোনাব।

'অবশ্যই, তাই করো। এই বলে আবার ওয়াটার হোলের কাছে চলে এলাম আমি।

বাঘটা তখন ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করছিল, আশেপাশে যাকেই পাচ্ছিল, তাকেই দেখাচ্ছিল ধারাল শ্বদন্ত। চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে, এমনভাবে আমার দিকে তাকাল ও। ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু বেচারার দুই পায়ের ফাঁকে নজর পড়তেই উবে গেল ভয়। ওখানে যে আমার দেখা সবচেয়ে ছোট ছোট একজোড়া বিচি ঝুলছে!

'এই আনানসি, আমাকে দেখে বলল সে। তোমার না আমার বিচি জোড়া পাহারা দেবার কথা? কিন্তু গোসল সেরে এসে দেখি, তুমিও নেই...আমার বিচিও নেই। আছে কেবল এই ছোট ছোট দুটো। ব্যাপার কী!

'আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টাটাই করেছি, জানালাম ওকে। কিন্তু একদল বানর এসে তোমার বিচি জোড়া খেয়ে ফেলে! যখন ওদেরকে তাড়া দিতে চায়, তখন টেনে খুলে ফেলে আমার বিচি। লজ্জায় তাই পালিয়ে গিয়েছিলাম।

'মিথ্যা কথা বলছ, আনানসি-বাঘ বলল। তোমার কলিজা আমি চিবিয়ে খাব। এই বলে যখন আমার দিকে এক পা এগিয়েছে, ঠিক তখন একদল বানরকে আসতে দেখল ও। লাফাতে লাফাতে তারা গাইছে–

মজা করে চিবিয়ে, কোঁৎ করে গিলে,
খেয়েছি আমি বাঘের বিচি; নয় কো মনের ভুলে।
কে আমাকে রুখবে এখন, কে ঠেকাবে দেয়ালে,
খেয়েছি আমি বাঘের বিচি, কোঁৎ করে গিলে।

গান শোনা মাত্র হুঙ্কার ছাড়ল বাঘ, ঝাঁপিয়ে পড়ল বানরদের উপর। এদিকে বাঘের হুঙ্কার শুনে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার অবস্থা বানরদের। চিৎকার করতে করতে এক লাফে উঠে পড়ল উঁচু উঁচু সব গাছের মগডালে। আর আমি? নতুন বড় বড় বিচি চুলকাতে চুলকাতে চলে এলাম ঘরে। আজও বানর দেখতে পেলেই পিছু নেয় বাঘ। তাই মনে রেখ সবাই, ছোট বা দুর্বল হওয়া মানেই কিন্তু শক্তিহীন হয়ে পড়া না।'

হাসি মুখে বাউ করল মি. ন্যান্সি, পেশাদারদের মতোই চারপাশ থেকে ভেসে আসা শুভেচ্ছা গ্রহণ করছে। এরপর ফিরে এলো চেরনোবোগ আর শ্যাডোর কাছে।

'গল্প বলতে না নিষেধ করেছিলাম।' বললেন ওয়েনসডে।

'এটাকে গল্প বলে?' বলল ন্যান্সি। 'আমি তো গলাই পরিষ্কার করতে পারলাম না। যাক গে, এবার যাও। নিজের ঝলকটা দেখাও।'

এবার ওয়েনসডের পাদ-প্রদীপ...নাহ, অগ্নি-প্রদীপের আলোয় আসার পালা। এগিয়ে গেলেন তিনি, আরমানি কোট পরনে বয়স্ক লোকটাকে দেখতে একটু অদ্ভুতই লাগছে। চুপচাপ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, একটা শব্দও উচ্চারণ করলেন না। কেউ যে এতক্ষণ এইরকম কোন পরিস্থিতিতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তা বিশ্বাস হতে চাইছিল না শ্যাডোর। অবশেষে নীরবতা ভেঙ্গে কথা বলে উঠলেন তিনি, 'তোমার আমাকে চেন...তোমরা সবাই আমাকে চেন। কেউ কেউ আমাকে পছন্দ করো, কেউ কেউ অপছন্দ। তবে আমি আসলে কে, সেটা তোমাদের সবার জানা আছে।'

বেঞ্চে বসে থাকা লোকজন নড়ে-চড়ে উঠল।

'আমি তোমাদের প্রায় সবার চাইতেই আগে থেকে এখানে আছি। তোমাদের মতো আমিও ভাবতাম, যেভাবে চলছে, চলুক না। হয়ে যাচ্ছে তো। হ্যাঁ, আরামে আয়েসে হয়তো থাকতে পারছি না। কিন্তু টিকে তো আছি।

'তবে এখন আর সেই পরিস্থিতি নেই। ঝড় আসছে একটা, সেই ঝড় কিন্তু আমরা তৈরি করিনি।'

একটু থামলেন তিনি, এরপর এক পা এগিয়ে বুকের উপর হাত বাঁধলেন।

'লোকেরা যখন আমেরিকায় এলো, তখন সাথে করে নিয়ে এলো আমাদের। আমি, লোকি আর থর, আনানসি, লেপ্রিকন, ব্যানশি, কোবোল্ড, কুবের, অ্যাসটারথ-আমাদের সবাইকে ওরাই এনেছে। এনেছে তোমাদেরকেও। অভিবাসীদের মনকে নিবাস বানিয়ে আমরা সমুদ্র পাড়ি দিয়েছি।

'এই দেশটা অনেক বড়। দেখা গেল, এখানে আসার কিছুদিনের মাঝেই আমাদেরকে নিয়ে আসা লোকরাই আমাদেরকে পরিত্যাগ করছে। পুরনো দেশের পুরনো স্মৃতি বলে ধরে নিয়েছে আমাদের। যারা উপাসক ছিল, একে একে মৃত্যু বরণ করেছে সবাই। অনেকে আবার উপাসনা করাও ছেড়ে দিয়েছে। এদিক-ওদিক থেকে পাওয়া টুকরা-টাকরা উপাসনার উপর ভর করে এতদিন টিকে ছিলাম ভীত, সন্ত্রস্ত আর পরিত্যক্ত আমরা। লোকচক্ষুর আড়ালে, সবার অলক্ষ্যে টিকে থেকেছি।

'স্বীকার করতেই হয়, আমাদের প্রভাব একেবারেই কমে এসেছে। এখান থেকে চেয়ে, ওখান থেকে চিন্তে বেঁচে থাকতে হয় আমাদের। ন্যাংটা হয়ে নাচ দেখিয়ে আর বড়লোকদের গাড়িতে তেল ভরে পয়সা কামাই, আর সেটা উড়িয়ে দেই মদ খেয়ে। আমরা...দেবতারা, এই দেবতাবিহীন দেশে এভাবেই টিকে আছি কোনক্রমে।'

আবার বিরতি নিলেন ওয়েনসডে। একে একে সবার দিকে তাকালেন তিনি, দক্ষ প্রশাসকের মতো এক অর্থবহুল হাসি ফুটিয়ে তুললেন চেহারায়। অথচ শ্রোতামণ্ডলীর মুখে হাসি নেই, নিঃস্পৃহতার মুখোশ পরে বসে আছে যেন। গলা পরিষ্কার করলেন ওয়েনসডে, থুথু ফেললেন আগুনের মাঝে। সাথে সাথে যেন লাফিয়ে উঠল শিখা, এক পলকের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল চারপাশ।

'তোমরা সবাই নিশ্চয় যার যার মতো করে আবিষ্কার করেছ-এই দেশে নতুন কিছু দেবতা শক্তিশালী হতে শুরু করেছে। ক্রেডিট কার্ড আর ফ্রি-ওয়ের দেবতা, ইন্টারনেট আর টেলিফোনের প্রভু; রেডিও, হাসপাতাল আর টেলিভিশনের ভগবান, বিপার আর নিয়ন লাইনের হর্তা-কর্তা। এরা সবাই অহংকারী, মোটা-সোটা আর বোকা। নিজেদের গুরুত্ব আর নতুনত্বের মোহে অন্ধ।

'আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অজানা নেই তাদের। ওরা আমাদেরকে ভয় পায়, ঘৃণা করে।' বললেন ওডিন। 'যদি অন্য কিছু ভেবে থাকো তো চোখে ঠুলি পরে আছ! আমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। পারলে যেকোন দিন করেই বসবে। তাই এখনই সময়, এক হবার। এখনই সময়, পদক্ষেপ নেবার।'

লাল শাড়ি পরা বৃদ্ধা মহিলা এগিয়ে এলেন। তার মাথায় একটা ছোট্ট, নীল মণি। বললেন, 'এইসব ছাইপাঁশ শোনাবার জন্য ডেকে এনেছ আমাদের?' ঘোঁত করে উঠলেন তিনি। কিছুটা বিরক্তিতে, আর অনেকটা মজা পেয়ে।

কোঁচকানো ভ্রূ মসৃণ হয়ে এলো ওয়েনসডের। 'মানছি, আপনাদেরকে আমিই ডেকেছি, মামা-জী। কিন্তু এসব কথা ছাইপাঁশ নয়, গুরুত্বপূর্ণ। হাঁটুর বয়সী বাচ্চাও তা বুঝতে পারবে।'

'কী বলতে চাচ্ছ, আমার বুদ্ধি হাঁটুর বয়সী একটা বাচ্চার চাইতেও কম?' একটা আঙুল তুলে নাচালেন তিনি.। 'কালীঘাটে বসে বসে যখন বুড়ো হয়েছি, তখনও তোমার কথা কেউ কল্পনা করতেই শুরু করেনি, বুঝেছ? আর আমি কিনা বাচ্চার চাইতেও অবোধ! ঠিক আছে, তাহলে তাই। কেননা তোমার কথা পুরোই বাতুল।'

আরেক বার দ্বৈত দৃশ্য ধরা দিল শ্যাডোর চোখে–বৃদ্ধাকে দেখতে পেল সে, বিরক্ত চেহারায় তাকিয়ে আছে। কিন্তু তার পেছনে বৃহদাকার কিছু একটা দেখতে পেল ও। সদ্য কেনা চামড়ার জ্যাকেটের চাইতেও কালো ত্বকের এক নগ্ন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। মুখ আর ঠোঁট যেন ধমনীতে বয়ে চলা রক্তের চাইতেও বেশি লাল! তার গলায় খুলি দিয়ে বানানো মালা ঝুলছে। অগণিত হাতে ধরে আছে ছুরি, তলোয়ার আর কর্তিত মস্তক!

'আমি আপনাকে তা বলিনি, মামা-জী।' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললেন ওয়েনসডে। 'কিন্তু যে কেউ বুঝতে পারবে-'

'একমাত্র যে জিনিসটা যে কেউ বুঝতে পারবে, তা হলো...' বললেন বৃদ্ধা, আঙুল দিয়ে ওডিনের দিকে ইঙ্গিত করছেন (তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা কালো মহিলাও তাই করল)। '...যশের নেশায় তুমি অন্ধ হয়ে গিয়েছ। অনেকদিন হলো এই দেশে আমরা শান্তির সাথে বাস করছি। মানছি, আমাদের মাঝে কেউ কেউ অন্যদের তুলনায় একটা ভালো অবস্থানে আছে। ভারতে আমার আরেক অবতার কিন্তু আমার চাইতেও ভালো আছে। তাই বলে আমার ঈর্ষান্বিত হবার তো কোন মানে হয় না! অনেক নতুন দেবতাকে উপরে উঠতে দেখেছি, কেউ টেকেনি। কালের সাথে সাথে ধ্বসে পড়েছে তারা সবাই।' হাত নামিয়ে রাখলেন তিনি। অন্যরা তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কারও চোখে সম্মান, কারও কৌতুক আর কারও কারও লজ্জা। 'এই তো, কয়েক বছর আগেই আমেরিকা উপাসনা করল রেল লাইনের। আর এখন? ইস্পাতের দেবতাকে ভুলে...'

'আপনি যা বলতে চাইছেন তা সরাসরি বলুন, মামা-জী।' বললেন ওয়েনসডে।

'আমি কী বলতে চাইছি?' নাকের পাটা ফুলে উঠল মহিলার। 'আমি...যে কিনা একটা বাচ্চারও অধম...বলতে চাই যে আমাদের অপেক্ষা করা উচিৎ।

কোন পদক্ষেপ নেবার দরকার নেই। ওরা যে আমাদের ক্ষতি করতে চায়, এমন কোন প্রমাণ কিন্তু নেই!'

'যখন রাতের আঁধারে ওরা আমাদেরকে খুন করতে আসবে, তখন আমরা কী করব?'

চেহারায় ফুটে ওঠা বিরক্ত আর কৌতুক ধরতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হলো না শ্যাডোর। 'আমাকে ধরতে পারবে না, খুন করা তো দূরে থাক।'

পেছনে বসে থাকা এক যুবক ওয়েনসডের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কেশে উঠল। তারপর ভরাট কণ্ঠে বলল, 'সর্ব-পিতা, আমার লোকেরা ভালোই আছে। যা পেয়েছি, তা নিয়ে বিনা অসুবিধাতেই দিন কাটাচ্ছি। আপনার এই যুদ্ধের ফল যদি আমাদের বিপক্ষে যায়, তবে সব হারাতে হবে।'

'চোখ খুলে দেখ, বাছা।' বললেন ওয়েনসডে। 'তোমার সব হারিয়ে বসেছ। আমি চাইছি তোমাদেরকে কিছু ফেরত পাবার সুযোগ করে দিতে।'

আমি আসলে এগুলো বিশ্বাস করি না, ভাবল শ্যাডো। এসবের কিছুই বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। আসলে আমার বয়স এখনো পনেরো। মা এখনও বেঁচে আছেন, লরার সাথে এখনও দেখাই হয়নি। এ সবকিছু আসলে স্বপ্ন...হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্বপ্ন ছাড়া কিছুই না।

অথচ এই ভাবনাটাও বিশ্বাস হচ্ছে না ওর, দুনিয়াতে টিকে থাকতে হলে মানুষকে তার ইন্দ্রিয় আর তার স্মৃতির উপর বিশ্বাস করে থাকতে হয়। যদি ওগুলোও মিথ্যা বলে, তাহলে আর কোন কিছুতেই বিশ্বাস রাখা চলে না।

আচমকা বন্ধ হয়ে গেল আগুন, অন্ধকার নেমে এলো ওডিনের হলে।

'এবার?' ফিসফিস করে জানতে চাইল শ্যাডো।

'এখন আমরা ক্যারোসেলের ঘরটায় ফিরে যাব,' জানাল ন্যান্সি। 'বুড়ো এক-চোখা আমাদেরকে রাতের খাবার খাওয়াবে। চেষ্টা করবে কয়েকজনকে তেল মারার। আর কেউ 'দ' শব্দটা উচ্চারণও করবে না।'

'দ-শব্দ?'

'দেবতা। সত্যি বলছি, ঘটে কি তোমার একটুও ঘিলু নেই? যেদিন মানুষকে মগজ দেয়া হচ্ছিল, সেদিন কোথায় ছিলে?'

'একজন বাঘের বিচি চুরি করার গল্প বলছিল, সেটা শুনতে গিয়ে আর মগজ আনতে পারিনি।'

হাসল মি. ন্যান্সি।

'কিন্তু কোন সিদ্ধান্তেই তো উপনীত হওয়া গেল না!'

'আস্তে আস্তে সবাইকে রাজি করাচ্ছে ওয়েনসডে, এক এক করে। শেষ পর্যন্ত জয় হবে ওরই।'

আচমকা শ্যাডো টের পেল, কোত্থেকে যেন ঠান্ডা বাতাস বইছে। চোখ খুলে দেখতে পেল, সেই ক্যারোসেলের ঘরটায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা! চারপাশে পর্যটক, সবাই ঘিরে আছে ওয়েনসডেকে।

'এদিক দিয়ে এসো সবাই,' গমগমে কণ্ঠে বললেন তিনি। ঘরটা থেকে বেরোবার একমাত্র দরজার দিকে এগোল সবাই। পর্যটকদের মাঝে দক্ষ রাজনীতিবিদের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন ওয়েনসডে। এর প্রশংসা করছেন, ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

'স্বপ্ন ছিল না তো সব?' জিজ্ঞাসা করল শ্যাডো।

'কী সব?'

'ওই হলঘর, আগুন, বাঘের বিচি, ক্যারোসেলে চড়া।'

'ক্যারোসেলে চড়া! ওই কাজটা তো নিষিদ্ধ! কেন, নোটিশ পড়নি? এখন চুপ করো।'

চুপচাপ ওয়েনসডের দেখান পথ ধরে বাইরে চলে এলো ওরা।

শ্যাডো আর ন্যান্সি এলো সবার পেছনে। হাউজ অন দ্য রক থেকে বের হবার পর, সরাসরি রওনা হলো পার্কিং-লটের দিকে।

'শেষ হবার আগেই বিদায় নিতে হচ্ছে,' বলল ন্যান্সি। 'দুনিয়ার সবচেয়ে বড় কৃত্রিম অর্কেস্টা দেখতে পেতাম।'

'আমি দেখেছি,' বলল চেরনোবোগ। 'তেমন ভালো কীছু না।'

রেস্তোরাটা রাস্তায় দশ মিনিট দূরত্বে। ওয়েনসডে তার দশ অতিথির সবাইকে রাতের খাবারের দাওয়াত দিয়েছেন। এমনকী যাদের গাড়ি নেই, তাদের রেস্তোরায় যাবার ব্যবস্থাও করেছেন।

গাড়ি নেই যাদের, তারা কীভাবে হাউজ অন দ্য রকে এসে পৌঁছাল তা বুঝে পেল না শ্যাডো। কীভাবে ফিরে যাবে, তাও ধরতে পারল না সে। তবে বলল না কিছুই, এসব পরিস্থিতিতে কিছু না বলাটাই ভালো।

ওয়েনসডের কয়েকজন অতিথিকে গাড়িতে তুলল শ্যাডো। লাল শাড়ি পরা বৃদ্ধা ওর সাথে সামনে বসল, অদ্ভুত দর্শন যুবক পেছনে-তার নাম এলভিসের মতো শোনায়। আরেকজন এলভিসের সাথে পেছনে বসল, কিন্তু শ্যাডোর তাকে মনে নেই।

লোকটা যখন গাড়িতে ঢোকে, তখন পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল ও। এমনকী তার জন্য দরজা খুলেছিল আর বন্ধও করেছিল। অথচ তার ব্যাপারে কিছুই মনে নেই শ্যাডোর। ড্রাইভার সিট থেকে পিছু ফিরে একবার তাকাল ও। সাবধানতার সাথে মুখস্থ করল যেন তার চেহারা, পোশাক, চুল। ভবিষ্যতে যদি কখনও দেখা হয়, তাহলে যেন চিনতে পারে। কিন্তু যখন রাস্তার দিকে তাকাল তখন টের পেল, লোকটার ব্যাপারে কিছুই মনে নেই ওর!

আসলে আমি ক্লান্ত, ভাবল শ্যাডো। আড়চোখে ডান দিকে তাকাল ও। প্রথমেই নজরে পড়ল ওর গলার নেকলেসটা। মহিলা নড়ার সাথে সাথে ছোট ছোট ঘণ্টার মতো আওয়াজ করে উঠল তার হাতের বালাগুলো। কপালের নীল মণিটার রঙও আরও ঘন দেখাচ্ছে। শরীর থেকে মসলা আর নাটমেগের গন্ধ ভেসে আসছে ওর নাকে। ওকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসল মামা-জী।

'আমাকে মামা-জী বলে ডাক।' বললেন মহিলা।

'আমি শ্যাডো, মামা-জী।' বলল শ্যাডো।

'তোমার মনিবের পরিকল্পনা কেমন ঠেকছে, মিস্টার শ্যাডো?'

গতি একটু কমাল ও। 'আমি প্রশ্ন করি না, তিনি-ও উত্তর দেন না।'

'আমার কী মনে হয় জানো? ওডিন আসলে চায় শেষ একটা যুদ্ধ। আমাদের বয়স যথেষ্ট হয়েছে, তাই হয়তো অনেকে রাজিও হয়ে যাবে।'

'প্রশ্ন করাটা আমার দায়িত্বের মাঝে পড়ে না, মামা-জী।' বলল শ্যাডো। গাড়ির ভেতরটা ভরে উঠল বৃদ্ধা মহিলার হাসির খনখনে আওয়াজে।

পেছনে বসে থাকা লোকটা...না, না; অদ্ভুত-দর্শন যুবক নয়, অন্যজন...কিছু একটা জানতে চাইল। উত্তরও দিল শ্যাডো। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই আর প্রশ্নটা মনে করতে পারল না সে।

অদ্ভুত-দর্শন যুবক চুপচাপ বসে ছিল এতক্ষণ, এবার গুনগুণ করে গাইতে শুরু করল। গভীর, মেটালিক একটা সুর...যার তালে তালে কাঁপতে শুরু করল যেন গাড়ির ভেতরটা।

যুবক লম্বায় আর দশজনের মতোই। কিন্তু তার বুকটা অদ্ভুত। এতদিন কেবল শুনেই এসেছে শ্যাডো-কারও কারও বুক ব্যারেলের মতো হয় দেখতে। এই প্রথম দেখতে পেল। তার পা গুলো গাছের গুঁড়ির মতো, হাতগুলো যেন শুয়োরের হাঁটুর মতো। পরনে হুডওয়ালা একটা কালো পার্কা, তার উপরে বেশ কয়েকটা সোয়েটার। সবার উপরে চরিয়েছে পুরু ডাঙ্গারিজ। শীতের সাথে তাল মেলাবার জন্য পরা এই পোশাকগুলোর সাথে সাদা টেনিস শ্যু মিলে কিম্ভুতকিমাকার লাগছে তাকে।

'সুরটা একটু কড়া।' ড্রাইভারের সিট থেকে বলল শ্যাডো।

'দুঃখিত।' লজ্জিত কণ্ঠে বলল যুবক, বন্ধ করে দিল গুনগুণ করা।

'আমার ভালোই লাগছে,' বলল শ্যাডো। 'থেমো না।'

একটু ইতস্তত করল যুবক, তারপর আবার শুরু করে দিল। আগের মতোই ভরাট কণ্ঠে ভরে উঠল গাড়ির ভেতরটা। তবে এবার ফাঁকে ফাঁকে শব্দ উচ্চারণ করল কিছু। 'ডাউন, ডাউন, ডাউন।'

রাস্তার সবগুলো দালান আর অফিস বিল্ডিং-এ শোভা যাচ্ছে ক্রিসমাসের আলোকসজ্জা। ওগুলো দেখতে দেখতে কখন যে রেস্তোরা এসে পড়ল, টেরই পেল না শ্যাডো। বার্ণের মতো দেখতে দালানটার সদর দরজায় গাড়ির আরোহীদের নামিয়ে দিয়ে নিজে চলে গেল পার্কিং-লটে। ঠান্ডা হাওয়ায় একা একা কিছুক্ষণ হাঁটতে চায় ও।

একটা কালো ট্রাকের পাশে পার্ক করল নিজের গাড়ি, দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ঠান্ডা বাতাসে বাষ্পে পরিণত হচ্ছে ওর নিঃশ্বাস। রেস্তোরার ভেতরে কী হচ্ছে তা আঁচ করতে পারছে শ্যাডো। ওয়েনসডে অতিথিদেরকে একটা বড় টেবিলে বসাচ্ছেন। সত্যি সত্যি গাড়িতে কালী ছিল নাকি? ভাবল ও। তারচেয়ে বড় চিন্তার কথা, পেছনে বসা সেই বারবার ভুলে যাওয়া লোকটা কে?

'ওই, ম্যাচ আছে?' কিছুটা পরিচিত, কিছুটা অপরিচিত একটা কণ্ঠের প্রশ্নে সম্বিত ফিরল শ্যাডোর। ঘুরে দাঁড়িয়ে না বলতে যাবে, এমন সময় চুপ হয়ে গেল। কেননা বাঁ চোখের ঠিক সামনেই ধরা আছে একটা পিস্তল। আচমকা ওর পা জোড়া যেন হাল ছেড়ে দিল, পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলাবার জন্য একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে। এদিকে কে যেন নরম কিছু একটা ওর মুখে গুঁজে দিয়েছে।

চিৎকার করতে চাইল শ্যাডো, চাইল ওয়েনসডেকে...ওদের সবাইকে সাবধান করে দিতে। কিন্তু অর্থহীন কয়েকটা আওয়াজ ব্যতীত আর কিছু ওর মুখ দিয়ে বের হলো না।

'টার্গেটরা ভেতরে,' অর্ধ-পরিচিত কণ্ঠটা বলল। 'সবাই তৈরি?' রেডিওর অপর প্রান্ত থেকে উত্তর দিলে কেউ প্রশ্নটার। 'তাহলে কাজে নামা যাক।'

'এই বিশালদেহিকে নিয়ে কী করব?' আরেকটা কণ্ঠ জানতে চাইল।

'নিয়ে চলো।' প্রথম কণ্ঠটা উত্তর দিল।

ব্যাগের মতো কিছু একটা দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো শ্যাডোর মাথা, এরপর হাত আর পা বাঁধা হলো টেপ দিয়ে। ট্রাকের পেছনে ওকে তুলে, রওনা দিল দ্বিতীয় লোকটা।

শ্যাডোকে আটকে রাখা ছোট্ট ঘরটায় কোন জানালা নেই। আছে একটা প্লাস্টিকের চেয়ার, ভাঁজ করা যায় এমন একটা টেবিল, আর ঢাকনাসহ একটা বালতি। বালতিটাকে আপাতত টয়লেট হিসেবে ব্যবহার করছে শ্যাডো। মেঝেতে ছয়-ফুট লম্বা একটা ফোম আছে, আছে পাতলা একটা কম্বল। কম্বলটার মাঝখানে একটা একটা বাদামী দাগ, রক্তের হতে পারে। আবার হতে পারে পায়খানারও! অনুসন্ধান করে দেখার ইচ্ছা নেই শ্যাডোর। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা নগ্ন বাতি জ্বলছে, কিন্তু কোন সুইচ নেই দেয়ালে। সবসময় জ্বলছে তো জ্বলছেই। একটা দরজাও আছে বটে, কিন্তু সেটায় কোন হ্যান্ডেল নেই।

ক্ষুধা পেয়েছে শ্যাডোর।

কিম্ভূত লোকগুলো ওর হাত-পায়ের বাঁধন আর মুখের গোঁজ খোলার পর, ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে এই ঘরটার। প্রথম যে কাজটা শ্যাডো করেছে, তা হলো ঘরের ভেতরটা সাবধানতার সাথে ঘুরে দেখা। দেয়ালে আঘাত করে দেখেছে, কেমন যেন ধাতব আওয়াজ শুনতে পেয়েছে ফলশ্রুতিতে। দেয়ালের একদম উপরের দিকে রয়েছে একটা ছোট গ্রিল, বাতাস চলাচলের জন্য। দরজা ভালোভাবে বন্ধ করা।

এরপর নিজের দিকে নজর দিয়েছে ও, বুঝতে পারছিল যে বাঁ ভ্রূর উপর থেকে আস্তে আস্তে রক্ত ঝরছে। মাথাটাও যন্ত্রণা করছিল খুব।

মেঝেতে কার্পেট-টার্পেটের বালাই নেই। পা ঠুকে দেখেছে, মেঝে থেকেও ধাতব আওয়াজ আসছে!

বালতির ঢাকনা সরিয়ে ওতে প্রস্রাব করে হালকা হয়ে নিয়েছে ও, নিজস্ব হিসাব অনুযায়ী আক্রান্ত হবার পর মাত্র ঘণ্টা চারেক পার হয়েছে।

ওয়ালেট নেই পকেটে, কিন্তু পয়সাগুলো নেয়নি কিম্ভূতেরা।

চেয়ারে বসে পড়ল যুবক। পয়সার খেলা খেলতে শুরু করল ও। প্রথমে নিচ থেকে পয়সা টেবিলের ভেতর দিয়েই কীভাবে উপরে আনা যায়, সেই অনুশীলন করল। এরপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল অন্যান্য খেলা দেখাবার কাজে।

দরকারও ছিল। এই খেলাগুলো অনুশীলনের সময় শ্যাডো তার পূর্ণ মনোযোগ ব্যয় করে। অন্যভাবে বলতে গেলে, মনের ভেতর ক্রোধ বা বিভ্রান্তি

থাকলে, পয়সার খেলা দেখান সম্ভব হয় না ওর পক্ষে। তাই কেন জানি পয়সা হাতে নিলেই শান্ত হতে শুরু করে ওর মন, ভয় আর বিভ্রান্তি দূর হয়ে যায়।

অনুশীলন করছে আর ভাবছে, ওকে কি এই কিম্ভূত লোকগুলো খুন করে ফেলবে? ভাবনাটা মনে আসা মাত্র হাতটা যেন একটু কেঁপে উঠল। টেবিলের উপর পড়ে গেল হাতের পয়সা।

এখন আর হবে না বুঝতে পেরে, পয়সাগুলো সরিয়ে নিল শ্যাডো। হাতে রইল কেবল যরিয়া পলুনোচনেয়ার দেয়া লিবার্টির ছবিওয়ালা পয়সাটা। শক্ত করে চেপে ধরল ওটাকে মুঠোয় নিয়ে।

শুরু হলো অপেক্ষা।

ভোরের প্রায় তিনটার সময়, কিম্ভূতেরা ফিরে এলো ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। দুজন মানুষ, কালো স্যুট পরে আছে। চুলগুলোও কালো, কালো পায়ের জুতোজোড়াও। একজনের চিবুক চারকোনা, কাঁধ প্রশস্ত, দেখে মনে হয় যেন কলেজে থাকার সময় ফুটবল খেলত। কেবলমাত্র নখের অবস্থা বাজে, প্রায় সবগুলো দাঁতে-কাঁটা! অন্যজনের বয়স একটু বেশি, মাথার চুল কমে এসেছে, চোখে রূপালী রিমের চশমা। এ আবার তার নখগুলোর বেশ ভালোই যত্ন নেই। দুজনের মাঝে কোন মিলই নেই। তবে শ্যাডোর মনে হলো, একেবারে ভেতরে, দুজন আসলে একই অস্তিত্ব। টেবিলের দুই পাশে দাঁড়াল দুই কিম্ভূত, ওর দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে।

'কার্গোর হয়ে কতদিন হলো কাজ করছেন, স্যার?' একজন প্রশ্ন করল।

'কার্গো? মানে?'

'নিজেকে সে ওয়েনসডে নামে পরিচয় দেয়। কখনও গ্রিম, কখনও সর্ব-পিতা বলে।'

'কয়েকদিন হবে।'

'আমাদের সাথে মিথ্যা বলবেন না, স্যার।' চশমা-ওয়ালা কিম্ভূতের মন্তব্য।

'ঠিক আছে, বললাম না। আসলেই কয়েকদিন হয়েছে।'

চৌকা-চোয়াল কিম্ভূত ঝুঁকে এসে শ্যাডোর কানটা দুই আঙুলের ফাঁকে ধরল। একই সাথে মোচড়াতে আর চাপ দিতে শুরু করল সে। প্রচণ্ড ব্যথা পেল ও। 'মিথ্যা বলতে মানা করেছিলাম, স্যার।' বলেই ছেড়ে দিল কান।

দুই কিম্ভূতেরই জ্যাকেটের নিচে বন্দুক আছে, ফোলা দেখেই টের পাচ্ছে শ্যাডো। তাই প্রতি-আক্রমণ করতে গেল না। এমনভান করল যেন ফিরে

গিয়েছে জেলে। মাথা নিচু করে থাকো, ভাবল শ্যাডো। এমন কিছু ওদেরকে বোলো না, যা তারা ইতিমধ্যেই জানে। আর প্রশ্নটা তো ভুলেও করো না।

'এই লোকগুলো খুব বিপদজনক, স্যার।' চশমা-ওয়ালা কিম্ভূত বলল। 'ওদের বিরুদ্ধে তথ্য দিয়ে নিজের আর দেশের উপকারই করবেন, স্যার।' সহানুভূতির হাসি হাসল সে।

'ওহ।' কেবল এতটুকুই বলল শ্যাডো।

'আর যদি সাহায্য না করেন, স্যার।' চৌকা-চোয়াল বলল। 'অখুশি হলে আমরা যে পশু হয়ে যাই, তা নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।' হাত মুঠি না করেই শ্যাডোর পাকস্থলীতে মাপা হাতের আঘাত হানল সে। নাহ, অত্যাচার শুরু হয়নি। কেবল নিজের অত্যাচার করার ইচ্ছার প্রমাণ দিল লোকটা।

'আমি আপনাদের দুজনকেই খুশি করতে চাই।' দম ফিরে পেলে বলল শ্যাডো।

'আপনার সহযোগিতা চাই কেবল, স্যার।'

'আমি কি জানতে পারি...' বলতে বলতেই আঁতকে উঠল ও (ধুস, প্রশ্ন করা উচিৎ হয়নি)। '...কাদেরকে সহযোগিতা করছি।'

'আমাদের নাম জানতে চাচ্ছেন?' চৌকা কিম্ভূত জিজ্ঞাসা করল। 'ফাজলামি করেন?'

'নাহ, লোকটার কথায় যুক্তি আছে।' চশমা কিম্ভূত বলল। 'এতে আমদেরকে তথ্য দেয়াটা ওর জন্য সহজ হবে।' এমনভাবে হাসল লোকটা যেন টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন করছে। 'আমি মিস্টার স্টোন, স্যার। আর আমার সহকর্মী, মিস্টার উড।'

'আসলে,' বলল শ্যাডো। 'আমি জানতে চাচ্ছিলাম, আপনারা কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করছেন?'

মাথা নাড়ল স্টোন। 'আহ, প্রশ্নটার উত্তর খুব একটা সহজে দেয়া সম্ভব না, স্যার।'

'সরকারি প্রতিষ্ঠান,' বলল উড। 'বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এরকম শত শত প্রতিষ্ঠান এখন মাঠে নেমেছে, জানেনই তো!'

'তবে এতটুকু নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি,' আবারও সুন্দর করে হেসে বলল স্টোন। 'আমরা ভালোর পক্ষে। আপনার ক্ষুধা লেগেছে, স্যার?' বলে পকেট থেকে একটা স্নিকারস বার বের করল সে। 'এই নিন, উপহার।'

'ধন্যবাদ,' শ্যাডো বললেন। বারটা খুলে মুখে দিল ও।

'সাথে পান করার জন্য কিছু নেবেন? কফি? বিয়ার?'

'পানি হলে ভালো হয়।'

দরজার কাছে চলে গেল স্টোন, নক করে ওপাশে দাঁড়ান গার্ডকে বলল কিছু একটা। একটু পরেই ফিরে এলো পলিস্টাইরিন কাপ ভর্তি পানি নিয়ে।

'সি.আই.এ.,' বলল উড। মাথা নাড়তে নাড়তে যোগ করল। 'ওই বলদগুলোকে নিয়ে নতুন একটা কৌতুক শুনলাম, বুঝেছ স্টোন। শোন, কেনেডি হত্যার পেছনে যে সি.আই.এ.র হাত নেই, সেটা নিশ্চিত হবে কী করে?'

'আমি জানি না,' বলল স্টোন। 'কীভাবে?'

'হত্যাকাণ্ড সফল হয়েছে যে, তাই!' হাসিতে ফেটে পড়ল দুজন।

'পানি খেতে ভালো লাগছে, স্যার?' জানতে চাইল স্টোন।

'কিছুটা।'

'তাহলে আজ সন্ধ্যায় কী কী করলেন, সেগুলো বলুন, স্যার।'

'পর্যটকরা যা করে, তাই। আমরা হাউজ অন দ্য রকে গেলাম, সেখান থেকে একটা রেস্তোরায়। বাকিটা তো আপনাদের জানা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্টোন, হতাশা ভরে মাথা নাড়ল উড নিজেও। নাড়তে নাড়তেই লাথি হাঁকাল শ্যাডোর মালাইচাকি লক্ষ করে। তীব্র ব্যথায় আরেকটু হলেই চিৎকার করে উঠছিল ও। কিন্তু এক মুহূর্ত সামলাতে না দিয়ে শ্যাডোর পিঠে মুঠো বসিয়ে দিল কিম্ভূত। হাত না সরিয়ে গিঁট দিয়ে চাপ দিতে শুরু করল কিডনির ঠিক উপরে। এই ব্যথাটা যেন হাঁটুর ব্যথার চাইতেও বেশি।

আমি এদের দুজনের চাইতেও দশাসই, ভাবল ও। ওদেরকে চাইলেই শায়েস্তা করতে পারি। কিন্তু না, অস্ত্র আছে দুজনের কাছেই। এদেরকে সামলাতে পারলেও, সেল থেকে বেরোন হবে না (তবে হ্যাঁ, একটা না...দুটো বন্দুক থাকবে তখনও ওর হাতে।) (নাহ, থাক)।

শ্যাডোর চেহারা থেকে হাত সরিয়ে রাখছিল উড, যেন কোন দাগ না পড়ে যায়। মারগুলো মাপা, ব্যথা দেবার উদ্দেশ্যেই মারা। শ্যাডো লিবার্টির মুখ ছাপা পয়সাটা আরও জোরে আঁকড়ে ধরল, কখন এই মার-পিট শেষ হবে-সেই অপেক্ষায়।

বেশ অনেক...অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো ওকে।

'কয়েক ঘণ্টা পরেই আবার আপনার সাথে দেখা হচ্ছে, স্যার।' বলল স্টোন। 'উডি কিন্তু ওসব অত্যাচার-টত্যাচার করা পছন্দ করে না। আমরা দুজন যুক্তি মেনে চলি। বললাম না, আমরা ভালোর পক্ষে? আপনি ভুল দলে নাম লিখিয়েছেন। খানিকক্ষণ নাহয় ঘুমিয়ে নিন।'

'আমাদেরকে আরেকটু সিরিয়াসলি নিবেন আশা করি।' যোগ করল উড।

'আমারও তাই আশা,' বলল স্টোন। 'ভেবে দেখবেন কিন্তু।'

ধাম করে দরজা লাগিয়ে বিদায় নিল দুজন। শ্যাডো আশা করল, বাতিটা নিভিয়ে যাবে হয়তো। কিন্তু সেই আশার গুড়ে বালি। মাথার উপরে এখনও জ্বলজ্বল করছে বাতিটা। কোন রকমে নিজেকে টেনে নিয়ে গেল ও ফোমের উপরে। এরপর কম্বলটা জড়িয়ে নিয়ে চোখ বন্ধ করল।

হারিয়ে গেল স্বপ্ন রাজ্যে।

এখন ওর বয়স পনেরো। মারা যাচ্ছেন ওর মা, খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা বলছেন তিনি। কিন্তু বুঝতে পারছে না সে।

ঘুমের মাঝেই নড়ল শ্যাডো, তীব্র ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল যেন।

পাতলা কম্বলের নিচে কাঁপছে ও, হাত দিয়ে বাতির আলো ঢাকার প্রয়াস পাচ্ছে। ওয়েনসডে আর অন্যরা কি এখনও মুক্ত আছে? বেঁচে আছে তো?

রূপালী ডলারটা শীতল লাগছে ওর, ওটা কেন তার শরীরের উষ্ণতায় গরম হচ্ছে না, তাই ভাবল মনে মনে। আধা-ঘুম...আধা-জাগরণে কেন যেন স্বাধীনতা, চাঁদ, যরিয়া পলুনোচনেয়া এক হয়ে মিলে-মিশে গেল! রূপ নিল স্বর্গ থেকে নামা রূপালী আলোর স্তম্ভে। আস্তে আস্তে ওটা ধরে উপরে উঠতে শুরু করল শ্যাডো। ওর ব্যথা, ওর ভয় সব যেন আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আচমকা অনেকদূর থেকে যেন ভেসে এলো একটা আওয়াজ। কিন্তু ততক্ষণে ঘুমের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছে শ্যাডো।

কোথাও...কোন একজন সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। হয়তো ওর স্বপ্নে...অথবা সত্যি সত্যি।

ফোমের উপর থেকে গড়িয়ে নামল শ্যাডো, এমন এমন জায়গায় ব্যথা পেল যার অস্তিত্বের কথা আগে জানাতই না। মনে হলো, কেউ যেন ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে!

ধমক দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল ও, ঘুমাতে চায়। কিন্তু মুখ দিয়ে বেরোল শুধু একটা ঘোঁত শব্দ।

'পাপি?' বলল লরা। 'উঠে পড়। উঠে পড়, সোনামণি।'

স্বস্তির একটা পরশ বয়ে গেল ওর দেহজুড়ে। কেমন এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ, জেলের স্বপ্ন...দেবতা আর ঈশ্বরের স্বপ্ন। এখন লরা এসেছে ওকে ডেকে তুলতে। কাজে যেতে হবে তো। সুযোগ পেলে হয়তো কফির একটা

কাপ শেষ করা যাবে...স্ত্রীর নরম ঠোঁটে চুমু বসাবার সম্ভাবনাও রয়েছে। হাত বাড়িয়ে লরাকে স্পর্শ করল ও।

বরফ শীতল...আঠালো একটা মাংসে হাত পড়ল শ্যাডোর।

চোখ খুলল ও।

'এত রক্ত কেন?' জানতে চাইল সে।

'আমার না,' বলল মেয়েটা। 'অন্য মানুষের রক্ত। আমার দেহে এখন রক্ত নেই। আছে তো শুধু ফরমালডিহাইড, গ্লিসারিন আর লিনোলিন।'

'অন্য মানুষ বলতে?' আঁতকে উঠল যেন শ্যাডো।

'গার্ডদের।' উত্তর পেল। 'ভয় পেও না। আমি ওদেরকে খুন করেছি। যাই হোক, উঠে পড়ো। অনেকদূর যেতে হবে তোমাকে। কেউ অ্যালার্ম বাজাবার সময় পেয়েছে বলে মনে হয় না। তবে যাবার আগে একটা কোট নিয়ে যেও, বাইরে তীব্র ঠান্ডা।'

'খুন করেছ মানে?'

শ্রাগ করে বিব্রতভঙ্গিতে হাসল মেয়েটা। হাত দেখে মনে হচ্ছে যেন মেয়ে এতক্ষণ তুলির বদলে আঙুল দিয়ে আঁকা-আঁকি করেছে। যে ছবিতে রঙ হিসে ব্যবহৃত হয়েছে শুধু লাল রঙ। চেহারা আর কাপড়ে এখনও রক্তের ছোপ লে আছে। লরার পরনে সেই নীল স্যুট।

'নিজে মৃত হলে, মানুষকে খুন করা সহজ হয়ে যায়।' ওকে জানাল লরা। 'মানে, বলতে চাইছি-ব্যাপারটা তখনও আর এত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না বিবেকও বাঁধা দেয় না।'

'আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ!' জানাল শ্যাডো।

'সকালের ক্রুরা আসার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাও নাকি?' প্রশ্ন করল লরা। 'চাইলে থাকতে পারো। তবে আমার ধারণা পালালেই ভালো করবে।'

'সবাই সন্দেহ করবে, কাজটা আমিই করেছি।' বোকার মতো বলল শ্যাডো।

'হয়তো,' বলল লরা। 'সোনামণি, কোট পরে নাও। বাইরে ঠান্ডা।'

করিডরে চলে এলো শ্যাডো, ওটার শেষ মাথায় একটা গার্ড রুম। ঘরের ভেতরে পড়ে আছে চারটা লাশ, এদের তিনজন অচেনা গার্ড। অন্যজন স্টোন নামে নিজেকে পরিচয় দেয়া লোকটা। তার বন্ধু, উডকে কোথাও দেখা গেল না। মেঝেতে রক্তের দাগ দেখে বুঝতে পারল ও, ওদের দুজনকে টেনে আনা হয়েছে ঘরের ভেতরে।

ওর নিজের কোটটাও দেখতে পেল, দেয়ালে ঝোলান। কেউ স্পর্শ করেছে বলেও মনে হলো না। ক্যান্ডিবার ভর্তি একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স টেনে আনল লরা।

গার্ডদের পরনে ছিল কালো...ক্যামোফ্লাজ ইউনিফর্ম। কিন্তু তাতে কোন ট্যাগ দেখতে পেল না শ্যাডো। তাই কাদের হয়ে তারা কাজ করছে, সেটাও বুঝতে পারল না।

নিজের ঠান্ডাটা হাতটা দিয়ে শ্যাডোর হাতে চাপ দিল লরা। সোনালী পয়সাটা দিয়ে নেকলেস বানিয়ে গলায় ঝুলিয়েছে সে।

'ভালো মানিয়েছে।' প্রশংসা করল শ্যাডো।

'ধন্যবাদ।' সুন্দর করে হাসল লরা।

'মি. ওয়েনসডে আর অন্যদের খবর জানো? কোথায় তারা?' প্রশ্ন করল শ্যাডো। উত্তরে একগাদা ক্যান্ডিবার এগিয়ে দিল লরা, হাতে নিয়ে সেগুলোকে পকেটে পুরল ও।

'এখানে তুমি ছাড়া আর কাউকে পাইনি। আমি ভয় পাচ্ছিলাম, তোমার কোন ক্ষতি করে বসতে পারে এরা। বলেছিই তো, তোমার উপর নজর রাখব আমি। যাই হোক, এগুলো নাও।' বলে কয়েকটা কেমিকেল প্যাড এগিয়ে দিল ও। পাতলা প্যাডগুলো হাত আর পা গরম রাখে, একেকটা দিয়ে কাজ চলে যায় বেশ কয়েক ঘণ্টা। কৃতজ্ঞতার সাথেই ওগুলো নিল শ্যাডো।

'তা বলেছিলে।'

একটা আঙুল বাড়িয়ে ওর বাঁ ভ্রূর উপরে বুলিয়ে দিল লরা। 'আঘাত পেয়েছ!'

'আমি ঠিক আছি।'

ধাতব দরজার মাঝখানে অবস্থিত একটা দরজা খুলল শ্যাডো, আস্তে আস্তে খুলে গেল ওটা। মাটি চার-ফুট নিচে। লাফিয়ে নামল সে, মনে হলো যেন নুড়ির উপর নামছে। লরার কোমর ধরে নামিয়ে আনল মেয়েটাকেও। আগেও অনেকবার কোলে নিয়েছে ও মেয়েটাকে...দ্বিতীয়বার ভাবেওনি...

এতক্ষণ অন্ধকার মেঘের আড়ালে লুকিয়ে ছিল চাঁদ, এখন বাইরে বেরিয়ে এলো। অস্ত যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে যে আলো আছে তাতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে চারপাশ।

পিছু ফিরে তাকাল শ্যাডো। বুঝতে পারল, এতোক্ষণ ওকে একটা ফ্রেইট ট্রেনের কালো রঙ করা ধাতব বগিতে রাখা হয়েছিল! পরিত্যক্ত ট্রেনটা, যতদূর দেখা যায় কেবল বগি আর বগি। আগেও এরকম ট্রেনে উঠেছে ও, ধরতে পারা উচিৎ ছিল।

'আমাকে খুঁজে পেলে কী করে?' মৃতা স্ত্রীর কাছে জানতে চাইল ও।

আস্তে আস্তে মাথা তুলল লরা। 'অন্ধকার দুনিয়াতে আলো যেমন পরিষ্কার দেখা যায়, আমার চোখেও তুমি তেমন। খুব একটা কষ্ট হয়নি। যাই হোক, রওনা

দাও। যত তাড়াতাড়ি পার, যতদূর সম্ভব চলে যাও। আর ভালো কথা, ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করো না। তাহলে আর সমস্যা হবে না।'

'কোথায় যাব?'

মাথার চুলে হাত বুলাল লরা। 'রাস্তাটা ওদিকে, যেভাবেই হোক দক্ষিণে চলে যাও। দরকার হলে গাড়ি চুরি করো।'

'লরা,' বলে ইতস্তত করতে লাগল শ্যাডো। 'এসব কী হচ্ছে, জানো? এরা কারা? কাদেরকে খুন করলে তুমি?'

'হুম,' উত্তর দিল মেয়েটা। 'সম্ভবত জানি।'

'অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে,' বলল শ্যাডো। 'তুমি না এলে এখনও আটকা থাকতে হত আমাকে, মনে হয় না ছেড়ে দিত।'

'নাহ,' বলল লরা। 'আমারও তা মনে হয় না।'

খালি বগিগুলোপার হয়ে এলো ওরা। শ্যাডো আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ওর রূপালী পয়সা। যরিয়া পলুনোচনেয়া আর তার স্মৃতির কথা মনে পড়ে গেল ওর। কেন এসেছিল, জানতে চেয়েছ? মৃত মানুষের কাছে প্রাপ্ত জ্ঞানে কোন খাদ থাকে না।

'লরা...তুমি কী চাও?' প্রশ্ন করল শ্যাডো।

'তুমি সত্যি সত্যি জানতে চাও?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

মৃত একজোড়া নীল চোখ দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটা। 'আবার বাঁচতে চাই। এরকম জিন্দালাশ হয়ে থাকতে চাই না। হৃদপিণ্ডের ধুকপুকানি অনুভব করতে চাই, পেতে চাই শিরা-উপশিরায় বয়ে চলা রক্তের স্পন্দন টের পেতে। যতক্ষণ রক্ত বইতে থাকে, ততক্ষণ কেউ টের পায় না। কিন্তু যখন বন্ধ হয়, তখন বোঝা যায় অনুভূতিটা কেমন দারুণ ছিল।' হাত দিয়ে চোখ ঘষল মেয়েটা, রক্ত লেগে গেল ওর চেহারায়। 'এই জীবনটা খুব কঠিন, পাপি! জানো, আমার মতো জিন্দালাশ কেন রাতেই বের হয় কেবল? কারণ রাতের আঁধারে নিজেকে জ্যান্ত মানুষ বলে চালিয়ে দিতে কষ্ট হয় না আমাদের। কিন্তু আমি চাই বাঁচতে, বেঁচে থাকা কারও অনুকরণ করতে নয়!'

'আমি বুঝতে পারছি না, আমার কাছে কী চাও তুমি।'

'আমি চাই, তুমি আমার এই আশাটাকে পূর্ণ করো। আমি জানি সোনামণি, চাইলে তুমি পারবে।'

'ঠিক আছে,' বলল ও। 'আমি চেষ্টা করব। আর যদি কীভাবে কাজটা করতে হবে তা বুঝতে পারি, তাহলে তোমাকে খুঁজে পাব কীভাবে?'

উত্তর পেল না কোন, মেয়েটা নেই! চলে গিয়েছে! চারপাশের এই বনের ভেতর একা একা দাঁড়িয়ে আছে এখন ও। আকাশের এক ফালি আলো দেখে বুঝতে পারছে, পূর্ব কোনদিকে। কানে ভেসে এলো রাতের পাখির শেষ চিৎকার, চেহারায় পেল ডিসেম্বর মাসের ঠান্ডা বাতাসের স্পর্শ।

এসব কিছুকে সঙ্গী বানিয়ে দক্ষিণ দিকে হাঁটা ধরল শ্যাডো।

অধ্যায় সাত

হিন্দু দেবতারা অমর বটে! কিন্তু আমরা যেভাবে ভাবি সেভাবে নয়। তাদের মৃত্যু হয়, আবার তাদের জন্মও আছে। মানুষ যেসব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলাচালে দোলে, তাদেরকেও সেসব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়। সত্যি বলতে কী, মানুষের সাথে তাদের পার্থক্য দেখা যায় খুব কম ক্ষেত্রেই...অসুরদের সাথে তো সেই পার্থক্য থাকেই না প্রায়। অথচ হিন্দুদের কাছে তারা সবার চাইতে উঁচু আর আলাদা একটা জাত। তারা যেন এমন এক প্রতীক, যা কোন মানুষ কোনভাবেই কখনও হতে পারবে না। বলা যায়, হিন্দু দেবতারা এমন এক নাটকের কুশীলব, যা আমরা নিজেদের জীবনে চেয়েছি সবসময়; তারা এমন এক মুখোশ, যার দিকে চেয়ে নিজেদেরকেই দেখতে চেয়েছি।

–ওয়েন্ডি ডনিজার ও'ফ্ল্যাহার্টি, প্রবন্ধ, হিন্দু মিথস

শ্যাডো কয়েক ঘণ্টা ধরে কেবল হাঁটছে তো হাঁটছে। দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছে সে, অন্তত ওর সেটাই ধারণা। গাছের ভেতর দিয়ে পরিত্যক্ত রাস্তা ধরে আবার কখনও বহুল ব্যবহৃত রাস্তা ধরে এগোচ্ছে ও। সোজা হাঁটতে থাকলে এক সময় না এক সময় দক্ষিণ উইসকনসিনে পৌঁছানো যাবে। রাস্তায় অবশ্য কয়েকবার জিপ গাড়িকে আলো জ্বালিয়ে ওর দিকে আসতে দেখেছিল শ্যাডো, তবে সাহায্য না চেয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকেছে। সকালের কুয়াশা এখনও কোমরের মাঝ-পর্যন্ত, তাই অসুবিধা হয়নি। গাড়িগুলোর রঙ ছিল কালো।

রওনা দেবার মিনিট তিরিশেক পর, দূর থেকে হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল শ্যাডো, তখনই বড় রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। যান্ত্রিক ফড়িং-এর আওয়াজ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত মাটিতে পড়ে থাকা একটা গাছের আড়ালে আত্মগোপন করেছিল ও।

একেবারে শেষ মুহূর্তে অবশ্য আকাশের দিকে একপলক চেয়েছিল ও, ধূসর আকাশের পটভূমিতে কালো হেলিকপ্টার একেবারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। তারপরই আবার মাথা গুঁজে দিয়েছে, আওয়াজ না মেলানো পর্যন্ত বেরোয়নি।

গাছের নিচটা অবশ্য স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশি ঠান্ডা। কেমিক্যাল প্যাডগুলোর জন্য মনে মনে লরাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল শ্যাডো। ওগুলো না থাকলে হয়তো জমেই যেতে হতো। তবে হাত-পা ছাড়া বাকি দেহটা যেন জমে গিয়েছে–হৃদপিণ্ড, মন, আত্মা-সব।

আমি কী চাই? নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করল শ্যাডো। উত্তর দিতে না পেরে হেঁটে চলল সামনে। এক পা এক পা করে এগোচ্ছে, এতক্ষণে পরিচিত লাগতে শুরু করেছে গাছগুলো। যেন আগেও গিয়েছে এ পথ ধরে। বৃত্তাকারে ঘুরছে না তো? হয়তো কপালে এই ক্যাণ্ডি বারগুলো শেষ হওয়া পর্যন্ত এভাবে ঘোরাই লেখা যাচ্ছে। একসময় ফুরিয়ে যাবে প্যাডগুলোও। তখন কোন গাছের গুঁড়ির উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়বে ও, আর কখনও যে ঘুম ভাঙবে না।

প্রশস্ত একটা ঝর্ণার ধারে এসে উপস্থিত হলো শ্যাডো, স্থানীয়রা একে ক্রিক বলে ডাকে। ঠিক করল, এর ধার ধরেই এগোতে থাকবে। ক্রিক গিয়ে নামে নদীতে, আর সব নদী শেষ হয় মিসিসিপিতে। হাঁটতে থাকলে...অথবা কোন নৌকা চুরি বা ভেলা বানিয়ে এক সময় না এক সময় ঠিক নিউ অর্লিয়েন্সে পৌছে যেতে পারবে। জায়গাটার উষ্ণতার কথা মনে পড়তেই, ওর নিজের ভেতরেও কেমন এক উষ্ণ অনুভূতি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

অনেকক্ষণ হলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে হেলিকপ্টারের আনাগোনা। কেন জানি ওর মনে হচ্ছিল, বগিতে ঘটে যাওয়া তাণ্ডব সামাল দেবার জন্যই এসেছিল ওই হেলিকপ্টারগুলো; ওর পিছু ধাওয়া করার উদ্দেশ্যে নয়। নইলে ফিরে আসত তারা, কুকুর লেলিয়ে দিত, সাইরেন বাজত-এক কথায় নরক নামিয়ে আনত।

আসলেই, কী চায় শ্যাডো? আপাতত একটা উত্তর আসছে মনে, ধরা পড়তে চায় না। চায় না ওই বগিতে যেসব মানুষ খুন হয়েছে তাদের হত্যার দায় নিতে। 'আমি কিছু করিনি,' নিজের কণ্ঠ শুনতে পেল ও। 'সব করেছে আমার মৃতা স্ত্রী।' এই কথা কোন আইনের লোকের সামনে বললে তার চেহারা কেমন হবে, তা আন্দাজ করতে পারছে ও। এরপর শুরু হবে মানুষের তর্ক-ওকে কী পাগলা গারদে পোরা হবে, নাকি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে...?

উইসকনসিনে কি এখনও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়?-ভাবল সে। তবে তাতে কিছু যায় আসে না। শ্যাডো আসলে চায়, ওর জীবনে এখন কী ঘটছে, তা জানতে...বুঝতে। জানতে চায়, কখন শেষ হবে অদ্ভুত এসব ঘটনার ঘনঘটা। মুচকি হাসি হেসে ভাবল, আসলে ও চায় সবকিছু যেন আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। কখনও যেন জেলে যেতে না হয় ওকে, লরা যেন এখনও জীবিত থাকে, চায় এ সবকিছু যেন আসলে না ঘটে!

'সেই ট্রেন অনেক আগেই প্ল্যাটফর্ম ত্যাগ করেছে বাছা।' নিজেকে শোনাল শ্যাডো। তোমার আর ফেরার কোন পথ নেই, এখন শুধু সামনে এগিয়ে যাওয়া।

দূর থেকে কাঠঠোকরা কাঠ ঠোকরাবার আওয়াজ ভেসে এলো।

শ্যাডো টের পেল, কেউ একজন ওকে দেখছে। কয়েকটা লাল কার্ডিনাল পাখির অস্তিত্ব টের পেল ও ঝোপের আড়ালে। পথের উপর পড়ে আছে একটা হরিণের বাচ্চার লাশও। ওটার পার্শ্বটা ছিঁড়ে খাচ্ছে ছোট-খাটো কুকুর আকৃতির একটা পাখি। লাল মাংস টেনে আনছে বাঁকানো, তীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে। হরিণটার চোখ অনেক আগেই খুবলে খাওয়া শেষ, তবে মাথাটা আস্ত আছে এখনও। কীভাবে যে মারা গেল ওটা, ভাবল শ্যাডো।

কালো পাখিটা একদিকে কাত করল মাথা। এরপর কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, 'তুমি ছায়া-মানব।'

'আমি শ্যাডো।' বলল ও। পাখিটা ডানা ঝাঁপটে উঠে বসল মৃত পশুটার দেহে। পাখিটার চোখগুলো বিশাল, আর ঘন কালো কালো। কেমন যেন একটা ভয় ভিড় করে ওটাকে কাছ থেকে দেখলে।

'তোমাকে কাই-রো যেতে বলেছে,' দাঁড়কাকটা সেই কর্কশ কণ্ঠেই আবার কথা বলে উঠল। এটা কি হুগিন, না মুনিন? ভাবল শ্যাডো।

'কাই-রো?' প্রশ্ন করল ও।

'মিশরে।'

'এখন আমাকে মিশরে যেতে হবে?'

'মিসিসিপি ধরে এগোও। দক্ষিণে যাও। শিয়ালকে খুঁজে বের করো।'

'দেখ,' বলল শ্যাডো। 'আমার মনে হচ্ছে...হে যীশু, ওটা...' বলতে বলতেই থেমে গেল ও। কী করছে? জঙ্গলের রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে একটা দাঁড়কাকের সাথে? 'ঠিক আছে। কেবল বলতে চাচ্ছি, আর কোন রহস্য চাই না আমার।'

'রহস্য,' ওর সাথে একমত হলো যেন পাখিটা।

'আমি ব্যাখ্যা চাই। কাই-রোতে শিয়ালকে খুঁজব-মানে কী এর? এতে তো আমার কোন উপকার হচ্ছে না। মনে হচ্ছে কোন স্পাই-থ্রিলারের লাইন শুনছি।'

'শিয়াল। বন্ধু। টোক। কাই-রো।'

'আগের বারই শুনেছি, কিন্তু আমার আরও তথ্য চাই।'

উত্তর না দিয়ে আরেক টুকরা কাঁচা মাংস ছিঁড়ল পাখিটা। এরপর উড়ে গিয়ে বসল গাছের মাথায়, ঠোঁট থেকে মাংসের টুকরাটা ঝুলছে।

'হেই! অন্তত সত্যিকারের একটা রাস্তা পর্যন্ত পৌছে দাও!'

উড়াল দিল দাঁড়কাক। হরিণের বাচ্চাটার দিকে তাকাল শ্যাডো। সত্যিকারের শিকারি হলে এতক্ষণে ওটার রসালো একটা টুকরা কেটে নিয়ে ঝলসাতে শুরু করত। কিন্তু উপলব্ধি করতে পারল, সত্যিকারের শিকারি সে নয়। এখন কোন গাছের গুঁড়িতে বসে চকলেটের বার খেতে মন চাইছে ওর।

কিছুদূর গিয়েই থেমে গিয়েছে দাঁড়কাকটা, শব্দ করে ডেকে উঠল।

'আমাকে অনুসরণ করতে বলছ?' জানতে চাইল শ্যাডো। উত্তরে আরেকবার কর্কশ কণ্ঠে ডেকে উঠল দাঁড়কাকটা। উঠে দাঁড়াল ও, পাখিটার কাছে পৌঁছাতেই আবার উড়াল দিল ওটা। শ্যাডো যেদিকে এগোচ্ছিল, ওটার কিছুটা বাঁয়ে গিয়ে একটা ডালের উপর বসে পড়ল।

'ওই,' বলল শ্যাডো। 'হুগিন না মুনিন, তুমি যেটাই হও না কেন...'

ঘুরে তাকাল পাখিটা, মাথা আবার একদিকে কাত করে আছে।

'বলো-নেভারমোর।' বলল শ্যাডো।

'চুলোয় যাও।' উত্তর পেল কেবল। বাকি সময়টা চুপচাপ এগোল ওরা দুজন।

আধ-ঘণ্টার মাঝে একটা শহরের প্রান্তে এসে উপস্থিত হলো ওরা। শ্যাডোকে একা রেখে আবার জঙ্গলে চলে গেল দাঁড়কাক। শহরে কালভারের ফ্রোজেন কাস্টার্ড বাটার-বার্গারের সাইন দেখতে পেল শ্যাডো, তার পাশেই একটা গ্যাস স্টেশন। প্রথমে কালভারের দোকানে খেল, খালি ওটা। কেবল মাথা কামানো এক যুবক বসে আসে রেজিস্টারে। দুটো বার্গার আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের অর্ডার দিল ও। এরপর রেস্টরুমে গেল একটু পরিষ্কার হয়ে নিতে। একেবারে বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে ওকে। পকেটে কী কী আছে, দেখে নিল এই সুযোগে–কয়েকটা পয়সা যার মধ্যের রয়েছে রূপালী ডলারটাও, টুথপেস্ট আর টুথব্রাশ, তিনটা ক্যান্ডিবার, পাঁচটা কেমিক্যাল প্যাড, একটা ওয়ালেট (ভেতরে ওর ড্রাইভিং লাইসেন্স আর একটা ক্রেডিট কার্ড আছে কেবল), আর কোটের ভেতরের পকেটে পঞ্চাশ আর বিশ ডলারের নোট মিলিয়ে এক হাজার ডলার। হাত-মুখ গরম পানিতে ধুয়ে নিল ও, চুল হাত দিয়ে আঁচড়ে ফিরে গেল রেস্তোরায়। বার্গার, ফ্রাই আর কফি ওর জন্য প্রস্তুত!

খাওয়া শেষ করে রেজিস্টারের কাছে গেল ও। 'ফ্রোজেন কাস্টার্ড খাবেন?' জানতে চাইল পেছনে বসা যুবকটা।

'না, ধন্যবাদ। আমি আসলে জানতে চাচ্ছিলাম যে, এখানে গাড়ি ভাড়া নেবার কোন ব্যবস্থা আছে? আমার গাড়িটা পথেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।'

মাথার খোঁচা খোঁচা চুল চুলকালো যুবক। 'শহরে নেই, মিস্টার। চাইলে আপনি নষ্ট গাড়িটার জন্য ট্রিপল-এ কে ফোন করতে পারেন। গ্যাস স্টেশনে গিয়েও দেখতে পারেন।'

'খারাপ না বুদ্ধিটা, ধন্যবাদ।'

গলতে থাকা তুষারের উপর দিকে রাস্তা পার হলো শ্যাডো। গ্যাস স্টেশন থেকে আরও কয়েকটা ক্যাণ্ডি বার আর কেমিক্যাল প্যাড কিনে জানতে চাইল, 'গাড়ি ভাড়া নিতে চাই। কার সাথে কথা বলা যায়?'

এখানকার ক্যাশ রেজিস্টারের পেছনে বসে আছে মোটা-সোটা, চশমা পরা এক মহিলা। কথা বলার সুযোগ পেয়ে খুব খুশি মনে হলো তাকে। 'একটু ভাবতে দাও,' বলল সে। 'আমরা তো একটু প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকি। ম্যাডিসনের আগে গাড়ি ভাড়া দেয়, এমন কাউকে পাবে না। কোথায় যাচ্ছ?'

'কাই-রো। অবশ্য জায়গাটা যে কোথায়, তাই জানি না!'

'আমি জানি।' বলল মহিলা। 'এক কাজ করো, ওই ওখান থেকে একটা ইলিনয়ের ম্যাপ এনে দাও তো।' নির্দেশ পালন হলে ম্যাপটা খুলে একটা জায়গা দেখাল মহিলা, বিজয়ীর সুরে বলল, 'এই তো।'

'কায়রো?'

'মিশরের ওই শহরটার নাম ওভাবেই উচ্চারণ করা হয়। তবে এর নাম স্থানীয়রা বলে-কাইরো। ওখানে একটা থিবসও আছে। আমার ভাবীর জন্ম থিবসে। আমি জানতে চেয়েছিলাম, মিশরের থিবসে নাকি? আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল যেন পাগল হয়ে গিয়েছি!' মৃদু হাসল মহিলা।

'পিরামিড-টিরামিড নেই?' শহরটা এখান থেকে প্রায় পাঁচশ মাইল দক্ষিণে।

'আমার জানামতে নেই। লোকে জায়গাটাকে লিটল ইজিপ্ট নামেও ডাকে। কারণ প্রায় দেড়শ বছর আগে, এই এলাকায় আচমকা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ফসল সব ক্ষেতেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওখানকার ফসলের কিচ্ছু হয়নি। তাই সবাই খাবারের জন্য যেত লিটল ইজিপ্টে, ঠিক বাইবেলে বর্ণিত প্রাচীন মিশরের মতো।'

'ওখানে যাব কীভাবে?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'গাড়ি চালিয়ে।'

'আমার গাড়ি এখানে আসার পথে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কয়েক মাইল আগেই। মাফ করবেন, কিন্তু জিনিসটা একেবারে রদ্দিমাল ছিল।'

'রদ্দিমাল,' হেসে ফেলল মহিলা। 'আমার দেবরও এ নামেই ডাকে ওর গাড়িগুলোকে। পুরনো গাড়ি কেনা-বেচা করে সে। মাঝে মাঝে ফোন দিয়ে বলে,

আরেকটা রদ্দিমাল গছিয়ে দিয়েছি, ম্যাটি। সে হয়তো তোমার গাড়ির প্রতি আগ্রহী হবে।'

'গাড়িটা আসলে আমার বসের,' এত সহজে মিথ্যা বলছে দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল শ্যাডো। 'আমি তাকে ফোন করে জানিয়ে দেব, তিনি এসে নিয়ে যাবেন।' আচমকা একটা চিন্তা এলো মাথায়। 'আপনার দেবর কি আশেপাশেই থাকে নাকি?'

'মাসকোডায় থাকে, এখান থেকে দক্ষিণে দশ মিনিটের পথ। নদীর ওধারেই। কেন?'

'পাঁচ-ছয়শ ডলারের মাঝে তার একটা রদ্দিমাল কেনা যাবে না?'

মিষ্টি করে হাসল মহিলা। 'জনাব, পাঁচশ ডলার দিলে ট্যাঙ্কি ভর্তি তেলসহ গাড়ি বিক্রি করে দেবে ও। তবে বোলো না যে আমি একটা বলে দিয়েছি।'

'একটু কষ্ট করে ফোন করবেন?' জানতে চাইল শ্যাডো।

হাতের ফোনটা দেখাল মহিলা। 'এরইমাঝে করে ফেলেছি। হ্যালো? আমি ম্যাটি। এখুনি এখানে চলে এসো। তোমার জন্য খদ্দের ধরেছি।'

শ্যাডোর কেনা রদ্দি মালটা ১৯৮৩ মডেলে শেভি নোভা। তেলসহ মাত্র সাড়ে-চারশ ডলারে যন্ত্রটা কিনতে পেরেছে ও। এই পর্যন্ত ওটা চলেছে প্রায় পৌনে এক মিলিয়ন মাইল। ভেতর থেকে বুর্বন, তামাক আর কলার গন্ধ ভেসে আসছে। ওটার আদি রঙ যে কী ছিল, তা আঁচ পর্যন্ত করতে পারছে না শ্যাডো, তুষার আর কাদার নিচে চাপা পড়ে গিয়েছে। তবে এটা ছাড়া ম্যাটির দেবরের আর কোন গাড়ি পাঁচশ মাইল চলতে পারবে বলে ওর মনে হয়নি।

নগদ টাকায় দাম চুকিয়ে দিয়েছে ও, ম্যাটির দেবরও তার ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখায়নি। টাকা পেয়েই সে খুশি।

প্রথমে পশ্চিম দিকে এগোল শ্যাডো গাড়ি নিয়ে, এরপর উত্তরের পথ ধরল। পকেটে এখনও সাড়ে পাঁচশ ডলার আছে। সাবধানতার সাথে হাইওয়ে এড়িয়ে চলছে ও। রদ্দিমালটায় রেডিও আছে বটে, কিন্তু চালু হচ্ছে না। কিছুক্ষণের মাঝেই একটা সাইন দেখতে পেল সে, বুঝতে পারল যে উইসকনসিন পার হয়ে ইলিনয়ে প্রবেশ করেছে।

মম'স নামের একটা দোকানের সামনে থামল ও, বন্ধ হয়ে যাব-যাব করছিল দোকানটা।

পথে যতগুলো শহর পড়ল, সবগুলোর নামের সাইনবোর্ডের পাশে আরেকটা সাইনবোর্ড দেখতে পেল ও। গর্বের সাথে ওগুলো জানাচ্ছে, শ্যাডো প্রবেশ

করছে 'অমুক' শহরে (জনসংখ্যা 'তমুক')। আর অতিরিক্ত বোর্ডটা জানাচ্ছে, এই শহরের অনূর্ধ্ব-১৮ দলটা ইন্টারস্টেট বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়ানশিপে রানার-আপ হয়েছিল। কোন কোনটা জানাচ্ছে, শহরটায় বাস করে ইলিনয় অনূর্ধ্ব-১৬ মহিলা রেসলিং সেমিফাইনালিস্টরা।

এগিয়ে চলল শ্যাডো, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, প্রতিটা মুহূর্ত যেন প্রাণশক্তি শুষে নিচ্ছে। লালবাতি উপেক্ষা করল একবার, আরেকবার তো আরেকটু হলেই একটা ডজের সাথে লাগিয়ে দিচ্ছিল! গ্রাম্য রাস্তায় ওঠা মাত্র একটা ফাঁকা পার্শ্ব রাস্তায় ঢুকল শ্যাডো। গাড়িটা পার্ক করে বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন। এরপর পেছনের সিটে গা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

অন্ধকার গ্রাস করে নিল ওকে; মনে হলো যেন পড়ে যাচ্ছে ও-ঠিক অ্যালিসের মতোই। শত শত বছর ধরে পড়ছে তো পড়ছেই, দুপাশে একের পর এক দেখা দিচ্ছে অগণিত চেহারা, কিছু চেনা আবার কিছু অচেনা...

আচমকা, ঝটকা দিয়ে বন্ধ হয়ে গেল ওর পতন। এখন একটা গুহায় আছে সে, আর একাকী নেই। পরিচিত একজোড়া চোখের দিকে তাকিয়ে আছে শ্যাডো–বড় বড়, তরল এক জোড়া চোখ।

জায়গাটাকেও চেনা চেনা লাগছে ওর, পরিচিত মনে হচ্ছে ভেজা গরুর গন্ধ। গুহার দেয়ালে জ্বলছে মশাল, মহিষের মাথা আর মানুষের দেহটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

'আমাকে মুক্তি দেয়া যায় না?' জানতে চাইল শ্যাডো। 'শান্তি মতো ঘুমাতে দাও একটু।'

নড করল মহিষ-মানব। ঠোঁট নড়ছে না, তখনও শ্যাডো মাথার ভেতরে তার কণ্ঠ শুনতে পেল। 'তুমি কোথায় যাচ্ছ, শ্যাডো?'

'কায়রো।'

'কেন?'

'যাওয়ার মতো আর কোন জায়গাটা আছে আমার? ওয়েনসডে আমাকে ওখানে যেতে বলেছেন। ওর মীড পান করেছি আমি।' স্বপ্নের মাঝে যুক্তিটা অকাট্য বলে মনে হলো শ্যাডোর। তিন বার ওয়েনসডের মীড পান করেছে ও, আর তাই চুক্তি ভঙ্গের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আগুনের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল মহিষ-মানব, নাড়া খেয়ে আরও জোরে জ্বলে উঠল আগুন। 'ঝড় আসছে।' বলল সে, হাত বের করে এনে ছাইটা মুছল লোমহীন বুকে।

'তোমরা সেই কবে থেকেই তো কথাটা আমাকে বলে আসছ। আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মহিষ-মানব, একটা মাছি এসে বসল তার কপালে। 'করো।'

'এসব কি সত্যি সত্যি ঘটছে? তোমরা কি আসলেই দেবতা? সব কিছু...' এক মুহূর্ত চুপ করে আবার যোগ করল শ্যাডো, '...অসম্ভব ঠেকছে।'

'দেবতা আসলে কী?' প্রশ্ন করল মহিষ-মানব।

'আমি জানি না।'

টোকা দেবার শব্দ শুনতে পাচ্ছে শ্যাডো। একটানা...একঘেয়ে। ওদিকে পাত্তা না দিয়ে পূর্ণ মনোযোগ মহিষ-মানবের দিকে ঢেলে দিল শ্যাডো। দেবতারা কী, জানতে চায়। জানতে চাই এই অদ্ভুত কয়েকটা দিনের ব্যাপারে।

ট্যাপ, ট্যাপ, ট্যাপ।

চোখ খুলে তাকাল শ্যাডো, চোখ ঘষতে ঘষতে উঠে বসল। ঠান্ডায় যেন হাড় পর্যন্ত জমে গিয়েছে। গাড়ির বাইরের দুনিয়া কেমন যেন বেগুনী বর্ণ ধারণ করেছে। গোধূলি বেলার এই আলো সন্ধ্যা আর রাতের মাঝে পার্থক্য করে দেয়।

ট্যাপ, ট্যাপ। 'হেই, মিস্টার।' কেউ একজন ডাকল ওকে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল শ্যাডো। গাড়ির পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে, অন্ধকারে ঠিক দেখা যাচ্ছে না তার চেহারা। শ্যাডো হাত বাড়িয়ে কয়েক ইঞ্চি নামিয়ে দিল জানালার কাঁচ। আড়মোড়া ভেঙ্গে বলল, 'হাই।'

'ঠিক আছ তুমি? অসুস্থ না তো? নাকি মাতাল?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শুনতে পেল ও-হয় কোন মহিলার, আর নয়তো বাচ্চা ছেলের।

'আমি ঠিক আছি,' বলল শ্যাডো। 'দাঁড়াও,' বলে গাড়ির দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো। হাত-পা-ঘাড় ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে আছে।

'উরে বাপস, তুমি দেখি বিশালাকার!'

'সবাই তাই বলে,' বলল শ্যাডো। 'তুমি কে?'

'আমি স্যাম।' কণ্ঠটা উত্তর দিল।

'ছেলে-স্যাম? নাকি মেয়ে-স্যাম?'

'মেয়ে-স্যাম। আগে স্যামি ছিল নাম, এখন শুধু স্যাম।'

'শোনো তাহলে, মেয়ে-স্যাম। ওদিকে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকো।'

'কেন? তুমি কি কোন পাগল খুনি নাকি?'

'না,' বলল শ্যাডো। 'প্রস্রাব করতে হবে, একটু প্রাইভেসি তো চাই, নাকি?'

'ওহ, ঠিক আছে। সমস্যা নেই। তুমি যা বলো। আমি তো পাশের স্টলে কেউ থাকলেও শুরু করতে পারি না!'

'ঠিক আছে রে বাবা, এখন একটু ওদিকে যাও।'

গাড়ির ওপাশে চলে গেল মেয়েটা, রাস্তার পাশের ক্ষেতে নেমে গেল ও। জিপার খুলে অনেকক্ষণ ধরে প্রস্রাব করল। এরপর আবার ফিরে এলো গাড়ির কাছে, রাত নেমে এসেছে ততক্ষণে।

'আছ এখনও?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ,' বলল মেয়েটা। 'তোমারটা ব্লাডার না নদী? তুমি যতক্ষণ পেশাব করেছ, ততক্ষণে মনে হয় সাম্রাজ্য শুরু হয়ে আবার ধ্বংসও হয়ে গিয়েছে।'

'ধন্যবাদ। কিছু চাই তোমার?'

'হুম, দেখতে চেয়েছিলাম তুমি ঠিক আছ কিনা। মানে মারা-টারা গেলে তো আবার পুলিশ ডাকতে হতো।'

'এখানেই থাক?'

'নাহ। ম্যাডিসন থেকে হাঁটা ধরেছি।'

'কাজটা কিন্তু নিরাপদ না।'

'প্রতিবছর পাঁচবার করে এই কাজ করি, এবার তৃতীয় বছর হবে। এখনও বেঁচে আছি তো, নাকি? তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'কায়রো।'

'ওহ, আমি এল পাসোতে যাবো। আমার খালার সাথে ছুটির দিনগুলোতে থাকব।'

'আমি তো তোমাকে অত দূর নিতে পারব না।'

'আরে, টেক্সাসের এল পাসোতে নিয়ে যেতে হবে না। ইলিনয়েও আছে একটা। কয়েক ঘণ্টার পথ, দক্ষিণ দিকে। এখন কোথায় আছ, জানো?'

'না,' বলল শ্যাডো। 'কোন ধারণাই নেই। হাইওয়ে বায়ান্নোর কোথাও?'

'এর পরের শহর হচ্ছে পেরু।' বলল স্যাম। 'ইলিনয়েও আছে একটা। এক কাজ করো, হাঁটু গেঁড়ে বসো, আমি শুঁকব।'

অবাক হলেও, কথা মতো কাজ করল শ্যাডো। ওর মুখের কাছে নাক এনে শুঁকল স্যাম। 'হুম, মদের গন্ধ নেই। তুমি গাড়ি চালালে অসুবিধা নেই। চলো, যাই।'

'তোমাকে সাথে নিব কে বলল?'

'কারণ আমি বিপদে পড়া এক রাজকুমারী, আর তুমি আমার নাইট। খালি ঘোড়ার বদলে তুমি এসেছে নোংরা গাড়িতে করে। জানো, পেছনের জানালায় কে যেন 'আমাকে পরিষ্কার করো' লেখে গিয়েছে!' গাড়িতে বসে দরজা খুলে দিল শ্যাডো। সাধারণত সামনের দরজা খুললে ভেতরের বাতি জ্বলে ওঠে সব গাড়িতে, এটাই জ্বলল না।

'না,' বলল ও। 'জানতাম না।'

উঠে বসল মেয়েটা। 'আমিই লিখেছি! হালকা আলো থাকতে থাকতেই।'

ইঞ্জিন চালু করল শ্যাডো, হেডলাইট জ্বালিয়ে উঠে পড়ল গাড়িতে। 'বাঁয়ে যাও,' সাহায্য করল স্যাম। মেয়েটার কথা মতো তাই করল ও, কয়েক মিনিটের মাঝে চালু হয়ে গেল গাড়ির হিটার; উষ্ণতায় ভরে উঠল ভেতরটা।

'চুপ করে আছ কেন?' বলল স্যাম। 'কিছু একটা বলো!'

'তুমি কি মানুষ?' জানতে চাইল শ্যাডো। 'নারী-পুরুষের মিলনের ফলে জন্ম নেয়া মানুষ?'

'অবশ্যই।'

'খুব ভালো। নিশ্চিত হয়ে নিলাম। আমার কাছ থেকে কি শুনতে চাও?'

'আমাকে নিশ্চিত করার মতো কিছু। কেন জানি মনে হচ্ছে, কোন পাগল ড্রাইভারের গাড়িতে উঠে বসেছি।'

'হুম,' বলল শ্যাডো। 'কী বললে স্বস্তি পাবে?'

'বলো যে তুমি কোন জেল পালানো কয়েদি না, বা কোন খুনি নও।'

একটু ভাবল ও, 'আমি ও দুটোর কোনটাই নই।'

'ভেবে বলতে হলো?'

'কয়েদি ছিলাম, কিন্তু কাউকে খুন করিনি।'

'ওহ।'

ছোট একটা শহরে প্রবেশ করল ওদের গাড়ি, রাস্তার বাতি জ্বলছে। আবার ক্রিসমাসের আলোকসজ্জাও দেখা যাচ্ছে বাড়িতে বাড়িতে। ডান দিকে তাকাল শ্যাডো, মেয়েটার চুল ছোট ছোট করে কাঁটা। চেহারাটা আকর্ষণীয়...আবার কিছুটা পুরুষালীও। দেখতে পেল, মেয়েটাও ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

'জেলে কেন গিয়েছিলে?'

'রাগের মাথায় কয়েকজনকে খুব খারাপভাবে আহত করেছিলাম।'

'প্রাপ্য ছিল?'

একটু ভাবল শ্যাডো। 'তখন তো তাই মনে হয়েছিল।'

'আরেকবার সেই একই পরিস্থিতিতে পড়বে মারবে?'

'আরে না, জীবনের তিনটা বছর নষ্ট হয়েছে এ জন্য।'

'হুম। তোমার দেহে ইন্ডিয়ান রক্ত আছে?'

'জানামতে নেই।'

'দেখে মনে হয় কিন্তু।'

'তোমাকে নিরাশ করার জন্য মাফ চাইছি।'

'অসুবিধা নেই। ক্ষুধা পেয়েছে?'

নড করল শ্যাডো। 'খাওয়া যায়।'

'সামনেই কয়েকটা দোকান আছে, খেতেও ভালো, দামেও সস্তা।'

পার্কিং-লটে গাড়ি ঢোকাল শ্যাডো, একসাথে বেরিয়ে এলো দুজন গাড়ি থেকে। তালা দেবার প্রয়োজনবোধ করল না ও, তবে চাবিগুলো পকেটে ভরে নিল। খবরের কাগজ কেনার জন্য কিছু পয়সা বের করে জানতে চাইল, 'এখানে খাওয়ার মতো টাকা আছে তোমার কাছে?'

'আছে।' থুতনি উপরে তুলে বলল মেয়েটা।

নড করল শ্যাডো। 'এক কাজ করা যাক, লটারি করি। হেডস উঠলে তুমি আমার খাবার খরচ দেবে, আর টেলস উঠলে আমি তোমার।'

'আগে পয়সাটা দেখতে দাও,' সন্দেহ নিয়ে বলল স্যাম। 'আমার এক চাচা আছে। ওর কাছে থাকা পয়সাটার দুই দিকই হেডস।'

হাতে নিয়ে পয়সাটা পরখ করে দেখল মেয়েটা। যখন সন্তুষ্ট হলো যে কোন দুই নম্বুরি নেই তখন ফিরিয়ে দিল শ্যাডোর হাতে। বৃদ্ধাঙ্গুলিতে পয়সাটা এমনভাবে স্থাপন করল যেন হেডস উপরে থাকে। এরপর চুরি করল লটারিতে।

'টেলস উঠেছে,' আনন্দের সাথে বলল স্যাম। 'আমার খাবার খরচ তুমি দেবে!'

'হুম, কী আর করা! সবসময় তো আর জেতা যায় না।'

নিজের জন্য মিট লোফ নিল শ্যাডো, স্যাম নিল লাসানিয়া। খবরের কাগজে মনে দিল শ্যাডো, দেখল ট্রেনের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কিছু লেখা আছে কিনা। নেই। প্রথম পাতার আকর্ষণীয় খবর বলতে—শহরে কাকের উপদ্রব বেড়ে গিয়েছে। স্থানীয় কৃষকরা শহরের দেয়ালে কাকের লাশ ঝোলাতে চায়। অরিন্থলজিস্টদের মতে, এতে কোন লাভ হবে না। জীবিত কাক খেয়ে ফেলবে লাশগুলোকে। কিন্তু স্থানীয়রা মানতেই চাচ্ছে না। 'যখন স্বজাতির লাশ দেখবে কাকরা,' স্থানীয় একজন বলল। 'তখন বুঝতে পারবে যে ওদেরকে আমরা চাই না।'

ধোঁয়া ওঠা খাবার চলে এলো সামনে, একজনের পক্ষে এত খাবার শেষ করা অসম্ভব।

'কায়রোতে যাচ্ছ কেন?' মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে জানতে চাইল স্যাম।

'কোন ধারণা নেই। বসের আদেশ, তাই যেতে হচ্ছে।'

'কী করো তুমি?'

'ফাই-ফরমাশ খাটি।'

হাসল স্যাম। 'তুমি যে মাফিয়ার লোক না, তা ওই রদ্দিমাল দেখলেই বোঝা যায়। আচ্ছা, তোমার গাড়ির ভেতর থেকে কলার গন্ধ আসছে কেন?'

শ্রাগ করে খেতে শুরু করল শ্যাডো।

চোখ ছোট ছোট করে তাকাল স্যাম। 'তুমি কলার চোরাচালানকারী হতে পারো! যাই হোক, আমি কি করি তা জানতে চাইলে না যে?'

'স্কুলে পড় নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ। ইউ.ডব্লিউ. ম্যাডিসনে।'

'নিশ্চয় আর্ট হিস্টরি, উম্যান'স স্টাডি আর তামার কাজ নিয়ে লেখাপড়া করো? ফাঁকা সময়ে কাজ করো কোন কফি হাউসে?'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল মেয়েটার, চামচ নামিয়ে রেখে বলল, 'তুমি জানো কী করে?'

'কী? আরে তোমার এখন বলা উচিতঃ আমি রোমান্স ভাষা আর অরিন্থলজি নিয়ে পড়া-শোনা করি।'

'মানে কী? আন্দাজে বলেছ?'

'কী বললাম?'

শ্যাডোর চোখে চোখ রাখল মেয়েটা। 'তুমি একটা অদ্ভুত লোক, মিস্টার...এই, আমি তোমার নাম জানি না এখনও!'

'শ্যাডো।'

চেহারা বাঁকাল মেয়েটা, যেন মুখে এমনকিছু ঢুকিয়েছে যেটার স্বাদ ভালো লাগছে না। কিন্তু কিছু না বলে মাথা নিচু করে শেষ করল খাবার।

'জায়গাটার নাম মিশর কেন, জানো?' স্যামকে জিজ্ঞাসা করল শ্যাডো।

'জানি। শহরটা ওহাইও আর মিসিসিপির মোহনায় বলে। প্রাচীন মিশরও তাই ছিল, নীলের মোহনায়।'

'বুঝলাম।'

খাবার শেষ, তাই চেয়ারে হেলান দিয়ে কফি আর চকলেট ক্রিম পাইয়ের অর্ডার দিল স্যাম। 'বিয়ে করেছ, মিস্টার শ্যাডো?' ওকে ইতস্তত করতে দেখে বলল, 'বাজে একটা প্রশ্ন করে বসেছি, তাই না?'

'বৃহস্পতিবার ওকে কবর দিয়েছি,' শব্দ বেছে বেছে উচ্চারণ করল শ্যাডো। 'গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে।'

'হায়, ঈশ্বর। আমি দুঃখিত।'

'আমিও।'

অদ্ভুত একটা বিরতির পর মেয়েটা বলল, 'আমার সৎ বোনের ছেলে খোয়া গিয়েছে গত বছর।'

'তাই? কীভাবে?'

কফির কাপে চুমুক দিল মেয়েটা। 'আমরা জানি না। আসলে আমরা জানিও না যে ও আসলেই মারা গিয়েছে কিনা! বলতে পারো, হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে সে। বয়স ছিল মাত্র তেরো। গত বছর শীতের মাঝামাঝি সময়ের কথা। আমার বোন ভেঙ্গে পড়েছিল।'

'কোন সূত্র পাওয়া যায়নি?' নাটকের পুলিশ বলে মনে হলো ওর নিজেকে। 'কোন অপরাধের শিকার হয়নি তো?'

'পুলিশের সন্দেহ পড়েছিল আমার দুলাভাইয়ের উপর। ওর বাপ লোকটা ভালো না, তালাকের সময় বাচ্চার দেখ-ভাল করার দায়িত্ব পেয়েছিল আমার বোন। ওই হারামজাদা আমার ভাগিনাকে অপহরণ করতে পারে, হয়তো করেওছে। ঝামেলা হলো, আমাদের এই শহরটা একদম ছোট, এখানে কেউ দরজা পর্যন্ত লাগায় না!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে কফির কাপটাকে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল ও। 'তুমি নিশ্চিত, ওই দেহে ইন্ডিয়ান রক্ত নেই?'

'থাকতেও পারে, তবে আমার জানা মতে নেই। বাবার ব্যাপারে আমি বেশি কিছু জানি না। মা বলেননি। তবে সে নেটিভ আমেরিকান হলে অবশ্যই বলতেন।'

আবার চেহারা বাঁকাল মেয়েটা। চকলেট ক্রিম পাই পুরোপুরি শেষ হবার আগেই থামল স্যাম, থালাটাকে এগিয়ে দিল শ্যাডোর দিকে। 'খাবে?' উত্তরে হাসল শ্যাডো। 'অবশ্যই,' খানিকক্ষণের ভেতরেই শেষ করে ফেলল থালাটা।

বিল নিয়ে এলো ওয়েট্রেস, টাকা দিয়ে দিল শ্যাডো।

'ধন্যবাদ।' কৃতজ্ঞতা জানাল স্যাম।

ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। চালু হবার আগে কয়েকবার খুক খুক করে কেশে উঠল গাড়িটা। দক্ষিণ দিয়ে চলতে শুরু করল ওরা। 'হেরোডোটাস নামে কোন লোকের বই পড়েছ?'

'হায় যীশু, কী বললে নামটা?'

'হেরোডোটাস। কোন বই পড়েছ?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তোমাকে,' স্বপ্নালু কণ্ঠে বলল মেয়েটা। 'এই তোমাকে মনে হয় নির্বোধ, আবার পরমুহূর্তেই আমার মন পড়তে শুরু করে দাও! আবার ইচ্ছা হলেই শুরু করে দাও হেরোডোটাসকে নিয়ে গল্প। যাই হোক, আমি লোকটার কোন বই পড়িনি। তবে শুনেছি। রেডিওতেই তো মনে হয়। ভালো কথা, লোকটাকে মিথ্যার জনক বলে না?'

'আমি তো জানতাম, সেই উপাধি শয়তানের!'

'ওকেও বলে। তবে রেডিওতে শুনেছিলাম, হেরোডোটাস সব উল্টাপাল্টা ইতিহাস বর্ণনা করে গিয়েছে।'

'আমার তা মনে হয় না। লোকটা তা-ই লিখেছে, যা সে শুনেছে। অদ্ভুত অনেক কথা লিখেছে সে । যেমন মিশরে যখন কোন সম্ভ্রান্ত লোকের স্ত্রী মারা যায়, তখন মমিকারকদের দেবার আগে তিনদিন অপেক্ষা করা হয়। আগে দেহটা পচে যায়, তারপর...'

'কেন? ওহ, দাঁড়াও...দাঁড়াও। বুঝতে পেরেছি। ছিহ... ঘেন্না!'

'তার লেখা ইতিহাসে অনেক যুদ্ধের কথাও আছে। আছে দেবতাদের কথাও। মাঝে মাঝেই দেখা যায়, কোন সৈনিক যুদ্ধের ফলাফল জানাবার জন্য দৌড়ে রাজসভার দিকে আসছে। পথে আচমকা প্যানের সাথে দেখা হয়ে গেল। প্যান বলল, এখানে আমার জন্য মন্দির বানাতে বলবে। সৈন্যটা রাজাকে যুদ্ধের খবর জানিয়ে যোগ করে, 'ওহ, ভালো কথা। প্যান চায়, তার জন্য একটা মন্দির বানানো হোক।' পুরো ব্যাপারটা যেন একদম ডাল-ভাত!'

'তারমানে দেবতাদের নিয়ে অনেক গল্পও লিখেছে লোকটা? মানে কী? সবটাই তার ভ্রম?'

'নাহ,' বলল শ্যাডো। 'তা না।'

'মগজের ব্যাপারে কয়েকটা বই পড়েছিলাম,' বলল মেয়েটা। 'আমার রুমমেটের ছিল। ওতে লেখা, পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষের মস্তিষ্কের দুই খণ্ড জোড়া লাগে। তার আগে সবার ধারণা ছিল, ডান দিকের মস্তিষ্ক থেকে যে আওয়াজ আসে তা আসলে ঈশ্বরের আদেশ। সবটাই আসলে মগজের খেল।'

'আমার তত্ত্বটা বেশি ভালো।' বলল শ্যাডো।

'কোন তত্ত্ব?'

'মানুষ আসলে অতীতে মাঝে মাঝেই দেবতাদের সামনে পড়ত।'

'ওহ্।' আবার নেমে এলো নীরবতা। আওয়াজ বলতে কেবল মাফলারের গর্জন, খুব একটা সুস্থ মনে হচ্ছে না যন্ত্রাংশটাকে। 'কী মনে হয়, দেবতারা কি এখনও আছে ওখানে?'

'কোথায়?'

'গ্রিসে, মিশরে, যেসব জায়গায় দেবতাদের বাস...সেখানে? যদি এখন ওখানে যাই, তাহলে দেবতাদের দেখা পাব?'

'হয়তো। কিন্তু মনে হয় না দেবতাকে দেখলেও চিনতে পারবে।'

'আমার ধারণা,' বলল মেয়েটা। 'এখন যেমন মানুষ এলিয়েনদের দেখে, তখন দেখত দেবতাদের। হয়তো এলিয়েনদের জন্ম মানুষের মস্তিষ্কের ডান দিকে।'

'দেবতারা কখনও কারও পশ্চাদদেশে কিছু ঢুকিয়েছে বলে তো জানা নেই,' বলল শ্যাডো। 'আর নিজের হাতে গরু-বাছুরও খুন করেনি। উপাসক ছিল কাজটা করার জন্য।'

হেসে ফেলল স্যাম। চুপচাপ কেটে গেল আরও কিছুক্ষণ। তারপর আচমকা সে বলল, 'তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের একটা গল্প মনে পড়ে গেল। শুনবে?'

'অবশ্যই।' বলল শ্যাডো।

'গল্পটা ওডিন, নর্স দেবতাকে নিয়ে। অনেকদিন আগের কথা। তখন ভাইকিং জাহাজে চড়ে সফর করছিল ভাইকিং এক রাজা। বাতাস বওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই রাজা প্রার্থনা জানালেন, ওডিন যদি বাতাস পাঠান তো নাবিকদের একজনকে উৎসর্গ করবেন তিনি। বুঝেছ? যাই হোক, তাদের প্রার্থনা শুনলেন সর্ব-পিতা। বাতাসের উপর ভর করে তীরে পৌঁছাল জাহাজ। মাটিতে পা রেখে লটারি হলো, কী কপাল-রাজা সাহেব হারলেন লটারিতে! ওডিনের উদ্দেশ্যে তাই বলি হতে হবে তাকে। বুঝতেই পারছ, লোকটা এতে খুব একটা খুশি হলো না। নাবিকরা আলোচনা করে ঠিক করল, বলি দেয়া হবে তাকে। তবে রাজার যেন কোন ক্ষতি না হয়, সেদিকেও লক্ষ রাখবে। একটা বাছুর মেরে ওটার নাড়ি-ভুঁড়ি দিয়ে তারা পেঁচিয়ে দিল রাজার গলা, অন্য প্রান্তটা বাঁধল পাতলা একটা ডালের সাথে। বর্শার জায়গায় অস্ত্র হিসেবে নিল একটা নলখাগড়ার ডাল। এরপর লোকটাকে ঝুলিয়ে দিয়ে পাশে খোঁচা মেরে বলল—আপনাকে সর্ব-পিতার উদ্দেশ্যে বলি দিলাম।'

কথা বলছে স্যাম, আর মন দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে শ্যাডো। সামনেই পড়ল একটা নতুন সাইনবোর্ড–তমুক শহর (জনসংখ্যা, ৩০০)। স্টেট অনূর্ধ্ব-১২ স্পীড-স্কেটিং চ্যাম্পিয়নশিপের রানার-আপদের আবাস। রাস্তার দু'পাশে দুটো ফিউনারেল পার্লার দেখতে পেল ও। তিনশ মানুষ থাকে, এমন শহরে দুই-দুইটা ফিউনারেল পার্কার কেন...?

'যাই হোক, ওডিনের নাম নেয়ার সাথে সাথে নলখাগড়া পরিণত হলো বর্শায়, বেচারা রাজার বাঁ দিকটা ফুটো করে দিল। আর বাছুরের নাড়ি পরিণত হলো পুরু দড়িতে, গাছের পাতলা ডালটা হয়ে গেল এই মোটা গুঁড়ির সমান। ক্ষত দিয়ে রক্ত ঝরতে ঝরতে আর চেহারা কালো হয়ে মারা গেলেন রাজা। গল্প শেষ। সাদা লোকদের দেবতারা খুব অদ্ভুত হয়, মিস্টার শ্যাডো।'

'হ্যাঁ।' বলল শ্যাডো। 'তুমি সাদা নও?'

'চেরোকি।'

'পুরোপুরি?'

'নাহ। চার ভাগের এক ভাগ। আমার মা সাদা ছিলেন, বাপ ছিলেন রিজার্ভেশনবাসী ইন্ডিয়ান। রিজার্ভেশন ছেড়ে এদিকে এসেছিলেন, আমার মাকে বিয়ে করলেন। আমি জন্মালাম। তারপর আলাদা হয়ে গেলেন দু'জনে, চলে গেলেন ওকলাহামায়।'

'আর তোমার বাবা? রিজার্ভেশনে ফিরে গেলেন?'

'নাহ। টাকা-পয়সা ধার করে টাকো বিল'স নামে একটা টাকো বেলের নকল দোকান চালু করলেন। ভালোই কামান, অবশ্য আমাকে পছন্দ করেন না। বলেন, আমি নাকি দোআঁশলা!'

'কষ্ট পেলাম।'

'ভালো মানুষ না খুব একটা। তবে আমি আমার ইন্ডিয়ান পরিচয় নিয়ে গর্বিত। আমার কলেজের খরচ অনেকটাই বেঁচে যায়। কে জানে, সামনে হয়তো চাকরিও মিলবে একটা, যদি তামার জিনিস-পত্র বেঁচতে না পারি আরকি।'

'তা তো করাই উচিৎ।' বলল শ্যাডো।

এল পাসো, ইলিনয় (জনসংখ্যা ২৫০০), সাইনবোর্ড দেখল শ্যাডো। শহরের প্রান্তের একটা বাড়ির সামনে নামিয়ে দিল স্যামকে। 'ভেতরে আসবে?' জানতে চাইল মেয়েটা। 'খালা কফি খাওয়াবে।'

'না,' বলল যুবক। 'চলার উপর থাকা দরকার।'

হাসল মেয়েটা, এই প্রথমবারের মতো ভঙ্গুর মেয়েটা বেরিয়ে এলো স্যামের ভেতর থেকে। শ্যাডোর হাতে আলতো করে চাপড় দিয়ে বলল, 'তোমার মাথা খারাপ, মিস্টার। তবে তুমি লোক ভালো।'

'মানুষ মাত্রই তাই,' বলল শ্যাডো। 'আমাকে সঙ্গ দেবার জন্য ধন্যবাদ।'

'কোন অসুবিধা নেই।' বলল স্যাম। 'ভালো কথা, কায়রোর রাস্তায় কোন দেবতার দেখা পেলে আমার তরফ থেকে হাই বলে দিও।' গাড়ি থেকে নেমে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। ঘণ্টা বাজিয়ে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ, একবারের জন্যও পিছু ফিরে তাকাল না। মেয়েটা ঘরের ভেতরে না প্রবেশ করা পর্যন্ত গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করল শ্যাডো। তারপর রওনা দিল হাইওয়ের দিকে। পথে পড়ল নরম্যাল, ব্লুমিংটন আর লনডেল শহরগুলো।

সেদিন রাত এগারোটার দিকে, অনিয়ন্ত্রিতভাবে কাঁপতে শুরু করল শ্যাডো। মিডলটাউনে ঢুকেছে কেবল তখনও। সিদ্ধান্ত নিল ও, এখন ঘুমানো দরকার; আর গাড়ি চালান সম্ভব না। তাই একটা মোটেলের সামনে গাড়ি থামাল ও, পঁয়ত্রিশ ডলার দিয়ে নিচতলার একটা ঘর ভাড়া নিল। ঘরে ঢুকে প্রথমেই চলে গেল বাথরুমে। টাইল করা মেঝেতে একটা তেলাপোকা মরে পড়ে আছে। বাথটাব পরিষ্কার করার জন্য একটা তোয়ালে হাতে তুলে নিল শ্যাডো, কাজ শেষে পানি দিয়ে ভর্তি করল টাবটা। গোসলে যাবার আগে শোবার ঘরে গিয়ে খুলে ফেলল পরনের জামা। দেহের এখানে সেখানে ক্ষতের দাগ কালো হতে শুরু করেছে। পানি ভরা শেষ হলে, বাথটাবে বসল শ্যাডো। কিছুক্ষণ আরাম করে নিয়ে বেসিনেই ধুয়ে ফেলল মোজা, টি-শার্ট আর জাঙ্গিয়া। ভালো মতো পানি ঝরিয়ে নিয়ে ওগুলো ঝুলিয়ে দিল একটা দড়িতে। তেলাপোকাটাকে সরালো না, মৃত্যুর প্রতি সম্মান দেখিয়ে রেখে দিল জায়গামতোই।

অবশেষে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল শ্যাডো। টিভি চালু করে দিয়ে তিন বার 'স্লিপ' বোতামটা চাপল, পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর আপনা-আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে যন্ত্রটা। এখন রাত বারোটা বাজতে মিনিট পনেরো বাকি।

ছবি খুব একটা ভালো আসছে না, পর্দায় লাফালাফি করছে রঙ। টেলিভিশন প্রোগ্রামের জঙ্গলে যেন হারিয়ে গেল শ্যাডো। এক চ্যানেলে শেখাচ্ছে রান্নার পদ্ধতি তো আরেক চ্যানেল জানাচ্ছে-কেয়ামত সন্নিকটে। এখন যদি যীশুর আশীর্বাদ আর ব্যবসায় সফলতা পেতে হয়, তাহলে অমুক যাজককে টাকা পাঠাতে হবে। চ্যানেল পরিবর্তন করল ও। ম*য*া*শ্-এর একটা পর্ব শেষ হয়ে ডিক ভ্যান ডাইক শো শুরু হলো!

অনেকদিন হলো সিরিজটার কোন পর্ব দেখে না শ্যাডো। ১৯৬৫ সালের সাদা-কালো ছবিটা দেখে স্বস্তিতে ভরে ফেল ওর মন। রিমোট নামিয়ে রেখে বিছানার পাশের বাতি নিভিয়ে দিল সে, দেখতে দেখতে হারিয়ে যেতে লাগল ঘুমের অতলে। তবে অবচেতন মন জানাচ্ছে, অদ্ভুত কিছু একটা হচ্ছে এখানে। ডিক ভ্যান ডাইক শো খুব একটা দেখেনি ও, কিন্তু এই পর্বটা একেবারেই অন্যরকম মনে হচ্ছে।

অভিনেতা-অভিনেত্রীরা রবের মাতলামি নিয়ে চিন্তিত। লোকটা ঠিকমতো কাজেই যাচ্ছে না! সবাই মিলে তাই ওর বাড়িতে গেল, এদিকে রব বেডরুমে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে রেখেছে! অনুরোধ-উপরোধ করে বাইরে বের করে আনতে হলো তাকে। মাতালের মতো হেলছিল সে, কিন্তু কৌতুকটা ভোলেনি। কিছু ঠাট্টা করার পর বিদায় নিল ওর বন্ধুরা। রবির বউ যখন ওকে বোঝাতে গেল, তখন মেয়েটাকে মেরে বসল সে! তাও আবার গায়ের জোরে! মেঝেতে বসে কাঁদতে শুরু করল মেয়েটা। নাহ, মেরি টাইলার মুরের সেই বিখ্যাত চিলের মতো চিৎকার করা কান্না নয়। নিজেকে আঁকড়ে ধরে ফোঁপাতে শুরু করল সে। 'আমাকে মের না, প্লিয। তুমি যা চাও, তাই করব। কিন্তু আমাকে আর মের না!'

'এসব কী?' উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল শ্যাডো, কার উদ্দেশ্যে...কে জানে?

ঝিরঝির করতে শুরু করল টিভির পর্দা। যখন আবার ছবি ফিরে এলো, তখন কীভাবে যেন ভ্যান ডাইক শো'র জায়গা করে নিয়েছে আই লাভ লুসি! শ্যাডো দেখল, রিকিকে ওদের আইসবক্স বদলে ফ্রিজ কেনার জন্য বাধ্য করতে চাইছে লুসি। রিকি বিদায় নিলে, কাউচে গিয়ে বসে পড়ল মেয়েটা। একহাত কোমরে রেখে চাইল সরাসরি শ্যাডোর চোখে।

'শ্যাডো?' বলল মেয়েটা। 'আমাদের কথা বলা দরকার।'

হতবাক হয়ে গেল শ্যাডো। এদিকে মেয়েটা কিন্তু বসে নেই। পার্স খুলে সিগারেট বের করেছে একটা, তারপর দামী একটা রূপালী লাইটার দিয়ে ওটা ধরিয়ে আবার লাইটারটা রেখে দিয়েছে। 'ভুল শোননি,' বলল সে। 'আমি তোমার সাথেই কথা বলছি।'

'অদ্ভুত!'

'তোমার বাকি জীবনটা বুঝি অদ্ভুত না?'

'ওগুলো বাদ দাও। টিভির ভেতর থেকে খোদ লুসিল বল আমার সাথে কথা বলছে-এর সামনে ওসব কিছুই না।'

'লুসিল বল না, লুসিল রিকার্ডো। আর শোন, আমি লুসিল নই। দেখা দিতে সুবিধা হয়, তাই আমার এই রূপ।' অস্বস্তিভরে সোফায় নড়ে উঠল মেয়েটা।

'তাহলে তুমি কে?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'ভালো প্রশ্ন। আমাকে এই নির্বোধ বাক্স বলতে পারো। আমি টিভি, আমি সেই চোখ যা সব দেখে। আমি টিউব...আমি সেই উপাসনালয়, যার সামনে এক হয় পুরো পরিবার।'

'তুমি টেলিভিশন? নাকি টেলিভিশনের ভেতরে কোন অস্তিত্ব?'

'টিভি আসলে প্রার্থনার বেদি। আমিই সে, যাকে উদ্দেশ্য করে বলি দেয় মানুষ।'

'কী বলি দেয়?'

'অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের সময়।' বলল লুসি। 'কখনও কখনও সম্পর্কের বন্ধন।' দুই আঙুল এক করে পিস্তলের মতো করে ধরল মেয়েটা, তারপর যেন ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল ধোঁয়া। এরপর শ্যাডোকে অবাক করে দিয়ে চোখ টিপল, আই লাভ লুসি-র নায়িকা এই ভঙ্গিতে চোখ টেপাকে বিখ্যাত করেছেন।

'তুমি দেবতা?' জানতে চাইল শ্যাডো।

তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল লুসির ঠোঁটে, আয়াসের সাথে রাজসিক ভঙ্গিতে টান দিল সিগারে। 'তা বলতে পারো।'

'স্যাম তোমাকে হাই বলেছে।'

'কী? স্যাম কে? কী সব বলছ?'

ঘড়ির দিকে তাকাল শ্যাডো, বারোটা বেজে পঁচিশ। 'গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলছি না। যাই হোক, টিভির-লুসি, কী নিয়ে কথা বলতে চাও? আজকাল দেখি অনেকেই আমার সাথে কথা বলতে আগ্রহী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার সমাপ্তি হয় আমাকে আঘাত করার মাধ্যমে।'

ক্যামেরা জুম করে লুসির চেহারা ফুটিয়ে তুলল পর্দায়, চিন্তিত বলে মনে হলো মেয়েটাকে। 'আমার ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি। শ্যাডো, সোনামণি, আমার দ্বারা তোমার কখনও কোন ক্ষতি হবে না। আমি তোমাকে একটা চাকরির প্রস্তাব দিতে চাই।'

'কী করতে হবে আমাকে?'

'আমার হয়ে কাজ করবে। কিস্তূতদের সাথে তোমার যে ঝামেলা হয়েছে, তা আমি শুনেছি। তুমি যেভাবে ব্যাপারটা সামলেছ, সেটাও শুনেছি। দক্ষ হাতে সামলেছ সব। কে ভেবেছিল, বেচারা শ্যাডো এমন নৃশংস হতে পারে। ওরা তো দারুণ ক্ষেপে আছে!'

'তাই?'

'তোমাকে আসলে গোণায় ধরেনি ওরা। তবে আমি সেই ভুল করছি না। নিজের দলে তোমাকে আমার চাই।' উঠে ক্যামেরার কাছে চলে এলো মেয়েটা। 'শোন শ্যাডো, আমরাই ভবিষ্যত। আমরা যদি শপিং মল হই, তবে তোমার বন্ধুরা রাস্তার পাশের দর্শনীয় স্থান বই কিছু না। আমরা অন-লাইন দোকান, তোমার বন্ধুরা হাইওয়ে বসে জিনিস-পত্র বিক্রি করা ছোটলোক। আমরা আগামী, তোমার বন্ধুরা অতীতের বিস্মৃতে হারিয়ে গিয়েছে...'

খুব পরিচিত শোনাল কথাগুলো। শ্যাডো জিজ্ঞাসা করল, 'লিমোতে বসে থাকা কোন মোটা বাচ্চাকে চেন নাকি?'

দুই হাত দুই দিকে দিয়ে চোখ ওল্টালো মেয়েটা, ঠিক যেমন করে লুসি ওল্টায়। 'টেকনিক্যাল বয়? তোমার সাথে ওর দেখা হয়েছে? ছেলেটা কিন্তু আসলে ভালো, আমাদেরই একজন। আমার প্রস্তাব মেনে নাও, দেখবে কী দারুণ সে!'

'আর যদি তোমার, আই-লাভ-লুসির সাথে কাজ না করি তো?'

লুসির অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় নক হলো একটা, রিকির আওয়াজ শুনতে পেল শ্যাডো। ছেলেটা জানতে চাইছে, লুসির এত দেরী হচ্ছে কেন? পরের সীনের শ্যুটিং এই শুরু হলো বলে! বিরক্তি খেলে গেল মেয়েটার সুন্দর চেহারায়। 'ধুরো,' বলল সে। 'দেখো, ওই বুড়ো-হাবড়া তোমাকে যা দিচ্ছে, আমি তার দ্বিগুণ দেব। লাগলে তিনগুণ। কে জানে, সব শেষে শতগুণও দিতে পারি। তারচেয়ে বড় কথা, বুড়ো যাই দেক না কেন...' দুষ্টামি, আবেদন, আমন্ত্রণ-সব একসাথে ঝরে পড়ল যেন মেয়েটার হাসিতে। '...আমি তারচেয়েও বেশি কিছু দেব।' বলতে বলতেই ব্লাউজের বোতাম খুলতে শুরু করল মেয়েটা। 'লুসির বুক দেখতে চাও?'

কালো হয়ে গেল পর্দা, পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে গিয়েছে! ঘড়ির দিকে তাকাল শ্যাডো। মাঝরাত হয়েছে তা-ও আধ-ঘণ্টা হলো। 'খুব একটা না।'

কাত হয়ে চোখ মুদল ও। ওয়েনসডে আর মি. ন্যান্সির মতো লোকদের কেন পছন্দ হয়, সেটা এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে। ওদের মাঝে লুকোছাপা কম। হ্যাঁ, টাকা-পয়সা খুব একটা নেই। খাবারের স্বাদও ভালো না, কিন্তু এত নাটক করে কথা বলে না।

বুঝতে পারলো, রাস্তার পাশের দোকান যত কমদামী আর সস্তায় হোক না কেন, ওর কাছে দামী শপিং মলের চাইতে বেশি আকর্ষণ রাখে।

পরদিন সকালে যখন রাস্তার উপর সুর্যের আলো পড়ল, তখন শ্যাডো অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। তুষারের নাম-গন্ধ নেই, দুপাশে শীতের ঘাস আর ন্যাড়া গাছ দেখা যাচ্ছে। রদ্দিমালটায় গ্যাস ভরার জন্য একটা ছোট স্টেশনে থামল ও। ভয়ে ভয়ে গাড়িটাকে ধুয়েও নিল। যন্ত্রটা ওপাশ থেকে যখন বের হলো, তখন অবাক হয়ে শ্যাডো দেখল-গাড়িটার রঙ আসলে সাদা! মরচেও পড়েনি খুব একটা। কিছুক্ষণের মাঝেই আবার পথে নামল ও।

আকাশটাকে এমন নীল দেখেনি অনেকদিন, তবে ফ্যাক্টরির চিমনি থেকে বেরিয়ে আসা সাদা ধোঁয়া কিছুটা হলেও কৃত্রিমতা এনে দিয়েছে দৃশ্যে। মৃত এক গাছের ডালে বসেছিল একটা বাজপাখি, ওর গাড়িটাকে দেখে উড়ে এসেছে। পুরো দৃশ্যটা যেন ফ্রেমে বেঁধে রাখার মতো।

অনেকক্ষণ আপনমনে গাড়ি চালাবার পর আচমকা আবিষ্কার করল, ও পূর্ব সেন্ট লুইসের দিকে যাচ্ছে। ইচ্ছে করেই অন্য দিকে গাড়ির নাক ঘোরাল সে, এবার নিজেকে আবিষ্কার করল একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের রেড-লাইট এলাকায়। আঠারো হুইলের বিশাল বিশাল ট্রাক আর তারচেয়েও বড় বড় বাহন পার্ক করা আছে গুদামঘরের সামনে। না থেমে এগিয়ে চলল শ্যাডো। দুপুরের খাবারটা সেরে নিল রেড বাড নামের একটা শহরে, স্যাণ্ডউইচ আর কোক দিয়ে।

পথে পড়ল শত শত হলুদ বুলডোজার, ট্রাক্টর আর ক্যাটারপিলারের ধ্বংসাবশেষ সম্বলিত উপত্যকা। মনে মনে জায়গাটির নাম দিল ও বুলডোজারের কারবালা, যেখানে যন্ত্রগুলো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার জন্য আসে।

পথে পড়ল পপ-আ-টপ লাউঞ্জ, পড়ল চেস্টার (পপাইয়ের উৎপত্তি এখানে)। শ্যাডো লক্ষ করল, এখনকার বাড়িগুলোর সামনে থাম দেখা যাচ্ছে। এমনকি একেবারে জীর্ণ আর একেবারে ছোট বাড়িটাও গর্ব ভরে নিজেকে প্রাসাদ বলে ঘোষণা করছে! শুকিয়ে যাওয়া একটা বড়, কাদাময় নদী পার হতে হলো ওকে। একটু এগিয়ে যখন নদীটার নাম লেখা সাইনবোর্ড দেখতে পেল, তখন না হেসে পারল না। ওটার নাম-বড় কাদাময় নদী!

মিসিসিপির ধার ধরে এগিয়ে চলল শ্যাডো, নীল নদ দেখেনি কখনও ও। কিন্তু বিকালের পড়ন্ত আলোয় কেন নদীটার হলদে পানি দেখে ওর বারবার নীলের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। নাহ, এখনকার নীল নদ নয়। অনেকদিন আগের সেই নদটা, যখন ওটার অববাহিকা ভরা থাকত কোবরা, শিয়াল আর বুনো গরুতে...

থিবসে যাবার দিক-নির্দেশনা দেয়া একটা সাইন নজরে পড়ল ওর।

রাস্তাটা মাটি থেকে প্রায় বারো ফুট উপরে, তাই উপর থেকে জলাভূমি দেখার সৌভাগ্য হলো শ্যাডোর। সেই সাথে আকাশে উড়তে থাকা ঝাঁক ঝাঁক পাখিও, এবার ঝাঁক এগোচ্ছে তো আরেকবার পিছাচ্ছে। ব্রাউনীয় গতির প্রকৃষ্ট এক উদাহরণ যেন ওগুলো।

গোধূলি বেলায় আরও মরে এলো সূর্যের আলো, সারা দুনিয়াকে ভরে দিল যেন নরম-স্বাদু রঙে। আচমকা চারপাশের পৃথিবী শ্যাডোর চোখে ধরা দিল অলীক এক বস্তু রূপে। কখন যে ও কায়রোর অভ্যন্তরে চলে এসেছে, টেরই পায়নি। একটা ব্রিজ অতিক্রম করা মাত্র সে নিজেকে আবিষ্কার করল একটা ছোট্ট শহরে। প্রথমেই নজরে পড়ে কায়রো কোর্টহাউস আর কায়রো কাস্টমস হাউস। মরা আলোতে ওর মনে হলো, সোনালী রস দিয়ে মাখানো দুটো কুকি বিস্কুট যেন দালান দুটো।

একটা পার্শ্ব-রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে শ্যাডো হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো বেড়িবাঁধে। ওহাইও নদী দেখছে এখন, নাকি মিসিসিপি তা জানে না ও। ছোট্ট একটা বাদামী বিড়াল দৌড়াদৌড়ি করছে একটা দালানের পেছনে রাখা দুই ট্রাশ-ক্যানের মাঝে। বিকালের এই আলোয় আবর্জনাকেও কেমন যেন জাদুময় মনে হচ্ছে।

নদীর ধার ধরে উড়ে যাচ্ছে একাকী এক সীগাল, মাঝে-সাঝে ডানা ঝাঁপটে ভারসাম্য সামলে নিচ্ছে।

আচমকা শ্যাডো বুঝতে পারল, ও একা নেই। একটা ছোট্ট মেয়ে, পায়ে পুরাতন টেনিস শ্যু আর পরনে বুড়ো মানুষের পশমি সোয়েটার পরে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে। ওর থেকে মাত্র দশ মিটার দূর থেকে দেখছে ছয়-বছর-বয়সী চোখের গাম্ভীর্য দিয়ে। চুলগুলো কালো মেয়েটার, লম্বা আর সোজা; ত্বকের রঙ নদীটার মতোই বাদামী।

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাসল শ্যাডো, কিন্তু মেয়েটা হাসল না। কেবল বিদ্রোহ চোখে নিয়ে তাকিয়ে রইল। এদিকে বাদামী বিড়ালটার অবস্থান থেকে ভেসে এলো দুটো প্রানির চিৎকারের আওয়াজ। বেচারিকে ধাওয়া করছে একটা লম্বা নাক বিশিষ্ট কালো কুকুর।

'হাই,' মেয়েটাকে বলল শ্যাডো। 'আগে কখনও অদৃশ্য হবার গুঁড়ো দেখেছ?'

একটু ইতস্তত করে মাথা নাড়ল মেয়েটা, দেখেনি।

'হুম,' বলল শ্যাডো। 'তাহলে এটা দেখ।' পকেট থেকে একটা কোয়ার্টার বের করে বাঁ হাতের উপর নিল ও। এরপর সেটা উঁচু করে এপিঠ-ওপিঠ

দেখাল। এরপর সেটা ডান হাতের দিকে ছুঁড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল কেবল, বাতাস খামচে ধরে ডান হাতটা মেয়েটার সামনে এনে বলল, 'মন দিয়ে দেখ। এবার আমার পকেট থেকে কিছু অদৃশ্য হবার গুঁড়ো নিচ্ছি...' বাঁ হাতটা বুক-পকেটের কাছে নিয়ে এলো শ্যাডো, এই সুযোগে পয়সাটাও পকেটে ফেলে দিল। '...এবার ওগুলোকে ছড়িয়ে দিচ্ছি হাতে...' লবণ ছড়াবার মতো ভঙ্গি করল ও। '...দেখ, পয়সাটা নেই!' খালি ডানহাতটা দেখাল শ্যাডো, মেয়েটাকে আরও অবাক করে দেবার জন্য বাঁ হাতটাও দেখাতে ভুলল না!

মেয়েটা তাকিয়ে রইল কেবল।

শ্রাগ করল শ্যাডো। হাত দুটো পকেটে ভরল, সুযোগ বুঝে একহাতে তুলে নিলে কোয়ার্টার আর অন্য হাত দিয়ে পাঁচ ডলারের একটা নোট। বাতাস থেকে ওগুলো নিয়ে আসার ভান করবে সে, তারপর তুলে দেবে মেয়েটার হাতে। 'আরে,' বলল ও। 'আমাদের সাথে দেখি আরেক সঙ্গী যোগ হয়েছে।'

কালো কুকুর আর বাদামী বিড়ালটাও ঝগড়া ভুলে ওর খেলা দেখায় মনে দিয়েছে, মেয়েটার দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে দুজন। কুকুরটার বড় বড় কান দুটো খাড়া খাড়া হয়ে আছে, হাস্যকর দেখাচ্ছে ওটাকে।

ফুটপাত ধরে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে সারসের মতো লম্বা ঘাড় ওয়ালা এক লোক, চোখে সোনা দিয়ে বানানো ফ্রেমের চশমা। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে সে, মনে হচ্ছে খুঁজছে কিছু একটা। শ্যাডোর মনে হলো, লোকটা সম্ভবত কুকুরটার মনিব।

'কী মনে হয়,' কুকুরটাকে জিজ্ঞাসা করল শ্যাডো, মেয়েটাকে শান্ত করার প্রয়াস আরকী। 'দারুণ না?'

লম্বা নাক চাটল কালো কুকুরটা। এরপর মানুষের গলায় বলল, 'আমি একবার হুডিনির জাদু দেখেছিলাম। তুমি হ্যারি হুডিনির নখেরও যোগ্য নও।'

বাচ্চা মেয়েটা একবার দুই প্রানির দিকে তাকাল, এরপর আবার শ্যাডোর দিকে। আচমকা পালাতে শুরু করল সে, নরক থেকে দানব উঠে এসে ওর পিছু ধাওয়া করছে! প্রাণী দুটো পিছু নিল না। সারসের কথা মনে করিয়ে দেয়া লোকটা কুকুরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, আলতো করে চুলকে দিল ওটার কান।

'একটু নরম হও!' কুকুরটাকে বলল সে। 'পয়সার একটা খেলা দেখিয়েছে কেবল। পানির নিচ থেকে পালানোর চেষ্টা তো আর করেনি।'

'এখনও করেনি,' বলল কুকুর। 'কিন্তু সামনে যে করবে, সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ নেই।' সোনালী আলো বিদায় নিয়েছে, সন্ধ্যা যেন ঘনিয়ে এসেছে।

পকেটে পয়সা আর নোটটা পুরে নিল শ্যাডো। 'তোমাদের মাঝে শিয়াল কে?'

'চোখ নেই নাকি?' কালো কুকুরটা ঘোঁত করে উঠল। সারসের মতো লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে সাথে যোগ দিল শ্যাডো। বিড়ালটার হদিস নেই কোন।

হাঁটতে হাঁটতে একসারি বিশাল, পুরাতন দালানের সামনে এসে উপস্থিত হলো তারা। বিশেষ একটা বাড়ির সামনে এসে থামল। দরজার পাশে লেখা সাইনে লেখা–

আইবিস আর জ্যাকেল। পারিবারিক ফার্ম। ফিউনারেল পার্লার। ১৮৬৩ সাল থেকে।

'আমি মি. আইবিস,' চশমা পরা লোকটা বলল। 'চলো, তোমাকে রাতের খাবার খাওয়াব। আমার বন্ধুর আবার কাজ আছে।'

আমেরিকার কোথাও

নিউইয়র্ককে ভয় পায় সালিম। বুকের কাছে তাই ওর স্যাম্পল ভর্তি কেসটা আঁকড়ে ধরাটা খুব একটা অস্বাভাবিক না। কালো মানুষদের অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকাটাকেও ভয় পায় সে। ভয় পায় ইহুদীদের, যারা সম্পূর্ণ কালো পোশাকে আবৃত রাখে নিজেদেরকে...অনেককে তো ইহুদী হিসেবে চিনতেও পারে না। এত অধিক সংখ্যক মানুষ দেখে অভ্যস্ত নয় সে। লম্বা-লম্বা, নোংরা দালানগুলো থেকে পিঁপড়ার মতো পিলপিল করে বের হয় তারা। গাড়ির অদ্ভুত হর্নের আওয়াজ ভয় পায়...ভয় পায় একইসাথে নোংরা আর মিষ্টি গন্ধের বাতাসও; ওমানের সাথে যার কোন মিল নেই!

এক সপ্তাহ হলো নিউইয়র্ক, আমেরিকায় এসেছে সালিম। প্রতিদিন দুই, কখনও কখনও তিনটা আলাদা আলাদা অফিসে যায় ও। স্যাম্পল ভর্তি কেসটা থেকে বের করে দেখায় তামার মনোহারী সামগ্রী-চাবির রিং, বোতল, ছোট ছোট ফ্ল্যাশলাইট, দ্য এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং এর মডেল, স্ট্যাচু অফ লিবার্টি, আইফেল টাওয়ার ইত্যাদি। প্রতি রাতে ওর দুলাভাই ফুয়াদকে মাস্কাটে ফ্যাক্সও পাঠায় সে। যদি কোন দিনে কয়েকটা অর্ডার পায় তাহলে সেটাও জানায়। তবে অর্ডারের কামাই যে সালিমের আমেরিকায় আসা বা হোটেল থাকা-খাবার খরচ যোগাবার জন্য যথেষ্ট না, সেটা জানে ভালোভাবেই।

কেন জানে না, ওর দুলাভাইয়ের ব্যবসায়িক পার্টনাররা প্যারামাউন্ট হোটেলে রেখেছে ওকে। বদ্ধ, খরুচে আর বিভ্রান্তিকর মনে হয় জায়গাটাকে।

ফুয়াদ, ওর দুলাভাই, খুব একটা ধনী নয়। তবে ছোট-খাটো তামার জিনিসপত্র বানাবার একটা ফ্যাক্টরির সহ-মালিক সে। ওখানে সবকিছুই বানানো হয় আরব দেশ, ইউরোপ আর আমেরিকায় পাঠাবার জন্য। ছয় মাস হলো ফুয়াদের হয়ে কাজ করছে সালিম। দুলাভাইকে কেন যেন ভয় পায়, তার ওপর লোকটার ফ্যাক্সের ভাষাও দিন দিন কড়া হয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যাবেলা হোটেল রুমে বসে সময়টা কাটায় সালিম, নিজেকেই বোঝায় সব ঠিক হয়ে যাবে। বোঝায়, এই অদ্ভুত দুনিয়ায় ওর বাস করার সময় খুব অল্প...নির্দিষ্ট।

হাত-খরচ হিসেবে এক হাজার ডলার দিয়েছে ওকে ফুয়াদ, ওমানে থাকার সময় অনেক মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন বানের জলের মতো খরচ হয়ে যাচ্ছে।

প্রথম প্রথম ইচ্ছামতো সবাইকে বখশিশ দিত ও, পাছে লোকে ওকে কঞ্জুস আরব বলে ধরে নেয়। যখন বুঝতে পারল যে ওকে পকেট কাটা হচ্ছে, আর সম্ভবত ওকে নিয়ে হাসাহাসিও করা হচ্ছে-বখশিশ দেয়াই বন্ধ করে দিল।

মাত্র একবার সাবওয়েতে চড়েছিল বেচারা, বিভ্রান্ত হয়ে মিস করে বসেছিল অ্যাপয়েন্টমেন্ট। এখন মিটিংয়ে যাওয়ার সময় ট্যাক্সি নেয় সালিম, অন্য কোথাও যেতে হলে হেঁটে যায়। কখনও কখনও যেতে হয় স্বাভাবিকের চাইতেও গরম অফিসে, কখনও কখনও ঠান্ডায় জমে যাওয়া ঘরে। রাস্তায় হাঁটার সময় প্রায়শই পানিতে ভিজে যায় ওর জুতা, বৃষ্টির সময় অবস্থা আরও বেশি খারাপ হয়ে যায়।

হোটেলে খায় না সালিম (থাকার খরচ ফুয়াদের পার্টনাররা দিলেও, খাবার খরচটা ওর নিজেকেই দিতে হয়)। তাই কালাফেল হাউজ আর ছোট ছোট দোকানগুলো থেকে খাবার কিনে কোটের আড়ালে লুকিয়ে নিয়ে আসে হোটেলে। আসলে আসে না, আসত। যখন বুঝতে পারল যে ও কী খায়, তাতে কারও কিছু যায় আসে না-তখন সবার চোখের সামনেই খাবার নিয়ে উঠতে শুরু করল।

আজ সালিমের মনটা বিক্ষিপ্ত। আজ সকালে পাওয়া ফ্যাক্সটা ছোট, কিন্তু কড়া। ওটা অনুসারে, সালিমের কর্মকাণ্ড হতাশাজনক। ওর বোন, ফুয়াদ, ফুয়াদের পার্টনার, ওমানের সুলতান আর সারা আরব বিশ্বকেই হতাশ করছে সে। দ্রুত কিছু অর্ডার না পেলে, ফুয়াদ আর ওকে টানতে পারবে না। হোটেল খরচ অনেক বেশি। আমেরিকায় আসলে করছেটা কী সালিম? ওদের টাকায় আয়েশে দিন কাটাচ্ছে? ঘরে বসে বসে ফ্যাক্সটা পড়েছিল সালিম (গত রাতে একটু বেশি গরম লেগেছিল বলে জানালা খুলে রেখেছিল, সকালে উঠে দেখে ঘরটা ফ্রিজের চাইতেও ঠান্ডা), জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিল বাইরে।

স্যাম্পল কেসটাকে এমনভাবে বুকের সাথে আঁকড়ে ধরল সালিম, যেন ভেতরে হীরা-পান্না নিয়ে ঘুরছে। ব্লকের পর ব্লক পার হয়ে রওনা দিল ব্রডওয়ের দিকে। যে দালানটা খুঁজছিল, সেটা বের করে উঠে গেল পঞ্চম তলায়; প্যানগ্লোবাল ইম্পোর্টসের অফিসে।

ঘরটা একদম ছোট, তবে কোম্পানিটার কর্মক্ষেত্র অনেক বিশাল। প্রাচ্য থেকে যত স্যুভনির ইউ.এস.এ. আসে, তার অর্ধেকটাই এদের হাত ধরে। প্যানগ্লোবালের কাছ থেকে বড় ধরনের অর্ডার পাওয়া সালিমের ব্যর্থতা আর সফলতার মাঝে পার্থক্যকারী হয়ে দাঁড়াবে। তাই শক্ত হয়ে কাঠের চেয়ারে বসে রইল ও, স্যাম্পলের কেসটা কোলের উপর রেখে দিয়েছে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনেই, ডেস্কের ওপাশে বসে থাকা মহিলার দিকে। চুলে একটু বেশিই লাল রঙ ব্যবহার করে ফেলেছে বেচারি, একের পর এক ক্লিনেক্স ব্যবহার করে নাক মুছছে সে।

এগারোটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট হলেও, আধা-ঘণ্টা আগে এসে উপস্থিত হয়েছে সালিম। এখন বসে বসে কাঁপছে সে, জ্বর আসবে মনে হচ্ছে। একঘেয়ে সময় কেটে যাচ্ছে এক সেকেন্ড-এক সেকেন্ড করে।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল ও, খুক খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করল।

ডেস্কে পেছনে বসা মহিলা চেহারায় বিরক্ত নিয়ে তাকাল ওর দিকে। 'কী চাই?' এমনভাবে বলল যেন শোনা গেল-খী সাই?

'এখন এগারোটা বেজে পঁয়ত্রিশ।' বলল সালিম।

দেয়াল ঘড়িটা এক নজর দেখে নিয়ে বলল, 'হুম।'

'আমাকে এগারোটায় আসার কথা বলা হয়েছিল।' সেলিম মুখে হাসি এনে বলল।

'মিস্টার ব্ল্যাডিং আপনার আসার কথা জানেন।' বলল মহিলা।

কথা না বাড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে এক কপি দ্য নিউইয়র্ক পোস্ট তুলে নিল সালিম। ইংরেজি যতটা ভালো বলতে পারে, পড়তে ততটা পারে না। গোলকধাঁধায় আটকা পড়া লোকের মতো কাগজের সব গল্প পড়ল ও। অপেক্ষা করল সে, একবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে তো আরেকবার কাগজের দিকে।

সাড়ে বারোটার দিকে ভেতরের অফিস থেকে বেশ কয়েকজন বেরিয়ে এলো। ইংরেজি হাসি-ঠাট্টা করছিল তারা। এদের মাঝে একজনের দিকে নজর গেল ওর-বড়, ভুঁড়ি-ওয়ালা এক লোক, দুই ঠোঁটের মাঝে সিগার ঝুলিয়ে আছে। একবার সেলিমের দিকে তাকাল সে, তারপর মহিলাকে জানাল-জিঙ্ক আর ভিটামিন সি ঠান্ডায় দারুণ কাজে আসে। পরামর্শ মোতাবেক কাজ করবে জানিয়ে কয়েকটা খাম এগিয়ে দিল মহিলা। পকেটে ওগুলো পুরে, বাকিদের সাথে হলে চলে গেল লোকটা। অল্প কিছুক্ষণের মাঝেই হাসির আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

ঘড়িতে একটা বাজে যখন, তখন মহিলা দুপুরের খাবার হিসেবে ব্যাগ থেকে বের করল কয়েকটা স্যান্ডউইচ, একটা আপেল আর একটা পানীয়।

'ক্ষমা করবেন,' বলল সালিম। 'মিস্টার ব্ল্যাভিংকে কি জানান যাবে যে আমি এখনও অপেক্ষা করছি?'

অবাক চোখে সালিমের দিকে তাকাল মহিলা, ও যে এখনও অপেক্ষা করছে সেটা যেন বিশ্বাসই হতে চাইছে না। মাত্র পাঁচ ফুট দূরে যে আড়াই ঘণ্টা ধরে সালিম বসে আছে, সেটা যেন ভুলেই গিয়েছে। 'তিনি লাঞ্চে গিয়েছেন।'

তা সালিম আগেই বুঝতে পেরেছে, সিগার ঝোলান লোকটাই যে ব্ল্যান্ডিং-সে ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত ও। 'ফিরবেন কখন?'

শ্রাগ করে স্যান্ডউইচ মুখে দিল মহিলা। 'বাকি দিনটা তিনি ব্যস্ত।'

'তাহলে ফিরে এলে কি দেখা হবে?'

আবারও শ্রাগ করে নাক ঝাড়ল মহিলা।

ক্ষুধা পেয়েছে সালিমের, কিন্তু ক্ষমতাহীনতা আর ব্যর্থতার জ্বালা ওকে ভোগাচ্ছে আরও বেশি। তিনটার দিকে মহিলা ওর দিকে ফিরে বলল, 'আজ আর তিনি ফিরবেন না।'

'বুঝিনি?'

'মিস্টার ব্ল্যান্ডিং আজ আর ফিরবেন না।'

'কালকের জন্য একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা যাবে?'

নাক মুছল মহিলা। 'টেলিফোন করে আসতে হবে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট শুধু টেলিফোনেই দেয়া হয়।'

'বুঝেছি।' সালিম বলল। এরপর হাসল ও-সেলসম্যানের হাসি। মাস্কাট থেকে বেরোবার আগে বারবার বলে দিয়েছে ফুয়াদ-আমেরিকায় এই হাসি ছাড়া সবকিছু অচল। 'ফোন করে আসব তাহলে,' বলে তুলে নিল স্যাম্পল কেসটা। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমেই মুখোমুখি হলো ঝিরঝিরে বৃষ্টির। হোটেলে ফিরতে হলে হাঁটতে হবে অনেকক্ষণ, তাই সিদ্ধান্ত নিয়ে হাত তুলে ডাকল রাস্তা দিয়ে যেতে থাকা সবগুলো হলদে ক্যাব। একটাও দাঁড়াল না।

একটা তো পার হয়ে গেল তীব্র গতিতে, যাবার সময় কাদা ছিটিয়ে গেল সালিমের কোট-প্যান্টে। আচ্ছা, ক্যাবের সামনে ঝাঁপ দিলে কেমন হয়? ভাবল সালিম। উপলব্ধি করতে পারল, দুলাভাই ওকে হারাবার চাইতে বেশি দুঃখ করবে স্যাম্পল কেসটাকে নিয়ে। একমাত্র ওর বোন

বাদে আর কেউ আফসোস করবে বলে মনে হয় না (বাবা সারাজীবনই ওর কর্মকাণ্ডে হতাশ ছিলেন; এদিকে সালিমের প্রেমের কোন সম্পর্কও বেশিদিন টেকোনি)। তবে কাজটা শেষ পর্যন্ত করল না সে, কেননা কোন গাড়িই অতটা দ্রুত চলছে বলে মনে হয় না।

বেশ কিছুক্ষণ পর একটা জীর্ণ হলদে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল ওর পাশে, চিন্তা-ভাবনার সুতো ছিঁড়ে গেলে বলে কৃতজ্ঞতাবোধ করল সে।

গাড়ির পেছনের সীটটায় ধূসর ডাক্ট টেপ লাগানো, চালক আর আরোহীর মাঝে যে প্লেক্সিগ্লাসটা থাকে, সেটা আধ-খোলা। 'প্যারামাউন্ট হোটেল, প্লিয।' বলল সালিম।

ঘোঁত করে গাড়ি হাঁকাল ক্যাব-ড্রাইভার। লোকটার গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। পরনে ধুলো-রঙা সোয়েটার আর প্লাস্টিকের কালো সানগ্লাস। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রাত নেমে এসেছে। এমন সময় সানগ্লাস! চোখে সমস্যা নেই তো, ভাবল সালিম।

আচমকা একটা ট্রাক এসে দাঁড়াল ওদের সামনে, গাল বকে উঠল ড্রাইভার। ড্যাশবোর্ডে লাগান নামটার দিকে তাকিয়ে রইল সালিম, কিন্তু পড়তে পারল না। 'কতদিন ধরে ক্যাব চালাচ্ছ, বন্ধু?' আরবিতে জানতে চাইল ও।

'দশ বছর,' একই ভাষায় জবাব দিল ড্রাইভার। 'তোমার দেশ কোনটা?'

'মাস্কাট,' বলল সালিম। 'ওমান।'

'আহ, আমিও একদা ওমানে ছিলাম। অনেক দিন আগের কথা। উবার শহরের নাম শুনেছ?' জানতে চাইল লোকটা।

'হ্যাঁ। টাওয়ারের হারানো সেই শহর। পাঁচ...নাকি দশ বছর আগে মরুভূমির বালি খুঁড়ে পুনরায় আবিষ্কার করা হয়েছে শহরটাকে। তুমি কি সেই খনন-কার্যে ছিলে নাকি?'

'ওরকমই কিছু একটা। শহরটা ভালো ছিল।' ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল। 'অধিকাংশ রাতে তিন বা চার হাজার মানুষ থাকত শহরটাতে। সব পথিক বিশ্রাম নেবার জন্য আসত উবারে। গান বাজত, মদ বইত পানির মতো!'

'আমিও তাই শুনেছি।' বলল সালিম। 'তারপর একদিন আচমকা ডুবে গেল শহরটা, তাই না? কত বছর আগে? এক? নাকি দুই?'

কিছু বলল না ট্যাক্সি ড্রাইভার। পথে একটা লাল ট্রাফিক বাতি পড়ায়, থামল ওখানে। লাল বাতির জায়গায় জ্বলল সবুজ বাতি, কিন্তু গাড়ি

এগোল না। একটু ইতস্তত করে সালিম হাত দিল ড্রাইভারের **কাঁধে। ঝটকা** মেরে সোজা হলো লোকটা, অ্যাক্সিলেটরে চেপে বসল ওর পা।

'বালবালবালবাল,' ইংরেজিতে বলল সে।

'খুব ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে?' জানতে চাইল সালিম।

'এই যন্ত্র চালাচ্ছি একটানা ত্রিশ ঘণ্টা হলো।' বলল চালক। 'এভাবে আর কতক্ষণ। এর আগে মাত্র পাঁচ ঘণ্টা ঘুমাতে পেরেছিলাম, তা-ও একটানা চোদ্দ ঘণ্টা চালাবার পর! ক্রিসমাসের আগে আমাদের লোকবল কমে গিয়েছে।'

'আশা করি, যথেষ্ট পরিমাণে টাকা অন্তত পেয়েছ!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল চালক। 'খুব একটা না। আজ সকালে এক লোককে ফিফটি-ফার্স্ট স্ট্রিটে তুলে বিমানবন্দরে গিয়ে নামিয়েছি। ওখানে পৌঁছান মাত্র লোকটা বিমানবন্দরের ভেতরে পালিয়ে গেল! নেই...পঞ্চান্ন ডলার...একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ফেরার টোলটাও নিজের পকেট থেকে দিতে হয়েছে।'

নড করল সালিম। 'আজকের দিনটা এক লোকের দেখা পাওয়ার পেছনে ব্যয় করেছি, দেখা হয়নি। দুলাভাই আমাকে ঘৃণা করে। আমেরিকায় এসেছি এক সপ্তাহ হলো, টাকা খরচ ছাড়া আর কোন লাভ হয়নি। কিচ্ছু বিক্রি করতে পারিনি।'

'কী বিক্রি করো তুমি?'

'বাল-ছাল। সস্তা জিনিস-পাতি। কমদামী, বিচ্ছিরি সব স্যুভনির।'

ডানে কেটে এগিয়ে নিল ড্রাইভার ক্যাবটাকে। লোকটা দেখছে কীভাবে, ভাবল সালিম। এই রাতে...এই বৃষ্টির মাঝে ওই সানগ্লাস পরে?

'তুমি তাহলে বাল-ছাল বিক্রি করো?'

'হ্যাঁ।' বলল সালিম, দুলাভাইয়ের বানানো জিনিসগুলোকে এই নামে ডাকতে পেরে একই সাথে ভয় আর শিহরণ জাগল ওর দেহে।

'মানুষ কেনে না?'

'না।'

'কী অদ্ভুত! নিউইয়র্কের দোকানগুলোতে শুধু ওগুলোই বিক্রি হতে দেখি।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল সালিম।

ওদের সামনের রাস্তায় একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, লালচে-মুখো এক পুলিশ অফিসার ওটার সামনে দাঁড়িয়ে সবাইকে অন্য পথে যাবার নির্দেশ দিচ্ছে।

'আমরা ইংলিশ অ্যাভিনিউ ধরে এগোব,' ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল। কিন্তু মোড় ঘুরেই দেখতে পেল, রাস্তাটা পুরোপুরি বন্ধ!
চুপচাপ বসে রইল ড্রাইভার। ওর থুতনিটা নামতে শুরু করল বুকের কাছে...একবার...দুইবার...তিনবার। এরপর আস্তে আস্তে নাক ডাকতে শুরু করল বেচারা। হাত তুলে ওকে জাগাতে চাইল সালিম, আচমকা স্পর্শে কেঁপে উঠল ড্রাইভার। লোকটার চশমায় হাত লেগে খসে পড়ল ওটা।

চোখ খুলে তাকাল ট্যাক্সি ড্রাইভার, কোলের উপর পড়ে থাকা সানগ্লাসটা তুলে নিয়ে আবার চোখে দিল। কিন্তু ততক্ষণে দেরী হয়ে গিয়েছে অনেক, সালিম ওর চোখ দেখে ফেলেছে। বৃষ্টির মাঝে কচ্ছপের গতিতে এগোচ্ছে গাড়িগুলো।

'আমাকে খুন করবে?' জানতে চাইল সালিম।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে উত্তর দিল ড্রাইভার, 'না।'

আবার বন্ধ হয়ে গেল গাড়ির এগোন, ছাদে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে টপটপ করে।

সালিম মুখ খুলল, 'আমার দাদীর মুখে শুনেছিলাম, তিনি প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন-ইফ্রিত দেখেছেন একটা। তবে মারিদও হতে পারে। মরুভূমির ধারে ঘুরঘুর করছিল ওটা। আমরা বিশ্বাস করিনি, তাকে বলেছিলাম যে সম্ভব কোন বালুঝড় দেখেছে...অথবা কোন দমকা হাওয়া। কিন্তু না, তিনি হার মানবেন না। বললেন, ওটার চোখ দেখেছেন তিনি। তোমার চোখের মতোই জ্বলছিল তার মণি।'

হাসল ড্রাইভার, চোখগুলো এখন কালো সানগ্লাসের আড়ালে ঢাকা। সালিম বুঝল না, হাসিতে ঠাট্টা মিশে আছে কিনা। 'দাদীরা এখানেও এসেছে কিন্তু।'

'নিউইয়র্কে জ্বীনের সংখ্যা অনেক?' জানতে চাইল সালিম।

'নাহ, খুব বেশি নেই।'

'আল্লাহ ফেরেশতা বানিয়েছে নূর দিয়ে, মানুষকে মাটি থেকে। আর কাউকে কাউকে বানিয়েছেন আগুন দিয়ে।' বলল সালিম।

'এখানকার মানুষজন আমাদের ব্যাপারে কিচ্ছু জানে না,' বলল ড্রাইভার। 'তাদের ধারণা, আমরা এসে মানুষের ইচ্ছা পূরণ করি। আচ্ছা, যদি তাই পারতাম তো ক্যাব চালাব কেন?'

'বুঝলাম না।'

চালক লোকটাকে বিষণ্ন মনে হলো। ‘এরা বিশ্বাস করে, আমরা আছি কেবল মানুষের ইচ্ছা পূরণের জন্য। অথচ আমি ঘুমাই ব্রুকলিনের একটা ঘরে। সারাদিন ধরে চালাই ট্যাক্সি। কখনও কখনও বখশিশ পাই, আবার কখনও ভাড়াও পাই না।’ লোকটার নিচের ঠোঁট কাঁপতে শুরু করল। ‘একবার একজন পেছনের সিটে বসে পায়খানা পর্যন্ত করেছে, জানো? নিজ হাতে ওটা পরিষ্কার করতে হয়েছে আমাকে! কেন করল কাজটা? কেন?’

এক হাত বাড়িয়ে ইফ্রিতের কাঁধ স্পর্শ করল সালিম, সোয়েটারের কাপড়ের ফাঁক দিয়ে মাংস অনুভব করছে! সালিমের হাতে হাত রাখল ইফ্রিত, ওখানেই রাখল কতক্ষণ।

মরুভূমির কথা মনে পড়ে গেল সালিমের, লালচে বালির ঝড় দখল করে নিল ওর ভাবনার জগত। কখন যে এইটথ অ্যাভিনিউতে এসে পৌঁছেছে, বলতেই পারবে না।

‘বয়স্করা বিশ্বাস করে। কপাল ভালো এখনও গর্তে পেশাব করে না তারা। ওরা জানে, ফেরেশতাদের কথা শুনতে গেলে আমাদের দিকে ছুঁড়ে দেয়া হয় জ্বলন্ত তারা। কিন্তু যখন এই বয়স্করা এখানে আসে, আমাদেরকে রেখে আসে অনেক...অনেক দূরে। ওখানে অন্তত আমার ক্যাব চালাতে হতো না!’

‘আমি দুঃখিত।’

‘আসলে সময়টাই খারাপ,’ বলল ইফ্রিত। ‘ঝড় আসছে, ভয় করছে আমার। পালাতে পারলে আর কিছু চাইতাম না।’

আর কোন কথা হলো না দুজনের মাঝে।

হোটেলের সামনে ক্যাব থেকে নেমে ইফ্রিতকে বিশ ডলারের একটা বিল ধরিয়ে দিল সালিম, বলল খুচরা টাকা রেখে দিতে। এরপর ভেতরের সবটুকু সাহসকে জড়ো করে ড্রাইভারকে ওর রুম নাম্বার জানিয়ে দিল। উত্তরে কিছুই বলল না ড্রাইভার। এদিকে পেছনে সিটে ততক্ষণে উঠে বসেছে এক যুবতী, তাকে নিয়ে রওনা দিল ট্যাক্সি ক্যাব।

সন্ধ্যা ছয়টা বাজে ঘড়িতে। সালিম এখনও বাড়িতে পাঠাবার জন্য ফ্যাক্সটা লেখেনি। বৃষ্টির মাঝেই বেরিয়ে পড়ল ও, কাবাব আর ফ্রেঞ্চ-ফ্রাই কিনল। মাত্র এক সপ্তাহ হলো এসেছে এ দেশে, কিন্তু এরইমধ্যে নিজেকে আগের চাইতে মোটা আর গোল বলে মনে হচ্ছে।

নিউইয়র্ক ওকে নরম করে তুলছে।

হোটেলে ফিরে এসে অবাক হয়ে লক্ষ করল, ট্যাক্সি ড্রাইভার লবিতে দাঁড়িয়ে আছে! হাত দুটো পকেটে ভরে দেখছে সাদা-কালো পোস্ট কার্ড। সালিমকে দেখে হাসল সে। 'তোমার ঘরে ফোন করেছিলাম,' বলল ইফ্রিত। 'কিন্তু কোন উত্তর পাইনি। তাই ভাবলাম অপেক্ষা করি।'

হেসে তার হাত স্পর্শ করল সালিম। 'এখন এসেছি।'

হাত ধরাধরি করে লিফটে উঠল ওরা দুজন। ঘরে ঢুকে বাথরুমের দিক নির্দেশনা চাইল ইফ্রিত। 'নিজেকে খুব নোংরা মনে লাগছে।' নড করে পথ দেখাল সালিম। ইফ্রিত বাথরুমে ঢুকলে জুতা-মোজা খুলল সে, এরপর বাকি পোশাক।

ট্যাক্সি ড্রাইভার কোমরের সাথে তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে এলো। চোখে এখন আর সানগ্লাস নেই, আধো-অন্ধকার ঘরটা তার চোখের আলোতে লালচে দেখাচ্ছে।

চোখ টিপে টিপে চোখের পানি আটকাল সালিম। 'ইস! আমি যা দেখছি, তা যদি তুমি দেখতে পেতে!' বলল সে।

'আমি কারও ইচ্ছা পূরণ করি না।' ফিসফিস করে বলল ইফ্রিত। কোমরের তোয়ালে খুলে ফেলে আলতো করে সালিমকে শুইয়ে দিল বিছানায়।

সেদিন রাতে, দৈহিক-ক্ষুধা মেটাবার এক পর্যায়ে সালিম জানতে চাইল, 'নাম কী তোমার?'

'ড্রাইভিং পারমিটে একটা নাম আছে বটে, কিন্তু ওটা আমার নাম না।' বলল ইফ্রিত।

ঘুম থেকে যখন উঠল সালিম, তখন ঠান্ডা সূর্য চুপি চুপি উঁকি দিচ্ছে ঘরটার ভেতরে। নিজেকে একাকী আবিষ্কার করল ও।

সে-ই সাথে এ-ও টের পেল, তার স্যাম্পল কেসটা নেই। নেই ওর স্যুটকেসও, ওর ওয়ালেট, পাসপোর্ট আর ওমানে ফেরার টিকিটও!

একটা জিন্সের প্যান্ট, টি-শার্ট আর পশমি একটা সোয়েটার পড়ে আছে মেঝেতে। ওগুলোর নিচে একটা ড্রাইভিং লাইসেন্সও আছে, ইব্রাহিম বিন ইরামের নামে। ট্যাক্সিটার পারমিটও সেই নামেই। ইংরেজিতে লেখা একটা কাগজ জড়ানো অবস্থায় সালিম পেল ট্যাক্সির চাবি। লাইসেন্স আর পারমিটের ছবিটার সাথে ওর খুব একটা মিল নেই। অবশ্য ইফ্রিতের সাথেও মিল ছিল না।

ঝন ঝন করে বেজে উঠল টেলিফোনটা। রিসেপশন থেকে ওকে জানানো হলো–যেহেতু মিস্টার সালিম ঘর ছেড়ে দিয়েছেন, তাই মিস্টার সালিমের বন্ধুর তাড়াতাড়ি ঘরটা ছেঁড়ে দিতে হবে।

'আমি কারও ইচ্ছা পূরণ করি না।' জ্বীনের বলা কথাগুলো ফিসফিস করে বলল সে।

পোশাকগুলো পরে নিজেকে হালকা মনে হলো খুব।

নিউইয়র্কের রাস্তাগুলো একেবারে সরল–অ্যাভিনিউগুলো উত্তর-দক্ষিণ বরাবর, রাস্তাগুলো পূর্ব-পশ্চিম। খুব একটা কঠিন হবে না, ভাবল সে।

চাবিগুলো নিয়ে কিছুক্ষণ লোফালুফি করল সালিম। এরপর পকেটে পাওয়া কালো প্লাস্টিকের সানগ্লাসটা চোখে দিয়ে বিদায় নিল হোটেল ঘরটা থেকে।

ক্যাবটাকে খুঁজে বের করতে হবে।

অধ্যায় আট

আমাকে বলল ও, মৃতদের আত্মা আছে। কিন্তু যখন জানতে চাইলাম,
কী করে তা সম্ভব–আমি তো ভেবেছিলাম তারাই আত্মা!
আমার ধ্যান ভাঙ্গল সে। বলল, সন্দেহ হয় না তোমার?
মৃতরা কেন লুকিয়ে রাখা কথা?
বলো আমায়, মৃতরা কেন লুকিয়ে রাখে কথা?

–রবার্ট ফ্রস্ট, টু উইচেস

ক্রিসমাসের আগের সপ্তাহটায় যেকোন ফিউনারেল পার্লারের ব্যবসাই মন্দা যায়, রাতের খাবার খেতে খেতে জানল শ্যাডো। ছোট একটা রেস্তোরায় খেতে এসেছে ওরা, আইবিস অ্যান্ড জ্যাকেলের ব্যবসাস্থল থেকে দুই ব্লক দূরে জায়গাটা। পেট ভরে খেল শ্যাডো, তবে মি. আইবিস কফি-কেক নাড়াচাড়া করল কেবল। 'মৃত্যু-পথযাত্রীরা শেষ আরেকটা ক্রিসমাস ভালোবাসার লোকজনের সাথে কাটানোর জন্য দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা করে। অথবা নববর্ষের জন্য।'

ফিউনারেল পার্লারটা একেবারে ছোট, পারিবারিকভাবে চালানো হচ্ছে অনেকদিন হলো। প্রকৃতপক্ষে আশেপাশের এলাকাগুলোতে সত্যিকার অর্থে এমন স্বাধীন ফিউনারেল পার্লারের সংখ্যা অতি অল্প, অন্তত মি. আইবিসের সেটাই দাবী। 'মানুষ কেন যেন সারা দেশজুড়ে আছে, এমন সব ব্র্যাণ্ডের প্রতি একটু বেশি আকৃষ্ট হয়।' ব্যাখ্যা করার ভঙ্গিতে বললেন মি. আইবিস। শ্যাডোর মনে পড়ে গেল এক কলেজ প্রফেসরের কথা। ভদ্রলোক ব্যায়ামাগারে আসতেন প্রায়ই, স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারতেন না। তবে তর্কে জুড়ি ছিল না তার। পরিচিত হবার কয়েক মিনিটের মাঝেই শ্যাডো বুঝতে পেরেছিল, ফিউনারেল পার্লারের এই ডিরেক্টরের সাথে কথোপকথনে যেকারও অংশগ্রহণ হতে হবে অতি সীমিত-শুধু শোনা।

'কারণটাও পরিষ্কার, কীসের পেছনে পয়সা ঢালা হচ্ছে, সেটা মানুষ খরচ করার আগেই জানতে চায়। এজন্যই ম্যাকডোনাল্ড'স, ওয়াল-মার্ট, এফ.ডব্লিউ.

উলওয়র্থ আছে সারা দেশজুড়ে। যেখানে যাও না কেন, আশেপাশে তাদেরকে পাবেই!'

'তবে ফিউনারেল হোমের ব্যবসা পদ্ধতি আলাদা। সবাই চায়, প্রিয়জনের শেষ যত্নটা দক্ষ কেউ নেক। হারাবার কষ্ট সবাইকেই পীড়া দেয়, তাই এমনসব সময়ে মানুষ চায় তাদের পছন্দের মানুষটা আলাদা মনোযোগ পাক। বড় বড় কোম্পানিদের মতো যেন কোন পণ্য হিসেবে দেখা না হয় মরদেহটাকে। সমস্যা হলো, যেকোন ব্যবসায়-মৃত্যুও একধরনের ব্যবসা-পয়সা কামান সম্ভব হয় একবারে অনেক পরিমাণে কিনে, দক্ষতার সাথে সেটা পরিচালনা করে। শুনতে ভালো না লাগলেও, কথাটা সত্যি। কিন্তু ওই যে, আলাদা মনোযোগের কথা বললাম! যে লোক জীবিত থাকা অবস্থায় মানুষটাকে দেখে সম্মান জানাত, সেই লোকটার হাতেই ভালোবাসার লোকটার মরদেহ তুলে দিতে চায় তারা।'

মি. আইবিস বাদামী একটা হ্যাট পরে আছেন, সেই সাথে বাদামী ব্লেজারও। ছোট, সোনার রিমের চশমা নাকের উপরে বসে আছে। প্রথমে মি. আইবিসকে খাটো বলে মনে হয়েছিল তার, কিন্তু পাশে দাঁড়াবার পর বুঝতে পারল-লোকটা প্রায় ছয় ফুটের চাইতে বেশি লম্বা।

'তাই বড় বড় কোম্পানিগুলো যখন আমাদের মতো ছোট কোম্পানিগুলোকে কিনে নেয়, তখন নাম বদলায় শুধু। ডিরেক্টররা কিন্তু রয়েই যায়। যাই হোক, ব্যক্তিগত কারণেই আমরা এখনও আমাদের পার্লারটা বিক্রি করিনি। আমাদের এখানে সবকিছু নিজ হাতে করা হয়। সত্যি বলতে কী, আমরাই এই দেশে সেরা। তবে এ কথা আমরা দুজন বাদে আর কেউ জানে না। পার্লারে কিন্তু মরদেহ জ্বালানো হয় না। নিজস্ব ক্রিমেটোরিয়াম বানালে অনেক টাকা কামাতে পারতাম বটে, কিন্তু সেকাজে তো আর আমদের স্বকীয়তা থাকত না। আমার পার্টনার তাই প্রায়শই বলেন-স্রষ্টা যে যোগ্যতা বা দক্ষতা দিয়েছেন, সেটাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো দরকার। তোমার কী মনে হয়?'

'ঠিকই তো।' উত্তর দিল শ্যাডো।

'প্রভু আমার পার্টনারকে মৃতদের উপর ক্ষমতা দিয়েছেন, আর আমাকে দিয়েছেন শব্দের উপর। জানো, এই শব্দ ব্যাপারটা না বড় অদ্ভুত। আমি গল্পের বই লিখি। ছাপাবার ইচ্ছা নেই, নিজের আনন্দেই বলতে পারো। অনেকটা জীবনী-মূলক।' থেমে গেল মি. আইবিস। যতক্ষণে শ্যাডো ধরতে পারল যে ওকে পড়তে চাইবার সুযোগ করে দেবার জন্য এই বিরতি, ততক্ষণে আবার মুখ খুলেছে লোকটা। 'যাই হোক, আমাদের ব্যবসার বয়স প্রায় দুইশ বছর হলো। আর এই দুইশ বছরে একজন আইবিস আর একজন জ্যাকেল সবসময় ওই

ফিউনারেল হোমের কর্তৃত্বে ছিল। অবশ্য এর আগে ছিলাম মুর্দাফরাশ, তারও আগে লাশের সদগতি করা মানুষ!'

'তার আগে?'

'আসলে,' কিছুটা গর্বের হাসি দেখা গেল মি. আইবিসের ঠোঁটে। 'আমাদের ইতিহাস অনেক পুরনো। তবে গৃহযুদ্ধের আগে আমরা ঠিক জাঁকিয়ে বসতে পারিনি। যুদ্ধের সময় কালো মানুষদের মুর্দাফরাশ হিসেবে কাজ করতে শুরু করি আমরা। তবে আমাদেরকে কেউ নিগ্রো ভাবেনি-হয়তো বিদেশি ভেবেছে, অথবা অদ্ভুত...তবে নিগ্রো না। তবে যুদ্ধ শেষে এমন একটা সময় এলো, যখন আমাদেরকে একসময় যে বিদেশি ভাবা হতো, তাই ভুলে বসল সবাই। অবশ্য আমার পার্টনারের ত্বক আমার চাইতেও কালো বলে, নতুন এই পরিচয়ে পরিচিত হতে খুব একটা কষ্ট হয়নি। মানুষ যখন নিগ্রোদেরকে আফ্রিকান-আমেরিকান বলে, তখন অবাক লাগে। আমরা কিন্তু নিজেদেরকে নীল নদের মানুষ ভাবতেই বেশি পছন্দ করি।'

'আপনারা তাহলে মিশরীয়?'

'হ্যাঁ...আবার না। মিশরীয় বলতে আমি বুঝি যারা এখন ওখানে বাস করছে, তাদেরকে। আমাদের কবর আর প্রাসাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে তাদের শহর। ওরা কি আমার মতো দেখতে?'

শ্রাগ করল শ্যাডো। এমন অনেক কালো মানুষের সাথে ওর পরিচয় আছে, যারা মি. আইবিসের মতো দেখতে। আবার এমন সাদা মানুষকেও চেনে, যাদের ত্বক রোদে পুড়ে লোকটার মতো হয়ে গিয়েছে।

'কফি-কেক কেমন লাগল?' কাপে কফি ঢালতে ঢালতে জানতে চাইল ওয়েট্রেস।

'আমার খাওয়া সবচেয়ে সেরা।' বলল মি. আইবিস। 'তোমার মাকে আমার শুভেচ্ছা জানিও।'

'অবশ্যই।' বলে বিদায় নিল মেয়েটা।

'ফিউনারেল পার্লার যারা চালায়, তারা সাধারণত লোক-জনকে তাদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে প্রশ্ন করে না। মানুষ ধরে নেয়, সে ব্যবসার খোঁজ করছে।' দুঃখিত শোনাল কণ্ঠটাকে। 'চলো দেখি, তোমার ঘর গোছান শেষ কিনা।'

রাতের বাতাসে নাক থেকে বেরোন মাত্র বাষ্পের জন্ম দিচ্ছে ওদের সাথে। দোকানের জানালায় দেখা যাচ্ছে ক্রিসমাসের আলোকসজ্জা। 'আমার জন্য ঝামেলা সহ্য করছ, ধন্যবাদ।' বলল শ্যাডো।

'তোমার চাকরিদাতা কৃতজ্ঞতাপাশে আমরা আবদ্ধ। আর ঘরের কথা কী বলব, কতগুলো যে অব্যবহারে ধুলোয়-ধূসরিত হয়ে যাচ্ছে তা স্রষ্টা জানেন। আগে অবশ্য অনেকেই থাকত বিশাল ওই বাড়িটাতে। এখন আমরা মাত্র তিনজন আছি। অসুবিধা হবে না।'

'কয়দিন থাকতে হবে আমাকে, ধারণা আছে?'

মাথা নাড়ল মি. আইবিস। 'তা বলেনি। তবে তুমি এখানে এসেছ বলে আমরা আনন্দিত। খুব বেশি নাক উঁচু না হলে আর মৃতদেরকে সম্মান জানাতে পারলে কাজেরও অভাব হবে না।'

'তোমরা কায়রোতে এলে কেন?' জানতে চাইল শ্যাডো। 'নামের টানে?'

'নাহ। আসলে আমাদের কারণেই এই এলাকার এমন নামকরণ। অতীতে জায়গাটা ছিল আমাদেরই একটা ব্যবসাকেন্দ্র।'

'ফ্রন্টিয়ারের দিনগুলোতে?'

'তা বলতে পারো।' বলল মি. আইবিস। 'শুভ সন্ধ্যা, মিসেস সিমন্স! ক্রিসমাসটা আনন্দে কাটুক! আমাকে আনয়নকারীরা এখানে পা রেখেছে তারও আগে, মিসিসিপি হয়ে।'

থমকে দাঁড়াল শ্যাডো, একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জানতে চাইল, 'তুমি বলতে চাইছ, পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরীয়রা এখানে ব্যবসা করতে এসেছিল?'

কিছুই বলল না মি. আইবিস, তবে হাসল একটু। 'তিন হাজার পাঁচশ ত্রিশ বছর আগে।'

'ঠিক আছে,' বলল শ্যাডো। 'মেনে নিলাম। পণ্য কী ছিল?'

'তেমন কিছু না,' উত্তর দিল মি. আইবিস। 'পশুর চামড়া, খাবার, তামা। খাজনার চাইতে বাজনা বেশি পড়ে গিয়েছিল। তবে এখানে থেকে আমাদের উপাসনা করার সময় পেয়েছিল তারা, কয়েকজন মারাও গিয়েছিল। আশেপাশেই কোথাও তাদের কবর পাওয়া যাবে। তাই ওরা চলে গেলেও, আমরা রয়ে গেলাম।' আচমকা ফুটপাতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা! দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে বলল, 'এই দেশটা দশ হাজার বছর ধরে বিশাল বড় এক স্টেশন হিসেবে ব্যবহৃত হতে আসছে। কলোম্বাসের গল্প জানো না?'

'কলোম্বাসের আবার কোন গল্প?'

'কলোম্বাস তাই করেছে, যা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ করে আসছিল। আমেরিকায় আসার মাঝে এমন বিশেষ কিছু নেই। মাঝে মাঝে সেই গল্প লিখি আমি।' হাঁটতে শুরু করেছে ওরা আবার।

'সত্যি গল্প?'

'অনেকাংশেই সত্যি। চাইলে দুই-একটা পড়তে পারো। যার চোখ আছে, সে অবশ্য সত্যগুলো দেখতে পাবে। ব্যক্তিগতভাবে, সায়েন্টিফিক আমেরিকান-এর একজন গ্রাহক হিসেবে বলছি কথাটা, পেশাদার নৃ-তত্ত্ববিদদের প্রতি আমার মায়াই হয়। এই দেশে কোন একটা খুলি পেলেই তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে! আর যখন প্রাচীন কোন সভ্যতার নিদর্শন খুঁড়ে বের করে, তখনকার কথা তো বলাই বাহুল্য। মাথা চুলকে চুলকে তারা বলে-এ তো অসম্ভব! আইনু, জাপানের প্রাচীন সভ্যতার মানুষদের কথাই ধরো। একটা খুলি পাওয়া গেল, আর সবাই অসম্ভব অসম্ভব বলে চিৎকার করতে শুরু করল! অথচ নয় হাজার বছর আগেই তারা আমেরিকায় পা রেখেছে। এর দুই হাজার বছর পর পলিনেশনিয়ানরা যে ক্যালিফোর্নিয়ায় পা রেখেছিল, তার প্রমাণও আছে কিন্তু! বিজ্ঞানীদের মাথা ব্যথা কার সাথে কার সম্পর্ক, সেটা বের করা নিয়ে-অথচ সত্যিটা তারা যেন দেখেও দেখে না। হোপিদের বানানো টানেল আবিষ্কার করলে যে ওদের অবস্থা কী হবে, তা ভেবে ভয়ই পাচ্ছি!

'আইরিশরা আমেরিকায় পা রেখেছিল কিনা জানতে চাইছ? অবশ্যই রেখেছিল। যেমন রেখেছিল ভাইকিং আর ওয়েলশের অধিবাসীরাও! আফ্রিকানরা দক্ষিণ আমেরিকার সাথে ব্যবসা করত। চাইনিজরা কয়েকবার এসেছিল ওরেগনে, ওর অবশ্য এলাকাটাকে ফু সাঙ বলে ডাকত। বারো'শ বছর আগে বাস্করা নিউফাউন্ডল্যান্ডের তীরে মাছ ধরতে আসত। জানি তুমি বলবে, মি. আইবিস, এই লোকরা তো আদিম! ওদের না রেডিও ছিল আর না জেট প্লেন।'

কিছু বলল না শ্যাডো, ওর কিছু বলার ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু বুঝতে পারল, মি. আইবিস চাইছে সে কিছু বলুক। তাই মুখ খুলল, 'কেন, আদিম ছিল না তারা?'

'বর্তমান দুনিয়ার একটা ভুল ধারণা হলো, কলোম্বাসের আগে মানুষ দূরপাল্লার যাত্রা করতে অক্ষম ছিল। অথচ নিউজিল্যান্ড, তাহিতি আর প্যাসিফিক আইল্যান্ডের অগণিত দ্বীপের লোকরা এমন দক্ষ ছিল যা কলোম্বাসকেও লজ্জায় ফেলে দেবে! আফ্রিকা এত সম্পদশালী হলো কী করে? ব্যবসার মাধ্যমে। তবে হ্যাঁ, ওরা ব্যবসা করত ভারত আর চীনের সাথে। আমার দেশের মানুষ, মানে নীলের লোকরা, বুঝতে পেরেছিলাম-ধৈর্য আর সুপেয় পানি থাকলে নলখাগড়ার নৌকা নিয়েই বিশ্ব ঘুরে আসা সম্ভব। এখানে আগে কেউ আসেনি দুটো কারণে-দূরত্ব আর ব্যবসা করার মতো জিনিসের অভাব।'

কথা বলতে বলতে একটা বড় দালানের সামনে এসে পৌছাল ওরা, সদর দরজা দিয়ে ঢুকে সোজা চলে গেল দালানের পেছনে। সামনে বড় দুটো দরজা পড়লে, মি. আইবিস চাবি ব্যবহার করে খুলে ফেললেন ওটা। একটা বড়, শীতল কক্ষে প্রবেশ করল ওরা, ঘরের ভেতর এরইমাঝে দুজন মানুষ উপস্থিত আছে। তাদের একজন বেশ লম্বা আর কালো ত্বকের লোক, হাতে একটা বড় ধাতব স্কালপেল ধরে আছে। অন্য জন এক তরুণী, লাশ হয়ে পড়ে আছে একটা লম্বা, পোর্সেলিনের টেবিলে।

মরদেহের পাশের দেয়ালে মৃত মেয়েটার অনেকগুলো ছবি পিন দিয়ে লাগান। একটায় হাসছে সে, হাই-স্কুলের থাকার সময়কার ছবি। আরেকটায় সে দাঁড়িয়ে আছে তিন বান্ধবীর সাথে, পরনে স্কুল-নাচের পোশাক। কালো চুল মাথার উপরে বেণী করা, মুখে উষ্ণ হাসি।

তবে পোর্সেলিনে শোয়া দেহটা ঠান্ডা, চুল খোলা। শুকনো রক্তে মাখা-মাখা হয়ে আছে!

'আমার পার্টনারের সাথে পরিচিত হও। ইনি মিস্টার জ্যাকুয়েল।' বলল আইবিস।

'আমাদের আগেই দেখা হয়েছে।' বলল জ্যাকুয়েল। 'হাত মেলাতে পারছি না বলে দুঃখিত।'

মৃত মেয়েটার দিকে তাকাল শ্যাডো। 'কী হয়েছে ওর?'

'প্রেমিক পছন্দ করতে ভুল করেছে।' উত্তর দিল জ্যাকুয়েল।

'সবসময় ভুলটা মারাত্মক হয় না বটে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মি. আইবিস। 'তবে এবার হয়েছে। লোকটা মাতাল ছিল, হাতে ছিল একটা ছুরি। মেয়েটা তাকে জানিয়েছিল, সম্ভবত সে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। সন্তানটাকে নিজের বলে মানতে চায়নি তার প্রেমিক।'

'মোট...' গুণতে শুরু করল মি. জ্যাকুয়েল। 'পাঁচ বার ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল তাকে। তিনটা বুকের সামনের দিকে। প্রথমটা বাঁ স্তনের ভেতরের দিকে, চতুর্থ আর পঞ্চম পাঁজরের হাড়ের মাঝখানে-দুই সেন্টিমিটার গভীর। দ্বিতীয় আর তৃতীয়টা বাঁ স্তনের মাঝ বরাবর, তিন সেন্টিমিটার গভীর হবে। বাঁ বুকের উপরের দিকে দুই সেন্টিমিটার গভীর আরেকটা আঘাত আছে, দ্বিতীয় পাঁজরের হাড়ের ঠিক নিচে। বাঁ হাতের উপরে রয়েছে আরেকটা পাঁচ সেন্টিমিটার লম্বা আর ছয় সেন্টিমিটার গভীর একটা ক্ষত। বুকের সবগুলো আঘাতই মারাত্মক। খালি চোখে দেখা যায়, এমন আর কোন আঘাত নেই।' ক্লিক করে আওয়াজ হলো একটা। শ্যাডো বুঝতে পারল, এতক্ষণ পা দিয়ে রেকর্ডারের

বোতাম চেপে রেখেছিল মি. জ্যাকুয়েল; কেননা মৃতদেহের টেবিলের উপরে দড়ি দিয়ে একটা মাইক্রোফোন ঝুলছে!

'তুমি করোনারের দায়িত্বও পালন করো?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'আমাদের এদিকে করোনারের পদ আছে, কর্মকর্তা নেই।' বলল আইবিস। 'জ্যাকুয়েলের কাজ হলো লাশকে লাথি মারা। যদি ওটা উত্তরে লাথি না হাঁকায়, তাহলে ডেথ সার্টিফিকেটে সই করে দেয় ও। জ্যাকের পদবী হলো প্রোসেকটর। কাউন্টি মেডিকেল এক্সামিনারের হয়ে কাজ করে সে, ময়নাতদন্ত সারে আর পরীক্ষার জন্য টিস্যুর স্যাম্পল রাখে।'

আইবিসকে পাত্তা দিল না জ্যাকুয়েল। বড় আরেকটা স্কালপেল নিয়ে মহিলার দেহ কাটতে শুরু করল সে, ভি-আকৃতির একটা ক্ষত তৈরি করল যেটা এক হলো বুকের হাড়ের শেষের দিকে। এরপর সোজা নিজের দিকে কাটতে শুরু করল-বুক থেকে তলপেটের হাড় পর্যন্ত। এরপর একটা ভারী, ক্রোম-নির্মিত ড্রিল হাতে নিয়ে বুকের হাড়ের দুপাশের পাঁজরের হাড় কাটতে শুরু করল।

মেয়েদের পার্স যেভাবে খট করে খুলে যায়, সেভাবেই যেন খুলে গেল লাশটা।

আচমকা একটা হালকা, কিন্তু বাজে গন্ধ নাকে পেল শ্যাডো। 'আমি তো ভেবেছিলাম লাশ পচার গন্ধ আরও বাজে হবে।'

'লাশটা একদম তাজা,' বলল জ্যাকুয়েল। 'পেটের নাড়ি-ভুঁড়িও ফুটো হয়নি। তাই বিষ্ঠার গন্ধও বেরোয়নি।'

অন্য দিকে তাকাল শ্যাডো, ঘেন্নায় না। কেন জানি মেয়েটাকে একটু প্রাইভেসি দেবার ইচ্ছা হলো ওর।

পেটের নাড়িগুলো বেঁধে ফেলল জ্যাকুয়েল, টিপে টুপে দেখল কোথাও কোন ছিদ্র আছে কিনা। মাইক্রোফোনে 'স্বাভাবিক' বলে ফেলে দিল মেঝেয় রাখা একটা বালতিতে। এরপর লাশটার বুকের ভেতর থেকে সব রক্ত শুষে নিল একটা ভ্যাকিয়ুম ক্লিনার দিয়ে, পরিমাণ মেপে নিয়ে মন দিল ভেতরের অঙ্গগুলোর দিকে। 'পেরিকার্ডিয়ামে তিনটা ক্ষতচিহ্ন আছে। জমাট-বাঁধা আর তরল রক্তে ভর্তি।'

মেয়েটার হৃদপিণ্ডটার উপরের অংশ ধরল জ্যাকুয়েল, এরপর সেটা কেটে নিয়ে এসে উল্টো দেখল। 'মায়োকার্ডিয়ামে দুইটি ক্ষত। একটা ডান দিকে এক দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার, অন্যটা বাঁ দিকে এক দশমিক আট সেন্টিমিটার।'

এবার ফুসফুসের দিকে মন দিল লোকটা। বাঁ দিকের ফুসফুসে ছুরি ঢুকেছিল, ওটা চুপসে আছে। দুই ফুসফুস আর হৃদপিণ্ডের ওজন নিল সে, এরপর ছবি

তুলল ক্ষতগুলোর। উভয় ফুসফুস থেকেই ছোট ছোট একটা করে অংশ কেটে নিয়ে একটা পাত্রে ভরল।

'ফরমালডিহাইড,' ফিস ফিস করে শ্যাডোকে জানাল মি. আইবিস।

কী কী করছে, তার ধারা-বিবরণী মাইক্রোফোনে বলতে থাকল জ্যাকুয়েল। মেয়েটার যকৃত, পাকস্থলী, প্লীহা, অগ্ন্যাশয়, বৃক্ক, গর্ভাশয় আর ডিম্বাশয় কেটে নিল একে একে। সবগুলোর ওজন মেপে প্রতিটা থেকে একটু একটু কেটে নিয়ে ফরমালডিহাইডের পাত্রে ভরে রাখল।

তবে হৃদপিণ্ড, যকৃত আর দুই বৃক্ক থেকে বাড়তি একটা অংশ কাটল সে। এগুলো চাবাল আস্তে আস্তে। কেন জানি শ্যাডোর খুব স্বাভাবিক মনে হলো ব্যাপারটাকে। মনে হলো যেন লোকটা এভাবে মৃতের প্রতি সম্মান দেখাচ্ছে!

'তুমি তাহলে আমাদের সাথে কিছুদিন থাকতে চাও?' মেয়েটার হৃদপিণ্ডের টুকরা চিবাতে চিবাতে বলল জ্যাকুয়েল।

'যদি তোমাদের কোন আপত্তি না থাকে তো।'

'আমাদের আপত্তি থাকবে কেন!' বলল আইবিস। 'না করার কোন কারণই নেই।'

'মৃতের সাথে এক ছাদের নিচে ঘুমাতে আপত্তি না থাকলেই হলো।'

লরার স্পর্শ আর ওর ঠান্ডা ঠোঁটের কথা মনে পড়ে গেল শ্যাডোর। 'নেই। কেবল ওরা জীবিত না হয়ে উঠলেই হয়।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল জ্যাকুয়েল। 'আমাদের এখানে মৃত...মৃতই থাকে।'

'আমার তো মনে হয়,' বলল শ্যাডো। 'মৃতদের প্রাণ ফিরে পেতে বেশি একটা কষ্ট হয় না!'

'আরে না,' বলল আইবিস। 'জিন্দালাশদের কথাই ধরো। একটু গুড়া, দুই-একটা মন্ত্র আর হালকা কপাল-ব্যস, জিন্দালাশ বানিয়ে ফেলতে পারবে তুমি। ওগুলো নড়বে-চড়বে, কিন্তু জীবিত হবে না। সত্যি সত্যি মৃতকে পুনরায় জীবিত করার জন্য চাই-ক্ষমতা।' একটু ইতস্তত করে যোগ করল সে। 'অবশ্য আমাদের আদি ভূমিতে কাজটা খুব কঠিন ছিল না।'

'চাইলেই তখনও দেহের সাথে কা পাঁচ হাজারের বছরের জন্য বেঁধে দেয়া যেত।' বলল জ্যাকুয়েল। 'কিন্তু সে অনেক আগের কথা।' যেসব অঙ্গ দেহ থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল, সেগুলো সম্মানের সাথে আবার জায়গামতো রেখে দিল সে, চামড়ার কাটা দুই প্রান্ত কাছাকাছি এনে সেলাই করতে শুরু করল। মাংসের তালটাকে আবার মেয়ের লাশে পরিণত করতে বেশি সময় নিল না সে।

'বিয়ার দরকার একটা,' বলে হাত থেকে গ্লাভস খুলে ফেলল জ্যাকুয়েল। পরনের বাদামী ওভারঅলটা ঝুলিয়ে রেখে হাতে তুলে নিল অঙ্গের অংশ বিশেষ কেটে রাখা পাত্রগুলো। 'আসছ?'

রান্নাঘরে ফিরে এলো ওরা। দেয়ালগুলো বাদামী আর সাদা রঙ করা, ভেতরটা যেন সেই ১৯২০ সালে সাজানো হয়েছে। একটার সাথে লাগান রয়েছে একটা বৃহদায়তন কেলভিনেটর। ওটার দরজা খুলে পাত্রগুলো ভেতরে রেখে দিল জ্যাকুয়েল, বের করে আনল তিনটা বাদামী বোতল। এদিকে আইবিস ততক্ষণে তিনটা উঁচু গ্লাস বের করে এনেছে। শ্যাডোকে রান্নাঘরের টেবিলে বসার ইঙ্গিত দিল সে, বিয়ার ঢেলে একটা গ্লাস ওর দিকে আর একটা জ্যাকুয়েলের দিকে এগিয়ে দিল। বিয়ারটা ভালো, একটু তেতো হলেও কড়া।

'দারুণ।' বলল শ্যাডো।

'আমরাই বানাই,' জানাল আইবিস। 'আগে মেয়েরা এসব কাজ করত। সত্যি বলতে কী, আমাদের চাইতে দক্ষ ছিল তারা। কিন্তু এখন আমরা মাত্র তিনজন বাকি আছি-আমি, জ্যাকুয়েল আর ও।' ছোট্ট, বাদামী বিড়ালটার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'শুরুতে আমাদের সাথে আরও অনেকে ছিল। কিন্তু সেট গেল দেশ দেখতে, তা-ও প্রায় দুইশ বছর হতে চলেছে। ১৯০৫ কি ১৯০৬ সালের দিকে স্যান ফ্রান্সিসকো থেকে একটা পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিল, তারপর আর কোন খবর নেই। আর হোরাসের কথা কী বলব! বেচারা...' বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে থেমে গেল সে, হতাশা ভরে মাথা নাড়ল।

'মাঝে মাঝে দেখি ওকে,' বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে জানাল জ্যাকুয়েল। 'লাশ তোলার সময়।'

'আমি কাজ করে খেতে চাই,' বলল শ্যাডো। 'তোমাদের উপর বোঝা হতে চাই না।'

'অসুবিধা নেই, করার মতো অনেক কাজ পাবে।'

গুটিসুটি পাকিয়ে ঘুমাচ্ছিল বিড়ালটা, চোখ খুলে উঠে দাঁড়াল। শ্যাডোর কাছে এসে মাথা ঘষল বুটের সাথে। বাঁ হাত দিয়ে ওটার কপাল, কানের পেছনটা আর ঘাড় চুলকে দিল ও। আরামে বাঁকা হয়ে গেল বিড়ালটার শরীর, লাফিয়ে ওর কোলে উঠে পড়ল ওটা। সেখানেই আবার গুটিসুটি পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। হাত দিয়ে আদর করতে লাগল শ্যাডো প্রাণীটাকে, ওর কোলকে দুনিয়ার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা ভেবে ঘুমাচ্ছে ওটা। শ্যাডোর নিজেরও ভালো লাগছে তাতে।

'তোমরা ঘরটা সিঁড়ির একেবারে মাথায়, বাথরুমের পাশে।' বলল জ্যাকুয়েল। 'কাজের সময় তোমাকে যে জামা-কাপড় পরতে হবে তা ক্লজিটেই থাকবে। তবে সবার আগে নিশ্চয় একটু পরিষ্কার হয়ে নিতে চাইছ তুমি?'

আসলেই তাই। ঢালাই লোহার তৈরি বাথটাবে দাঁড়িয়ে গোসল সেরে নিল ও। এরপর ক্ষুর দিয়ে দাড়ি কামাল। জিনিসটা জ্যাকুয়েলের কাছ থেকে নেয়, প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ জিনিসটা সম্ভবত মৃত পুরুষদের দাড়ি শেষবারের মতো কামাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এর আগে কোনদিন ক্ষুর ব্যবহার না করলেও, কোন দুর্ঘটনা ঘটল না। শেভিং ক্রিম মুছে ফেলে আয়নায় নিজের নগ্ন দেহ দেখল একবার। বুকে আর হাতে নতুন করে আঘাতের চিহ্ন পড়েছে, অথচ পাগলা সুইনির দেয়া ক্ষতগুলো এখনও শুকায়নি। আয়নার ভেতর দিয়ে শ্যাডোর প্রতিচ্ছবি যেন সন্দেহের চোখে তাকাল ওর দিকে।

তারপর...একদম আচমকা...যেন অন্য কেউ ওর হাত ধরে আছে...আস্তে আস্তে ক্ষুরটা তুলে নিজের গলায় ঠেকাল শ্যাডো। মুক্তি পাবার এটাও একটা পথ, ভাবল ও। বড় সহজ একটা পথ। নিচের তলায় দুজন এমন মানুষ আছে, যারা ওর মৃতদেহের ভালো খেয়াল রাখবে! লরাকে নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না...হতে হবে না কোন ষড়যন্ত্রের ঘুঁটি। আর কখনও দুঃস্বপ্নও দেখতে হবে না। শুধু শান্তি আর শান্তি। একটা মাত্র আঘাত, এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত...

...ব্যস।

গলায় ক্ষুর ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ও, এক বিন্দু রক্ত গড়িয়ে পড়ল চামড়ার উপর দিয়ে। কখন যে কেটে গিয়েছে, টেরই পায়নি সে। কত সহজ, কেউ যেন ফিসফিস করে বলছে ওর কানে। একদম টের পাবে না, ব্যথার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিছু বোঝার আগেই কাজ শেষ হয়ে যাবে।

আচমকা খুলে গেল বাথরুমের দরজা, হাট হয়ে না-মাত্র কয়েক ইঞ্চি। এই অল্প জায়গার ভেতর দিয়েই মাথা ঢোকাল ছোট্ট, বাদামী বিড়ালটা। 'মরর?' ওর দিকে তাকিয়ে ডেকে উঠল।

'আমি তো ভেবেছিলাম,' বিড়ালটাকে বলল শ্যাডো। 'দরজা লাগিয়ে দিয়েছি!'

ধারাল অস্ত্রটা বন্ধ করে রাখল ও, সিঙ্কের পাশে রেখে দিয়ে কাটা স্থানে লাগাল টয়লেট পেপারের একটা টুকরা। তারপর কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে চলে এলো পাশের শোবার ঘরে। এটাও রান্নাঘরের মতো ১৯২০ সালের আদলে সাজানো। একটা ওয়াশস্ট্যান্ড আর পানি রাখার পিচার আছে ভেতরে। ওগুলোর পাশেই আছে ওয়ারড্রোব আর আয়না। বিছানার উপর কে যেন সুন্দর করে

গুছিয়ে রেখেছে জামা-কাপড়–কালো স্যুট, সাদা শার্ট, কালো টাই, সাদা গেঞ্জি আর জাঙ্গিয়া, কালো মোজা। মেঝেতে রাখা আছে একজোড়া কালো জুতা।

পোশাক পরে নিল শ্যাডো, ভালো মানের কাপড় দিয়ে বানানো হয়েছে এগুলো; যদিও একটাও নতুন নয়। কে জানে, কোন মৃত মানুষের পোশাক পরছে হয়তো! অত-শত না ভেবে সবকিছু পরে নিল ও। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, হাসছে ওর প্রতিচ্ছায়া।

এই একটু আগেই নিজের গলা কেটে ফেলতে চাইছিল, বিশ্বাসই হতে চাইছে না শ্যাডোর। 'হাসছ কেন?' আয়নার শ্যাডোকে জিজ্ঞাসা করল ও। 'আমার অজানা কোন রহস্য জান মনে হচ্ছে?' বলেই লজ্জা পেল।

আচমকা ক্যাচ-ক্যাচ শব্দে খুলে গেল দরজা। বিড়ালটা বিনা শব্দে প্রবেশ করল ঘরে। 'এবার যে দরজা লাগিয়েছিলাম,' প্রানিটাকে বলল ও। 'তাতে কোন সন্দেহ নেই।' আগ্রহ নিয়ে ওর দিকে তাকাল বেড়ালটা, হলদে রঙের মণি ওটার। তারপর লাফিয়ে উঠে পড়ল বিছানায়, আরাম করে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সাথে সাথেই।

দরজা খোলা রেখেই বেরোল শ্যাডো। বিড়ালটা চাইলে বেরিয়ে যেতে পারবে, আবার ঘরটাতেও বাতাস ঢুকবে একটু। ওর ওজনের ভার নিতে না পেরে প্রতিবাদ জানাল যেন কাঠের সিঁড়ি।

'আরে!' বলল জ্যাকুয়েল। 'দারুণ লাগছে দেখতে।' শ্যাডোর মতোই আরেকটা স্যুট পরে আছে সে। 'ভালো কথা, শববহনকারী গাড়ি চালিয়েছ কখনও?'

'হার্স? না।'

'ব্যাপার না,' বলল জ্যাকুয়েল। 'সবকিছুরই একটা শুরু থাকে। ওটা সামনে পার্ক করে রাখা আছে।'

মারা গিয়েছেন এক বৃদ্ধা, নাম ছিল তার লিলা গুডচাইল্ড। মি. জ্যাকুয়েলের নির্দেশনা মোতাবেক শ্যাডো একটা ভাঁজ করা, অ্যালুমিনিয়ামের গার্নি নিয়ে উঠে গেল উপরে। ভদ্রমহিলার বিছানার পাশে খুলল সে গার্নিটা, নীলচে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ নিয়ে রাখল লাশের পাশে। লিলি গুডচাইল্ড একটা গোলাপি নাইটগাউন আর একটা পুরু রোব পরে আছেন। লাশটাকে তুলে নিয়ে একটা কম্বলে জড়াল শ্যাডো, একদম হালকা...পাখির মতো দেহ যেন। সবশেষে ব্যাগে ভরে আলতো করে তুলল গার্নিতে। এদিকে জ্যাকুয়েল ভদ্রমহিলার স্বামীর সাথে কথা বলায় ব্যস্ত। আসলে বলছে কম, শুনছে বেশি। নিজের সন্তান, নাতিপুতির

বিরুদ্ধে যত অভিযোগ আছে, সব শোনাচ্ছে ভদ্রলোক জ্যাকুয়েলকে। বলছে, নাতিদের দোষ দেয় না সে। দোষ দেয় ছেলে-মেয়েদের। বৃক্ষ তোমার নাম কী? ফলে পরিচয়।

জ্যাকুয়েলের সহায়তায় গার্নিটাকে সরু সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামিয়ে আনল শ্যাডো। বুড়ো লোকটা এলো সাথে, এখনও কথা বলেই যাচ্ছে। লোকটার পায়ে শোবার ঘরে পরার চপ্পল। গার্নির ভারী, নিচের অংশটা বয়ে রাস্তায় এলো শ্যাডো। এরপর চাকার সাহায্যে ঠেলে নিয়ে গেল হার্সের কাছে। জ্যাকুয়েল পেছনের দরজাটা খুলে ধরলে, ইতস্তত করল শ্যাডো। 'ভেতরে ঢুকিয়ে দাও, নিচের চাকাগুলো আপনা-আপনি ভাঁজ হয়ে যাবে।' তা-ই করল শ্যাডো, সুন্দর মতো গার্নিটা এঁটে গেল ভেতরে। কীভাবে গার্নি বেঁধে লাশটাকে সাবধানে রাখতে হয়, তা দেখাল জ্যাকুয়েল। শ্যাডো যখন হার্সটার দরজা বন্ধ করছে, তখন জ্যাকুয়েল মন দিয়ে লিলা গুডচাইল্ডকে বিয়ে করা বুড়োর কথা শোনায় ব্যস্ত। সন্তানদের গাল-মন্দ করছে সে। বলছে, ওরা আসলে শকুনের চাইতে ভালো কিছু নয়। লিলা আর ওর জমান অল্প যা আছে, সব কেড়ে নেবার জন্য ওঁত পেতে আছে। তবে ওর স্ত্রী যে কোন নার্সিং হোমে মারা যায়নি, তাতে সে খুশি। আবার তার নিজের ভাগ্যে ওরকম কিছু লেখা আছে ভেবে ভয়ও পাচ্ছে।

বুড়ো লোকটার সাথে বাড়ি পর্যন্ত হেঁটে এলো ওরা, এমনকী সিঁড়ি বেয়ে তাকে শোবার ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিল। ছোট্ট একটা টিভি আছে এই রুমে, ওটার পাশ দিয়ে যাবার সময় শ্যাডোর যেন মনে হলো, খবর পাঠিকা ওর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপছে!

'গুডচাইল্ডদের খুব একটা টাকা-পয়সা নেই।' হার্সে ফিরে বলল জ্যাকুয়েল। 'আগামীকাল লোকটা আইবিসের সাথে দেখা করতে আসবে। সবচেয়ে কম খরুচে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াটা পছন্দ করবে স্ত্রীর জন্য। কিন্তু মহিলার বান্ধবীদের চাপে বাধ্য হবে আরও বেশি দামী আরেকটা বেছে নেবার জন্য। কী আর করা বলো, আজকাল কারও হাতেই টাকা-পয়সা বেশি নেই। যাই হোক, আমার তো মনে হয় ভদ্রলোক আর ছয় মাস বাঁচবে না...খুব বেশি হলে এক বছর।'

তুষারপাত হচ্ছে, হেডলাইটের আলোতে অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওগুলোকে। 'কেন, অসুস্থ নাকি?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'নাহ, তা না। মেয়েরা সাধারণত তাদের স্বামীর চাইতে বেশি বাঁচে। পুরুষ, বিশেষ করে মি. গুডচাইল্ডের মতো পুরুষ, স্ত্রী মারা গেলে আর বেশিদিন বাঁচে না। আস্তে আস্তে ক্লান্ত হতে শুরু করবে সে, তারপর একদিন হাল ছেড়ে দিয়ে চোখ বুঝবে। ডাক্তার হয়তো বলবে, ক্যান্সারে বা নিউমোনিয়ায় মারা গিয়েছে।

আসলে বুড়ো বয়সে মানুষের আর লড়াই করে বাঁচার ইচ্ছা থাকে না। মরণটা হয় সে কারণেই।'

'আচ্ছা, জ্যাকুয়েল।'

'বলো।'

'তুমি কি আত্মায় বিশ্বাসী?' আসলে এই প্রশ্নটা করার ইচ্ছা ছিল না শ্যাডোর। নিজেও অবাক হয়ে গিয়েছে শব্দগুলো উচ্চারণ করার পর।

'নির্ভর করে অনেক কিছুর উপরে। যখন আমরা ক্ষমতায় ছিলাম, তখন সবকিছু ছিল ছকে বাঁধা। মারা গেলে সবাইকে এক সারিতে দাঁড় করান হতো। পাপের জন্য জবাবদিহিতা করতে হতো, পুণ্যের জন্য পাওয়া যেত প্রশংসা। যদি পাপের ওজন একটা পালকের চাইতে বেশি হতো, তাহলে আত্মাটাকে অ্যামেটের সামনে রেখে দিতাম আমরা। গপগপ করে গিলে ফেলত সে ওটাকে।'

'তাহলে নিশ্চয় অগণিত আত্মা খেতে পেয়েছে সে!'

'অতো বেশিও না। পালকটা আসলে খুব ভারী ছিল। বিশেষভাবে বানানো হয়েছিল ওটাকে। খুব বড় ধরনের পাপী না হলে, ওটার চাইতে বেশি ওজন হতো না আত্মার। ওই গ্যাস স্টেশনের সামনে থামো, কয়েক গ্যালন নিয়ে নেই।'

নির্জন রাস্তা, অবশ্য প্রথম তুষারপাতের সময় রাস্তা খালিই হয়ে যায়। 'এবারের ক্রিসমাসে সাদার রাজত্ব থাকবে।' তেল ভরতে ভরতে বলল শ্যাডো।

'হ্যাঁ। কুমারী-পুত্রের কপাল বটে।'

'যীশুর কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, কপাল নিয়ে জন্মেছে। গুয়ের গর্তে পড়লেও দেখা যাবে, ফুলের সুগন্ধি গায়ে নিয়ে উঠে এসেছে! অথচ ক্রিসমাস আসলে ওর জন্মদিনও না, ওটা ধার করেছে মিথরাসের কাছ থেকে। মিথরাসের সাথে দেখা হয়েছে? লাল ক্যাপ পরে থাকে? ভালো ছেলে।'

'মনে হয় না।'

'অবশ্য আমিও অনেকদিন দেখি না। আর্মিতে নাম লিখিয়েছে, বুঝলে। হয়তো এখন মধ্য প্রাচ্যে আছে। তবে কে জানে, বিস্মৃতও হয়ে যেতে পারে এতদিনে। এরকমটাই হয়। একদিন যার নামে বিশাল বিশাল সব পশু বলি দেয়া হয়, পরেরদিন তার জন্মদিনটাও কারও মনে থাকে না।'

কাজ শেষে আবার রওনা দিল ওরা, মাঝখানে সুযোগ বুঝে একটু গতি তুলতে গিয়ে আরেকটু হলেই গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসেছিল শ্যাডো। তাই

এবার ঘণ্টা প্রতি মাত্র দশ মাইল বেগে চালাল। গাড়িটাকেও মনে হলো এই গতিতে সন্তুষ্ট।

'যা বলছিলাম,' বলল জ্যাকুয়েল। 'যীশুর কপালটা ভালো। এদিকটায় ওর নামও আছে বেশ। কিন্তু আমি এমন একজনকে চিনি, যে ওকে আফগানিস্তানের রাস্তায় হাঁটতে দেখেছে। অথচ কেউ ওকে লিফট দেয়ার জন্য গাড়িটা পর্যন্ত থামায়নি। আসলে পুরোটাই অবস্থানের উপরে, নিজ পাড়ায় কুকুরও সিংহ।'

'আমার ধারণা, একটা ঝড় আসছে।' বলল শ্যাডো, আসলেই আবহাওয়ার ব্যাপারে বলেছে।

কিন্তু জ্যাকুয়েল যখন কথা বলল, তখন সে আবহাওয়ার ধারে-কাছে দিয়েও গেল না। 'আমার আর আইবিসের কথাই ধরো। বছরখানেকের মধ্যে আমাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। মন্দার জন্য বেশ কিছু টাকা আলাদা করা আছে আমাদের। তবে সত্যি বলতে কী, মন্দা চলছে কয়েক বছর ধরেই। আবার প্রতি বছর আগের চাইতেও বেশি খারাপ হচ্ছে অবস্থা। হোরাস তো পুরো পাগল হয়ে গিয়েছে, পুরোটা সময় বাজপাখি হয়েই কাটিয়ে দেয়। মরা প্রাণী খেয়ে বাঁচা-এটা কোন জীবন হলো। বাস্টকেও তো দেখেছ। আমাদের অবস্থা বাকিদের চাইতে ভালো। এখনও অল্প-স্বল্প বিশ্বাস পাই আমরা। অধিকাংশ তো কিছুই পায় না। পুরোটা অনেকটা ফিউনারেল ব্যবসার মতো-বড় কোম্পানিগুলো একদিন না একদিন তোমাকে কিনেই নেবে। তা ব্যাপারটা তোমার মনে ধরুক আর না-ই ধরুক। এর বিরুদ্ধে লড়াই করেও কোন লাভ নেই। যখন একশ...এক হাজার বা দশ হাজার বছর আগে এই দেশে পা রেখেছি, তখনই হেরে গিয়েছি সেই যুদ্ধে। আমাদেরকে নিয়ে আমেরিকার না কোন মাথা ব্যথা ছিল, আর না আছে। তাই হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। ঝড় আসছে।'

পেছনের দুই বড় দরজার সাথে প্রায় লাগিয়ে হার্সটা থামাল শ্যাডো। আইবিস ওটার দরজা আর সেই সাথে মর্গের দরজাও খুলে দিল। শ্যাডো নেমে পড়ল গার্নিটা নামাবার কাজে। গাড়ি থেকে নামানো মাত্র গার্নিটার নিচের চাকাগুলো নেমে এলো আবার। ওটা ঠেলে টেবিলের কাছে আনতে তাই কোন কষ্ট হলো না। লিলা গুডচাইল্ডকে বহন করা ব্যাগটা তুলে এমনভাবে তাকে ওই ঠান্ডা টেবিলে শুইয়ে দিল শ্যাডো যেন কোন ঘুমন্ত বাচ্চাকে কোলে নিয়েছে!

'কোলে না নিলেও হতো, আমার আলাদা বোর্ড আছে।' বলল জ্যাকুয়েল।

'সমস্যা নেই।' বলল শ্যাডো। 'আমার কষ্ট হয়নি।'

শৈশবে, বয়সের তুলনায় খাটো ছিল শ্যাডো। ওর ছেলেবেলার একটা মাত্র ছবি পছন্দ হয়েছিল লরার। অগোছালো চুল আর কালো চোখের একটা গম্ভীর

বাচ্চাকে দেখা যাচ্ছিল ওতে, কেক আর কুকি ভর্তি একটা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। যেহেতু ওতে ছেলেটা বো-টাই আর সুন্দর জামা পরা ছিল, তাই শ্যাডোর ধারণা কোন দূতাবাসের ক্রিসমাস পার্টির সময় তোলা ছবি ওটা।

শ্যাডো আর ওর মা কোথাও থিতু হতে পারত না। প্রথমে ইউরোপ জুড়ে, এক দূতাবাস থেকে অন্য দূতাবাসে যেত ওরা। শ্যাডোর মা কাজ করতেন ফরেন সার্ভিসের কমিউনিকেটর হিসেবে, তার দায়িত্ব ছিল বিশ্ব জুড়ে গোপন টেলিগ্রাম পাঠানো আর দূতাবাসে আসা টেলিগ্রামগুলো লিখে রাখা। শ্যাডোর বয়স যখন আট, তখন ইউ.এস.এ. ফিরে আসে ওরা। মা ততদিনে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাই একটানা কোন চাকরি করতে পারতেন না। এক বছর এই শহরে তো অন্য বছর ওই শহরে করে থাকতে হতো তাদের। বাচ্চা শ্যাডো যে কোথাও বন্ধু বানাবে, একটু স্থির হবে-সেই সুযোগ পায়নি। তার উপর আকারে ছিল ও ছোট...

বেড়ে উঠেছেও একেবারে আচমকা। তেরোতম বছরের এক বসন্তের কথা। ওর স্কুলের বাচ্চারা খেপাচ্ছিল বেচারাকে। জানত, লড়াই করতে চাইলে সহজেই পিটিয়ে ছাতু বানাতে পারবে বাচ্চা শ্যাডোকে। সেজন্যই হয়তো খুব উসকানি দিচ্ছিল। সাধারণত এধরনের ঘটনা ঘটলে পালিয়ে ছেলেদের ওয়াশরুমে চলে আসত ও, কাদা আর রক্ত ধুয়ে ফেলত চেহারা থেকে। এরপর এলো গ্রীষ্মের ছুটি। জীবনের তেরোতম বছরের এই ছুটিটাকে ওর আশীর্বাদ বলে মনে হয়। পুরোটা সময় গা বাঁচিয়ে চলছিল ও, সাঁতার কাটত আর পুলের পাশে বসে লাইব্রেরি থেকে আনা বই পড়ত। ছুটির শুরুতে সাঁতারের কেবল 'স' জানত ও। কিন্তু আগস্টের শেষ দিকে দেখা গেল, আরামসে পুলের এপার-ওপার করছে ও, উঁচু ডাইভিং-বোর্ড থেকে লাফিয়ে নামছে পুলে, গায়ের চামড়া হয়ে গিয়েছে তামাটে। সেপ্টেম্বরে যখন স্কুল খুলল তখন অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, এতদিন ধরে ওর উপরে অত্যাচার করে আসা ছাত্রগুলো আসলে একেবারে নরম আর দুর্বল কয়েকটা পুতুল ছাড়া আর কিছুই না! দুজন অবশ্য তা-ও ঝামেলা করতে এসেছিল, কিন্তু দ্রুতই তাদের ঘরে না শেখা ভদ্রতার পাঠ পড়িয়ে দিল শ্যাডো।

তবে সমস্যাও হলো, এখন আর চুপচাপ একেবারে পেছনে বসে থাকা ছাত্রের চরিত্রে মানিয়ে নেয়া গেল না। একটু বেশিই দশাসই হয়ে গিয়েছে ও, নজরে পড়ে সবার। ওই বছরের শেষের দিকে এসে দেখা গেল, শ্যাডো সাঁতার দলের তারকা সাঁতারু; ভারবহনকারী দলের সদস্য। কোচের নজরে পড়ে গেল সে, তিনি ওকে ট্রায়াথলনের জন্য প্রস্তুত করতে শুরু করলেন। শক্তিশালী আর বিশালদেহি পরিচয়ে খুব সহজেই মানিয়ে নিতে পারল ও নিজেকে। এতদিন

লাজুক, বইপ্রেমি ছিল-কষ্ট পেতে হতো খুব। আর এখন সে বিশাল এক বোকা মানব-মানুষজন ওর কাছ থেকে বিশেষ কিছু আশা করে না। সোফাটাকে একঘর থেকে অন্যঘরে নিয়ে যেতে পারলেই সবাই খুশি।

কিন্তু লরা...লরার আগমন পাল্টে দিল সব কিছু।

রাতের খাবার রান্না করল মি. আইবিস। নিজের ও মি. জ্যাকুয়েলের জন্য রাঁধল ভাত আর সবজি সিদ্ধ। 'আমি মাংস খাই না,' জানাল সে। 'আর জ্যাকুয়েল কাজ করতে করতেই যথেষ্ট পরিমাণ পায়।' শ্যাডোর জন্য যোগ করা হলো কে.এফ.সি.র চিকেন আর বিয়ারের একটা বোতল।

মুরগীর পরিমাণ এত বেশি ছিল যে পুরোটা একা খেতে পারল না শ্যাডো, বিড়ালটাকেও দিতে হলো কিছু। তবে তার আগে চামড়া সরিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে ভুলল না।

'জ্যাকসন নামে এক কয়েদি ছিল জেলে,' খেতে খেত বলল শ্যাডো। 'লাইব্রেরিতে কাজ করত। ওর মতে, কেন্টাকি ফ্রায়েড চিকেনের নাম কে.এফ.সি. করার কারণ একটাই-এখন আর আসলে মুরগী পরিবেশন করা হয় না। এখন আমরা যেগুলোর মাংস খাই, ওগুলো আসলে জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত প্রাণী। তাদের না মাথা আছে আর না মুখ। শুধু পা, বুক আর পাখনা। ওদের খাওয়ানো হয় টিউব দিয়ে। লোকটার মতে, সরকার তাই কোম্পানিকে নামের সাথে 'চিকেন' ব্যবহার করতে বাঁধা দিয়েছে।'

ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইল আইবিস। 'তোমার-ও কি তাই মনে হয়?'

'না। তবে আমার আরেক সেলমেট, লো কীর ব্যাখ্যাটা মনে ধরেছিল। ওর মতে, ফ্রায়েড শব্দটা এখন মানুষের পছন্দ হয় না। ওরা ভাবতে চায়, মুরগী নিজেই নিজেকে রান্না করে তাদের সামনে উপস্থাপন করেছে।'

রাতের খাবার শেষ হলে, জ্যাকুয়েল মর্গে চলে গেল। আইবিস গেল তার স্টাডিতে, লেখালেখি করবে। শ্যাডো আরও কিছুক্ষণ বসে রইল রান্নাঘরে, ছোট্ট বিড়ালটাকে মাংস খাওয়াল। যখন মুরগী আর ওর বিয়ার, দুটোই ফুরিয়ে গেল-তখন বাসন-কোসন ধুয়ে সাজিয়ে রেখে চলে এলো শোবার ঘরে।

এসে দেখে, বিড়ালটা এরইমাঝে ওর বিছানার নিচে ঘুমিয়ে পড়েছে! ওয়ারড্রোবের মাঝের ড্রয়ারে কয়েক জোড়া সুতির পায়জামা খুঁজে পেল শ্যাডো। দেখে মনে হয় সত্তর বছরের পুরনো, কিন্তু গন্ধে নতুন। কালো স্যুটের মতোই, সুন্দর ওর শরীরে এঁটে গেল ওটা।

বিছানার পাশের টেবিলে অনেকগুলো রিডার'স ডাইজেস্ট রাখা আছে। অবশ্য কোনটাই মার্চ ১৯৬০ সালের পরের নয়। জ্যাকসন, জেলের লাইব্রেরিতে কাজ করা পাগলাটে লোকটার এই রিডার'স ডাইজেস্ট নিয়েও একটা তত্ত্ব আছে। সি.আই.এ. নাকি একে তাদের শাখা অফিসের কাভার হিসেবে ব্যবহার করে। দেশ জুড়ে রিডার'স ডাইজেস্টের যত অফিস আছে, সব আসলে সি.আই.এ.'র শাখা!

আচমকা মরহুম মি. উডের সেই ঠাট্টার কথা মনে পড়ে গেল শ্যাডোর- কেনেডির হত্যাকাণ্ডে যে সি.আই.এ.'র হাত ছিল না, তা নিশ্চিত হবে কী করে?

জানালাটা অল্প একটু খুলে ধরল শ্যাডো, যেন বাতাস আসতে পারে। আর রাতে যদি চায়, তাহলে যেন বিড়ালটা চলে যেতে পারে ব্যালকনিতে।

বেডসাইড ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে বিছানায় উঠে পড়ল ও, অল্প কিছুক্ষণ ডাইজেস্ট পড়তেই ঘুমে যেন বন্ধ হয়ে গেল চোখ। নিদ্রা-দেবীর হাতে নিজেকে সঁপে দেবার আগে কেবল বাতিটাই নেভাতে পারল শ্যাডো।

স্বপ্নটা কখন শুরু হলো, কীভাবে শুরু হলো বা কোনটার পর কী দেখল- এসবের কিছুই বলতে পারে না যুবক। মনে করতে গেলে শুধু অন্ধকার কিছু আবছা দৃশ্য দেখতে পায়। মেয়ে ছিল একজন। কোথায় যেন দেখেছিল সে মেয়েটাকে। ব্রিজের উপর দিয়ে হাঁটছে দুজন, ছোট একটা হ্রদের উপর অবস্থিত ওটা...কোন এক শহরের ঠিক মাঝখানে। বাতাস বইছে পানির উপর দিয়ে, ছোট ছোট ঢেউ-এর জন্ম দিয়ে দূরে কোথাও চলে যাচ্ছে।

-নিচের দিকে মন দাও, আদেশ দিল মেয়েটা। তার পরনে একটা চিতাবাঘের ছোপ-ওয়ালা স্কার্ট, বাতাসে পতপত করে উড়ছে। স্কার্টের নিচ থেকে উঁকি দিচ্ছে ক্রিমের মতো নরম মাংস। নাকে মেয়েলি সুবাস টের পাচ্ছে শ্যাডো। স্বপ্নে দেখা মেয়েটা যে ওকে বাস্তব জীবনেও উত্তেজিত করে তুলছে, তা বুঝতে পারছে।

মেয়েটার চেহারার দিকে চাইল সে, কিন্তু অন্ধকারে ঢেকে আছে তা। মুখ বাড়িয়ে খুঁজতে চাইল তার নরম ঠোঁট, খুঁজেও পেল। ঠোঁটে পেলব ঠোঁটের স্পর্শ আর হাতে নরম স্তনের ছোঁয়া পেয়ে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল যেন শ্যাডো। আস্তে আস্তে সিল্কের মতো মসৃণ পিঠ আর কোমর বেয়ে দুই উরুর ফাঁকে চলে এলো ওর হাত। নরম, ভেজা জায়গাটা যেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

উত্তেজনার শীৎকার বেরিয়ে আসছে মেয়েটার দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়েও। আচমকা নিজের পুরুষাঙ্গের উপর মেয়েটার হাতের মৃদু চাপ অনুভব করল শ্যাডো। আর সামলাতে না পেরে মেয়েটাকে শুইয়ে দিয়ে আর উপরে চড়ে বসল ও।

আগে কখনও এমন নরম ঠোঁটে চুমু খায়নি শ্যাডো, আসলে কারও ঠোঁট যে এতটা নরম হতে পারে তা জানতই না। তবে মেয়েটার ঠোঁট বেশ কর্কশ, যেন স্যান্ডপেপার।

-কে তুমি? জানতে চাইল ও।

উত্তর দিল না মেয়েটা, দেয়ার চেষ্টাও করল না। উল্টো ওকে শুইয়ে দিয়ে নিজে উঠে এলো উপরে। তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে আঁচড়ে দিল শ্যাডোর দুই পাশ, কিন্তু ব্যথা পেল না যুবক। বরঞ্চ সুখের আবেশে যেন তলিয়ে গেল। মেয়েটা যা-ই করছে, কোন এক পরশ-পাথর যেন সেটাকে পরিণত করছে আনন্দে...আবেশে...

কী যেন বলতে চাইল শ্যাডো, কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছে না। অনেক চেষ্টার পর আবারও জানতে চাইল, কে তুমি?

এবারও উত্তর এলো না। কেবল উজ্জ্বল চোখ দিয়ে চেয়ে রইল মেয়েটা শ্যাডোর দিকে। আলতো করে মুখ নামিয়ে প্রবল অনুরাগের সাথে চুমু খেল, এমনভাবে যে ওই ব্রিজের উপর...না না, কায়রো ফিউনারেল হোমের বিছানার উপর আরেকটু হলেই রেতঃপাত হয়ে যেত শ্যাডোর। কিন্তু না, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস পেল ও। মেয়েটাকে সাবধান করে দিতে হবে।

-আমার স্ত্রী, লরা। তোমাকে খুন করবে।

-না, করবে না। জানাল মেয়েটা।

মেয়েটার নাম জানার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে শ্যাডোর মন, কিন্তু তৃতীয়বারের মতো জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছে না। আচমকা আঁকড়ে ধরল ওকে মেয়েটা, বুকের উপর শক্ত হয়ে থাকা স্তন-বৃন্তের স্পর্শ পেল শ্যাডো। ওকে যেন চাপ দিয়ে সর্বোচ্চ সুখ দিতে চাইছে মেয়েটা। এবার আর পারল না সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে। সর্বশক্তিতে প্রবেশ করল মেয়েটার ভেতরে, যত দূর পারে...যতটা পারে...

-আটকে রেখো না নিজেকে, ছেড়ে দাও। আমাকে দাও সবটা।

তিন বছরের জমিয়ে রাখা পৌরুষ তাই একবাওে উপহার দিল শ্যাডোর দেহ।

-বিশ্রাম নাও এবার। নরম ওই ঠোঁট জোড়া দিয়ে যুবকের পাপড়িতে চুমু খেল মেয়েটা। ছেড়ে দাও নিজেকে।

আবার ঘুমিয়ে পড়ল শ্যাডো। গভীর...স্বপ্নহীন আর স্বস্তির ঘুম।

নিদ্রা দেবীর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিল শ্যাডো।

পরদিন শ্যাডোর ঘুম ভাঙ্গল অদ্ভুত এক আলোয়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে, ভোর ছয়টা পঁয়তাল্লিশ বাজে। বাইরে এখনও অন্ধকার, তবে ঘরের ভেতরটায় হালকা নীলচে আলো। বিছানা ছেড়ে নামল ও, কিন্তু এখন কেন যেন নগ্ন হয়ে আছে। ঠান্ডা বাতাসে শীত করছে ওর, তাই বন্ধ করে দিল জানালা।

রাতে তুষার-ঝড় হয়েছে, রাস্তায় জমে থাকা ছয় ইঞ্চি পুরু বরফই তার প্রমাণ। জানালা দিয়ে দেখতে পাওয়া দালানগুলো যেন সাদা কোন সাজে সেজেছে। রাস্তার কোন চিহ্ন নেই, ওখানে এখন শুধু বরফের ক্ষেত!

একটা চিন্তা খেলে গেল ওর মনে... ঠিক মনে না, মনের কাছ দিয়ে। তবে দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার সেই চিন্তাটুকু।

আয়নার দিকে তাকাল ও, কেন জানি কিছু একটা ঠিক নেই বলে মনে হচ্ছে। মনোযোগ দিয়ে আয়নার শ্যাডোর দিকে তাকাতেই ধরলে পারল ব্যাপারটা। দেহে এখন কোন ক্ষত দেখা যাচ্ছে না! আঙুল দিয়ে চাপ দিল আগের ক্ষতগুলোতে, কিন্তু না পাগলা সুইনির উপহার দেয়া আঘাতগুলো টের পেল আর না মি. উড ও মি. স্টোনের মারের আঘাত! তবে হ্যাঁ, পিঠে আঁচড়ের দাগ রয়েছে বটে।

পুরোটাই তাহলে কল্পনা ছিল না।

ড্রয়ারগুলো খুলল শ্যাডো। ভেতরে পেল পুরনো এক জোড়া নীল ডেনিম-লিভাই, একটা শার্ট আর নীল সোয়েটার। মুর্দাফরাশের একটা কোটও আছে। সবগুলো পড়ে নিল শ্যাডো, তবে জুতা পরল নিজেরটাই।

পুরো বাড়ি ঘুমিয়ে আছে। চুপিচুপি নিচে নেমে এলো শ্যাডো। বাইরে বেরিয়ে বরফের মাঝে হাঁটল কিছুক্ষণ। বাড়ির ভেতর থেকে দেখে যতটা পুরু মনে হয়েছিল, ততটা পুরু হয়ে বরফ জমেনি!

মিনিট পনেরো হাঁটার পর, শ্যাডো একটা ব্রিজের নিচে এসে উপস্থিত হলো। বড় একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেল ও। এই ব্রিজটাই যে কায়রো শহরটার শেষ সীমা, সেটা লেখা আছে তাতে। ব্রিজের নিচে দাঁড়িয়ে আছে কেউ একজন, এখান থেকে মনে হচ্ছে গার্গল করছে। মুখে সিগারেট, ঠকঠক করে কাঁপছে ঠান্ডায়। পরিচিত বলে মনে হলো লোকটাকে।

এগিয়ে গিয়ে বলল, 'শুভ সকাল, মিস্টার সুইনি।'

নিশ্চুপে হয়ে আছে পুরো বিশ্ব, এমনকী চারপাশে কোন গাড়ির আওয়াজ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না।

'হেই।' বলল পাগলা সুইনি, মুখ তুলে তাকাবার চেষ্টাও করল না। মুখে রাখা সিগারেটটা হাতে বানানো।

'ব্রিজের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা বন্ধ করো,' বলল শ্যাডো। 'মানুষ-জন তোমাকে ট্রল ভাববে।'

এতক্ষণে চোখ তুলে তাকাল পাগলা সুইনি। লোকটার ভয়ার্ত চোখের সাদা অংশ পর্যন্ত দেখতে পেল ও। 'তোমাকেই খুঁজছিলাম,' বলল সুইনি। 'আমার সাহায্য দরকার। অনেক বড় ঝামেলায় পড়ে গেছি।' সিগারেটটা মুখ থেকে সরাতে চাইল সে, কিন্তু কাগজের অংশটা নিচের ঠোঁটের সাথে লেগে খুলে গেল পুরোটা। ভেতরের তামাকটুকু ছড়িয়ে পড়ল দাড়ির উপরে। টি-শার্টের সামনের অংশটুকুও বাদ পড়ল না। হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলাবার চেষ্টা করল পাগলা সুইনি, যেন কোন পোকা তাড়াচ্ছে!

'আমার পয়সা-কড়ি প্রায় শেষ, সুইনি।' বলল শ্যাডো। 'তবে কী দরকার, তা বলতে পারো। কফি আনব?'

মাথা নাড়ল পাগলা সুইনি। পরনের ডেনিম জ্যাকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করে আনল সে, নতুন একটা সিগারেট বানাতে শুরু করল। মুখ নড়তে শুরু করল বেচারার, কিন্তু কোন আওয়াজ উচ্চারিত হলো না। সিগারেট কাগজের আঠাওয়ালা অংশটা চেটে দুই আঙুল দিয়ে রোল করল। তারপর বলল, 'আমি কোন ট্রল নই। বাল, ওইগুলা খুব খারাপ।'

'আমি তা জানি, সুইনি।' বলল শ্যাডো। 'তাহলে বলো, আমার কী সাহায্য চাও?'

হাতের তামা জিপ্পোটা জ্বালাল পাগলা সুইনি। ওর সিগারেটের প্রথম ইঞ্চিটা পুড়ে গেল সাথে সাথে। 'মনে আছে? তোমাকে একটা পয়সা দিয়েছিলাম, মনে আছে?'

'হ্যাঁ,' বলল শ্যাডো। লরার কবরে ওটা ছুঁড়ে দেবার কথাও মনে পড়ে গেল ওর। 'মনে আছে।'

'ভুল পয়সাটা নিয়েছ।'

ব্রিজের আড়াল থেকে আচমকা বেরিয়ে এলো একটা গাড়ি, ওটার হেডলাইটের আলোয় ধাঁধিয়ে গেল দুজনের চোখ। যেতে যেতে আচমকা ব্রেক কষল গাড়িটা। জানালা নামিয়ে চালক জানতে চাইল, 'সব ঠিক আছে তো?'

'একদম ঠিক, অফিসার।' জানাল শ্যাডো। 'সকালের হাওয়া খেতে বেরিয়েছি।'

'ঠিক আছে,' বলল পুলিশ অফিসার। তবে তাকে দেখে মনে হলো না যে সে শ্যাডোর কথা বিশ্বাস করেছে। অপেক্ষা করে রইল সে। তাকে দেখাবার জন্যই শ্যাডো একটা হাত রাখল সুইনির কাঁধে। দুজনে মিলে একটু সামনে এগিয়ে গেল, শহরের বাইরে। জানালা বন্ধ হলো বটে পুলিশের গাড়ির, তবে একচুলও নড়ল না ওটা।

হাঁটতে থাকল শ্যাডো, হাঁটল পাগল সুইনিও। তবে মাঝে মাঝে হোঁচট খেল বেচারা।

পুলিশের গাড়িটা এতক্ষণে এগোতে শুরু করল। শহরের বাইরে চলে এসেছে শ্যাডোরা। ওদের বিরক্ত করার আর কেউ নেই। 'এবার বলো, কী এমন ঝামেলায় পড়েছ?'

'আমাকে যা যা বলেছে, আমি করেছি। যেভাবে বলেছে, সেভাবেই করেছি। কেবল তোমাকে পয়সা দেবার সময় ভুল পয়সাটা দিয়ে ফেলেছি। যেটা দিয়েছি, ওটা আসলে রাজাদের জন্য, বুঝেছ? আমার আসলে ওটা বাতাস থেকে তোলারও কথা ছিল না। ওটা পাওয়ার কথা ছিল আমেরিকার রাজার...তোমাকে আমার মতো চাষার না। এখন ঝামেলায় পড়েছি! শ্যাডো, আমাকে ফিরিয়ে দাও পয়সাটা। যদি দাও, তাহলে আর কখনও আমার এই চেহারা দর্শন করতে হবে না তোমাকে। ঠিক আছে? ব্রানের কসম খেয়ে বলছি।'

'কার কথা শুনে কী করেছ, সুইনি?'

'গ্রিমনিরের, তুমি যাকে ওয়েনসডের নামে চেন। ওর আসল পরিচয় জানা আছে?'

'হ্যাঁ...তা আছে।'

আইরিশ লোকটার উন্মাদনাপূর্ণ চোখে এখন ভয়ের ছায়া। 'খারাপ কিছু করতে বলেনি। নির্দিষ্ট একটা সময়ে নির্দিষ্ট একটা বারে উপস্থিত থেকে তোমার সাথে মারামারি করতে বলেছে। তুমি আসলে কতটা যোগ্য, সেটাই নাকি পরখ করে দেখতে চেয়েছিল।'

'আর কিছু করতে বলেছে?'

আবারও কেঁপে উঠল সুইনি। শ্যাডোর মনে হলো, ভয়ের কাঁপুনি ওটা। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারল, ব্যাপারটা তা না। যেভাবে কেঁপে উঠেছে লোকটা, তা কেবল মাদকাসক্ত কেউ মাদকের অভাবেই কাঁপে! সুইনিও তাই, ওর দেহ কিছু একটা চাচ্ছে। হয়তো হেরোইন! সিগারেটের জ্বলন্ত অংশটুকু ফেলে দিল লোকটা, বাকিটুকু ভরে নিল পকেটে। হাত দুটো ঘষে ঘষে গরম করার প্রয়াস পেল। সুইনির

কণ্ঠ এখন আকুতিতে পরিণত হয়েছে। 'শোন, আমাকে শুধু পয়সাটা ফিরিয়ে দাও। আরেকটা দেব, দরকার হলে আরও কয়েকশটা!'

বেসবল ক্যাপটা মাথা থেকে খুলে নিল সুইনি। আগের মতো খেলা দেখার ভঙ্গিতে বাতাস থেকে সোনার পয়সা তুলে নিয়ে ভরল ক্যাপটা। সোনা ভর্তি ক্যাপ পরক্ষণেই এগিয়ে দিল শ্যাডোর দিকে। 'সব তোমার। শুধু আমাকে আমার পয়সাটা ফিরিয়ে দাও।' এগিয়ে দেয়া টুপিটার ভেতরে উঁকি দিল শ্যাডো, কত টাকার সোনা আছে ওতে তাই ভাবল কেবল।

'সোনা খরচ করার জায়গা কোথায়?' জানতে চাইল শ্যাডো। 'কোথায় এই সোনাকে নগদে পরিণত করা যাবে?'

ওর মনে হলো, আইরিশ লোকটা বুঝি ওকে আঘাত করে বসবে। কিন্তু না, নিজেকে সামলে নিল পাগলা সুইনি। উল্টো চোখ ভরে উঠল পানিতে। মাথায় আবার চড়াল ক্যাপটা, এখন খালি! 'দিতেই হবে তোমাকে, কাজটা কীভাবে করতে হয় তা তো তোমাকে শিখিয়েই দিয়েছি! দাও না, প্লিয। ওটা আসলে আমার ছিল না!'

'আমার কাছে নেই।'

বন্ধ হয়ে গেল ম্যাড সুইনির কান্না। 'তুই...হারামজাদা...' কী যেন বলতে চাইল সে। কিন্তু মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোল না।

'আমি সত্যি কথাটাই বলছি।' বলল শ্যাডো। 'আমি দুঃখিত। থাকলে দিয়ে দিতাম।'

সুইনির তৈলাক্ত হাতগুলো শ্যাডোর কাঁধ আঁকড়ে ধরল, নীল চোখ রাখল শ্যাডোর চোখে। বেচারার চেহারায় কান্নার দাগ পড়ে গিয়েছে। 'বাল,' বলল সে। ওর মুখ থেকে ভেসে আসা তামাক আর হুইস্কির গন্ধ পেল শ্যাডো। 'তুমি দেখি সত্যি কথাটাই বলছ। স্বেচ্ছায় আরেকজনকে দিয়ে দিয়েছ পয়সাটা!'

'আমি দুঃখিত।'

'দুঃখিত হলেই বা আমার কী লাভ?' শার্টের হাতায় নাক-চোখ মুছল সুইনি। এমনিতেই কাদা লেগে থাকা চেহারাটা আরও কুৎসিত দেখাল। সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে তার হাতে চাপ দিল শ্যাডো।

'এরচেয়ে কখনও জন্ম না নিলেই ভালো হতো।' বলল পাগলা সুইনি। 'আচ্ছা, যে লোকটাকে দিয়েছ, সে চাইলে ফেরত দেবে না?'

'এক মেয়েকে দিয়েছি। এখন সে কোথায় আছে, তা-ও জানি না। তবে মনে হয় না দেবে।'

দুঃখের সাথে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুইনি। 'যখন বয়স কম ছিল, তখন এক মহিলার সাথে তারার আলোয় দেখা হতো। তার দুধ নিয়ে খেলতাম, আর আমার ভাগ্য পড়ে শোনাত সে। বলেছিল, সূর্যাস্তেরও পশ্চিমে হবে আমার ধ্বংস। আর তা-ও হবে এক মৃতা মেয়ের হাতে! হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম সেদিন। মদ খেতে খেতে চুমু বসিয়ে দিয়েছিলাম মহিলার ঠোঁটে। দিন ছিল বটে ওগুলো, তখন সাধু-সন্তরা আমাদের দেশে পা রাখেনি। আর এখন...' বলতে বলতেই থেমে গেল সে। শ্যাডোকে সাবধান করে দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'তোমার ওকে বিশ্বাস করা উচিৎ না।'

'কাকে?'

'ওয়েনসডেকে। তোমার ওকে বিশ্বাস করা উচিৎ না।'

'আমি ওকে বিশ্বাস করি না, ওর হয়ে কাজ করি।'

'মনে আছে খেলাটার কথা?'

'কী?' শ্যাডোর মনে হচ্ছে, একসাথে যেন আধ-ডজন ভিন্ন ভিন্ন মানুষের সাথে কথা বলছে ও। লেপ্রিকন লোকটা একেক বার একেক মনস্তত্ত্ব ধারণ করছে!

'পয়সা, পয়সার খেলার কথা বলছি।' দুইটা আঙুল চেহারার সামনে তুলে ধরল সে, ওগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মুখ থেকে বের করে আনল একটা সোনার পয়সা। শ্যাডোর দিকে ওটাকে ছুঁড়ে দিল সে, ধরার জন্য হাত বাড়াল শ্যাডো। কিন্তু পেল না কিছুই!

'মাতাল ছিলাম,' জানাল শ্যাডো। 'কিছুই মনে নেই।'

রাস্তা দিয়ে টলতে টলতে এগোল সুইনি। সূর্য উঠেছে, দুনিয়া এখন সাদা আর ধূসর। শ্যাডো পিছু নিল ওর। ব্রিজের কাছাকাছি পৌঁছে এক হাত দিয়ে ওটার দেয়াল আঁকড়ে ধরল সুইনি। 'কয়েকটা টাকা দিতে পারবে?' জানতে চাইল সে। 'খুব বেশি লাগবে না। এখান থেকে বিদায় নেবার মতো হলেই হবে। এই ধরো, বিশ ডলার। আছে?'

'বিশ ডলারে কোথায় যাবার বাস টিকেট পাবে?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'এখান থেকে বিদায় নিতে পারব।' বলল সুইনি। 'ঝড় আসার আগেই পালাতে চাই। পালাতে চাই এমন এক দুনিয়া থেকে, যেখানে মানুষ আফিমের মাঝে ধর্মকে খুঁজে পায়। পালাতে চাই...' থেমে গেল আচমকা, নাক মুছল হাত দিয়ে।

জিন্সের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা বিশ ডলারের নোট বের করে আনল শ্যাডো, এগিয়ে দিল আইরিশ লোকটার দিকে। 'এই নাও।'

নোটটা হাতে নিয়েই দলা-পাকাল সুইনি। এরপর তেলের দাগ পড়া ডেনিম জ্যাকেটের পকেটে ঢোকাল। নড করে বলল, 'এতেই চলবে।'

দেয়ালে হেলান দিয়ে পকেট হাতড়াল সুইনি, একটু আগে গুঁজে রাখা সিগারেটের অংশটুকু বের করে এনে আগুন ধরাল তাতে। 'তোমাকে একটা কথা বলি,' এমনভাবে বলল যেন শ্যাডোর সাথে সেদিন প্রথম কথা হচ্ছে! 'ফাঁসি-কাষ্ঠের দিকে এগোচ্ছ তুমি, গলায় যে দড়ি সেঁটে আছে তা বুঝতেও পারছ না। তোমার দুই কাঁধেই বসে আছে দুটো দাঁড়কাক, চোখ গুলো খুবলে খাবার অপেক্ষায়। দুনিয়া থেকে নরক পর্যন্ত বিস্তৃত গাছটার ডালে ঝুলতে হবে তোমাকে।' থেমে গেল লোকটা। 'আমি কিছুক্ষণ এখানেই বিশ্রাম নেব।' বলে বসে পড়ল দেয়াল ঘেঁষে।

'তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি।' বলল শ্যাডো।

'আমার আবার সৌভাগ্য,' বলল পাগলা সুইনি। 'যাক গে, ধন্যবাদ।'

বাড়ি ফেরার পথ ধরল শ্যাডো। এখন সকাল আটটা বাজে, কায়রো আস্তে আস্তে জেগে উঠতে শুরু করেছে। ব্রিজের দিকে একবার ফিরে তাকাল ও, সুইনি ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

সেই ছিল জীবিত পাগলা সুইনিকে ওর শেষ দেখা।

ক্রিসমাসের আগের ছোট ছোট শীতের দিনগুলো যেন অন্ধকারের মাঝে এক টুকরা আলো। মৃতদের ঘরটায় সময়টুকু যেন চোখের পলকেই কেটে যায়!

ডিসেম্বর মাসের তেইশ তারিখে জ্যাকুয়েল আর আইবিস লিলা গুডচাইল্ডের শেষকৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করল। দলে দলে মহিলারা এসে ভিড় জমাল ফিউনারেল পার্লারে। মৃতকে রাখা হয়েছিল সামনের ঘরে, ফুলে আবৃত হয়ে শুয়ে ছিলেন তিনি। ঘরটার উল্টো পাশে রয়েছে খাবার-ভর্তি আরেকটা টেবিল। মধ্য-বিকালে দেখা গেল, যাজকের সাথে হাত মেলাতে উপস্থিত হয়েছে আরও অনেকে। পুরো ব্যাপারটা দক্ষতার সাথে সামলাল জ্যাকুয়েল আর আইবিস। পরেরদিন কবর দেয়া হবে মিসেস লিলাকে।

হলঘরের ফোনটা বেজে উঠলে, সেদিকে এগিয়ে গেল মি. আইবিস। কথা বলে সে শ্যাডোকে টেনে নিয়ে এলো আরেকদিকে। 'পুলিশ ফোন করেছিল।' বলল সে। 'লাশ আনতে যেতে পারবে?'

'অবশ্যই।'

'কারও দৃষ্টি আকর্ষণ কোরো না আবার।' একটা কাগজে ঠিকানা লিখল সে। একবার ঠিকানাটা পড়ে নিয়ে পকেটে কাগজ ঢুকিয়ে রাখল শ্যাডো। 'পুলিশের গাড়ি তোমার জন্য অপেক্ষা করবে ওখানেই।' বলল আইবিস।

পার্লারের পেছন দিকে গিয়ে হার্সটা বের করে আনল শ্যাডো। আলাদা আলাদা করে মি. জ্যাকুয়েল আর মি. আইবিস, দুজনই ওকে বুঝিয়েছে, হার্সটা যেকোন

কাজে ব্যবহার করাটা ঠিক হবে না। লাশ নিয়ে আসার জন্য ভ্যানটা কাজে লাগাতে হবে। তবে এই মুহূর্তে ওটা গ্যারেজে, নষ্ট হয়ে পরে আছে। ঠিক হতে আরও তিন সপ্তাহ লাগবে, তাই এই সময়ের মাঝে হার্সটা ব্যবহার করলে যেন সাবধানে করে।

রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে গাড়িটা, বরফ সরিয়ে ফেলা হয়েছে এতক্ষণে। চাইলেই আরও জোরে চালাতে পারে শ্যাডো, কিন্তু তা না করে কমিয়েই রাখল গতি। কেন যেন এই গাড়িটার সাথে দ্রুতগতি মানায় না। আমেরিকার রাস্তা থেকে মৃত্যু বিদায় নিয়েছে, ভাবল শ্যাডো। মৃত্যু এখন হাসপাতাল আর অ্যাম্বুলেন্সে রাজত্ব করে।

একটা পার্শ্ব রাস্তায় দেখতে পেল ও নীল পুলিশ গাড়িটাকে, হার্স ওটার পেছনেই পার্ক করল শ্যাডো। গাড়ির ভেতরে দুই জন অফিসার বসে আছে, ফ্লাস্কে চুমুক দিয়ে পান করছে গরম চা। উষ্ণতা বজায় রাখার জন্য চালু রেখেছে গাড়ির ইঞ্জিন। এগিয়ে গিয়ে ওটার জানালায় নক করল শ্যাডো।

'কী?'

'আমি ফিউনারেল হোম থেকে এসেছি।' জানাল শ্যাডো।

'আমরা মেডিকেল এক্সামিনারের জন্য অপেক্ষা করছি।'

এই লোকটাই কি আমাকে থামিয়েছিল ব্রিজের নিচে? ভাবল শ্যাডো। দুই পুলিশের একজন বেরিয়ে এলো বাইরে, অন্যজন হুইলের পেছনেই বসে রইল। প্রথম পুলিশ, একজন নিগ্রো, ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো একটা আস্তাকুঁড়ের পেছনে। পাগলা সুইনি বসে আছে ওটাতে হেলান দিয়ে, কোলে একটা খালি সবুজ বোতল নিয়ে। ওর ক্যাপ, কাঁধ আর চেহারা ঢেকে আছে বরফে। পাতা ফেলাচ্ছে না আইরিশ লোকটা।

'মাতাল ভবঘুরে। মরে ভূত।' বলল পুলিশ।

'দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।'

'কিছু স্পর্শ করো না।' পুলিশ অফিসার জানাল। 'মেডিকেল এক্সামিনার যেকোন সময় চলে আসবে। আমার মনে হয় মাতাল হয়ে এখানেই পড়ে ছিল, বরফে জমে মারা গেছে।'

'দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।' একমত হলো শ্যাডো।

নিচু হয়ে পাগলা সুইনির হাতে ধরা বোতলটা পরখ করে দেখল ও। কম দামী জেমসন আইরিশ হুইস্কি—কায়রো থেকে পালানোর জন্য বিশ ডলারের টিকিট! ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ছোট, সবুজ নিসান গাড়ি এসে থামল আস্তাকুঁড়ের পাশে। মাঝ-বয়সী এক ঝাঁটার মতো গোঁফ ওয়ালা লোক বেরিয়ে এলো ওটা থেকে। লাশটার গলা স্পর্শ করল লোকটা।

'মারা গেছে,' বলল মেডিকেল এক্সামিনার। 'পরিচয়পত্র আছে কোন?'

'নাহ, অজ্ঞাত।' জানাল পুলিশ।

শ্যাডোর দিকে তাকাল এক্সামিনার। 'তুমি জ্যাকুয়েল আর আইবিসের হয়ে কাজ করছ?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে জ্যাকুয়েলকে বোলো, এর ডেন্টাল রেকর্ড আর ছবি যেন পরিচিতির জন্য পাঠায়। আর কেবল রক্ত টানলেই হবে, টক্সিকোলজির জন্য। বুঝেছ? না লিখে দেব?'

'লাগবে না।' জানাল শ্যাডো। 'মনে থাকবে।'

ভ্রূ কুঁচকে পকেট থেকে একটা বিজনেস কার্ড বের করল লোকটা। পেছনে কী সব লিখে এগিয়ে দিল শ্যাডোর দিকে। 'এটা জ্যাকুয়েলকে দিও। সবাইকে ক্রিসমাসের শুভকামনা।' বলে বিদায় নিল সে, অফিসার দুজন রেখে দিল সবুজ বোতলটা।

'অজ্ঞাতনামা'-র জন্য কাগজে সই করল শ্যাডো, এরপর লাশটাকে গার্নিতে শোয়াবার প্রয়াস পেল। জমে গিয়েছে আইরিশ লোকটার দেহ, বসা থেকে অনেক চেষ্টা করেও শোয়াতে পারল না লাশটা। সেভাবেই হার্সের পেছনে বসিয়ে দিল ওটাকে। এরপর রওনা দিল ফিউনারেল পার্লারের দিকে।

পথে লাল বাতি পড়লে থামল হার্স। ঠিক সেই সময়ই ও শুনতে পেল একটা কণ্ঠ। 'একটা দারুণ অনুষ্ঠান চাই আমার। সবকিছু যেন সেরা হয়, সুন্দরী সব মেয়ে এসে কান্নাকাটি করে। আর সাহসী পুরুষেরা আমার গল্প শোনায়।'

'তুমি মৃত, পাগলা সুইনি।' বলল শ্যাডো। 'মৃতের আবার চাহিদা কী?'

'তা ঠিক।' হার্সের পেছনে বসে থাকা মৃত লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মাতলামি উধাও হয়েছে কণ্ঠ থেকে। মনে হচ্ছে যেন সেই সুদূর থেকে ভেসে আসছে ওর কণ্ঠ।

সবুজ বাতি জ্বলে উঠলে আবার এগোতে শুরু করল হার্স।

'তবে একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করো কিন্তু।' বলল পাগলা সুইনি। 'আজরাতেই করো, তেমন দামী কিছু লাগবে না। হাজার হলেও, আমাকে তুমিই খুন করেছ!'

'আমি তোমাকে হত্যা করিনি, ম্যাড সুইনি।' বলল শ্যাডো। 'মাতাল হয়ে নিজেকে নিজেই খুন করেছ।'

উত্তর এলো না কোন, বাকি সময়টা নিস্তব্ধতার মাঝেই কেটে গেল। হার্স বাড়ির পেছনে পার্ক করে চলে এলো মর্গে। এমনভাবে পাগল সুইনিকে টেবিলের উপরে শোয়াল, যেন কোন গরুর মাংসের টুকরো ছুঁড়ে দিচ্ছে!

অজ্ঞাতনামাকে একটা শিট দিয়ে ঢেকে দিল ও, এরপর কাগজপত্রগুলো পাশে রেখে দিয়ে চলে এলো উপরে। পেছন থেকে ভেসে এলো একটা কণ্ঠ, 'লেপ্রিকনকে মদ বা ঠান্ডা খুন করবে কীভাবে? নাহ, শ্যাডো। তোমার ওই পয়সা আরেকজনকে বিলিয়ে দেয়াই আমার মৃত্যুর কারণ।'

কিছু একটা বলতে চাইছিল শ্যাডো, কিন্তু মৃতের সাথে ঝগড়া চলে না!

দালানের মুল অংশের দিকে এগিয়ে গেল ও, এখনও কয়েকজন মাঝ-বয়সী মহিলা অপেক্ষা করছে ওখানে। মি. গুডচাইল্ড, মৃতার স্বামী, মি. আইবিসকে একটা দেয়ালের সাথে ঠেসে ধরে জানাচ্ছে-সন্তানরা যে আসবে না তা ভালো করেই জানা ছিল তার। ওই যে, বৃক্ষ তোমার নাম কী? ফলে পরিচয়!

সেদিন সন্ধ্যায় শ্যাডো আরেকটা চেয়ার বসালো টেবিলে। প্রত্যেকটা চেয়ারের সামনে রাখল একটা করে গ্লাস, ঠিক মাঝখানে রইল এক বোতল জেমসন গোল্ড। দোকানে এর চাইতে দামী আর কোন আইরিশ হুইস্কির বোতল পাওয়া যায়নি। রাতের খাবার শেষ হবার পর, প্রতি গ্লাসে অনেকটা করে মদ ঢালল শ্যাডো...

...ওর, আইবিসের, জ্যাকুয়েলের আর পাগলা সুইনির গ্লাসে।

'হয়তো সেলারের একটা গার্নিতে শুয়ে আছে লোকটা,' বলল শ্যাডো। 'হয়তো কপালে জুটবে এক গরীব মানুষের কবর। আজ ওকে আমরা স্মরণ করব, অনুষ্ঠান পালন করব।'

খালি চেয়ারটা লক্ষ্য করে গ্লাস তুলল শ্যাডো। 'আমি জীবিত সুইনিকে দেখেছি মাত্র দুইবার।' বলল সে। 'প্রথমবার মনে হয়েছিল, লোকটা আসলে বিশ্বমানের হারামজাদা। দ্বিতীয়বার ওকে দেখেছিলাম যখন, তখন বেচারার অবস্থা খুব খারাপ। বলতে গেলে, ওর মৃত্যুর জন্য কেনা বোতলটা আমার পকেট থেকেই এসেছে। নিজেকে দাবী করত ও লেপ্রিকন বলে। শান্তিতে থাকো, পাগলা সুইনি।' গ্লাসে চুমুক দিল ও, স্বাদটা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ার সময় দিল। পান করল অন্য দুজনও।

জ্যাকেটের ভেতরের পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করে আনল আইবিস। ওটার একটা নির্দিষ্ট পাতা খুলে পড়ে শোনাল পাগলা সুইনির জীবনের গল্প।

মি. আইবিসের মতে, পাগলা সুইনির জীবন শুরু হয়েছিল একটা ছোট আইরিশ বন্যভূমির রক্ষক হিসেবে, তা-ও প্রায় তিন হাজার বছর আগে। পাগলা সুইনির প্রেম কাহিনি, তার শত্রুদের কথা, মিত্রদের গল্প-সব জানাল। প্রথম প্রথম সম্মান আর উপাসনা পেত সে আয়ারল্যান্ডের অধিবাসীদের কাছ থেকে। ধীরে ধীরে তা পরিণত হলো হাসি-ঠাট্টায়! ব্যানট্রি থেকে নিউইয়র্কে আসা এক মেয়ে সাথে করে নিয়ে এসেছিল পাগলা সুইনিকে।

সেরাতে রান্নাঘরের টেবিলে বসে এসব গল্পের পাশাপাশি আরও অনেক কিছু ওকে শোনাল মি. আইবিস। দেয়ালে পড়া ওর ছায়াটা দেখে সারসের কথা মনে পড়ে গেল শ্যাডোর। দ্বিতীয় গ্লাস শেষ হবার একটু আগে পাগলা সুইনি নিজেই শুরু করে দিল আইবিসের গল্পে নাক গলান। কিছুক্ষণের মাঝেই দেখা গেল, সুইনি হাত নাড়িয়ে আয়ারল্যান্ডে দেবতাদের ব্যাপারে শোনাতে শুরু করল। চার্চ এসে এই দেবতাদের সবাইকে পরিণত করল ট্রল, ফেয়ারি, মৃত রাজা অথবা সন্তে। মি. জ্যাকুয়েল দাঁতে দাঁত চাপতে শুরু করলে পর, চুপ করল সে।

'পয়সার খেলাটার কথা মনে আছে তো?' শ্যাডোর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে জানতে চাইল সে।

'নাহ, নেই।'

'ধারণা করতে পারো?' পাগলা সুইনি জানতে চাইল। ওর ঠোঁট বেগুনি হয়ে গিয়েছে, নীল চোখগুলো ঘোলাটে।

'হাতের ভেলকি?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'না।'

'কোন ধরনের যন্ত্র? হাতায় লুকিয়ে রেখেছিলে, এমন কিছু?'

'নাহ, তা-ও না। আর কারও হুইস্কি লাগবে?'

'একটা বইতে পড়েছিলাম, কৃত্রিম কিছু থলে বানানো হয়। ওটার রঙ একদম মানুষের হাতের মতো। তাই ভেতরে থাকা পয়সা ধরা যায় না।'

'মহান সুইনির শেষকৃত্যানুষ্ঠান এটা, যিনি আয়ারল্যান্ড জুড়ে উড়তেন পাখির মতো। অথচ আজ বেচারার জন্য চোখের পানি ফেলছে কেবল একটা পাখি, এক কুকুর আর এক গর্দভ। নাহ, কোন থলে-টলের মামলা না।'

'আমার মাথায় তো আর কিছু আসছে না।' বলল শ্যাডো। 'হাওয়া থেকে নিশ্চয় পয়দা করো না!' কথাটা বলা মাত্র অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখা গেল সুইনির চেহারায়। 'কী! হাওয়া থেকে তুলে নাও!'

'ঠিক হাওয়া থেকে না।' বলল পাগলা সুইনি। 'তবে সঠিক পথে চিন্তা করতে শুরু করেছ। গুপ্ত-ভাণ্ডার থেকে নেই।'

'গুপ্ত ভাণ্ডার।' বলল শ্যাডো। 'ওহ, আচ্ছা।'

'ওটাকে কেবল নিজের মনের মধ্যে স্থাপন করে নিতে হবে। তারপর হাত বাড়ালেই পাবে।'

শ্যাডোকে পদ্ধতিটা দেখাল ও।

এবার ধরতে পারল শ্যাডো।

তীব্র মাথা ব্যথায় চোখ খুলতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে শ্যাডোর, মুখের ভেতরটা মনে হচ্ছে যেন বালি দিয়ে তৈরি। চোখ পিটপিট করে সূর্যের দিকে তাকাল ও। রান্নাঘরের টেবিলে মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। পরনে রাতের পোশাকটাই, কেবল টাইটা খুলেছে।

সিঁড়ি বেয়ে নিচতলায় নামল ও, মর্গে এসে অজ্ঞাতনামা লাশটাকে ওখানেই দেখতে পেয়ে ফেলল স্বস্তির নিঃশ্বাস। উপরে কার যেন হাঁটা-চলা করার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। উপরে ফিরে এসে দেখে, মি. ওয়েনসডে রান্নাঘরের টেবিলে বসে আছেন। রাতের বেঁচে যাওয়া খাবার খাচ্ছেন তিনি। পরনে একটা ধূসর স্যুট, সাদা শার্ট আর ধূসর টাই। সকালের আলো পড়ে ঝিকঝিক করে উঠছে গাছের আকৃতির টাইপিন। শ্যাডোকে দেখে হাসলেন তিনি।

'আহ, শ্যাডো। বাছা আমার। তুমি জেগে আছ দেখে ভালো লাগছে। ভেবেছিলাম ঘুম আর ভাঙবেই না!'

'পাগলা সুইনি মারা গিয়েছে।' বলল শ্যাডো।

'শুনেছি,' বললেন ওয়েনসডে। 'দুঃখের খবর। তবে শেষ পর্যন্ত মরতে হবে আমাদের সবাইকে।' কাল্পনিক একটা দড়ি ধরল সে, ভান করল যেন চোখ বেরিয়ে আসবে সকেট থেকে; জিহ্বা বেরিয়ে এসেছে। 'নাস্তা খাবে?' হাতের খাবারটুকু এগিয়ে ধরল লোকটা।

'নাহ, দরকার নেই।' হলের দিকে একনজর তাকাল শ্যাডো। 'আইবিস আর জ্যাকুয়েলকে দেখেছেন?'

'দেখেছি। ওরা মিসেস লিলা গুডচাইল্ড না কাকে যেন কবর দিতে গিয়েছে। তোমার সাহায্য পেলে খুশি হতো, তবে আমি ওদেরকে জানালাম-আজ লম্বা সময় গাড়ি চালাতে হবে তোমাকে। তাই পারবে না।'

'আমরা বেরোচ্ছি?'

'এক ঘণ্টার মাঝে।'

'ওদেরকে বিদায় জানালে পারলে ভালো হতো।'

'ওসব বিদায়-টিদায় বাজে কথা। আবার দেখা হবে তোমাদের, এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই!'

সেই প্রথম রাতের পর, এই প্রথমবারের মতো বাদামী বিড়ালটাকে দেখতে পেল শ্যাডো। বাদামী চোখজোড়া দিয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে ওটা।

বিনা বাক্যব্যয়ে ফিউনারেল পার্লার থেকে বিদায় নিল শ্যাডো। ঝোপঝাড়গুলো এখনও বরফে ছাওয়া। পথটাও পিচ্ছিল।

পথ দেখিয়ে রাস্তায় পার্ক করে রাখা একটা সাদা শেভি নোভার কাছে শ্যাডোকে নিয়ে গেলেন ওয়েনসডে। সদ্য পরিষ্কার করা হয়েছে গাড়িটাকে, উইসকনসিনের নাম্বার প্লেট সরিয়ে লাগান হয়েছে মিনেসোটার প্লেট। পিছনের সীটটা ওয়েনসডের বাক্স-পেটরা দিয়ে ভর্তি। বাড়তি চাবি দিয়ে দরজা খুললেন তিনি।

'আমি চালাচ্ছি,' বলল ওয়েনসডে। 'এক ঘণ্টার আগে তুমি কিছুই করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

উত্তর দিকে এগোল ওরা, মিসিসিপিকে বাঁ দিকে রেখে।

শ্যাডো বুঝতে পারল, ফিউনারেল পার্লারে খুব অল্প কিছু সময়ের জন্য থাকতে পেরেছে ও। কিন্তু কেন জানি এখনই মনে হচ্ছে, অনেক অনেক দিন আগের কোন ঘটনা ওটা।

পর্ব দুই

আমার আইনসেল

অধ্যায় নয়

...আর ধ্বংসস্তূপের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয় পৌরাণিক চরিত্ররা...

–ওয়েনডি কোপ, 'আ পুলিশম্যান্স লট'

ইলিনয় থেকে বেরোবার পথে, সন্ধ্যার দিকে শ্যাডো প্রথম প্রশ্নটা করল। উইসকনসিনে স্বাগতম-লেখা সাইনটা নজরে আসার পর জানতে চাইল, 'পার্কিং-লটে আমাকে অপহরণকারী লোকগুলো কারা? এই মি. উড আর মি. স্টোনের পরিচয় কী?'

গাড়ির হেডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে শীতের অধিকারে থাকা চারপাশ। ওয়েনসডে আগেই জানিয়েছেন, ফ্রি-ওয়েতে ওঠা যাবে না। এই ফ্রি-ওয়েরা কোন দলে আছে, তা এখনও জানেন না তিনি। তাই পার্শ্ব-রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাতে হচ্ছে শ্যাডোকে। অবশ্য তাতে কিছু মনে করেনি সে, ওয়েনসডে যে মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ সেটাই নিশ্চিত হতে পারেনি এখনও।

ওয়েনসডে ঘোঁত করে উঠলেন। 'কিম্ভূত। বিপক্ষ দলের গুন্ডা।'

'আমার ধারণা,' বলল শ্যাডো। 'ওরা নিজেদেরকে গুন্ডা না, রক্ষাকর্তা বলে মনে করে।'

'তা তো করেই। যে যুদ্ধে দুই পক্ষই নিজেদেরকে সঠিক বলে মনে করে, তার চাইতে নির্মম যুদ্ধ আর কোনটা হতে পারে? সবচেয়ে বিপদজনক কারা জানো? যাদের ধারণা, তাদের সমস্ত পদক্ষেপ ভালোর জন্য নেয়া।'

'আর আপনি?' জানতে চাইল শ্যাডো। 'আপনি এসব কেন করছেন?'

'কারণ...আমার ইচ্ছা।' হাত বের করে হাসলেন ওয়েনসডে।

'আপনারা পালালেন কীভাবে? নাকি সবাই পারেনি?'

'পেরেছে।' উত্তর দিলেন ওয়েনসডে। 'তবে আরেকটু হলেই ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। তোমাকে অপহরণ করার জন্য সময় ব্যয় না করলে সম্ভবত পারতাম না। তবে লাভ হয়েছে আমারই। বেশ কয়েকজন এখন আমার পক্ষে!'

'আপনি কীভাবে পালালেন?'

মাথা নাড়লেন ওয়েনসডে। 'তোমাকে আমি প্রশ্ন করার জন্য টাকা দেই না, শ্যাডো। আগেও বলেছি কথাটা।'

শ্রাগ করল যুবক।

রাতটা ওরা কাটাল লা ক্রসের দক্ষিণে, একটা সুপার এইট মোটেলে।

ক্রিসমাস চলে গেল রাস্তায়, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গাড়ি চালিয়ে। খেত-খামারকে হটিয়ে জানালার ওপাশটা দখল করে নিল পাইন গাছের বন। শহরগুলোকেও এখন অনেক দূরে দূরে অবস্থিত বলে মনে হচ্ছে।

দুপুরের খাবার খাওয়ার সুযোগ এলো বিকালে, উইসকনসিনের উত্তরের একটা রেস্তোরায়। শ্যাডো নিল শুকনো টার্কি, ক্রানবেরি সস, কাঠের মতো শক্ত আলু সিদ্ধ আর সবুজ মটরশুঁটি। তবে ওয়েনসডের খাওয়ার গতি দেখে মনে হলো, আনন্দ নিয়েই খাচ্ছেন তিনি। আস্তে আস্তে খুলে গেল তার মুখ। গল্প আর ঠাট্টা করতে শুরু করলেন। ওয়েস্ট্রেস কাছে এলে তার সাথে দুষ্টামিও করলেন কিছুক্ষণ। মেয়েটা চিকন-চাকন, স্বর্ণকেশী মেয়ে; দেখে মনে হয় এখনও হাই-স্কুলে পড়ে।

'আহ, প্রিয়ে, তোমার হাতের মজাদার গরম চকলেট কি আরেক কাপ মিলবে? আর ভালো কথা, যদি বলি পোশাকটায় তোমাকে দারুণ লাগছে, তাহলে আশা করি অপরাধ নেবে না?'

উজ্জ্বল লাল-সবুজ স্কার্ট পরা মেয়েটা লাল হয়ে গেল লজ্জায়। বিশাল এক হাসি হেসে চলে গেল আরেক কাপ চকলেট আনতে।

মেয়েটার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে টার্কির শেষ টুকরাটা মুখে দিলেন ওয়েনসডে, ন্যাপকিন ব্যবহার করে দাড়ি পরিষ্কার করে নিয়ে খালি প্লেটটা ঠেলে দিলেন সামনে। 'আহ, শান্তি।' চারপাশে তাকালেন তিনি। হালকা শব্দে ক্রিসমাসের গান বাজছে পারুপাপম-পম, রাপাপম পম, রাপাপম পম।

'সময়ের সাথে অনেক কিছুই বদলায়।' আচমকা বললেন ওয়েনসডে। 'কিন্তু মানুষ...মানুষ বদলায় না। কোন কোন ধোঁকাবাজি টিকে থাকে অনন্তকাল। আবার ইতিহাস আর সময় গিলে নেয়, এমন ধোঁকাবাজিও আছে। যেমন ধরো স্প্যানিশ প্রিজনার, পিজিওন ড্রপ, ফওনি রিগ, ফিডল গেম...'

'অন্যগুলোর নাম শুনেছি,' বলল শ্যাডো। 'কিন্তু ফিডল গেমের কথা এই প্রথম শুনলাম। আমার সেলমেটও একজন প্রতারক ছিল।'

'আহ,' বললেন ওয়েনসডে, একমাত্র ভালো চোখটা আনন্দে ঝিলিক দিচ্ছে। 'ফিডল গেমের মতো ধোঁকাবাজি আর হয় না। তবে এর জন্য চাই দুজন। কৌতূহল আর লোভের উপর দাঁড়িয়ে আছে পুরো পরিকল্পনাটা। হ্যাঁ, নির্লোভ

আর সৎ মানুষকে ধোঁকা দেয়া যায় বটে, কিন্তু তাতে পরিশ্রম বেশি। পুরোটা বলি, শোন। নিজেই বুঝতে পারবে। একদম প্রথমে দরকার ভালো একটা মোটেল বা রেস্তোরা। আচমকা দেখতে পেলে, এক জীর্ণ পোশাক পরিহিত লোক খাবার খাচ্ছে। জীর্ণ হলেও, একেবারে সস্তা নয় সেই পোশাক। দেখেই বোঝা যায়, ভদ্রলোকের সময় ভালো যাচ্ছে না। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। ভদ্রলোক-ভদ্রলোক না বলে, লোকটাকে আব্রাহাম বলে ডাকি। খাওয়া শেষে যখন বিল দেয়ার সময় এলো, তখন বেচারা পড়ল বিপদে। নাহ, বিল বেশি আসেনি এই পঞ্চাশ বা পঁচাত্তর ডলার হবে। সমস্যা হলো, আব্রাহামের সাথে ওর ওয়ালেট নেই! ওটা সে ফেলে এসেছে কোন এক বন্ধুর বাড়িতে। বাড়িটা কাছেই, তাই একটু সময় পেলেই নিয়ে আসতে পারবে। ম্যানেজার সাহেব, বলল আব্রাহাম। গ্যারান্টি হিসেবে আমার এই বেহালাটা রাখতে পারেন। আমার জীবিকা এটা থেকেই আসে।'

ওয়েট্রেসকে আসতে দেখে ওয়েনসডের চেহারায় যে হাসিটা দেখা গেল, সেটা কেবল মাংসের খোঁজ পেলে মাংসাশী প্রাণিই হাসতে পারে। 'আহ! গরম চকলেট! আমার ক্রিসমাসের দেবী নিজ হাতে নিয়ে এসেছে! ভালো কথা প্রিয়ে, সময় পেলে আমাকে আরেকটু রুটি এনে দিতে পারবে?'

ওয়েট্রেসের বয়স বেশি হলে ষোলো হবে, ভাবল শ্যাডো। মেঝের দিকে তাকিয়ে গাল লাল করল মেয়েটা। কাঁপা কাঁপা হাতে চকলেটের মগ রেখে দিয়ে ঘরের অন্য দিকে চলে গেল। রেস্তোরার পাইয়ের কালেকশন যেখানে ডিসপ্লেতে রাখা আছে, সেখানে এসে একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ওয়েনসডের দিকে তাকাল। এরপর ঢুকে পড়ল রান্নাঘরে।

'বেহালার কথা বলছিলাম। জিনিসটার যে বয়স হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কয়েকটা জায়গায় চলটা ওঠাও হতে পারে। ওটাকে ম্যানেজারের হাতে তুলে দিয়ে আমাদের গোবেচারা আব্রাহাম চলে গেল তার ওয়ালেট আনতে। ঠিক সেই সময় আরেকজন স্যুট-বুট পরা ভদ্রলোক, যিনি এই মাত্র খাওয়া শেষ করেছেন, উঠে এলেন ম্যানেজারের কাছে। পুরো ব্যাপারটাই দেখছিলেন তিনি। এবার অনুরোধ করলেন আব্রাহামের রেখে যাওয়া বেহালাটা দেখার।

'ম্যানেজারের না করার প্রশ্নই ওঠে না। এই দ্বিতীয় ভদ্রলোক, যার নাম ধরা যাক ব্যারিংটন, বাদ্যযন্ত্রটা হাতে নিয়েই হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। এরপর সম্বিত ফিরে পেয়ে নব-উদ্যমে ওটা পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করলেন। তার হাবভাব দেখে মনে হলো কোন যাজক তার নবীর হাড় ধরে দেখার সুযোগ পেয়েছে! 'এটা...' অবিশ্বাসের সুরে বললেন তিনি। '...এটা তো দেখি...নাহ,

তা কী করে সম্ভব! কিন্তু...তাই তো! এটাই তো সেই...আমার বিশ্বাসই হতে চাইছে না!' বেহালার ভেতরে বাদামি কাগজে লেখা প্রস্তুতকারীর নামটা দেখালেন তিনি। তবে ওটা না হলেও এই যন্ত্রের কাঠ, বার্নিশের রঙ-এসব দেখেই নির্মাণকারীর হাতের কাজ চিনতে পারতেন বলে জানালেন।

'পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা দামি বিযনেস কার্ড বের করে আনলেন ব্যারিংটন। তিনি যে দুষ্প্রাপ্য, অ্যান্টিক বাদ্যযন্ত্রের ডিলার, সেটা ঘোষণা করছে কার্ডটা। 'এই বেহালাটা তাহলে দুষ্প্রাপ্য?' জানতে চাইল ম্যানেজার। 'অবশ্যই,' জানালেন ব্যারিংটন। চেহারা থেকে এখনও বিস্ময় যায়নি। 'ভুল না করে থাকলে, এর দাম এক লাখ ডলারের চাইতেও বেশি। তবে চোখ বন্ধ করেই পঞ্চাশ...নাহ, পঁচাত্তর হাজার নগদে দিতেও আপত্তি নেই। আমার হাতে এমনও ক্রেতা আছে যে না দেখেই জিনিসটা কিনে নেবে।' পরক্ষণেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চেহারা কালো হয়ে গেল ব্যবসায়ীর। 'আমার ট্রেনের সময় হয়ে গিয়েছে,' বলল সে। 'এখন রওনা দিলেও ধরতে পারব কিনা সন্দেহ। দয়া করে এই অমূল্য বাদ্যযন্ত্রের মালিক এলে তাকে আমার কার্ডটা দেবেন।' বলে বিদায় নিল ব্যারিংটন। সময় আর ট্রেন যে কারও জন্য অপেক্ষা করে না-সেটা তার ভালো করেই জানা আছে।

'এদিকে ম্যানেজার কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কৌতূহল আর লোভ আস্তে আস্তে দখল করে নিচ্ছে ওর মন-মনন। নতুন একটা পরিকল্পনা ডাল-পালা ছড়াতে শুরু করেছে মনে। এদিকে সময় বয়ে চলছে, আব্রাহামের কোন পাত্তা নেই। অনেকক্ষণ পর হাঁপাতে-হাঁপাতে এলো লোকটা, ওয়ালেটটা উঁচু করে ধরে আছে। পোশাকের মতো ওয়ালেটের অবস্থাও খুব একটা ভালো না, কোন দিন একশ ডলারের বেশি কিছু ওতে ছিল বলে মনে হয় না। টাকা বের করে খাবারের দাম চুকিয়ে দিল সে, হাত বাড়াল বেহালা নেবার জন্য।

'বেহালা ফিরিয়ে দিল ম্যানেজার। আব্রাহাম এমনভাবে ওটাকে জড়িয়ে ধরল, যেভাবে কোন ছোট বাচ্চাকে তার মা জড়িয়ে ধরে। 'আচ্ছা,' বলল ম্যানেজার, বুক পকেটে রেখে দিয়েছে দামি বিযনেস কার্ডটা, যেটার মালিক চাইলেই ওকে পঁচাত্তর হাজার ডলার দিতে পারে। 'এরকম একটা বেহালার দাম কত হবে? আমার ভাতিজি চেয়েছে, ওর জন্মদিনও সামনে।'

''এই বেহালার দাম জানতে চাইছেন?' বলল আব্রাহাম। 'আমি তো এটা জান গেলেও বিক্রি করব না। বিশ বছর ধরে এই দেশের প্রতিটা স্টেটে আমি একে নিয়ে গান শুনিয়েছি। যখন কিনেছিলাম, তখন গুণতে হয়েছিল মাত্র পাঁচশ ডলার।'

'মনের হাসি মুখে ফুটে উঠতে দিল না ম্যানেজার। 'পাঁচশ ডলার? যদি এখন নগদে এক হাজার ডলার দিতে চাই, তাহলেও বেচবেন না?'

'বেহালা-বাদককে প্রথমে আনন্দিত মনে হলো, এরপর বিমর্ষ। বলল, 'আমি বেহালা বাজাই, এছাড়া আর কোন কাজ জানি না। এই বেহালা আমাকে চেনে, আমাকে ভালোবাসে। প্রেমিকার দেহের চাইতেও ভালোভাবে এর প্রতিটা বাঁক আমার চেনা। চোখ বন্ধ করেও বাজাতে বেগ পেতে হবে না। এরকম আরেকটা পাব কোথায়? এক হাজার ডলার বেশ বড় একটা অঙ্ক। কিন্তু নিজের জীবিকার কথাও আমাকে ভাবতে হবে। এক কেন, পাঁচ হাজার ডলার দিলেও বিক্রি করব না।'

'লাভের অঙ্ক যে কমে আসছে, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে ম্যানেজার। কিন্তু নাই মামার চাইতে, কানা মামা ভালো না? আর তাছাড়া, টাকা খরচ করা ছাড়া কি টাকা বানানো যায়? 'আট হাজার ডলার দেব,' বলল সে। 'জানি, দামটা মাত্রাতিরিক্ত বেশি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জিনিসটা আমার পছন্দ হয়েছে। ভাতিজিকে দেব যখন, পছন্দের জিনিসটাই দেই।'

'ভালোবাসার যন্ত্রটাকে হারাতে হবে বলে কান্নায় যেন ভেঙে পড়বে আব্রাহাম। কিন্তু আট হাজার ডলারকে না বলার সামর্থ্য নিয়ে জন্মায় কয় জন? লোকটার এই অবস্থা দেখে ওর চোখের সামনেই দেয়ালের সেফ থেকে আট না...নয় হাজার ডলার বের করল ম্যানেজার। 'আপনি আসলে মানুষ নন,' ধন্যবাদ জানাতে জানাতে যেন মুখে ফেনা তুলে ফেলবে আব্রাহাম। 'ফেরেশতা! কথা দিন, আমার বেহালার খুব যত্ন নেবেন! এই বলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেহালা তুলে দিল ম্যানেজারের হাতে।'

'যদি ম্যানেজার সৎ হয়?' জানতে চাইল শ্যাডো। 'আব্রাহাম ফিরে আসামাত্র ওকে ব্যারিংটনের কার্ড দিয়ে দেয়?'

'তাতেই বা এমনকী ক্ষতি? দুইটা ডিনারের খরচই তো যাবে পকেট থেকে।' বললেন ওয়েনসডে। তরকারির অবশিষ্টাংশটুকু রুটি দিয়ে খেলেন তিনি।

'আব্রাহাম এরপর নয় হাজার ডলার নিয়ে চলে যাবে, ট্রেন স্টেশনের পার্কিং-লটে সে আর ব্যারিংটন ভাগাভাগি সেরে নেবে।' বলল শ্যাডো। 'এরপর ব্যারিংটনের গাড়িতে চড়ে বিদায় নেবে শহর থেকে। যে গাড়ির বুট সম্ভবত একশ ডলার দামের বেহালা দিয়ে ভর্তি!'

'আমি বেহালা প্রতি পাঁচ ডলারের চাইতে বেশি খরচ করার পক্ষপাতী নই।' ফিরে আসা ওয়েট্রেসের দিকে ফিরলেন ওয়েনসডে। 'আচ্ছা প্রিয়ে, আমাদেরকে সুন্দর করে বলো তো, ডেজার্ট হিসেবে কী কী বিক্রি করো তোমরা?' এমনভাবে

মেয়েটার দিকে তাকালেন তিনি, যেন ডেজার্ট হিসেবে তাকেই চাচ্ছেন। কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করল শ্যাডো। পুরো দৃশ্যটাকে মনে হচ্ছে যেন কোন শিকারি পশুর খাবার ধরার দৃশ্য। যেন কোন হিংস্র নেকড়ে তাকিয়ে আছে বাচ্চা একটা হরিণের দিকে। বেচারা হরিণ ভয়ে নড়ার সাহসটা পর্যন্ত পাচ্ছে না।

আবারও লাল হয়ে গেল মেয়েটা, আপেল পাই আছে বলে জানাল ওদেরকে। এক দৃষ্টিতে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে ওয়েনসডে জানালেন-ও যা দেবে, তিনি তাই খাবেন। শ্যাডো মানা করল, কিছু লাগবে না ওর।

'প্রতারণার ইতিহাসে,' বলল ওয়েনসডে। 'ফিডল গেম অনেক পুরনো এক ফুটনোট। ঠিক মতো পরিকল্পনাটা কাজে লাগাতে পারলে আমেরিকার যেকোন স্টেটে টাকা কামানো সম্ভব। তবে আমার সবচেয়ে পছন্দেরটা হলো দ্য বিশপ গেম। কী নেই ওতে? উত্তেজনা, ধোঁকাবাজি, সম্ভাবনা আর চমক, সব আছে। একটু গুছিয়ে নিলে এখনও মাঝে-সাঝে...' কী যেন ভাবলেন তিনি, তারপর মাথা নাড়লেন। 'নাহ, এখন আর ওসব চলবে না। যদি সালটা হতো ১৯২০, তাহলে মোটামুটি আকারের শহর যেমন শিকাগো বা নিউইয়র্কে... আচ্ছা, খুলেই বলি।

'আমরা বেছে নেব একটা জুয়েলারির দোকান। যাজকের পোশাক পরিহিত এক লোক প্রবেশ করল দোকানে। যেন-তেন যাজক না কিন্তু, একজন বিশপ। খুব সুন্দর দেখতে একটা হীরার নেকলেস বেছে নিল সে। দাম চুকালো একশ ডলারের কড়কড়ে এক ডজন নোট দিয়ে।

'একদম উপরের নোটটার সবুজ কালি কিছুটা উঠে গিয়েছে। দোকান মালিক তাই বারবার ক্ষমা চেয়ে নোটটা নিয়ে গেল পাশের ব্যাঙ্কে জাল কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে চায়। কিছুক্ষণের মাঝেই ফিরে এলো দোকানের কর্মচারী। ব্যাঙ্কের মতে যে একটাও নকল না, সেটা জানাল। দোকান মালিক ক্ষমা চাইল আবার, কিন্তু বিশপ হাসল শুধু। এরকমটা হতেই পারে! বর্তমান দুনিয়াতে এমন অনেকেই আছে, যারা আইনকে থোড়াই তোয়াক্কা করে। বাজে মহিলাদের কথা তো বলাই বাহুল্য। নরক থেকে উঠে আসা দানবরা দখল করে নিয়েছে সবকিছু। কথা বলতে বলতে নেকলেসটা কেসে ঢুকিয়ে রেখেছে দোকান-মালিক। একজন বিশপ কেন বারো শ ডলার দামি নেকলেস কিনতে চাইবে, তা মাথায় ধরছে না ওর! আর কিনলেও কেনই বা নগদ টাকা দিয়ে কিনবে?

'হাসিমুখে বিদায় নিল বিশপ। কিন্তু রাস্তায় নামার সাথে সাথে কাঁধে চেপে বসল ভারী একটা হাত। 'আরে সোপি, আবার চুরি-চামারি শুরু করেছ?' ঘাড়

ঘুরিয়ে এক পুলিশকে দেখতে পেল সে। দেখে আইরিশ মনে হয়, বিশপকে সাথে নিয়ে আবার জুয়েলারির দোকানে প্রবেশ করল লোকটা।

'বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাইছি।' বলল পুলিশ অফিসার। 'এই লোকটা কি কিছু কিনেছে?''না, কিনিনি।' বিশপ বলল। 'ঠিক বলেছি না?''অবশ্যই কিনেছেন,' বলল জুয়েলার। 'একটা হীরার নেকলেস নগদ টাকা দিয়ে কিনেছেন।''নোটগুলো আছে?' জানতে চাইল পুলিশ।

'দোকান মালিক তাই বারোটা একশ ডলারের নোট বের করে আনল। আলোর বিপরীতে নোটগুলো ধরে মাথা নাড়ল। 'সোপি, সোপি,' বলল সে। 'এত ভালো এর আগে বানাতে পারোনি। আসলেই, দক্ষ প্রতারক তুমি।'

'বিশপের চেহারায় সন্তুষ্টির হাসি ফুটে উঠল। 'তুমি কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না।' বলল লোকটা। 'ব্যাঙ্কও বলেছে, আমার কাজ ওদের সমমানের। ওগুলো আসল।''বলেছে হয়তো,' একমত হলো পুলিশ। 'কিন্তু ওরা তো আর জানে না যে সোপি সিলভেস্টার এখন শহরে। ডেনভার আর সেন্ট লুইসে তুমি যে জাল নোটগুলো আসল বলে চালিয়ে দিয়েছ, সেগুলোও দেখেনি।' হাত বাড়িয়ে বিশপের পকেট থেকে নেকলেস বের করে আনল পুলিশ। 'পঞ্চাশ সেন্ট দামের কাগজ আর কালির বিনিময়ে কিনেছ বারো শ ডলার দামি নেকলেস! তার উপর ধরেছ বিশপের ভেক! তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।' এই বলে নকল বিশপের হাতে পরিয়ে দিল হাতকড়া। টাকা আর নেকলেস, দুটোই একটা ব্যাগে ভরে নিল। তবে চলে যাবার আগে দোকান মালিককে রশিদ দিল একটা। জানাল-প্রমাণ হিসেবে সব নিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। কাজ শেষ হলেই ফিরিয়ে দেয়া হবে।'

'টাকাগুলো কি আসলেই জাল?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'একদম না! ব্যাঙ্ক থেকে সদ্য তোলা নোট হবে ওগুলো। আঙুলের সাথে থুথু মাখিয়ে একটু ঘষব কেবল।'

কফির কাপে চুমুক দিল শ্যাডো। জেলখানার কফিও এতো খারাপ ছিল না। 'পুলিশটাও নকল, সেটা তো বুঝতেই পারছি। নেকলেসের কী হবে?'

'ওটা তো প্রমাণ!' মুচকি হাসলেন ওয়েনসডে। লবণের পাত্রটার মুখ খুলে, কিছু লবণ ফেললেন টেবিলে। 'দোকান মালিকের ধারণা, সোপির কেসটা আদালতে উঠলেই নেকলেস ফিরে পাবে। এরইমাঝে কীভাবে রসিয়ে রসিয়ে গল্পটা সবাইকে বলবে, সেটা ভাবতে শুরু করেছে সে। এদিকে বিশপ আর পুলিশ অফিসার বের হয়ে যাবে দোকান থেকে, সাথে থাকবে বারো শ ডলার আর একটা হীরার নেকলেস!'

টেবিল পরিষ্কার করার জন্য ফিরে এলো ওয়েট্রেস। 'আচ্ছা প্রিয়,' জানতে চাইলেন ওয়েনসডে, 'তুমি কি বিবাহিতা?'

মাথা নেড়ে না করল মেয়েটা।

'কী আশ্চর্য! তোমার মতো একজন সুন্দরী মেয়ে এখনও অবিবাহিতা থাকে কী করে!' টেবিলের ফেলা লবণের উপর ঘুরে-বেড়াচ্ছিল তার হাত। এটা-সেটা আঁকছিলেন তিনি, অনেকটা রুনের মতো দেখাচ্ছিল সেগুলো। ওয়েট্রেস মেয়েটা দাঁড়িয়ে রইল তার পাশে।

ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন ওয়েনসডে, 'তোমার শিফট শেষ হয় কখন?'

'নয়টায়,' ঢোক গিলতে গিলতে বলল মেয়েটা। 'খুব দেরী হলে সাড়ে-নয়টায়।'

'এখানকার সবচেয়ে ভালো মোটেলের নাম কী?'

'মোটেল সিক্স আছে।'

মেয়েটার হাত আলতো করে স্পর্শ করলেন ওয়েনসডে, লবণের কয়েকটা দানা পড়ল হাতে। ওগুলো মোছার কোন চেষ্টাই করল না ওয়েট্রেস। 'আমাদের জন্য,' এমন স্বরে বললেন ওয়েনসডে যে শোনাটা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। 'মোটেল সিক্স হবে সুখের প্রাসাদ।'

একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মেয়েটা। এরপর ঠোঁট কামড়ে ধরে নড করল একবার। পরক্ষণেই পালিয়ে গেল রান্নাঘরে।

'মেয়েটা তো বাচ্চা!' বলল শ্যাডো। 'ওর সাথে শোয়াটা মনে হয় না আইন অনুমোদন করবে।'

'আইন নিয়ে আমি খুব একটা মাথা ঘামাই না,' ওয়েনসডে বললেন। 'আর তাছাড়া আমার মেয়েটাকে দরকার। আসলে ঠিক মেয়েটাকে না, দরকার একজন কুমারীকে। দেহে রক্তের বান ডাকতে কুমারীর জুড়ি নেই। সকালের আগে আমাকে বিরক্ত করো না।'

ঈগল পয়েন্টের মোটেল কর্মচারী মেয়েটাও কি কুমারী ছিল? ভাবল শ্যাডো। 'আপনার ভয় হয় না? রোগ-শোক হয়ে যেতে পারে।' জানতে চাইল ও। 'অথবা যদি মেয়েটা পেট বাঁধিয়ে ফেলে? যদি ওর কোন ভাই থেকে থাকে?'

'না,' বললেন ওয়েনসডে। 'আমি রোগ-টোগকে ভয় পাই না। ওসব আমার হয় না। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আমার মতো যারা আছে, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'অনুর্বর' হয়ে থাকে। তাই পেট বাঁধাবার ঝুঁকিও কম। আগে অনেক হতো, এখন প্রায় অসম্ভব। আর অনেক মেয়েরই বাপ-ভাই থাকে। তাতে কি? প্রায় সব ক্ষেত্রেই ওরা যখন আমাকে খুঁজতে আসে, তখন আমি আর শহরেই নেই!'

'এখানে তাহলে আমরা রাত কাটাচ্ছি?'

'আমি মোটেল সিক্সে থাকব,' বলে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা তামাটে রঙের চাবি বের করলেন। একটা ঠিকানা লেখা আছে ওতেঃ৫০২,

নর্থরিজ রোড, অ্যাপার্টমেন্ট ৩। 'তোমার জন্য অনেক দূরের একটা শহরে, এই অ্যাপার্টমেন্টটা অপেক্ষা করছে।' ক্ষণিকের জন্য চোখ বন্ধ করলেন ওয়েনসডে। কী যেন ভেবে বললেন, 'গ্রেহাউন্ড বাস আসবে আর বিশ মিনিট পর। গ্যাস স্টেশনে থামবে ওটা। এই নাও তোমার টিকিট।' একটা ভাঁজ করা টিকিট বের করে টেবিলের উপর রাখলেন তিনি। ওটা তুলে নিয়ে দেখল শ্যাডো।

'মাইক আইনসেল কে?' টিকিটে লেখা নামটা পড়ে জানতে চাইল ও

'তুমি। মেরি ক্রিসমাস।'

'লেকসাইড আবার কোন জায়গা?'

'যেখানে তুমি সামনের কয়েকটা মাস বড় আনন্দে কাটাবে। আর যেহেতু সুখবর দল বেঁধে আসে...' পকেট থেকে একটা প্যাকেজ বের করে ওর দিকে ঠেলে দিলেন তিনি। সুন্দর করে ফিতা বাঁধা হয়েছে প্যাকেজটাতে, যেন কোন উপহার। কিন্তু শ্যাডো হাত বাড়াল না।

'কী হলো?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্যাকেজটা নিল শ্যাডো, ভেতর থেকে বের হলো ব্যবহৃত একটা বাছুরের চামড়া নির্মিত ওয়ালেট। জিনিসটা যে অন্য কারও, সেটা বুঝতেই পারছে। ভেতরে শ্যাডোর ছবিওয়ালা একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স, নামের জায়গায় লেখা-মাইকেল আইনসেল। ঠিকানা হিসেবে দেয়া মিলওয়াকির একটা বাড়ি, একটা মাস্টারকার্ডও আছে। সেই সাথে আছে বিশটা পঞ্চাশ ডলারের কড়কড়ে নোট। ওয়ালেট বন্ধ করে পকেটে ভরল শ্যাডো।

'ধন্যবাদ।'

'ক্রিসমাস বোনাস হিসেবে ধরে নাও। চলো, তোমাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি।'

রেস্তোরার বাইরে চলে এলো ওরা, গত কয়েক ঘণ্টায় তাপমাত্রা আরও অনেক কমে এসেছে। এখন এতটাই ঠান্ডা যে তুষারপাত হওয়াটাও সম্ভব না।

'আছা, ওয়েনসডে। আপনার বলা দুই প্রতারণার দুটাতেই দুই জন লোক দরকার। আগে কোন পার্টনার ছিল নাকি?' শ্যাডোর নিঃশ্বাস যেন বের হবার আগেই বাষ্পে পরিণত হচ্ছে। নিজেকেই শোনাল, লেকসাইডে পা রেখেই প্রথমে সবচেয়ে মোটা আর সবচেয়ে উষ্ণ কোট কিনতে হবে।

'হ্যাঁ,' বললেন ওয়েনসডে। 'পার্টনার একজন ছিল। আমার তুলনায় বয়সও কম ছিল ওর। কিন্তু আফসোস, সেগুলো অতীতের স্মৃতি। যাই হোক, আমরা গ্যাস স্টেশনে এসে পড়েছি। ভুল না দেখলে, ওই যে ওখানে তোমার বাস দাঁড়িয়ে আছে।' বাসটা এরইমাঝে ছাড়ার সংকেত দিচ্ছে। 'ঠিকানা চাবির সাথেই লেখা আছে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তো বলবে, আমি তোমার চাচা। আমার নাম এমারসন বোরসন। এবার যাও, লেকসাইডে আরাম করে আস্তানা

গেঁড়ে বসো, ভাতিজা আমার। আমি এক সপ্তাহ পর আসছি। তারপর আবার একত্রে ভ্রমণ শুরু হবে আমাদের। এই কটা দিন মাথা নিচু করে থেকো।'

'আমার গাড়ির কী হবে?'

'আমি দেখে শুনে রাখব।' বলে ডিয়ে দিলেন ওয়েনসডে। করমর্দন করল শ্যাডো। লোকটার হাত মৃত লাশের চাইতেও বেশি ঠান্ডা বলে মনে হলো ওর।

'হায় ঈশ্বর,' বলল শ্যাডো। 'আপনি তো জমে যাচ্ছেন!'

'তাহলে যত তাড়াতাড়ি মোটেল সিক্সের বিছানাটা ওই কুমারী মেয়ে দিয়ে গরম করাতে পারি, তত ভালো।' বলে অন্য হাত দিয়ে শ্যাডোর কাঁধে আলতো করে চাপ দিলেন তিনি।

দ্বৈত-দৃষ্টি পেয়ে বসল শ্যাডো। সামনে একজন বয়স্ক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে, ওর কাঁধে হাত দিয়ে চাপ দিচ্ছেন। আবার একই সাথে শত শত শীতকাল ও ধূসর চুলের হ্যাট পরা এক বৃদ্ধকেও দেখতে পেল। লোকটা হাতে ছড়ি নিয়ে এক বসতি থেকে অন্য বসতিতে যাচ্ছেন। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখছেন আগুনের দিকে, দেখছেন এমন এক জীবনের নাট্যায়ন যা কখনও স্পর্শ...কখনও উপভোগ করতে পারবেন না।

'যাও,' বললেন ওয়েনসডে, হুংকারের মতো শোনার তার কণ্ঠ। 'সব ঠিক আছে, ছিল আর সামনেও থাকবে।'

বাস-চালক মহিলাকে নিজের টিকিট দেখাল শ্যাডো। 'খুব বাজে দিনে বাইরে বেরিয়েছেন।' বলল মহিলা। এরপর দিনটার তাৎপর্যের কথা মনে পড়তেই হেসে বলল, 'মেরি ক্রিসমাস।'

বাসটা মোটামুটি ফাঁকাই। 'আমরা কখন লেকসাইডে পৌঁছাব?'

'দুই ঘণ্টা, একটু বেশিও লাগতে পারে।' উত্তর দিল মহিলা। 'খুব ঠান্ডা পড়েছে।' বলে একটা সুইচ টিপল সে, হিসহিস শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

বাসের মাঝামাঝি গিয়ে বসল শ্যাডো, সিটটা যথাসম্ভব পেছনে ঠেলে দিল। বাসের উষ্ণতা আর হালকা দুলুনিতে ঘুম পেয়ে গেল ওর। চোখ বন্ধ হয়ে আসছে টের পাবার আগেই হারিয়ে গেল ঘুমের অতলে।

দুনিয়ায়...তবে দুনিয়ার অভ্যন্তরের সেই জায়গাটায় আবিষ্কার করল শ্যাডো নিজেকে। দেয়ালের চিহ্নগুলো দেখে ভেজা লাল কাদা বলে মনে হচ্ছে। হাতের ছাপ, আঙুলের ছাপ আর এখানে সেখানে অদক্ষ হাতের আঁকা পশু, পাখি ও মানুষের ছবি পড়ছে নজরে।

এখনও জ্বলছে অগ্নিকুণ্ড, এখনও ওটার ওপাশে বসে আছে মহিষ-মানব। বড় বড় চোখে শ্যাডোর দিকে তাকিয়ে আছে সে। ঠোঁটগুলো লোম

দিয়ে ঢাকা। মহিষ-মানব কথা বলে উঠলেও, নড়ল না ওগুলো। 'শ্যাডো, এখন বিশ্বাস হয়েছে তো?'

'আমি ঠিক জানি না,' বলল শ্যাডো। ওর ঠোঁটও নড়েনি কথা বলার সময়, ব্যাপারটা ধরতে পারল। দুজনের এই আলাপচারিতায় বাক্য বিনিময় হচ্ছে না কোন। 'তুমি কি আসল?'

'বিশ্বাস রাখো,' কেবল এতটুকুই বলল মহিষ-মানব।

'তুমি কি...' ইতস্তত করে প্রশ্নটা করেই ফেলল শ্যাডো। 'দেবতা?'

আগুনের ভেতর এক হাত বাড়িয়ে দিল মহিষ-মানব, বের করে আনল উত্তাপে লাল হয়ে যাওয়া একটা ব্র্যান্ড। তালুর ঠিক মাঝখানে ধরে রেখেছে ওটাকে, নীল আর হলদে আগুন উড়ছে তার লালচে হাতকে ঘিরে। তবে কিছু জ্বালাচ্ছে বলে মনে হলো না।

'এই দেশটা দেবতাদের জন্য নয়।' বলল সে। কিন্তু নাহ, মহিষ-মানব নয়, শ্যাডোর স্বপ্নে কথা বলে উঠেছে খোদ অগ্নিকুণ্ড। 'এক সাঁতারু একে সমুদ্রের তলদেশ থেকে তুলে এনেছে। একে বানিয়েছে এক মাকড়সা, এতে মলত্যাগ করেছে এক দাঁড়কাক। এই দেশ আসলে একটা পতিত পিতার দেহ, যার হাড়গুলো হলো পাহাড় আর যার চোখগুলো হ্রদ।

'এই দেশ, স্বপ্ন আর আগুনের দেশ।' আগুন জানাল ওকে।

আগুনের ভেতর ব্র্যান্ডটাকে আবার রেখে দিল মহিষ-মানব।

'আমাকে এসব বলছ কেন?' প্রশ্ন করল শ্যাডো। 'আমি তো গুরুত্বপূর্ণ কেউ নই। আমি একেবারে তুচ্ছ। এককালে ছিলাম ব্যায়ামবিদ, এরপর ছিঁচকে চোর। স্বামী হিসেবেও নিজেকে খুব একটা সফল বলে দাবী করতে পারি না...' মিইয়ে এলো ওর কণ্ঠ।

'লরাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি আমি?' আচমকা মহিষ-মানবের কাছে জানতে চাইল শ্যাডো। 'আবার বাঁচতে চায় সে। বলেছিলাম, আমি সাহায্য করব। এটুকু অন্তত ওর প্রাপ্য।'

কিছুই বলল না মহিষ-মানব।গুহার ছাদের দিকে ইঙ্গিত করল সে, শ্যাডোও তাকাল সেদিকে। ছাদের একটা ছোট গর্ত দিয়ে হালকা আলো ভেসে আসছে।

'ওখানে?' জানতে চাইল শ্যাডো। 'ওখানে যেতে হবে?'

আচমকা স্বপ্নটা ভিন্ন দিকে মোড় নিল। পাথর আর মাটি ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গেল শ্যাডো, যেন ও কোন ছুঁচো! বার বার চেষ্টা করছে মাটি সরিয়ে উঠে আসার। যেন সে কোন ব্যাজার, চাইছে মাটি ভেদ করে উঠে আসছে। অথবা কোন ভালুক, যে দুহাতে ঠেলে সরাতে চাইছে মাটি। তবে পৃথিবী কোন অবলা নারী নয়; শক্ত, ঘন মাটি আরও শক্ত

করে আঁকড়ে ধরছে ওকে। শ্যাডো বুঝতে পারছে, অচিরেই মারা যাবে সে। দুনিয়ায়...তবে দুনিয়ার অভ্যন্তরে কোথাও রচিত হবে ওর কবর।

যথেষ্ট শক্তি নেই ওর দেহে, আস্তে আস্তে কমে আসছে প্রতিরোধ। সে জানে–এখন যদি দম নেয়া বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে মারা যাবে পৃথিবীর বুকে চলতে থাকা বাসে বসা ওর দেহটাও।

বৃথা প্রচেষ্টা চালাল আরও কয়েকবার, কিন্তু প্রতিবারই আরও কমে আসছে তার প্রচণ্ডতা। প্রতিটা নড়াচড়া খেয়ে নিচ্ছে অমূল্য বাতাস। ফাঁদে আটকা পড়েছে ও, না যেতে পারছে সামনে আর ধরতে পারছে ফিরতি পথ।

‘দরকষাকষি করবে না?’ শ্যাডোর মনের ভেতর বলে উঠল কেউ।

‘কী নিয়ে করব?’ পাল্টা প্রশ্ন করল শ্যাডো। ‘দেয়ার মতো তো আমার কিছু নেই।’ মাটির স্বাদ এখন মুখের ভেতরে অনুভব করতে পারছে ও। ‘কেবল নিজেকে বাদে।’

দম বন্ধ করে বলল সে, ‘আমি নিজেকেই উৎসর্গ করলাম।’

ফল পাওয়া গেল সাথে সাথে। চারপাশের পাথর আর মাটি এমনজোরে চাপ দিতে শুরু করল যে ফুসফুস থেকে শেষ বাতাসটুকুও বেরিয়ে গেল পলকেই। চারপাশের চাপ এখন ব্যথায় পরিণত হয়েছে। কষ্টের শেষ সীমায় পৌঁছে গেল শ্যাডো, আর সহ্য করা সম্ভব না। ঠিক সেই মুহূর্তেই কমে গেল চাপ, বুক ভরে মিষ্টি বাতাস টেনে নিল সে। ছাদের থেকে আসা আলোটা আরও উজ্জ্বল...আরও বড় হয়ে উঠেছে।

ভূ-পৃষ্ঠের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে ওকে।

পরবর্তী চাপের সাথে তাল মেলাবার প্রয়াস পেল শ্যাডো, সফলও হলো।

এবারের চাপটা নিয়ে এলো আগের চাইতেও তীব্র ব্যথা। শ্যাডোর মনে হলো যেন কেউ ওকে নিয়ে খেলছে। হাতের মুঠোয় নিয়ে চাপ দিচ্ছে সর্বশক্তিতে, দেহের প্রতিটা হাড় যেন ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে, মাংসের তালে পরিণত হবে আরেকটু হলেই। ওর মুখ আর মাথাটা গর্ত থেকে বের হওয়া মাত্র ফুসফুসের সবটুকু বাতাস খরচ করে চিৎকার করে উঠল শ্যাডো, ব্যথায়...ভয়ে।

চিৎকার করতে করতেই ভাবল, বাসে বসা ওর দেহটাও কি চিৎকার করছে?

আরেকবার চাপ দিয়ে মাটি উগড়ে দিল শ্যাডোর দেহটাকে, হাত দিয়ে লাল মাটি আঁকড়ে ধরল বেচারা। কোনক্রমে নিজেকে টেনে তুলল, চেহারা থেকে হাত দিয়ে মুছে ফেলল মাটি। আকাশের দিয়ে তাকিয়ে

দেখে, এখন গোধূলি বেলা। তারাগুলো একে একে উঁকি দিচ্ছে। এমন উজ্জ্বল তারা আগে কখনও দেখেনি শ্যাডো।

'অচিরেই,' আগুনের গমগমে কণ্ঠ পেছন থেকে ভেসে এলো। 'এদের পতন হবে। তারার মানুষের সাথে দেখা হবে মাটির মানুষের। তাদের মাঝে জন্ম নেবে বীরেরা, জন্ম নেবে দানব-হত্যাকারী মানব, চোখ খুলে দেখবে জ্ঞানীরা। এদের কেউ কিন্তু দেবতা হবে না। এই দেশটা দেবতাদের জন্য নয়।'

এক দমকা বাতাস, তীব্র ঠান্ডায় যা অবাক করে দেয়, শ্যাডোর চেহারা স্পর্শ করল। মনে হলো যেন বরফ-শীতল পানিতে চুবিয়েছে কেউ ওকে। চালকের কণ্ঠ শুনতে পেল ও, পাইনউডে এসেছে। 'কারও যদি সিগারেট খাবার বা একটু হাঁটাহাঁটি করার দরকার হয়, তাহলে করে নিন। আমরা এখানে মিনিট দশেক থামব।'

বাস থেকেনামল শ্যাডো। অবিকল আগেরটার মতোই একটা গ্রাম্য স্টেশনে এসে থেমেছে বাসটা। চালক দুজন টিনেজ মেয়েকে বাসে উঠতে সাহায্য করছে। ওদের লাগেজগুলো গুছিয়ে রাখছে লাগেজ কম্পার্টমেন্টে।

'এই,' শ্যাডোকে দেখে বলল চালক। 'আপনি তো লেকসাইডে যাচ্ছেন?'

মাথা নাড়ল শ্যাডো, চোখ থেকে এখনও ঘুম যায়নি।

'জায়গাটা ভালো,' বলল মহিলা। 'মাঝে মাঝে মনে হয়, সবকিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে লেকসাইডে গিয়ে থিতু হই। অনেকদিন হলো আছেন নাকি?'

'নাহ, প্রথমবারের মতো যাচ্ছি।'

'তাহলে ম্যাবেলের প্যাস্টি খেতে ভুলবেন না, বুঝেছেন?'

ব্যাখ্যা জানতে চাইল না শ্যাডো। 'আচ্ছা,' বরঞ্চ ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল। 'ঘুমাবার মাঝে কি আমি কথা বলছিলাম?'

'কে জানে!' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জবাব দিল মহিলা। 'বললেও আমি শুনতে পাইনি। এবার বাসে ফিরে চলুন। লেকসাইডে পৌঁছে আপনাকে আমি ডাকব।'

পাইনউডে ওঠা দুই টিনেজ মেয়ে শ্যাডোর ঠিক সামনের সিটেই বসেছে। বয়স টেনে-টুনে চোদ্দ হবে। ওদের কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে, মেয়ে দুটো বান্ধবী-আত্মীয়া নয়। এদের মাঝে একজনের যৌনতার ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই, তবে পশু-পাখি সম্পর্কে জ্ঞান অনেক। অন্যজনের আবার পশু-পাখির ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই। তার পূর্ণ মনোযোগ যৌনতার উপর। আলকা-সেল্টযার ট্যাবলেট ব্যবহার করে কীভাবে মুখ-মেহনের সর্বোচ্চ আনন্দ উপভোগ করা যায়, তার বিস্তারিত বর্ণনা না চাইতেও শুনতে হলো শ্যাডোকে।

চোখ বন্ধ করে বাস চলার আওয়াজের দিকে মন দিল শ্যাডো। এখন সামনে বসা দুজনের টুকরা-টুকরা কথা কেবল ভেসে আসছে কানে। কিছুক্ষণ পরেই

ব্রেক কষে থামল বাসটা, শ্যাডোর কানে এলো মহিলা চালকের চিৎকার, 'লেকসাইড!' সেই সাথে হিসহিস শব্দে খুলে গেল বাসের দরজা। মেয়ে দুটোর সাথে নামল শ্যাডোও। একটা ভিডিও স্টোর-কাম-ট্যানিং স্যালন-কাম গ্রেহাউন্ড স্টেশনের পার্কিং-লটে পা রাখল ওরা। বাতাস হাড় জমিয়ে দেয়ার মতো ঠান্ডা, তবে তাজা। এক লহমায় ঘুম বিদায় নিল। দক্ষিণে আর পশ্চিমে দেখতে পাচ্ছে শহরটার আলো। আর পুব থেকে ঝিলিক দিচ্ছে জমে যাওয়া একটা হ্রদ।

মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে লটে, পা ঠুকছে আর ফুঁ দিয়ে হাত গরম রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে। দুজনের মাঝে যে ছোট, সে আড়চোখে তাকাল শ্যাডোর দিকে। যখন বুঝতে পারল ওর এই মনোযোগ ধরা পড়ে গিয়েছে, তখন লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল।

'মেরি ক্রিসমাস।' বলল শ্যাডো।

'হুম,' অন্যজন উত্তর দিল। প্রথম জনের চাইতে বয়স দুই-এক বছর বেশিই হবে এর। 'আপনাকেও ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা।' এই মেয়েটার মাথায় গাজর-রঙা চুল, ছোট নাকটার চারপাশে শত-সহস্র ফুটকি।

'দারুণ শহর।' বলল শ্যাডো।

'আমাদের ভালোই লাগে।' ছোটজন উত্তর দিল। এই মেয়েটাই পশু-পাখি ভালো বাসে। সে হাসতেই দাঁতে লাগান নীলচে ব্রেসগুলো দেখা গেল। 'কার মতো যেন লাগছে দেখতে।' বলল মেয়েটা। 'তুমি কি কারও ভাই বা ছেলে বা ওরকম কিছু?'

'হায়রে অ্যালিসন,' বান্ধবী বলল। 'সবাই কারও না কারও ভাই, নইলে ছেলে নইলে ওরকম কিছু।'

'আমি সেটা বোঝাতে চাইনি।' আচমকা ওদের চোখে এসে লাগল উজ্জ্বল সাদা আলো। সেই আলোর পেছনে যে একটা স্টেশন ওয়্যাগন লুকিয়ে আছে, সেটা টের পেতে একটু দেরী হলো শ্যাডোর। এক মা চালাচ্ছেন গাড়িটা। ওটা দেখা মাত্র সবকিছু গুছিয়ে নিল দুই মেয়ে। কিছুক্ষণের মাঝেই দেখা গেল, শ্যাডো একাকী দাঁড়িয়ে রয়েছে পার্কিং-লটে।

'তোমাকে সাহায্য করতে পারি?' ভিডিও স্টোরের মালিক, বুড়ো এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে জানতে চাইলেন। 'ক্রিসমাসে তো দোকান খোলা থাকে না। তবে আমি বাসটাকে দেখতে আসি, যদি তোমার মতো কোন বেচারা একা দাঁড়িয়ে থাকে আরকি!' হাসি মুখে জানালেন তিনি।

বয়স্ক চেহারাটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে শ্যাডো, তৃপ্ত একটা চেহারা। এমন একজন ওই চেহারার মালিক, যে ছাই ওড়াতে গিয়ে অমূল্য রতন পেয়েছে।

'স্থানীয় ট্যাক্সি কোম্পানির নাম্বারটা পেলেই চলবে।' বলল শ্যাডো।

'দেয়া যাবে,' সন্দিগ্ধ সুরে বললেন বৃদ্ধ। 'তবে রাতের এই সময়টায় টম ঘুমিয়ে থাকে। যদি ওকে জাগাতেও পারো, মনে হয় না এখানে টেনে আনাটা

সম্ভব হবে। সন্ধ্যা বেলায় ওকে খুব হাসি-খুশি দেখেছিলাম...একটু বেশিই হাসি-খুশি, মাতাল না হলে অমন হয় না। কোথায় যাবে?'

চাবিতে লিখে রাখা ঠিকানাটা দেখাল শ্যাডো। 'হুম,' বললেন বৃদ্ধ। 'এখান থেকে দশ...অথবা বিশ মিনিট দূরত্বে। কিন্তু এই ঠান্ডায় হাঁটতে একদম ভালো লাগার কথা না। আর অজানা কোন গন্তব্যে যাবার দূরত্বটাকেও কেন জানি বেশি বলে মনে হয়। প্রথমবার অনেক সময় লাগে, অথচ এরপর বলতে গেলে চোখের পলকে পৌঁছান যায়!'

'সত্যিই তাই,' বলল শ্যাডো। 'অবশ্য আমি এভাবে কখনও ভাবিনি।'

নড করলেন বৃদ্ধ, হাসিতে আবারও ভরে উঠল তার মুখ। 'ধুর ছাই, ক্রিসমাস আজকে। চলো, তোমাকে টেসিতে করে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

শ্যাডোর আপত্তি করার প্রশ্নই ওঠে না। বৃদ্ধের পিছুপিছু রাস্তায় চলে এলো ও, একটা বিশাল রোডস্টার গাড়ির দিকে এগোলেন তিনি। দেখে মনে হয়, সেই ১৯২০ সালের দিকে এসবেরই কোন একটায় চড়ে ঘুরে বেড়াত মাফিয়ার পাণ্ডারা। রঙটা একটু গাঢ়, তবে সোডিয়াম ল্যাম্পের আলোয় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। 'এই হচ্ছে টেসি,' পরিচয় করিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বললেন বৃদ্ধ। 'দারুণ সুন্দরী না?' আদর করার ভঙ্গিতে চাপড় বসালেন গাড়িতে।

'সুন্দরী কেন? সুন্দর হতে অসুবিধা কি?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'ওর মডেল হচ্ছে ওয়েন্ড ফনিক্স। ওয়েন্ডকে সেই একত্রিশ সালের দিকে ক্রাইসলার কিনে নিয়েছিল। এখন আর ওয়েন্ড বানানো হয় না। কোম্পানিটার গোড়াপত্তন করেছিল হার্ভি ওয়েন্ড, স্থানীয় এক ছেলে। একচল্লিশ কি বেয়াল্লিশ সালে আত্মহত্যা করে।'

গাড়ির ভেতর থেকে চামড়া আর পুরাতন সিগারেটের গন্ধ ভেসে আসছে–নতুন বলা যাবে না কোনক্রমেই। আসলে এতদিন ধরে মানুষ ওতে চড়ে ধূমপান করেছে যে গন্ধটা সিটের কাপড়ের অংশ বনে গিয়েছে। প্রথম চেষ্টাতেই খুক খুক করে কেশে উঠল টেসি।

'আগামীকাল,' শ্যাডোকে বললেন বৃদ্ধ। 'ওকে গ্যারেজে তুলে রাখব। ভালো একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দেব ওকে, বসন্ত আসার আগ পর্যন্ত শীত-নিদ্রায় থাকবে। আসলে এখনই ওকে রাস্তায় বের করাটা ঝুঁকি পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। বরফ পড়ছে যে, তাই।'

'কেন? বরফে সমস্যা হয়?'

'সমস্যা হয় না। কিন্তু এখন রাস্তায় লবণ ঢালা হচ্ছে। এমন মরচে ফেলায় ওই লবণ যে তা আর বলার না। সরাসরি অ্যাপার্টমেন্টে যেতে চাও? নাকি শহরটা একটু ঘুরে দেখবে?'

'আপনাকে ঝামেলায় ফেলতে চাই না-'

'আরে, ঝামেলা কীসের! আমার বয়সে একটু-আধটু ঘুমাতে পারলেই সবাই কৃতজ্ঞবোধ করে। এখন রাতে যদি পাঁচ ঘণ্টা ঘুম হয়, তাহলে আনন্দে বুক ভরে যায়! জাগ্রত অবস্থায় মন শুধু দৌড়াতেই থাকে...দৌড়াতেই থাকে। ইস, নিজের পরিচয়ই তো এখনও দেইনি তোমাকে। আমি হিনজেলমান। করমর্দন করতাম, কিন্তু দুই হাত স্টিয়ারিং-এ বলে পারছি না। টেসি খুব দুষ্ট, সম্পূর্ণ মনোযোগ না পেলে গাল ফুলিয়ে বসে।'

'মাইক আইনসেল,' বলল শ্যাডো। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, হিনজেলমান।'

'তাহলে চলো, তোমাকে হ্রদটাসহ পুরো শহর দেখিয়ে আনি।' বললেন হিনজেলমান।

শহরের প্রধান সড়কটা বেশ সুন্দর, এমনকি এই রাতেও তাই মনে হচ্ছে। শহরের দুটো রেস্তোরা চিনিয়ে দিলেন হিনজেলমান (একটা জার্মান আর অন্যটা বৃদ্ধের ভাষ্যমতে আংশিক গ্রিক আর আংশিক নরওয়েজিয়ান)। শ্যাডো চিনে নিল বেকারি, বইয়ের দোকান (বইয়ের দোকান ছাড়া আবার শহর হয় নাকি, এমনটাই মত হিনজেলমানের); লাইব্রেরির পাশ দিয়ে যাবার সময় টেসির গতি একটু কমালেন তিনি, শ্যাডোকে ভালোমতো ওটা দেখে নেবার সুযোগ দিলেন। দালানটার দরজায় প্রাচীন গ্যাস লাইট জ্বলজ্বল করছে। 'সেই ১৮৭০ সালে জন হেনিং, স্থানীয় ব্যারন বানিয়েছিলেন দালানটা।' গর্বিত ভঙ্গিতে বললেন তিনি। 'তার ইচ্ছা ছিল, এটাকে হেনিং মেমোরিয়াল লাইব্রেরি নাম দেবেন। কিন্তু তিনি মারা যাবার পর সবাই একে লেকসাইড লাইব্রেরি বলে ডাকা শুরু করল। দারুণ না?' ভাবখানা এমন যে নিজ হাতে ওটাকে বানিয়েছেন তিনি। দালানটাকে দেখে কেন যেন দুর্গের আদলে গড়া বলে মনে হলো শ্যাডোর। 'ঠিক ধরেছ,' ব্যাপারটা হিনজেলমানকে বলতেই তিনি একমত হলেন। 'একসময় তো টারেটও ছিল। আসলে হেনিং চেয়েছিল, বাইরে থেকে যেন লাইব্রেরিটাকে দেখতে তেমনই লাগে। ভেতরে কিন্তু আধুনিক ডিজাইনের পাইন কাঠের তাক আছে। মিরিয়াম সুল্টজ চায় পুরোটাকে ভেঙ্গে আবার নতুন করে তুলতে। কিন্তু দালানটা ঐতিহাসিক স্থানের মর্যাদা পেয়েছে বলে কিছু করতে পারছে না।'

গাড়ি চালিয়ে হ্রদটার দক্ষিণ পাশে চলে এলো শ্যাডোরা। শহরটা ঘিরে আছে হ্রদটাকে, রাস্তার থেকে প্রায় ত্রিশ-ফুট নিচে পানি। সাদা বরফের ফাঁকে ফাঁকে পানির ঝলক দেখতে পেল যুবক।

'জমে যাচ্ছে মনে হচ্ছে,' বলল ও।

'একমাস হলো জমে গিয়েছে, থ্যাংক্সগিভিং-এর পরপরই। এক রাতে জমে এই অবস্থা। আইস ফিশিং করো নাকি, মি. আইনসেল।'

'কখনও করিনি।'

'একজন পুরুষ এরচেয়ে ভালো আর কোন কাজ পাবে না। মাছ ধরাটা বড় ব্যাপার না, দিন শেষে যে মানসিক প্রশান্তি নিয়ে বাড়ি ফেরা যায় সেটা আর কোনভাবে মেলে না।'

'মনে থাকবে আমার,' টেসির জানালা দিয়ে হ্রদের দিকে তাকাল শ্যাডো। 'হাঁটা যাবে বরফের উপর দিয়ে?'

'যাবে। চাইলে গাড়িও চালানো যাবে। তবে ঝুঁকিটা নিতে চাই না। শহরে শীত নেমেছে ছয় সপ্তাহ হলো।' বলল হিনজেলম্যান। 'কিন্তু উইসকনসিনের উত্তরে আর কোন জায়গায় এত দ্রুত ঠান্ডা নামে না। এক শীতের গল্প বলি শোন। হরিণ শিকারে বেরিয়েছি, ত্রিশ...নাহ, চল্লিশ বছর আগের কথা। একটাকে গুলি করলাম, লাগাতে পারিনি। ভয় পেয়ে বেচারা জঙ্গলের দিকে দৌড় দিল। হ্রদটা পার হতে পারলেই, মুক্তি! তুমিও কিন্তু ওদিকের একটা অ্যাপার্টমেন্টেই উঠছ, মাইক। যাই হোক, এরকম স্বাস্থ্যবান হরিণ আগে দেখিনি। ছোট-খাটো একটা ঘোড়ার সমান বিশাল হবে। তখন বয়স ছিল কম, রক্ত গরম। আগের বছর হ্যালোইনের আগেই বরফ জমতে শুরু করেছিল। কিন্তু সেই বছর থ্যাংকগিভিং-এর সময়ও শীতের কোন চিহ্ন নেই। মাটিতে জমে থাকা তুষারে পরিষ্কার দেখতে পেলাম ওটার পদচিহ্ন।

'বোকা না হলে কেউ হরিণের পিছু ধাওয়া করে না। কিন্তু তখন...ওই যে বললাম...বয়স ছিল কম! আমি পিছু নিলাম। লেকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় পেলাম ওটাকে, আট কি নয় ইঞ্চি গভীর পানিতে। চুপচাপ আমার দিকে তাকিয়ে রইল ওটা। ঠিক সেই সময় সূর্যকে ঢেকে ফেলল মেঘ। ঠান্ডাও নামল সাথে সাথে। দশ মিনিটের মাঝে ত্রিশ ডিগ্রি নেমে গেল তাপমাত্রা, সত্যি বলছি! বেচারা প্রানিটা দৌড়াতে চাইল, কিন্তু পারল না। পানি বরফ হয়ে গিয়েছে যে!

'আমি ধীর পায়ে হেঁটে গেলাম ওটার কাছে! বোঝাই যাচ্ছিল, পালাবার আপ্রাণ প্রয়াস চালাচ্ছে, কিন্তু কাজ হচ্ছে না। আমার কথা আর কি বলব, অসহায় একটা প্রাণীকে গুলি করি কীভাবে বলো? তাই শটগানটা উপরের দিকে তাক করে একটা গুলি ছুঁড়লাম!

'গুলির আওয়াজে ভয়ানকভাবে চমকে উঠল হরিণটা। এমনভাবে লাফ দিল যে চামড়া খুলে এলো ওটার। পা বরফে জমা বলে চামড়া আর শিং সাথে নিতে পারল না। তবে হ্যাঁ, সে দফা জঙ্গলে পালিয়ে যেতে পেরেছিল ওটা। দূর থেকে হরিণটার গোলাপি মাংস দেখে মনে হচ্ছিল যেন সদ্যজাত কোন ইঁদুরছানা পালাচ্ছে! তার উপর ঠান্ডায় কাঁপছিল ঠক ঠক করে।

'বেচারার জন্য এত মন খারাপ হয়েছিল যে লেকসাইডের সেলাই-ফোড়াইতে দক্ষ মহিলাদেরকে দিয়ে একটা ভেড়ার লোমের পোশাক বানিয়ে দিয়েছিলাম। অবশ্য আমাদেরই উল্টা শায়েস্তা করেছিলেন তারা। পুরো পোশাকটা বানিয়েছিলেন কমলা সুতা দিয়ে। সেসময় শিকারিরা ভুল বোঝাবুঝি না হবার

জন্য কমলা রঙের পোশাক পরে শিকার করত।' কী ভেবে যেন যোগ করলেন তিনি। 'যদি ভাবো যে এসব কথার একটা বিন্দুও মিথ্যা তো বলো। এখনও ওটার শিং আমার দেয়ালে ঝুলছে।'

হাসিতে ফেটে পড়ল শ্যাডো। বৃদ্ধের মুখে দেখা গেল সন্তুষ্টির ছাপ। লাল ইটের বানানো একটা দালানের সামনে এসে থামল গাড়িটা। 'ওই যে, পাঁচশ-দুই নাম্বার দালান।' বললেন হিনজেলমান। 'তোমার অ্যাপার্টমেন্ট সম্ভবত একেবারে উপরের তলায়, হ্রদের দিকে মুখ করে। বিদায়, মাইক।'

'ধন্যবাদ, মি. হিনজেলমান। তেলের জন্য কিছু টাকা দিলে কি রাগ করবেন?'

'মিস্টার-ফিস্টার বলা লাগবে না। শুধু হিনজেলমান বললেই চলবে। আর এক পেনিও দরকার নেই। আমার আর টেসির তরফ থেকে মেরি ক্রিসমাস।'

'আসলেই নেবেন না?'

থুতনি চুলকালেন বৃদ্ধ। 'এক কাজ করা যায়। সামনের সপ্তাহে আমি কিছু টিকিট বিক্রি করতে আসব, আমাদের এখানে র‍্যাফেল ড্র হয়। এখন গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়।'

'মেরি ক্রিসমাস,' হাসল শ্যাডো। 'হিনজেলমান।'

হাত মেলালেন বৃদ্ধ। 'সাবধান, সিঁড়িগুলো কিন্তু পিচ্ছিল। ওই যে, দালানে ঢোকার দরজা। আমি এখানেই আছে, তুমি দরজা খুলে আমাকে ইঙ্গিত দিও। বুঝে নেব যে সব ঠিক আছে।'

সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে উঠে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলল শ্যাডো, হিনজেলমান ইঞ্জিন চালু রেখে অপেক্ষা করলেন ততক্ষণ। অ্যাপার্টমেন্টের দরজাটা হাট হয়ে খুলে যেতেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সব ঠিক আছে বোঝাল শ্যাডো। তখন বৃদ্ধ লোকটা আর টেসি নামের ওয়েন্ড বাহনটা রওনা দিল বাড়ির দিকে।

সামনের দরজাটা বন্ধ করে দিল শ্যাডো। শীতে যেন জমে আছে ঘরটা। ভেতর থেকে আসছে অগণিত মানুষের গন্ধ, যারা এখন আর বাস করে না অ্যাপার্টমেন্টে। থার্মোস্ট্যাটটা খুঁজে বের করে তাপমাত্রা সত্তর ডিগ্রী পর্যন্ত তুলে দিল। ছোট রান্নাঘরটায় গিয়ে দরজাগুলো খুলে দেখল, এরপর নজর দিল অ্যাভোকাডো রঙের ফ্রিজটায়। ওতে নেই কিছুই! তবে হ্যাঁ, ভেতরটা পরিষ্কার।

ছোট একটা শোবার ঘর আছে অ্যাপার্টমেন্টে, খালি একটা ম্যাট্রেস রয়েছে কেবল। রান্নাঘরের পাশে এত ছোট একটা বাথরুম যে দেখে মনে হয় একটা স্টল! টয়লেটে পড়ে আছে এক টুকরা সিগারেট, বাদামি বানিয়ে দিয়েছে পানি। ফ্ল্যাশ করে সেটাকে বিদায় জানাল শ্যাডো।

ক্লজিট খুঁজে চাদর আর কম্বল বের করল ও, বিছানা গুছিয়ে পা থেকে খুলে নিল জুতা। কেবল জ্যাকেট আর ঘড়ি খুলে পোশাক পরেই ঘুমিয়ে পড়ল বিছানায়। গরম হতে কতক্ষণ লাগবে, ভাবল সে।

বাতি নেভানোই আছে, আওয়াজ বলতে কেবল ফ্রিজের মৃদু গুঞ্জন। ওহ আর সেই সাথে দালানের ভেতর থেকে ভেসে আসছে একটা রেডিওর গান। অন্ধকারে শুয়ে রইল শ্যাডো, ভাবল ঘুমটা বোধ হয় গ্রেহাউন্ড বাসেই ঘুমিয়ে নিয়েছে।

ওয়েনসডে কতদিন পর নিতে আসবেন তাকে? একদিন? নাকি এক সপ্তাহ। সময়টা যাই হোক না কেন, ব্যস্ত থাকার মতো কিছু একটা বেছে নিতে হবে। আবার ব্যায়াম শুরু করবে? হ্যাঁ, সেটাই ভালো। সাথে পয়সার খেলাগুলো অনুশীলন করলেও মন্দ হয় না।

যাই হোক, শহরটা বেশ ভালো। আপাতত তেমনটাই মনে হচ্ছে ওর।

স্বপ্নটা নিয়ে ভাবল শ্যাডো, এরপর কায়রোতে কাটানো প্রথম রাতটা নিয়ে। যরিয়ার কথাও মনে পড়ল তার...কী যেন নাম? পলু...?

মেয়েটার কথা ভাবা মাত্র যেন ওর মনের ভেতর একটা জানালা খুলে গেল, 'মাঝরাত্রীর' বোনকে দেখতে পেল সে। কীভাবে...কে জানে? এরপরই দেখতে পেল লরাকে।

ঈগল পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, ওর মায়ের বাড়ির পেছনের উঠানে।

ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে আছে বেচারি, এখন অবশ্য নতুন করে শীত লাগছে না লরার। ঠান্ডা যে ওর চিরসঙ্গী। এই বাড়িটা তার বাবা, হার্ভি ম্যাককেব ১৯৮৯ সালে মারা যাবার পর, ইনস্যুরেন্সের টাকা দিয়ে কেনা হয়েছিল। জানালায় হাত ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, দেখছে ওর মাকে...ওর বোনকে আর বোনের পরিবারকে।

চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াতে শুরু করল শ্যাডোর, বিছানার উপর কাত হলো সে।

নিজেকে অনাহুত কোন গুপ্তচর বলে মনে হচ্ছে, চিন্তার লাগাম টেনে ধরল তাই। মনোযোগ নিজের উপর ফিরিয়ে আনতেই দেখতে পেল জমাট বাঁধা হ্রদটাকে। ধীর হয়ে আসছে ওর নিঃশ্বাস। বাতাস বইবার শব্দ শুনতে পাচ্ছে, হাহাকার করছে যেন সে বাড়িটাকে ঘিরে।

জায়গাটা মন্দ নয়-ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল শ্যাডো মুন।

কোন এক কথোপকথন

ডিংডং...

'মিস ক্রো?'

'বলছি।'

'মিস সামান্থা ব্ল্যাক ক্রো?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই, আশা করি কিছু মনে করবেন না ম্যাম।'

'আপনারা কে? পুলিশ?'

'আমার নাম টাউন, আর ইনি মিস্টার রোড। আমাদের দুজন সহকর্মীর আকস্মিক অন্তর্ধানের তদন্ত করছি।'

'নাম কী ছিল তাদের?'

'দুঃখিত?'

'আপনার দুই সহকর্মীর নাম জানতে চাইছি, তাহলে সাহায্য করলেও করতে পারি।'

'...ঠিক আছে। ওদের নাম ছিল মিস্টার স্টোন আর মিস্টার উড। এবার আমরা কিছু প্রশ্ন করতে পারি?'

'আপনারা কি চোখের সামনে যেটা দেখতে পান, সেটাকেই নাম হিসেবে ব্যবহার করেন? তোমার নাম মিস্টার ফুটপাত, তোমার মিস্টার কার্পেট। আর তুমি হলো মিস্টার বিমান-এরকম?'

'মজার কথা বলেছেন, ম্যাম। আমাদের প্রথম প্রশ্নঃ এই লোকটাকে আগে দেখেছেন? ছবিটা হাতে নিয়ে দেখুন, অসুবিধা নেই।'

'হোয়া! সবই আছে দেখছি, পাশ থেকে তোলা ছবি, নিচে আবার নাম্বারও আছে! কী করেছে লোকটা?'

'চালক হিসেবে ব্যাঙ্ক ডাকাত দলে ছিল। বেশ কয়েক বছর আগের কথা সেটা। দলের দুজন ওকে লুটের ভাগ না দিয়ে নিজেরাই সব মেরে দিতে চেয়েছিল। রেগে-মেগে ওই লোক দুজনের বেহাল অবস্থা করে ছেড়েছে। আরেকটু হলে খালি হাতেই মেরে ফেলত। আহত দুজনের সাথে চুক্তি করে সরকারঃ ওরা এই লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। তিন বছর জেল খাটতে হয়েছে লোকটাকে। আমার মতে, এধরনের মানুষের আজীবন জেলে পচে মরাই ভালো।'

'টিভি ছাড়া সত্যি সত্যি কাউকে এধরনের কথা বলতে শুনিনি আমি।'

'কোন ধরনের কথা, মিষ ক্রো?'

''লুট'। সাধারণ মানুষ এভাবে কথা বলে না। কেবল অভিনেতারা চলচ্চিত্রে বলে।

'এখানে কোন চলচ্চিত্রের দৃশ্যায়ন হচ্ছে না, মিষ ক্রো।'

'ব্ল্যাক ক্রো। মিষ ব্ল্যাক ক্রো নাম আমার। তবে বন্ধুরা স্যাম বলে ডাকে।'

'বুঝতে পেরেছি, স্যাম। দেখো-'

'আপনারা তো আমার বন্ধু না। আমাকে মিষ ব্ল্যাক ক্রো বলে ডাকবেন।'

'বেয়াদব মেয়ে-'

'চুপ করো তো, মিস্টার রোড। স্যাম-ক্ষমা চাইছি, ম্যাম-মিয ব্ল্যাক ক্রো আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নাগরিক। নিশ্চয় আমাদেরকে সাহায্য করতে চাইবেন তিনি।

'দেখুন ম্যাম, আমরা জানি আপনি শ্যাডোকে চেনেন। ওকে সাহায্যও করেছেন। একটা সাদা শেভি নোভায় আপনাদের দুজনকে একসাথে দেখা গিয়েছে। সে আপনাকে গাড়িতে করে এগিয়ে দিয়েছে, এমনকি রাতের খাবারও খাইয়েছে। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, ওর মুখে কি এমন কিছু শুনেছেন, যেটা থেকে আমরা কোন সূত্র খুঁজে পেতে পারি? আসলেই আমাদের দুই সহকর্মী লাপাত্তা।'

'আমি একে কখনও দেখিনি।'

'দেখেছেন। আমাদেরকে বোকা ভাবার ভুল করবেন না দয়া করে, আমরা বোকা নই।'

'উম, দেখে থাকতেও পারি। আসলে অনেকের সাথেই তো দেখা হয়। যাই হোক, ভুলে গেছি সব।'

'ম্যাম, আমাদেরকে সহায়তা করায় আপনার জন্য ভালো হবে।'

'নইলে কী? আপনাদের দুই বন্ধু মিস্টার হাল্লুড়ি আর মিস্টার পেন্টাথলের সাথে মোলাকাত হবে আমার?'

'ম্যাম, আপনি কিন্তু নিজের জন্যই ব্যাপারটা আরও কঠিন করে তুলছেন।'

'ইস-সি-রে। ভয় পাচ্ছি। আর কিছু জানতে চাইবেন? উত্তরটা না হলে আপনাদেরকে 'বাই-বাই' জানিয়ে আমি দরজা বন্ধ করে দিতে চাই। এরপর সম্ভবত আপনারা মিস্টার গাড়ির ঘাড়ে করে চলে যাবেন। তাই না?'

'আপনার অসহযোগী মনোভাবের কথা আমাদের রিপোর্টে উল্লেখ করা থাকবে।'

'বাই-বাই।'

ক্লিক।

অধ্যায় দশ

গোপন সবই বলব তোমায়,
তবে অতীতের সব কথা শেষ হয় মিথ্যায়।
তাই বিদায় দাও আমায়, ঘুমাই অনন্তের তরে।

–টম ওয়াইটস, 'ট্যাংগো টিল দে আর সোর'

লেকসাইডের প্রথম রাতে স্বপ্ন দেখল শ্যাডো। দেখল একটা জীবনের স্বপ্ন, যে জীবনে ওকে আস্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল অন্ধকার আর ময়লা। দেখল একটা বাচ্চার জীবনকে, অনেক দূরের কোন দেশে...সমুদ্রের ওপারে...যেখানে সূর্য উদয় হয়। অথচ ওর স্বপ্নের জীবনটায় সূর্যোদয় নেই। দিনের বেলা রয়েছে আবছা আলো, আর রাতের বেলা ঘন অন্ধকার।

কেউ কথা বলে না ওর সাথে। বাইরে থেকে ভেসে আসা মানব কণ্ঠ শুনতে পায় বটে; কিন্তু পেঁচার হাহাকার বা কুকুরের চিৎকার যেমন বুঝতে পারে না, তেমন বুঝতে পারে না সেসব কণ্ঠও।

ওর মনে আছে, অন্তত সে তেমনটাই ভাবে, অর্ধ-জীবন আগের সেই রাতটার কথা। সেরাতে বড়দের একজন এসে প্রবেশ করেছিল তার কক্ষে। নাহ, ওকে খাওয়ায়নি বা হাত শেকলে বাঁধেনি সেই বড় মানুষ। বরঞ্চ কোলে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করেছিল ভালোবেসে। অদ্ভুত সুন্দর একটা গন্ধ ভেসে আসছিল মহিলার গা থেকে। তার চেহারা থেকে ওর চেহারার উপর এসে পড়ছিল গরম ফোঁটা। ভয় পেয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল!

খড়ের উপর শুইয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়েছিল সেদিন মহিলা। দরজা বন্ধ করে রেখে গিয়েছিল।

সেই মুহূর্তের কথা আজও তৃপ্তির সাথে স্মরণ করে ও। যেমন করে স্মরণ করে প্রথম নেয়া ফুলকপির স্বাদ, প্রথম সেই তালের মিষ্টতা, প্রথম আপেলের বিচি খাওয়ার অনুভূতি।

এখন...আগুনের আলোয় অনেক মানুষের চেহারা দেখতে পাচ্ছে ও। সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। এই প্রথম আর সম্ভবত একমাত্র বারের জন্য কুঁড়েঘর থেকে সবাইকে পথ দেখিয়ে বাইরে এনেছে সে। ভাবছে, এই তাহলে মানুষ! অন্ধকারে বড় হয়েছে বলে আগে কখনও কারও চেহারা দেখেনি ও। সব কিছু নতুন...অদ্ভুত মনে হচ্ছে। অগ্নিকুণ্ডের আলোয় টাটাচ্ছে চোখ। ওর গলায় ফাঁস বাঁধল কেউ একজন, যেখানে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে।

ছুরির তীক্ষ্ণ ফলার উপর আগুনের আলো পড়ে যখন ঝকঝক করে উঠল, উপস্থিত সবার মুখে তখন শোনা গেল হর্ষ-ধ্বনি। অন্ধকার থেকে বাইরে আসা বাচ্চাটাও হেসে উঠল সেই সাথে। আনন্দে আর স্বাধীনতার স্বাদে।

পরক্ষণেই নেমে এলো ছুরি।

চোখ খোলা মাত্র শ্যাডো বুঝতে পারল, ক্ষুধা লেগেছে ওর। সেই সাথে ঠান্ডায় যেন কাঁপছে। অ্যাপার্টমেন্টের জানালার কাঁচগুলোতে জমতে শুরু করেছে বরফ। বিছানা ছাড়ল সে, নতুন করে জামা-কাপড় পড়তে হবে না ভেবে স্বস্তি পেল। এগোতে এগোতে নখ দিয়ে আঁচড় কাটল জানালায়, টের পেল-নখের নিচে জমা হচ্ছে বরফ, গলে পরিণত হচ্ছে পানিতে।

স্বপ্নটার কথা মনে করতে চাইল ও, কিন্তু অন্ধকার আর দুঃখ ছাড়া কিছু মনে পড়ল না।

জুতায় পা গলাল শ্যাডো। শহরের কেন্দ্র পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে ফেরার পথে ব্রিজটা একটু ঘুরে এলে পুরো শহরটার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। পাতলা জ্যাকেটটা গায়ে চড়াল ও, পুরু একটা শীতবস্ত্র কিনবে-সেই প্রতিজ্ঞা মনে করিয়ে দিল নিজেকে। অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে পা রাখল কাঠের ডেকে। ঠান্ডা বাতাস যেন হাতুড়ি হয়ে আঘাত করল শ্যাডোর বুকে, বুক ভরে একবার শ্বাস নিতেই মনে হলো-নাকের সব লোম জমে গিয়েছে! সামনের দৃশ্যটা মনলোভা, বরফ জমা হ্রদ তার পুরো সৌন্দর্য নিয়ে শুয়ে আছে।

শৈত্য-প্রবাহ হচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাপমাত্রা শূন্যের খুব একটা বেশি হবার কথা না; হাঁটাটা বোকার মতো একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে কিনা, তাই ভাবল ও। মোটামুটি নিশ্চিত যে শহর পর্যন্ত যেতে কষ্ট হবে না। কিন্তু ফেরাটা সমস্যা হয়ে যেতে পারে।

তবু দক্ষিণে এগিয়ে চলল শ্যাডো, ওর লক্ষ্য ব্রিজ।

খুব দ্রুতই কাশিতে পেয়ে বসল ওকে, শুকনো কাশি। এর কারণ যে ফুসফুসে ঢোকা শীতল বাতাস, তা-ও বুঝতে পারল। দ্রুতই কান, চোখ আর ঠোঁট ব্যথা করতে শুরু করল ওর। এরপর এলো পা ব্যথা। হাত দুটোকে গরম রাখার জন্য কোটের পকেটে ঢুকিয়ে মুষ্টিবদ্ধ করে রাখল। মিনেসোটার শীতের ব্যাপারে লো কী লেস্মিথের ছাড়া বড় বড় বুলির কথা মনে পড়ে গেল শ্যাডোর। এক শিকারির গল্প বলেছিল লো কী। লোকটা ভালুকের ভয়ে উঠে বসেছিল গাছে। নামার আর কোন উপায় না পেয়ে প্রস্রাব করেছিল ডালে বসা অবস্থাতেই। মাটিতে পড়ার আগেই জমে বরফে পরিণত হয়েছিল প্রস্রাব। সেটা বেয়ে নিচে নেমেছিল লোকটা। হাসিতে মুখ বেঁকে গেল শ্যাডোর, পরক্ষণেই ব্যথা পেয়ে মিলিয়ে গেল তা।

এক পা এক পা করে এগোচ্ছে, আর পিছু ফিরে ফিরে দেখছে শ্যাডো। অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংটাকে যতটা দূর বলে মনে হচ্ছিল, ততটা দূরে দেখতে না পেয়ে অবাক হলো।

আসলেই বোকার মতো কাজ হয়েছে, সিদ্ধান্ত নিল ও। তবে এতক্ষণে চার-পাঁচ মিনিট হেঁটে এসেছে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে, ব্রিজটাও বেশি দূরে নেই। সামনে এগোলেও যা, পেছনে গেলেও তাই (ঘরে ফিরেই বা লাভ কী? খাবার নেই একবিন্দুও)।

তাই এগোতে লাগল ও, প্রতি পদে তাপমাত্রা মাপার প্রয়াস পেল। মাইনাস দশ? নাকি মাইনাস বিশ? হয়তো মাইনাস চল্লিশে নেমেছে পারদ। থার্মোমিটারের শূন্যের নিচে একটা বিন্দু আছে, যেখানে সেলসিয়াস আর ফারেনহাইটের মান এক। সম্ভবত এখনও অত নিচে নামেনি। তবে আর্কটিক থেকে ভেসে আসা শৈত্য-প্রবাহ ওকে সেটার কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে।

লরার দেয়া সেই কেমিক্যাল প্যাডগুলোর কথা মনে পড়ে গেল শ্যাডোর। ইস, ওগুলোর বিনিময়ে যেকোন দাম চুকাতেও আপত্তি থাকত না ওর।

আন্দাজে আরও দশ মিনিট হাঁটার পরও যখন ব্রিজটার কাছে পৌঁছাতে পারল না, তখন ঠান্ডায় কাঁপতে শুরু করল বেচারা। এখন এমনকী চোখও ব্যথা করছে। একে ঠান্ডা বলা যায় না, এমন শীতলতা কেবল কোন সায়েন্স-ফিকশনের বইতেই থাকা সম্ভব।

পাশ দিয়ে চলতে থাকা গাড়িগুলোকে অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে এখন। ওগুলো যেন কোন স্পেস-শীপ। ধাতু আর কাঁচ দিয়ে তৈরি এমন বাহন যাকে শীত ভেদ করতে পারে না। ভেতরে বসে থাকা লোকগুলোকেও ঈর্ষা হলো ওর, গরম কাপড় পরে বসে আছে। মায়ের পছন্দের একটা পুরাতন গানের কথা মনে

পড়ে গেল, 'ওয়াকিং ইন আ উইন্টার ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড।' চেপে বসে ঠোঁট দিয়ে উচ্চারণ না করেই গুনগুণ করে গাইতে শুরু করল শ্যাডো, গতি কমাল না হাঁটার।

পায়ে সার পাচ্ছে না কোন, ওগুলো যে আছে তা বোঝার জন্য বার বার নিচের দিকে তাকাতে হচ্ছে। পাতলা মোজা আর কালো লেদারের জুতার দিকে তাকিয়ে ফ্রস্টবাইটের ভয় ঢুকল ওর মনে।

ব্যাপারটা আর হেসে উড়িয়ে দেবার পর্যায়ে নেই, অনেক বড় একটা ভুল হয়ে গিয়েছে। পোশাক পরেও লাভ হয়নি কোন, শীতল বাতাসের প্রকোপে নিজেকে নগ্ন মনে হচ্ছে ওর। হাড় তো জমে যাচ্ছেই, ভেতরের মজ্জাটাও যেন বরফ হয়ে যাচ্ছে। চোখের পাপড়ি খুলতে কষ্ট হচ্ছে এখন, ঠান্ডায় সংকুচিত হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে ওর অণ্ডকোষ।

হাঁটতে থাকো, নিজেকে নির্দেশ দিল শ্যাডো। হাঁটতে থাকো সামনের দিকে। ঘরে ফিরে বুক ভরে শ্বাস নেয়া যাবে। বিটলস ব্যান্ডের একটা গান ঘুরতে শুরু করল ওর মাথায়, সেই তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চলল ও। গানের যেখানে কোরাস আছে সেখানে এসে বুঝতে পারল শ্যাডো, বিড়বিড় করে 'সাহায্য' চাইছে সে!

ব্রিজের কাছে প্রায় পৌঁছে গিয়েছে ও, এখন কেবল পার হবার অপেক্ষা। তারপর আর মাত্র দশ মিনিট হাঁটলেই পৌঁছে যাবে নিরাপদ স্থানে...

কালো একটা গাড়ি ওকে অতিক্রম করে থমকে দাঁড়াল, ধোঁয়া বের করে পিছিয়ে এসে থামল ওর পাশে। একটাজানালা নেমে এলো, 'সব ঠিক আছে?' ভেতর থেকে একজন পুলিশ জানতে চাইল।

শ্যাডো যেন অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বলে উঠেছিল-হ্যাঁ, ঠিক আছে সবকিছু। ধন্যবাদ অফিসার। কিন্তু তা না বলে বলল, 'আমি মনে হয় জমে যাচ্ছি, অফিসার। লেকসাইডে গিয়ে খাবার আর পোশাক কিনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দূরত্বটা আঁচ করতে পারিনি।' পরক্ষণেই বুঝতে পারল, এসব আসলে মনে মনে বলেছে সে। মুখ দিয়ে বের হয়েছে, 'জ-জ-জমে যাচ্ছি, ঠান্ডা।'

গাড়ির পেছনের দরজাটা খুলে ধরল অফিসার। 'এখুনি উঠে বসো, গরম হয়ে নাও।' কৃতজ্ঞতার সাথে নির্দেশ পালন করল শ্যাডো, পেছনে বসে হাতে হাত ঘষল। পায়ের অবস্থা এখন চিন্তা করে লাভ নেই। ধাতব গ্রিলের পেছন থেকে সামনে বসা পুলিশ অফিসারের দিকে তাকাল ও। শেষবার পুলিশের গাড়ির পেছনে উঠার স্মৃতি মনে পড়ল শ্যাডোর। পেছনের দরজায় যে কোন হ্যান্ডেল নেই, তা-ও না দেখার প্রয়াস পেল। সম্পূর্ণ মনোযোগ দিল হাত গরম

করার কাজে। এখন আবার সার ফিরে এসেছে চেহারায়, লালচে হাতগুলোও ব্যথা করতে শুরু করেছে। উষ্ণতা যে আস্তে আস্তে শীতকে সরিয়ে পুনর্দখল করে নিচ্ছে পায়ের আঙুলগুলো, সেটাও টের পাচ্ছে পরিষ্কারভাবে। ব্যাপারটাকে ভালো লক্ষণ হিসেবেই ধরে নিল।

চলতে শুরু করলো গাড়িটা। 'কাজটা,' শ্যাডোর দিকে না তাকিয়েই বলল পুলিশ অফিসার। 'কিছু মনে করো না, একেবারে বোকার মতো হয়ে গিয়েছে। আবহাওয়ার কোন খবর শোননি? এখনকার তাপমাত্রা মাইনাস ত্রিশ ডিগ্রী!'

'থামার জন্য ধন্যবাদ,' বলল শ্যাডো। 'অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

'সকালের কথাই বলি। রাইনল্যান্ডারে এক মহিলা তার পাখিদেরকে খাবার দেবার জন্য কেবল চপ্পল আর রোব পরে বাইরে বেরিয়েছিলেন। একদম জায়গায় জমে গিয়েছেন তিনি! বিশ্বাস হয়! এখন অবশ্য আই.সি.ইউ.তে আছেন। সকালে খবরেও টিভিতে দেখিয়েছে। তুমি বোধহয় শহরে নতুন।' এটা যে একটা প্রশ্ন, তা বুঝতে অসুবিধা হলো না শ্যাডোর। অবশ্য লোকটা যে প্রশ্নটার উত্তর জানে, তা-ও বুঝল।

'গত রাতেই গ্রেহাউন্ডে করে এসেছি। ভাবলাম, গরম কাপড়, খাবার আর একটা গাড়ি কিনব আজ। এতটা ঠান্ডা হবে তা বুঝতে পারিনি।'

'হুম,' বলল পুলিশ অফিসার। 'আমিও অবাক। আসলে বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়েই বেশি দুশ্চিন্তা ছিল আমার। যাই হোক, আমি চ্যাড মুলিগান, লেকসাইডের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের প্রধান।'

'মাইক আইনসেল।'

'হাই, মাইক। এখন ভালো লাগছে একটু?'

'কিছুটা।'

'কোথায় যাবে প্রথমে?'

হিটারের উষ্ণ বাতাসে হাত রাখল শ্যাডো, আঙুল ব্যথা করতে শুরু করেছে। তারপর সরিয়ে নিল; থাক, সময় নিয়েই উষ্ণ হোক। 'টাউন সেন্টারে নামিয়ে দিলেই হবে।'

'না, না। তা করা যাবে না। ডাকাতির কাজে আমার গাড়ি ব্যবহার করা ছাড়া আর যেখানে নিয়ে যেতে বলো, আমার আপত্তি নেই। ধরো নাও, শহরের হয়ে তোমাকে আমি স্বাগতম জানাচ্ছি।'

'তোমার কী পরামর্শ?'

'গত রাতে এসেছ বললে?'

'হ্যাঁ।'

'নাস্তা হয়েছে?'

'নাহ।'

'তাহলে ওখান থেকেই শুরু করা যাক।' বলল চ্যাড মুলিগান।

ব্রিজের উপর চলে এসেছে ওরা, এখান থেকে শহরের উত্তর-পশ্চিম দিকে যাওয়া যায়। 'এটা শহরের প্রধান রাস্তা,' চিনিয়ে দিল মুলিগান। ডানে মোড় নিয়ে বলল, 'আর এই হলো তোমার টাউন স্কয়ার।'

এই তীব্র শীতের মাঝেও দারুণ দেখাচ্ছে টাউন স্কয়ারকে। তবে শ্যাডো বুঝতে পারছে, জায়গা সাজানো হয়েছে গ্রীষ্মের কথা মাথায় রেখে। কোন সন্দেহ নেই, তখন রঙের অদ্ভুত খেলা দেখা যাবে এখানে; পপি, আইরিশ আর প্রায় সবধরনের ফুলের মেলা বসবে। কোনার ওই বার্চ গাছগুলো সাজবে সবুজ আর রুপালী সাজে। এখন অবশ্য সব রঙহীন। তারপরও দম বন্ধ করা সুন্দর। ঝর্ণাটাকে শীতের জন্য বন্ধ করে রাখা হয়েছে। সিটি হলটা মাথায় পরেছে বরফের টোপর।

'...আর এই হলো,' শেষ করল চ্যাড মুলিগান। একটা পুরাতন দালানের সামনে থামিয়েছে গাড়ি, ওটার সামনে আবার কাঁচের দেয়াল। 'ম্যাবেলের দোকান।'

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল লোকটা, শ্যাডোর জন্য প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজা খুলে দিল। ঠান্ডা বাতাসকে অগ্রাহ্য করে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল দুজন। গরম ঘরটার ভেতরে পা রাখতেই নাকে এসে লাগল স্যুপ, সদ্য বেক করা রুটি, পেস্ট্রি আর বেকনের গন্ধ।

দোকানটাকে খালিই বলা চলে। একটা চেয়ারে বসল মুলিগান, শ্যাডো বসল তার উল্টো দিকে। কেন যেন মনে হচ্ছে, ওকে বাজিয়ে দেখার জন্যই এত আতিথেয়তা। আবার কে জানে, সত্যি স্যতিই হয়তো বন্ধু-বাৎসল লোকটা!

এক মহিলা এগিয়ে এলো ওদের দিকে, মোটা বলা যাবে না; তবে দশাসই অবশ্যই। বয়স ষাটের কোঠায়, মাথায় তামাটে চুল। 'হ্যালো, চ্যাড।' বলল মহিলা। 'কী খাবে বলো!' বলে এগিয়ে দিল লেমিনেশন করা তালিকা। 'ভাবতে ভাবতে হট চকলেট খেয়ে নেবে নাকি?'

'উপরে ক্রিম দিও না কিন্তু,' জানাল চ্যাড। 'ম্যাবেল আমাকে খুব ভালোভাবেই চেনে,' এবারের কথাটা শ্যাডোর উদ্দেশ্যে। 'তুমি নেবে?'

'হট চকলেট চলতে পারে,' বলল শ্যাডো। 'উপরে ক্রিম দিলেও সমস্যা নেই।'

'আমিও তাই বলি,' বলল ম্যাবেল। 'ঠিকমতো যদি না-ই খেলাম তো বেঁচে থেকে লাভ কী? কিন্তু চ্যাড, পরিচয় করিয়ে দেবে না আমাকে? এই যুবক কি তোমার নতুন অফিসার?'

'এখনও না,' হাসিতে সাদা দাঁত বেরিয়ে গেল মুলিগানের। 'এর নাম মাইক আইনসেল, গতরাতে প্রথম লেকসাইডে পা রেখেছে। একটু আসছি।' বলে ঘরের অন্য মাথার রেস্টরুমে চলে গেল লোকটা।

'তুমি নর্থরিজ রোজের অ্যাপার্টমেন্টটায় ওঠা নতুন ভাড়াটে!' খুশি মনে বলল মহিলা। 'আমি তোমার কথা জানি। আজ সকালেই হিনজেলমেন প্যাস্টি খেতে খেতে তোমার কথা বলছিল। তোমরা দুজন কি শুধু চকলেট নেবে? নাকি সাথে অন্য কিছু?'

'আমার নাস্তা চাই,' বলল শ্যাডো। 'কোনটা ভালো হবে?'

'আমার এখানে খারাপ কিছু নেই,' বলল ম্যাবেল। 'নিজের হাতে বানাই সবকিছু। তবে হ্যাঁ, আশেপাশে কোথাও প্যাস্টি পাবে না। আমার বিশেষত্ব ওটা, চেখে দেখতে পারো।'

প্যাস্টি যে কী জিনিস, সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই শ্যাডোর। তবে খেতে আপত্তি করল না। কয়েক মিনিটের মাঝে ফিরে এলো ম্যাবেল। মহিলার হাতে ধরা জিনিসটাকে দেখে ভাঁজ করা পাই বলে মনে হলো ওর, নিচের অর্ধেকটা টিস্যু পেপার দিয়ে ঢাকা। ন্যাপকিনসহ পুরোটাকে তুলে নিল শ্যাডো, কামড় বসাল একটা। উষ্ণ খাবারে ভরে উঠল ওর মুখ; একই সাথে মাংস, আলু, গাজর আর পেঁয়াজের স্বাদ পেল। 'এর আগে প্যাস্টি খাইনি,' মহিলাকে জানাল সে। 'দারুণ স্বাদ!'

'ইয়ুপপি খাবার,' জানাল মহিলা। 'কর্ণিশরা লোহার খনিতে কাজ করার সময় সাথে করে নিয়ে এসেছে।'

'ইয়ুপপি?'

'আপার পেনিনসুলা, ইউ.পি.পি-ইয়ুপপি।'

ঠিক তখনই ফিরে এলো পুলিশের চীফ। হট চকলেটের কাপটা তুলে নিয়ে চুমুক দিল। 'ম্যাবেল,' বলল সে। 'তোমার প্যাস্টি খাওয়াচ্ছ নাকি বেচারাকে?'

'খেতে খুব ভালো,' বলল শ্যাডো। আসতেই তাই।

'সরাসরি মেদ হিসেবে জমা হয় ওগুলো,' নিজের ভুঁড়িতে চাপড় মেরে দেখাল চ্যাড মুলিগান। 'পরে বোলো না যে সাবধান করিনি। ভালো কথা, গাড়ি লাগবে বললে না?' পার্কা খুলে ফেলায় লোকটার আসল দেহ দেখতে পেল

এতক্ষণে। লম্বা আর চিকন লোকটা, পেটের মাঝখানটা আপেলের মতো গোল। চেহারায় দক্ষতার ছাপ, না জানলে যে কেউ ইঞ্জিনিয়ার বলে ভুল করবে।

নড করল কেবল শ্যাডো, মুখ খাবারে ভর্তি বলে কথা বলল না।

'কয়েকজনকে ফোন করলাম। জাস্টিন লোবোউইটয ওর জিপ বিক্রি করবে, চার হাজার চেয়েছে। তবে তিন পেলেই ছেড়ে দেয়ার কথা। গুন্থাররা অবশ্য ওদের ফোররানার গাড়িটা বিক্রি করতে চাইছে আট মাস হলো। দেখতে একদম বদখত, তবে সম্ভবত এমনিতেই বিলিয়ে দেবার অবস্থায় এসে পড়েছে। তোমার যদি গাড়ির দর্শন নিয়ে কোন সমস্যা না থাকে তো নিতে পারো। মিসি গুন্থারকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছি লেকসাইড রিয়েলিটিতে। তবে এখনও আসেনি মহিলা, সম্ভবত শীলা'র দোকানে চুল ঠিক করছে।'

একটা প্যাস্টি খেয়েই পেট ভরে গেল শ্যাডোর, পূর্ণ মনোযোগ এখন খাবারের দিকেই।

'আমার মনে হয়,' চীফ অফ পুলিস চ্যাড মুলিগান মুখ মুছতে মুছতে বলল। 'প্রথমে হেনিংস ফার্ম অ্যান্ড হোম সাপ্লাইতে গিয়ে তোমার জন্য কাপড় কেনা দরকার। ডেভ'স ফাইনেস্ট ফুডে গেলে কিনতে পারবে খাবার। তারপর নাহয় তোমাকে লেকসাইড রিয়েলিটিতে নামিয়ে দেব। গাড়ির জন্য প্রথমে নগদ এক হাজার ডলার দিলেই হবে, এরপর চার মাস পাঁচশ করে দিলেই হবে। গাড়িতে দেখতে একদমই বাজে; তবে যদি ওদের ছেলেটা বেগুনি রঙ না করত, তাহলে কমপক্ষে দশ-হাজার ডলার গুণতে হতো ওটা কেনার জন্য। এখনও ভালো অবস্থায় আছে। শীতে এদিক-ওদিক যেতে হলে গাড়ির বিকল্প নেই।'

'অনেক অনেক ধন্যবাদ,' বলল শ্যাডো। 'কিন্তু তোমার তো উচিৎ অপরাধী ধরা। নবাগতের পেছনে একটু বেশিই সময় দেয়া হয়ে যাচ্ছে না? অবশ্য আমার তাতে ভালোই হয়েছে।'

মুচকি হাসল ম্যাবেল। 'আমরা সবাই ওকে তাই বলি।'

শ্রাগ করল মুলিগান। 'শহরটা ভালো,' বলল নম্রস্বরে। 'সমস্যা হয় না খুব একটা। শহরের সাধারণত গতিসীমা ভঙ্গ ছাড়া আর কোন অপরাধ হয় না। এতে অবশ্য আমার লাভই হয়, বেতনটা ওসবের জরিমানা থেকেই পাই কিনা। শুক্র-শনিবার রাতে কোন কোন হারামজাদা মাতাল হয়ে বউ পেটায়। কখনও কখনও স্বামী পেটায় স্ত্রীকে, আবার কখনও স্ত্রী স্বামীকে! বাকি সময়টা শান্তই থাকে শহর। আমার ডাক পড়ে যখন মানুষ ভুল করে গাড়ির চাবি ফেলে যায়, তখন। ঝোপের আড়ালে গাঁজাসহ কিছু কলেজ ছাত্র-ছাত্রী ধরি প্রতি বছর। গত পাঁচ বছরের সবচেয়ে ঝামেলার কেস কী হয়েছিল শুনবে? ড্যান শোয়ার্টয

ট্রেইলার থেকে বন্দুক হাতে নেমে এসেছিল। হুইলচেয়ারে বসে চিৎকার করতে করতে জানাচ্ছিল-সামনে যে পড়বে, তাকেই খুন করবে। আমার ধারণা, ওয়াশিংটনে গিয়ে প্রেসিডেন্টকে খুন করার ইচ্ছা ছিল ড্যানের। দৃশ্যটা মনে পড়লেই হাসি ফুটে ওঠে আমার মুখে। তোমার মনে আছে, ম্যাবেল?'

নড করল মহিলা, হাসি ফুটে উঠেছে চেহারায়। তবে চ্যাডের মতো আনন্দ পাচ্ছে বলে মনে হলো না।

'কী করলে তুমি?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'ওর সাথে কথা বললাম...আমাকে শটগানটা দিয়ে দিল! জেলে একরাত কাটাতেই ঠান্ডা হয়ে গেল লোকটার মাথা। ড্যান ভালো মানুষ, তবে মাতাল হয়ে পড়েছিল সেদিন।'

নিজের নাস্তার দাম তো চুকালোই শ্যাডো, চ্যাড মুলিগানের হালকা প্রতিবাদ কানে না নিয়ে দিয়ে দিল চকলেটের দামও।

হেনিংস ফার্ম অ্যান্ড হোম সাপ্লাইযটা শহরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত গুদাম-আকারের দালান। ট্রাক্টর থেকে শুরু করে খেলনা পর্যন্ত সবকিছু বিক্রি করে ওরা। ক্রিসমাসের কেনাকাটা করার জন্য ভিড় জমিয়েছে সবাই। শ্যাডো এক মেয়েকে চিনতে পারল, বাসে ওর সামনে বসেছিল সে। বাবা-মা'র পিছু পিছু ঘুরছে বেচারি। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল শ্যাডো, বিনিময়ে পেল নীল রাবার দেখান হাসি। দশ বছর পর সে দেখতে কেমন হবে, তাই ভাবল যুবক।

সম্ভবত দোকানটার ক্যাশিয়ার মেয়েটার মতোই সুন্দর হবে। শ্যাডোর কেনা জিনিসপত্রের দাম হিসাব করছে। 'দশ জোড়া আন্ডারওয়্যার?' জিজ্ঞাসা করল মেয়েটা। মুখে নায়িকাদের মতো হাসি। 'জমাচ্ছ নাকি?'

শ্যাডোর মনে হলো, ওর বয়স যেন আবার কমে চোদ্দ হয়েছে। কিছু বলল না সে, নিজেকে কেন যেন বোকা বলে মনে হচ্ছে। একে একে থার্মাল বুট, গ্লাভস, সোয়েটার আর পুরু কোটের দাম তালিকায় যোগ করল মেয়েটা।

ওয়েনসডের দেয়া ক্রেডিট কার্ডটা ব্যবহার করতে চায় না ও, অন্তত চ্যাড মুলিগানকে পাশে নিয়ে তো কখনওই না। সবকিছু নগদেই চুকিয়ে দিল শ্যাডো। এরপর ব্যাগগুলো নিয়ে রেস্টরুমে চলে গেল সে, বেরিয়ে এলো যখন তখন পরনে সদ্য কেনা পোশাক।

'দেখে তো দারুণ লাগছে।' বলল মুলিগান।

'অন্তত গরম তো হচ্ছি,' শ্যাডো হাসল। পোশাকগুলো ওকে গরম রাখছে, এমনকি পার্কিং-লটে দাঁড়িয়েও শীত টের পেল না ও। কেবল উন্মুক্ত চেহারায়

কামড় বসাচ্ছে শীত। মুলিগানের পরামর্শ শুনে ব্যাগগুলো পুলিশের গাড়িটার পেছনে রেখে নিজে উঠে বসল সামনে।

'তুমি কী করো, মাইক আইনসেল?' জানতে চাইল পুলিশ প্রধান। 'তোমার মতো বিশালদেহির এমন কী কাজ লেকসাইডে?'

লাফাতে শুরু করেছে শ্যাডোর হৃদপিণ্ড, কিন্তু কণ্ঠ স্বাভাবিক। 'চাচার হয়ে কাজ করি, দেশ জুড়ে অ্যান্টিক জিনিসপত্র বিক্রি করে সে। আমি একটু সাহায্য করি কেবল!'

'টাকা ভালো দেয়?'

'আমি পরিবারের সদস্য, চাচা জানে যে আমি ধোঁকা দেব না। আর তাছাড়া, আমারও ব্যবসার ফাঁকফোকর শেখা হচ্ছে।' আপনা-আপনি কথাগুলো ওর মুখ থেকে বেরোচ্ছে। এমন মসৃণভাবে মিথ্যা বলতে পারবে, তা ভাবেনি কখনও। সত্যি সত্যি যেন সে মাইক আইনসেল, আর আইনসেল লোকটাকে ওর পছন্দ হয়েছে। শ্যাডোর অগণিত সমস্যার একটাও মাইকের নেই। আইনসেলের কখনও বিয়ে হয়নি, কখনও মি. উড আর মি. স্টোন ওকে অত্যাচার করেনি। টেলিভিশন থেকে কেউ উঁকি দিয়ে মাইকের সাথে কথা বলে না (লুসির দুধ দেখতে চাও? প্রশ্নটা মনে পড়ে গেল ওর)! মাইক আইনসেল দুঃস্বপ্ন দেখে না, বিশ্বাস করে না যে ঝড় আসছে।

ডেভ'স ফাইনেস্ট ফুড থেকে হালকা খাবার কিনে নিল শ্যাডো-দুধ, ডিম, পাউরুটি, আপেল, পনীর, কুকি। ভারি খাবার পরে কেনা যাবে। চ্যাড মুলিগান সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল ওকে। 'এ হচ্ছে মাইক আইনসেল, নর্থরিজ রোডে একটা অ্যাপার্টমেন্টে উঠেছে...পেছন দিকেরটায়।' নতুন পরিচিত হওয়া লোকদের নাম মুখস্থ করার প্রয়াস পেল শ্যাডো। এর সাথে হাত মেলাল, ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। দোকানের ভেতরটা একটু বেশিই গরম। আশ্চর্য হলেও সত্যি-ঘামতে শুরু করেছে সে!

চ্যাড মুলিগান গাড়ি চালিয়ে ওকে লেকসাইড রিয়েলটির অফিসে নিয়ে এলো। মিসি গুন্থারের সাথে আলাদা করে পরিচয় দেবার দরকার হলো না, মাইক আইনসেলকে ভালোভাবেই চেনে মহিলা। শ্যাডোর চাচা, মি. এমারসন বোরসন, খুব ভালো মানুষ। ছয় কি আট সপ্তাহ আগে ভদ্রলোক নর্থরিজ স্ট্রিটের পিলসেন প্লেসের একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেন। ওখান থেকে যে দৃশ্যটা দেখা যায়, সেটা মনকাড়া, তাই না? বসন্তে তো আরও সুন্দর রূপে সাজে লেকসাইড। সাধারণত পৃথিবীর এই দিকে গ্রীষ্ম হলেই পানিতে সবুজ শ্যাওলা জমে। কিন্তু লেকসাইডে তা হয় না। এই শহরের হ্রদের পানি চাইলে না ফুটিয়েই খাওয়া

যায়। পুরো এক বছরের অগ্রিম ভাড়া দিয়ে গিয়েছেন মি. বোরসন। টয়োটা ফোররানারের কথা যে এখনও চ্যাড মুলিগান মনে রেখেছে, সেটা বিশ্বাসই হতে চাইছে না ওর। জিনিসটা বিক্রি করতে পারলে খুশিই হবে সে। সত্যি বলতে কী, আরেকটু হলেই ওটা হিনজেলমানকে এই বছরের ক্ল্যাংকার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য দিয়ে দিত। আসলে গাড়িটা তার ছেলের, এখন গ্রিন বে'র একটা স্কুলে পড়তে গিয়েছে। কেন যেন একদিন...খেয়ালের বসেই গাড়িটা বেগুনি রঙ করেছিল ছেলেটা। মিসি গুন্থারের আশা, মাইক আইনসেলের বেগুনি রঙটা পছন্দ হবে...

এই বাক্য-বর্ষণের মাঝখানেই ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিল মুলিগান। 'আমার অফিসে ফিরতে হচ্ছে। তোমার সাথে পরিচয় হয়ে খুশি হলাম, মাইক।' বলে শ্যাডোর বাজার-সদাই মিসির স্টেশন ওয়্যাগনে তুলে দিল সে।

নিজের গাড়িতে করে শ্যাডোকে বাড়িতে নিয়ে এলো মিসি। পথে একটা বয়স্ক এস.এই.ভি. দেখতে পেল ও। গাড়িটার রঙ বাদামি হলেও, বরফ জমে সাদা হয়ে গিয়েছে। বাকিটা ক্যাটক্যাটে বেগুনি রঙা!

তবে দেখতে যেমনই হোক, প্রথমবারের চেষ্টাতেই চালু হয়ে গেল ওটার ইঞ্জিন। হিটারটাও কাজ করছে, তবে ভেতরটা গরম হতে হতে প্রায় দশ মিনিট লেগে গেল। যাই হোক, গাড়ি গরম হতে দিয়ে শ্যাডো চলে গেল মিসি গুন্থারের রান্নাঘরে। বাচ্চারা সারা ঘর জুড়ে খেলনা ছড়িয়ে রেখেছে। একটা লাল গাড়ি চেয়ারের উপর থেকে সরিয়ে তাতে বসল ও। মিসি জানতে চাইল, প্রতিবেশীদের সাথে দেখা হয়েছে কিনা। যুবক জানাল, দেখা হয়নি।

তাই মিসি প্রতিবেশীদের বর্ণনা দেয় শুরু করল। অ্যাপার্টমেন্টে আরও চারজন বাস করে। আগে যখন দালানটার নাম ছিল পিলসেন প্লেস, তখন পিলসেন পরিবার বসবাস করত দালানে। তারা একদম নিচ তালাটা নিজেরা ব্যবহার করে, উপরের দুটো ভাড়া দিয়েছিল। মি. হোলয আর মি. নেইম্যান নামের দুজন থাকত ওখানে। শ্যাডো বিশ্বাস করবে কিনা জানে না মহিলা, কিন্তু ওরা নাকি আসলে দম্পতি! তারা অবশ্য শীতের সময়টা কী ওয়েস্টে থাকবে, এপ্রিলের দিকে ফেরার কথা। তখন অবশ্য শ্যাডো নিজেই দেখতে পাবে তাদের। লেকসাইড আসলে থাকার জন্য খুব ভালো। মি. আইনসেলের পাশের অ্যাপার্টমেন্টেই ছেলেকে নিয়ে বাস করে মার্গারিতা ওলসেন। মেয়েটা খুব মিষ্টি, তবে খুব কঠিন একটা জীবন কাটাতে হচ্ছে ওকে। লেকসাইড নিউযে কাজ করে মেয়েটা। দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি বিক্রিত কাগজ না হলেও, এখানকার মানুষ-জন ওটাকে পছন্দই করে।

এসব বলতে বলতেই শ্যাডোর জন্য কফি ঢালল কাপে। জানাল, মি. আইনসেলের যেভাবেই হোক, শহরটাকে বসন্তে দেখা উচিৎ। তখন লাইলাক আর আপেল আর চেরি দেখা যায় গাছে। এরকম আর কিছু সারা দুনিয়াতেই নেই!

পাঁচশ ডলার জমা দিল শ্যাডো। গাড়িতে উঠে চালু করে দিল ইঞ্জিন, রাস্তায় উঠে পড়ল বাহনটা নিয়ে। তবে তার আগে মিসি গুন্থার ওকে একটা মোটা খাম দিতে ভুলল না। 'আমাদের তরফ থেকে একটা ঠাট্টা বলতে পারো, আরেকটু হলেই ভুলে গিয়েছিলাম। এখনই না দেখলেও চলবে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল শ্যাডো, হ্রদের পাশ দিয়ে যাওয়া পথটা ধরে প্রবেশ করল শহরে। গ্রীষ্মে, বসন্তে, শরতে-তিন ঋতুতেই ওটাকে দেখার ইচ্ছা জন্মাল তার মনে। দৃশ্যটা যে দারুণ মনোলোভা হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

দশ মিনিটের মাঝে বাড়িতে ফিরে এলো সে। গাড়িটা রাস্তায় পার্ক করে রেখে চলে এলো নিজের ঠান্ডা অ্যাপার্টমেন্টে। বাজার-সদাইগুলো বের করে নিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখল ফ্রিজ আর কাপবোর্ডে। মিসি গুন্থারের দেয়া খামটা খুলল এরপর।

একটা পাসপোর্ট বের হয়ে এলো খাম থেকে। নীল একটা কভার খুলে দেখতে পেল, ভেতরে সুন্দর করে হাতে লেখা কয়েকটা লাইন-মাইকেল আইনসেলকে লেকসাইডের নাগরিক বলে সম্মাননা জানান হয়েছে তাতে। পরবর্তী কয়েকটা পাতায় শহরের মানচিত্র আঁকা। অন্যগুলো শহরের নানা দোকানের ডিসকাউন্ট কুপন দিয়ে ভর্তি।

'জায়গাটা পছন্দ হবে বলেই তো মনে হচ্ছে,' উঁচু গলায় বলল শ্যাডো। জমে যাওয়া হ্রদের দিকে নজর পড়লে যোগ করল, 'এখন ঠান্ডাটা একটু কমলেই হয়।'

দুপুর দুইটার দিকে সদর দরজায় নকের আওয়াজ, শ্যাডোর পয়সা অনুশীলনে ব্যাঘাত ঘটাল। ঠান্ডায় হাত জমে যাচ্ছে যেন, তাই বারবার পয়সাটা ওর হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে। নক শুনে আবারও তাই হলো। অনুশীলন বন্ধ করে দরজা খুলল সে।

ভয়ে যেন জায়গায় জমে গেল সে-দরজার ওপাশে দাঁড়ান লোকটা কালো একটা মাস্ক পরে আছে। চেহারার নিচের দিকটা ঢেকে আছে মুখোশে, টিভিতে দেখা ব্যাঙ্ক ডাকাতরা অমন মুখোশই পড়ে থাকে।

তবে মানুষটার দেহ শ্যাডোর চাইতে অনেক ছোট, দেখে সাথে অস্ত্র আছে বলেও মনে হয় না। সেই সাথে পরনে একটা উজ্জ্বল কোট, ব্যাঙ্ক ডাকাতরা সাধারণত ওসব পরে না।

'লাবি হিহেলহান।' বলল লোকটা।

'হাহ?'

ওর কথা শ্যাডো বুঝতে পারেনি ধরতে পেরে, মুখোশ খুলল লোকটা। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো হিনজেলমানের চেহারা। 'বললাম, 'আমি হিনজেলমান'। এই মুখোশগুলো আবিষ্কার হবার আগে মানুষ যে কী করত, তা বুঝেই পাই না। তবে আমরা কী ব্যবহার করতাম, তা মনে আছে। উল দিয়ে বোনা ক্যাপ পরতাম, সারা মুখ ঢাকা থাকত। সেই সাথে স্কার্ফও পরতে হতো। এখন যেগুলো পরি, সেগুলোকে আমার আশীর্বাদ বলে মনে হয়। আমি বুড়ো হতে পারি, কিন্তু তাই বলে নতুন আবিষ্কার দেখে নাক সিঁটকাই না!' কথা শেষ করে একটা বাস্কেট এগিয়ে দিল লোকটা। স্থানীয়ভাবে বানানো পনীর, বোতল, পাত্র আর অনেকগুলো সালামী দিয়ে ভর্তি ওটা। 'ক্রিসমাসের পরেরদিন শুভ হোক,' বলল সে। লোকটার নাক, গলা আর কান লাল হয়ে আছে। 'শুনলাম, এরইমাঝে নাকি ম্যাবেলের প্যাস্টির স্বাদ নিয়েছ? তাই আমাদের শহরের অন্যান্য নামকরা জিনিস নিয়ে এলাম।'

'অনেক অনেক ধন্যবাদ।' বলল শ্যাডো।

'আরে না, ধন্যবাদের কি আছে? আর ওছাড়া, সামনের সপ্তাহে তোমাকে বেশ কয়েকটা লটারি টিকিট ধরিয়ে দেব। চেম্বার অফ কমার্স ওটার ব্যবস্থাপনায় আছে, আর আমি রয়েছি চেম্বার অফ কমার্সের ব্যবস্থাপনায়। গত বছর আমরা প্রায় সতেরো হাজার ডলার তুলেছিলাম, লেকসাইড হাসপাতালের শিশু বিভাগকে দিয়েছি সব টাকা।'

'তাহলে এখনই দিন, কিনে নেই।'

'ক্ল্যাংকার, মানে হ্রদের উপরে গাড়িটা না রাখা পর্যন্ত আমরা টিকিট বিক্রি শুরুই করব না।' বললেন হিনজেলমেন। শ্যাডোর জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি। 'বাইরে খুব ঠান্ডা, কাল রাতে সম্ভবত পঞ্চাশ ডিগ্রী কমেছে তাপমাত্রা।'

'খুব দ্রুতই তাপমাত্রা কমতে শুরু করেছে।' একমত হলো শ্যাডো।

'প্রাচীনকালে কিন্তু এর চাইতেও বেশি ঠান্ডা পড়ত।' বললেন হিনজেলমান। 'বাবার মুখে শুনেছি।'

'এরচেয়েও ঠান্ডা!'

'হ্যাঁ। আসলে তখন মানুষজন প্রার্থনা করত যেন অনেক বেশি ঠান্ডা হয়। বিশেষ করে সেটলাররা। হাজার হলেও, খাবারের অনেক কমতি ছিল তখনও। চাইলেই তো আর ডেভের দোকানে গিয়ে ইচ্ছামতো খাবার কেনা যেত না। আমার দাদার সময়কার গল্প বলি শোন–এরকম ঠান্ডা পড়লে তিনি আমার দাদী, তাদের বাচ্চা মানে, আমার চাচা-বাবা-ফুপুকে নিয়ে চলে যেতেন ক্রিকের ধারে। সাথে অবশ্য তার কর্মচারী মেয়েটা আর ভাড়াটে কাজের লোকও যেত। সবাইকে রাম আর কিছু জড়ি-বুটি খেতে দিতেন তিনি। তারপর ক্রিকের পানি ঢালতেন সবার মাথায়। কয়েক সেকেণ্ডের মাঝেই জমে যেত সবাই, একদম আইসক্রিমের মতোই ঠান্ডা আর নীল বর্ণ ধারণ করোট। এরপর সবাইকে আগে থেকে খুঁড়ে রাখা গর্তে শুইয়ে খড় আর কাঠের গুঁড়ি ব্যবহার করে ঢেকে দিতেন। গর্তটার মুখে বিছিয়ে রাখতেন কাঁটাতার পেঁচানো কাঠের তক্তা দিয়ে। ইঁদুর, নেকড়ে আর ভালুককে দূরে রাখার জন্যই করতে হতো কাজটা। হোডাগের কথা নাহয় বাদই দিলাম, প্রানিটাকে অনেকে অবশ্য পৌরাণিক বলে। তবে আমি বাজে গল্প বলার মতো মানুষ নই বলে তোমাকে সেসব শোনালাম না।

'যাই হোক, কাজ শেষ করে আমার দাদা শীতের বাকিটা কাটিয়ে দিতেন আরামে। না খাবারের কমতি পড়ত, আর না আগুন জ্বালাবার উপকরণের। বসন্তের আগমন দেখতে পেলে তিনি চলে যেতেন গর্তটার কাছে। বরফ খুঁড়ে বের করতেন সবাইকে। এরপর আগুনের সামনে তাদেরকে রেখে দিতেন গলবার জন্য। কেউ আপত্তি করত না। তবে একবার কর্মচারী বেচারার কান ইঁদুরে খেয়ে নেয়ায়, লোকটা কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়েছিল। আসলে দোষটা আমার দাদার, কাঠের তক্তাগুলো দিয়ে আসলে ঠিকমতো গর্তের মুখটা ঢেকে দেননি সেবার। সত্যিকারের শীত ঋতু ছিল তখন। তাই এভাবে সহজেই জমিয়ে রাখা যেত মানুষকে। আজকের এইসব শীত আসলে কিছুই না।'

'তাই নাকি?' জানতে চাইল শ্যাডো। হিনজেলমানের বানানো গল্প শুনে মনে মনে হাসলেও মুখে হাসির কোন লক্ষণ নেই।

'সেই ঊনচল্লিশ সালের পর আর কড়া শীত দেখেনি আমরা। তুমি তখন একেবারেই বাচ্চা ছিলে, মনে করতে পারার কথা না। গাড়ি কিনেছ দেখলাম।'

'হ্যাঁ, কেমন মনে হলো?'

'সত্যি বলতে কী, আমার কখনওই ওই গুন্ডার ছেলেটাকে পছন্দ হয়নি। এখন অবশ্য সে গ্রিন বে'তে আছে, ফিরেও আসবে অতি দ্রুত। দুনিয়াতে ন্যায়বিচার বলে কিছু থাকলে, ওই ছেলেটাও শীতের সময়ে পালিয়ে যাওয়াদের দলে নাম লেখাত। কিন্তু আফসোস, ন্যায়বিচার বলে কিছু নেই পৃথিবীতে।'

শ্যাডোর বাস্কেটের জিনিসগুলো কাউন্টারের উপর সাজিয়ে রাখতে শুরু করলেন তিনি। 'ক্যাথরিন পাউডারমেকারের ক্র্যাবঅ্যাপেল জেলি এনেছি। প্রতিবছর ক্রিসমাসের সময় একটা করে বোতল উপহার দেয় আমাকে। একটা বোতলও খোলা হয়নি কখনও। তাই ভাবলাম, তোমার জন্য একটা আনা যাক।'

'শীতের সময় পালিয়ে যাওয়া মানে?'

'উম,' উলের ক্যাপটা ঠেলে কানের উপর ওঠালেন বৃদ্ধ। গোলাপি আঙুল দিয়ে কপাল ঘষতে ঘষতে বললেন। 'লেকসাইডের বিশেষত্ব না কিন্তু ব্যাপারটা। আমাদের শহরটা ভালো, বেশ ভালো। কিন্তু সমস্যা যে একেবারেই নেই, তা কিন্তু না। শীতের সময় মাঝে-সাঝেই দেখা যায়, কোন ছেলে বা মেয়ে একটু পাগল হয়ে গিয়েছে। তখন এমন ঠান্ডা পড়ে যে বাইরে যাওয়াটা মুশকিল হয়ে যায়। তাই...'

'ওরা শহর ছেড়ে পালায়?'

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন হিনজেলমান। 'আমি দোষ দেব টেলিভিশনকে। ডালাস...ডাইনেস্টি এসব দেখিয়ে দেখিয়ে ওদের মাথা খারাপ করে ফেলেছে। সেই তিরাশি সালের পর থেকে আমি বাসায় টিভি রাখিনি। একটা সাদা-কালো অবশ্য আছে। মাঝে মাঝে মানুষজন বাইরে থেকে এলে খেলা-টেলা দেখতে চায়। এছাড়া ক্লজিটেই থাকে।'

'কিছু দেব?'

'কফি লাগবে না, পেটে ব্যথা শুরু হয়। শুধু পানি দিলেই চলবে।' মাথা নাড়লেন হিনজেলমান। 'এদিককার সবচেয়ে বড় সমস্যাটা কি জানো? দরিদ্রতা। মহামন্দার সময়কার মতো খারাপ অবস্থা এখনও হয়নি...কিন্তু এখনকার দরিদ্রতার মধ্যে কী যেন অশুভ একটা ব্যাপার আছে। তেলাপোকার মতো...'

'আচমকা, কিছু জানান না দিয়ে চলে আসে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক তেমন। কাঠ কেটে আয় করার উপায় নেই, খনিগুলোর অবস্থা ভালো না। এদিকে পর্যটকও আসে না। মাঝে-মধ্যে যে দু-একজন আসে, তারাও দেখা যায় শিকারি। বনের ভেতরেই থাকে। শহরে এসে টাকা উড়ায় না।'

'লেকসাইডকে অবশ্য উন্নয়নশীল শহর বলেই মনে হয়।'

বৃদ্ধের নীল চোখের তারায় হাসি খেলা করে গেল। 'অনেক কষ্ট করতে হয়েছে এর পেছনে,' বললেন তিনি। 'এখনও হয়। তবে শহরটা ভালো। সবাই মিলে এর উন্নতির জন্য কোন না কোন অবদান রাখছে। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখনকার মতো গরীব পরিবার এখন আর দেখা যায় না।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল শ্যাডো, হাসি চেপে রেখে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে পারে না এমন ভঙ্গিতে জানতে চাইল, 'আপনি যখন ছোট ছিলেন, তখনকার গরীব পরিবাররা কেমন ছিল, মি. হিনজেলমান?'

'শুধু হিনজেলমান বললেই হবে, মাইক। আমরা এত গরীব ছিলাম যে আগুন ধরাবার কাঠ পর্যন্ত কিনতে পারতাম না! নিউ ইয়ার্স ইভে আমার বাবা ঝাল পেপারমিন্ট মুখে দিতেন। তারপর তা দেহ এমন গরম হয়ে যেত যে আমর, মানে বাচ্চারা, তাকে ঘিরে ধরে পোহাতাম!'

হাসি চাপতে গিয়ে পুরোপুরি সফল হলো না শ্যাডো, মৃদু শব্দ বেরিয়ে এলো। সন্তুষ্ট হিনজেলমান তার মুখোশ আর ভারী কোট পড়ে নিয়ে পকেট থেকে গাড়ির চাবি বের করে আনলেন। সবার শেষে হাতে গলালেন গ্লাভসজোড়া। 'একা একা বিরক্ত লাগলে, দোকানে এসে আমার খোঁজ করো। আমার বড়শির কালেকশন দেখাব। এমন বিরক্ত লাগবে যে এরপর আর একা একা থাকতে কষ্ট হবে না।'

'ঠিক আছে,' হাসি মুখে বলল শ্যাডো। 'টেসি কেমন আছে?'

'শীতনিদ্রায় পাঠিয়ে দিয়েছি, বসন্তের আগে আর ওর ঘুম ভাঙাচ্ছি না। সাবধানে থেকো, মি. আইনসেল।' দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

ধীরে ধীরে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরের শীতলতা সন্থের বাইরে চলে যাচ্ছে।

কোট আর গ্লাভস পরে নিল শ্যাডো। এরপর বুটজোড়া পায়ে দিয়ে তাকাল জানালা দিয়ে। ভেতরের কাঁচে এই পরিমাণ বরফ জমেছে যে বাইরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে না। এমনকি ওর শ্বাসও বাতাসে মেঘের সৃষ্টি করছে!

কী ভেবে পাশের অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় নক করল ও। মহিলার কণ্ঠ ভেসে এলো ভেতর থেকে, ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে টেলিভিশনের আওয়াজ কমাতে বলছে। বাক্যের শব্দ আর কণ্ঠের সুর শুনে শ্যাডো বুঝতে পারল, কথাগুলোর উদ্দেশ্য কোন বাচ্চা। প্রাপ্ত বয়স্করা আরেকজন প্রাপ্ত বয়স্কের সাথে এই সুরে কথা বলে না। দরজা খুলে ভেতর থেকে উঁকি দিল ঘন কালো আর অনেক লম্বা চুলওয়ালা এক মহিলা, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ।

'বলুন?'

'কেমন আছেন, ম্যাডাম? আমি মাইক আইনসেল, আপনার পাশের অ্যাপার্টমেন্টে উঠেছি।'

এক বিন্দু পরিবর্তন এলো না মহিলার চেহারায়। 'তো?'

'ম্যাম। আমার অ্যাপার্টমেন্টটা যেন জমে গিয়েছে। হিটার থেকে অল্প কিছুটা উত্তাপ আসছে বটে, কিন্তু কাজ হচ্ছে না।'

শ্যাডোর মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক নজর বুলাল মহিলা, আস্তে আস্তে মুখে দেখা গেল হাসি। 'তাহলে ভেতরে এসো, নইলে আমাদের অ্যাপার্টমেন্টেও উত্তাপ থাকবে না।'

আমন্ত্রণ পেয়ে ভেতরে প্রবেশ করল ও। প্রথমেই দেখতে পেল মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা রঙের প্লাস্টিকের গাড়ি। দেয়ালের সাথে কিছু র‍্যাপিং পেপারও দেখতে পেল, সেই সাথে দেখতে পেল একটা ছোট্ট ছেলেকে। টিভির মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে বসে এক মনে ডিজনির হ্যারকিউলিস দেখছে সে। টিভির দিকে পিঠ দিয়ে বসল শ্যাডো।

'কী করতে হবে বলছি, শোন।' আন্তরিকতার আভাসটা সম্বোধন পরিবর্তনের সাথে টের পেল শ্যাডো। 'প্রথমে জানালাগুলো সীল করে ফেলতে হবে। হেনিং-এর দোকানে গেলেই কিনতে পাবে প্রয়োজনীয় উপকরণ। ভালোমতো একবার করতে পারলেই, সারা শীত আর অসুবিধা হবে না। এরপর স্পেস হিটার কিনতে হবে, দুইটা হলে ভালো হয়। এই বিল্ডিঙয়ের ফার্নেসটা অনেক পুরনো। ঠান্ডার সাথে তাল মিলাতে পারে না, তবে বিগত কয়েকটা শীতে খুব একটা কষ্ট হয়নি আমাদের।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে হাত বাড়িয়ে দিল সে, 'আমি মার্গারিতা ওলসেন।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' হাত থেকে গ্লাভস খুলে করমর্দন করল শ্যাডো। 'কিছু মনে করো না ম্যাম, আমি জানতাম ওলসেনরা স্বর্ণকেশী হয়।'

'আমার প্রাক্তন স্বামী তাই ছিল।'

'মিসি গুন্থারের কাছে শুনলাম, তুমি স্থানীয় পত্রিকায় সাংবাদিকতা করো?'

'মিসি গুন্থার সবাইকে সবকিছু বলে বেড়ায়। ও যেহেতু আছে, তাই স্থানীয় কাগজের কোন দরকার আছে বলে মনে হয় না।' নড করল মহিলা। 'মাঝে-মধ্যে কিছু সাংবাদিকতা করি। তবে আমার সম্পাদক সাধারণত অধিকাংশ খবর লেখেন। আমি প্রকৃতি, বাগান আর মতামতের কলামে লিখি। প্রতি রবিবার একটা করে বিশেষ কলাম লিখতে হয়-স্থানীয় সংবাদ। আশেপাশের পনেরো মাইলের মধ্যে কোনজনের সাথে কে ডিনার খেল, সেটাই লিখতে হয়। নাকি কার সাথে কে হবে?'

'কার সাথে কে,' বলে ফেলল শ্যাডো। 'ভালো শোনায়।'

কালো চোখজোড়া দিয়ে শ্যাডোর দিকে তাকাল মহিলা। **শ্যাডোর কেন যেন** মনে হলো, ওই চোখজোড়া আগেও কোথাও দেখেছে।

কার কথা যেন মনে পড়তে চাইছে ওর।

'যাই হোক, অ্যাপার্টমেন্ট গরম রাখতে চাইলে কাজগুলো করতে পারো।' বলল মহিলা।

'ধন্যবাদ, কাজ শেষ হবার পর তোমার আর তোমার ছেলের দাওয়াত রইল।'

'ওর নাম লিওন,' জানাল মার্গারিতা। 'তোমার সাথে পরিচিত হয়ে ভালো লাগল, মিস্টার...কী যেন নাম বললে?'

'আইনসেল, মাইক আইনসেল।'

'আইনসেল আবার কেমন নাম?'

শ্যাডোর কোন ধারণাই নেই। 'আমার নাম ওটাই। কেন এই নাম আমার ভাগ্যে জুটল, তা অবশ্য জানি না। পারিবারিক ইতিহাসে আমার আগ্রহ ছিল না কখনওই।'

'নরওয়েজিয়ান হতে পারে।' আন্দাজ করল মেয়েটা।

'পারে, তবে একটু দূরত্ব ছিল পরিবারের সাথে।' বলেই চাচা এমারসন বোরসনের কথা মনে পড়ে গেল ওর। 'মানে মায়ের দিকের সাথে।'

মি. ওয়েনসডে যখন এলেন, তখন শ্যাডোর জানালা সীল করা শেষ। এমনকি শোবার ঘরটায় একটা আর বসার ঘরে আরেকটা স্পেস হিটার বসানোর কাজও শেষ। এখন অ্যাপার্টমেন্টটাকে আরামদায়ক বলাই যায়!

'ওই বাজে গাড়িটা কোথায় পেলে?' প্রথমেই জানতে চাইলেন ওয়েনসডে।

'আপনি আমার রদ্দিমাল দখল করলেন, তাই আমার আর কী-ই বা করার ছিল?' পাল্টা প্রশ্ন করল শ্যাডো। 'যাই হোক, ওটা কই?'

'ডালাথে বদলে নিয়েছি।' জানালেন ওয়েনসডে। 'সাবধানের মার নেই। চিন্তা করো না, তোমার ভাগ পেয়ে যাবে।'

'আমি এখানে কী করছি?' জানতে চাইল শ্যাডো। 'মানে, লেকসাইডে এলাম কেন?'

হাসলেন ওয়েনসডে, যে হাসি দেখলে তার মুখে ঘুষি বসাতে মন চায় শ্যাডোর-সেই হাসি। 'তুমি এখানে আছ, কেননা তোমাকে এখানে কেউ খুঁজতে আসবে না। সবার নজর এড়িয়ে এখানে তোমাকে রাখতে পারব।'

'কেউ বলতে কি ওই 'কিম্ভূত'দের বোঝাতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ। হাউজ অন দ্য রকে এখন আর পা রাখা যাবে না। একটু সমস্যা হচ্ছে আমাদের, তবে সামলে নিতে পারব। এখন আসল খেলা শুরু হবার আগে কেবলই নাক ফোলানো আর পেশি দেখানোয় মন দিতে হবে। সত্যি বলতে কী,

আমরা গোলমালটা আরও আগে শুরু হবে বলেই ধরে নিয়েছিলাম। যাই হোক, বসন্তের আগে বড় ধরনের কিছু হবে বলে মনে হয় না।'

'কেন?'

'কেননা মুখে ওরা যতই মাইক্রোমিলিসেকেন্ড আর ভবিষ্যতের গল্প শোনাক না কেন, থাকতে তো হয় এদেশেই। আর সেই সাথে মেনেও চলতে হয় বছরের ঋতু-পরিক্রমা। এই মাসগুলোকে 'মরা মাস' বললেও অত্যুক্তি হবে না। এখন না লড়াই করে লাভ হবে, আর না সেই লড়াইতে জিতে।'

'আপনি কি বলছেন, তা কিছুই বুঝতে পারছি না।' বলল শ্যাডো। কথাটা অবশ্য পুরোপুরি সত্যি নয়। তবে যা বুঝতে পারছে, তা মিথ্যা হোক এটা মনেপ্রাণে চাইছে ও।

'শীতটা খুব খারাপ কাটবে। আমাদের সময়টাকে তাই খুব হিসাব করে খরচ করতে হবে। যুদ্ধের জন্য দল ভারী করতে হবে আমাদের।'

'ঠিক আছে।' ওয়েনসডে যে তাকে সত্যি...অন্তত অর্ধ-সত্য বলছেন সেটা ও বুঝতে পারছে। লড়াই অবশ্যম্ভাবী। নাহ ভুল হলো, লড়াই তো চলছেই। যুদ্ধের অপেক্ষা এখন। 'পাগলা সুইনির কাছে শুনলাম, বারে যেদিন ওর সাথে আমার দেখা হয়, সেদিন নাকি আপনার আদেশই পালন করছিল?'

'তোমার কি মনে হয়, ওরকম একটা মুষ্টিযুদ্ধে যে হারে, তাকে আমি দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ দেব? তবে দুশ্চিন্তা করো না, তোমার উপর আমার যে বিশ্বাস ছিল তা একেবারে অটুট আছে। ভালো কথা, কখনও লাস ভেগাসে গিয়েছ?'

'নেভাডার লাস ভেগাস?'

'হুম।'

'না।'

'আমরা আজরাতেই ম্যাডিসন থেকে বিমানে উঠব। চার্টার করা বিমান, বুঝলে? বড়লোকের কাজ-কারবার বলে কথা! আমার কথা শুনে বুঝতে পেরেছে ওই ফ্লাইটে তোমাকে-আমাকে ওর রাখা উচিৎ।'

'মিথ্যা বলতে কখনও ক্লান্ত লাগে না আপনার?' জানতে চাইল শ্যাডো, সত্যিকার অর্থেই কৌতূহলবোধ করছে।

'একদম না। আর তাছাড়া, মিথ্যা বলিনি তো। যাই হোক, রাস্তা পরিষ্কার আছে। ম্যাডিসনে যেতে বেশি সময় লাগবে না। দরজা বন্ধ করে হিটার অফ করে দাও। বেখেয়ালে পুরো দালান জ্বালিয়ে দাও, তা আমি চাই না।'

'লাস ভেগাসে কার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি আমরা?'

জানালেন ওয়েনসডে।

হিটার বন্ধ করে একটা ব্যাগে কিছু কাপড় ভরে নিল শ্যাডো। তারপর ওয়েনসডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখুন, নিজেকে আমার বোকা মনে হচ্ছে। কার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি, তা বলেছেন। কিন্তু মনে করতে পারছি না! আজব! যাই হোক, নামটা আবার বলবেন?'

আবার বললেন ওয়েনসডে।

এবার প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছিল শ্যাডো, ঠোঁটের আগায় চলে এসেছিল নামটা। কিন্তু না, তা-ও পুরোপুরি মনে করতে পারল না। হাল ছেড়ে দিল বেচারা।

'গাড়ি চালাবে কে?' জানতে চাইল বরং।

'তুমি।' বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পার্ক করে রাখা লিংকন টাউন কারে চড়ে বসল দুজন।

তারপর গাড়ি চালিয়ে দিল শ্যাডো।

ক্যাসিনোর এক ধরনের আলাদা আকর্ষণ আছে, যা ওতে পা রাখা মাত্র বোঝা যায়। চারিদিক থেকে যেন প্রলোভন ঘিরে ধরে প্রবেশকারীকে। কেউ একইসাথে পাথর দিয়ে নির্মিত, হৃদয়হীন, পাষাণ আর একেবারে নির্লোভ না হলে সেই প্রলোভনের হাতছানিকে উপেক্ষা করতে পারে না। মেশিনগানের মতো স্লট মেশিন থেকে বের হতে থাকা পয়সার ঝনঝনানি কে অগ্রাহ্য করতে পারে? কে পারে রুলেট বা অন্য কোন তাস খেলার টেবিল থেকে ভেসে আসা আনন্দধ্বনি শুনেও না শোনার ভান করতে? জুয়াড়িদের কথা নাহয় বাদই দেয়া গেল!

এসব ক্যাসিনো কিন্তু আসলে একটা গোপন রহস্যের রক্ষক! যে গোপন কথাটা তাদের কাছে সবচেয়ে দামি, প্রাণ-ভোমরা। বিজ্ঞাপনে যা-ই বলা হোক না কেন আর যা-ই দেখানো হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে কোন জুয়াড়িই জিতে ক্যাসিনো থেকে বেরোতে পারে না! একথা সম্ভবত জুয়াড়িরাও আঁচ করতে পারে, তবে প্রলোভন দেখানো দরজাগুলোর উদাত্ত আহ্বানের সামনে ভুলে যায়!

গোপন কথাটা হলো-মানুষ জুয়া খেলে টাকা খোয়াবার জন্য। ওরা ক্যাসিনোর বিশাল দরজা দিয়ে ভেতরে পা রাখে নিজেদেরকে জীবন্ত বলে অনুভব করতে চায় বলে; টাকা দিয়ে তারা কেনে স্লট মেশিন বন্ধ হবার বা রুলেট টেবিলের ঘূর্ণন শেষ হবার মুহূর্ত উপভোগ করার

আনন্দ! হয়তো ঘরে ফিরে এসব লোক গর্ব করে জানায়, ক্যাসিনোকে ধোঁকা দিয়েছে। কিন্তু এদের প্রত্যেকেই একটা মূল্যবান জিনিস দিয়ে আসে ক্যাসিনোকে-তাদের সময়। এক হিসেবে, এটাও এক ধরনের বলিদান।

টাকা এখানে প্রবাহিত হয় নদীর নিরবিচ্ছিন্ন স্রোতের মতো। এক হাত থেকে অন্য হাত, জুয়ারি থেকে ডিলার হয়ে ক্যাশিয়ার, আর সব শেষে গণন কক্ষে। এখানে এসে বিশ্রাম পায় অর্থ; গোণা হয়, লিখে রাখা হয়, গোছান হয়। অবশ্য আজকাল এই কক্ষের দাম ও গুরুত্ব, দুটোই কমে এসেছে। এখন টাকার হাত-বদল নোটে বা চিপসের আকারে হয় না, হয় বাইনারি কোডের শূন্য আর একের আদলে।

আমাদের আলোচ্য গণনা রুমে মানুষ তিনজন, টাকা গোণার কাজে ব্যস্ত সবাই। ক্যামেরা দিয়ে চোখ রাখা হচ্ছে তাদের উপরে। এসব যন্ত্রের কয়েকটা আছে তাদের চোখের সামনে, আবার অনেকগুলোই আছে লুকিয়ে। শিফট মেনে কাজ করতে হয় এই তিনজনকে। একেক শিফটে যে পরিমাণ টাকা গুণতে হয়, সে পরিমাণ সম্ভবত সারা জীবন খেটেও এদের কেউ কামাতে পারবে না। স্বপ্নেও টাকা গোনে তারা, প্রতি সপ্তাহেই পরিকল্পনা করে-কীভাবে ক্যাসিনোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার চোখে ধুলো দিয়ে টাকা চুরি করা যায়। তবে হ্যাঁ, অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বপ্নেই বুঝতে পারে-কাজটা করা তার পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব না। তাই কবর অথবা জেলের ফাঁদে পা না দিয়ে মাসিক বেতন নিয়েই খুশি।

আজ এখানে, এই গণনা কক্ষের নিরাপদ আশ্রয়ে, তিনজন মানুষ মাথা নিচু করে টাকা গোনায় মগ্ন। টাকা এনে দেয় কিছু প্রহরী, আবার ওরা ঠিকমতো কাজ করে কিনা সেদিকেও নজর রাখে। আরেকজন আছে, যাকে উল্লেখ না করলেই নয়। কয়লা রঙের একটা স্যুট পরে থেকে সে, তার চুল কালো, দাড়ি কামানো...চেহারা আর অঙ্গ-ভঙ্গিতে মনে রাখার মতো কিছুই নেই। লোকটা যে ঘরের ভেতরে আছে, সেটা অন্য কারও নজরেই পড়েনি। অথবা নজর পড়লেও, ভুলে গিয়েছে পরমুহূর্তেই।

শিফট শেষ হলে খুলে গেল দরজা। কয়লা-রঙা স্যুট পরা লোকটা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। শক্ত কয়েকটা বাক্সে করে টাকাগুলো নিয়ে যাওয়া হলো ভেতরের একটা লোডিং-বেতে। ওখান থেকে তাদের অবস্থান হলো একটা আর্মাড গাড়ির পেছনে। বাহনটা যখন লাস ভেগাসের রাস্তায় নেমেছে, তখন সবার অলক্ষ্যে সদর দরজা দিয়ে

বেরিয়ে ফুটপাতে পা রাখল কয়লা-রঙ্গা স্যুট পরিহিত ভদ্রলোক; ডানে বা বাঁয়ে, কোন দিকে নজর নেই তার।

লাসভেগাস যেন গড়ে উঠেছে কোন বাচ্চা ছেলের স্কেচ-বুকের আদলে। এখানে গল্পের বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসা একটা দুর্গ তো ওখানে স্ফিংক্স পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পিরামিড, শহরজুড়ে যেন নিওন আলো আর সাইনবোর্ডের খেলা! আলোকবাজির একটা শহর লাস ভেগাস, ঘণ্টায় একবার করে আলো আর আগুন লাফিয়ে ওঠে আকাশ ছুঁতে।

ফুটপাতে খুব সহজেই এগিয়ে যাচ্ছে কয়লা-রঙ্গের স্যুট পরা লোকটা, টাকার প্রবাহ যেন অনুভব করতে পারছে সে। গ্রীষ্মের সময়টায় রাস্তা যেন পরিণত হয়েছে উত্তপ্ত উনুনে, প্রতিটা দোকানের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসা ঠান্ডা বাতাস স্বস্তির পরশ বোলাচ্ছে দেহে। তবে হ্যাঁ, মরুভূমিররাতে যে ঠান্ডা পড়ে, তা ওর ভালোই লাগে। অর্থের প্রবাহ লোকটার মনে মাকড়সার জালের জন্ম দিয়েছে। মরুভূমির এই শহরটাকে ওর ভালো লাগে একটাই কারণে-গতি। অর্থ যখন শহরটার এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়, এক হাত থেকে আসে অন্য হাতে-তখন বেশ ভালো লাগে তার। কেমন যেন নেশা-নেশা ভাব হয়।

যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে একটা ট্যাক্সি লোকটাকে অনুসরণ করে চলছে। প্রথম প্রথম ওটাকে লক্ষ্য করেনি সে, কেউ যে ওকে অনুসরণ করতে পারে সেটা কল্পনাও করেনি। লোকজন তাকে কখনও খেয়াল করে না দেখে, আশেপাশে নজর রাখার কথা সে কল্পনাও করে না।

ভোর চারটায় নিজেকে একটা হোটেল অ্যান্ড ক্যাসিনোতে আবিষ্কার করল লোকটা। অবশ্য ব্যবস্থাপনাটা প্রায় ত্রিশ বছর আগেই পুরনো হয়ে গিয়েছে। বন্ধ হব-হব করছে ওটা, তবে আরও ছয় মাস চালু থাকলেও অবাক হবার কিছু নেই। তখন ওটাকে ধ্বংস করে সে জায়গায় তোলা হবে বিশাল বড় কোন দালান। এখানে কেউ চেনে না ওকে, কেউ মনে রাখে না। তবে লবির বারটা চুপচাপ, শান্ত। পুরনো সিগারেটের ধোঁয়ায় নীল বর্ণ ধারণ করেছে বাতাস। উপরের কোন একটা ঘরে পোকার খেলায় এক মিলিয়ন ডলার বাজি ধরতে যাচ্ছে এক জুয়াড়ি। বারে বসল লোকটা, ওয়েট্রেসরাও পর্যন্ত ওর দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না। গান বাজছে কোথাও, বসে বসে বারের টিভিতে ফুটবল খেলা দেখছে পাঁচজন 'নকল' এলভিস প্রিসলি।

তার পাশে এসে বসল হালকা ধূসর স্যুট পরিহিত বিশালদেহি এক মানব। নতুন আসা এক লোকটাকে দেখে এগিয়ে এসে তার কাছে এলো এক ওয়েট্রেস। মেয়েটা এতটাই চিকন যে তাকে খুব একটা সুন্দরী বলা চলে না। কাজটা যে সে পছন্দ করে না, তা-ও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। মেয়েটাকে দেখে হাসল নবাগত। 'তোমাকে আজ দেখে খুব ভালো লাগছে, প্রিয়া।' বড় অঙ্কের একটা বখশিশ পাবার আসায় দাঁত বের করে হাসল মেয়েটাও। সদ্য আগত লোকটা নিজের জন্য এক গ্লাস জ্যাক ড্যানিয়েল'স এবং অন্যজনের জন্য এক গ্লাস পানি মিশ্রিত ল্যাফোইগের অর্ডার দিল।

'এই দেশের ইতিহাসে,' মদ এলে বলল নবাগত। 'সবচেয়ে সুন্দর পঙতি কোনটা ছিল, জানো? সেই ১৮৫৩ সালে কয়েকটা কথা বলেছিল কানাডা বিল জোনস, ব্যাটন রুঁঝে। পাতানো কারো খেলায় লোকটার পকেট কাটা হচ্ছিল। কানাডা বিলের মতোই আরেকজন ছিল জর্জ ডেভল, তবে জুয়ায় তার মতো আসক্ত ছিল না। বিলকে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে জানতে চেয়েছিল সে, খেলাটা যে পাতানো, তা কি বিল বুঝতে পারছে না? দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটাই কথা বলেছিল লোকটা, 'আমি জানি। কিন্তু এই শহরে যে আর কোন খেলা নেই!' আর কথা না বাড়িয়ে পাতানো খেলাতেই ফিরে গিয়েছিল লোকটা।'

কালো একজোড়া চোখ অবিশ্বাস নিয়ে ধূসর স্যুট পরিহিত লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছু একটা বলল কয়লা-রঙা স্যুটের লোকটা। নবাগত, লালচে দাড়ি ভর্তি থুতনিটা নাড়াল।

'দেখো,' বলল সে। 'উইসকনসিনের ব্যাপারটার জন্য ক্ষমা চাইছি। তবে কোন সমস্যা ছাড়া কি আমি ওখান থেকে তোমাদেরকে বের করে আনিনি?'

উত্তর এলো না কোন। তবে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর কিছুটা একটা জানতে চাইল লোকটা।

'জানি না। সবকিছু আমার আশার চাইতে বেশি দ্রুত ঘটছে। আমি যে যুবককে ভাড়া করেছি, সবাই কেন জানি ওর পেছনে লেগেছে। ওকে বাইরে, ট্যাক্সিতে বসিয়ে রেখেছি। আমার প্রস্তাবে রাজি আছ?'

উত্তর দিল কয়লা-রঙা লোক।

নবাগত মাথা নাড়াল। 'গত দুইশ বছরে কেউ মহিলাকে দেখেনি। হয় মারা গিয়েছে সে, নয়তো আত্মগোপন করে আছে।'

কিছু একটা বলা হলো নবাগতকে।

'দেখ,' উত্তর দিল নবাগত। 'আমাদের যখন দরকার হবে, তখন যোগ দেবে। বিনিময়ে তোমার যা চাই, তা পাবে। কী চাও? সোমরস? সত্যিকারের একটা বোতল দিতে পারি তোমাকে।'

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল চুপ-চাপ লোকটা। এরপর নড করে কিছু একটা বলল।

'অবশ্যই,' উত্তর দিল নবাগত, হাসিটা এতই তীক্ষ্ণ যে ছুরিও হার মানবে। 'এছাড়া আর কি? কিন্তু ব্যাপারটাকে এভাবে দেখ-এই শহরে যে আর কোন খেলা নেই!' হাত বাড়িয়ে অন্য লোকটার বাহুতে চাপড় দিল লোকটা।

শুকনো ওয়েট্রেস এগিয়ে এলো ওদের দিকে, অবাক হয়ে লক্ষ্য করল-মাত্র একজন বসে রয়েছে টেবিলে। লোকটার পরনে কয়লা-রঙা স্যুট, মাথায় কালো চুল। 'সব ঠিক আছে তো?' জানতে চাইল মেয়েটা। 'তোমার বন্ধু ফিরে আসবে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোকটা। ওর বন্ধু যে আর আসবে না তা বলল, মেয়েটাকে হতাশ করে জানাল-কোন বখশিশ অপেক্ষা করছে না ওর জন্য। মেয়েটার চোখে দুঃখ দেখে দয়া হলো বেচারার। অর্থের প্রবাহ কল্পনা করল মনে, একটা ফাঁকা স্থান দেখতে পেয়ে জানাল-ট্রেজার আইল্যান্ডের বাইরে, ঠিক সকাল ছয়টায় যদি মেয়েটা থাকতে পারে তো ডেনভার থেকে আগত এক ক্যান্সার-চিকিৎসককে পাবে। লোকটা সদ্যই চল্লিশ হাজার ডলার কামিয়েছে। খরচ করার জন্য কোন সাহায্যকারী খুঁজছে সে, আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে বিমানে ওঠার আগেই পুরোটা খরচ করে ফেলতে চায়।

শব্দগুলো প্রায় সাথে সাথেই ভুলে গেল মেয়েটা, তবে ভালোলাগার অনুভূতিটা রয়ে গেল। আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল, কালো রঙের স্যুট পরা লোকটা তাহলে বিল না চুকিয়েই ভেগে গিয়েছে। ঠিক করল, শিফট শেষ হবার পর ট্রেজার আইল্যান্ডে যাবে ও। কেন, তা জানে না! জিজ্ঞাসা করলেও বলতে পারবে না!

'কার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন?' ফেরার পথে জানতে চাইল শ্যাডো। শহরটা এমন যে এমনকি বিমান বন্দরেও আছে কয়েকটা স্লট মেশিন। এখনও ভোর, তবে ওগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে অনেকেই, পয়সা খাওয়াচ্ছে মেশিনগুলোকে। এই বন্দরে সারাদিন পড়ে থাকে নাকি ওরা? ভাবল শ্যাডো। এমনও তো হতে পারে যে কেউ বন্দরে নেমে স্লট মেশিন নিয়ে মেতে গেল?

সাথে আনা সব পয়সা শেষ করে বন্দর থেকেই ফিরে গেল বাড়িতে! হতে পারে না?

আচমকা উপলব্ধি করল, ওয়েনসডে কথা বলছেন এখনও। শ্যাডোর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তিনি, কিন্তু ও শোনেনি।

'আমাদের দলে নাম লিখিয়েছে,' বললেন ওয়েনসডে। 'অবশ্য আমার এক বোতল সোমরস খরচ হবে।'

'সোমরস কী?'

'এক ধরনের পানীয়।' ভাড়া করা বিমানটার দিকে এগিয়ে গেল ওরা। ওদের আর অন্য তিনজন খরুচে লোকের বিমান ছাড়া বন্দরটা খালি।

আরাম করে বিমানের আসনে হেলান দিলেন ওয়েনসডে, নিজের জন্য জ্যাক ড্যানিয়েল'সের অর্ডার দিলেন তিনি। 'আমার মতো যারা আছে, তারা তোমাদের মতো মানুষকে ভাবে...' ইতস্তত করলেন ওয়েনসডে। '...ব্যাপারটা অনেকটা মধু আর মৌমাছির মতো। প্রতি মৌমাছি অল্প, অল্প...বিন্দু বিন্দু করে মধু জমায়। তোমার নাস্তার টেবিলে মধু-ভর্তি যে পাত্রটা আছে, সেটুকু জমা করতে হয়তো এরকম লাখ লাখ বিন্দুর প্রয়োজন পড়েছে। আমাদের জন্যও ব্যাপারটা অনেকটা সেরকম...আমরা তোমাদের বিশ্বাস, তোমাদের প্রার্থনা আর তোমাদের ভালবাসার উপর নির্ভর করে বেঁচে আছি।'

'তাহলে সোমরস কী?'

'বোঝাবার স্বার্থেই বলি, সোমরস হচ্ছে মধু দিয়ে তৈরি মদ।' মুচকি হাসলেন তিনি। 'ওটা একধরনের পানীয়। প্রার্থনা আর বিশ্বাসকে ঘন করে বানানো হয়েছে।'

বিমান এখন নেব্রাস্কার কোথাও আছে। আচমকা শ্যাডো বলল, 'আমার স্ত্রী।'

'তোমার মরহুমা স্ত্রী?'

'লরা। ও আবার বেঁচে উঠতে চায়। কিম্ভূতদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করার পর তো তাই বলেছিল।'

'ভালো স্ত্রীর তেমনটাই হওয়া উচিৎ। তোমার আসলে নিজ স্ত্রীকে আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরা উচিৎ, আইনসেল।'

'কাজটা কি সম্ভব? মানে ওকে বাঁচিয়ে তোলাটা?'

অনেকক্ষণ কিছু না বলে চুপ করে রইলেন ওয়েনসডে। ওর সন্দেহ হচ্ছে, ভদ্রলোক সম্ভবত কিছু শুনতেই পাননি। আর নয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন! ওকে চমকে দিয়ে আচমকা কথা বলে উঠলেন ওয়েনসডে। 'আমি এমন এক মন্ত্র

জানি, যেটা ব্যথা মিটিয়ে দিতে পারে; সুস্থ করে দিতে পারে যেকোন অসুস্থতা; অন্তর থেকে মিটিয়ে দিতে পারে দুঃখ।

'আমি এমন এক মন্ত্র জানি, যেটা আরোগ্য এনে দিতে পারে কেবলমাত্র স্পর্শের মাধ্যমে।

'আমি এমন এক মন্ত্র জানি, যেটা যেকোন শত্রুর অস্ত্র নষ্ট করে দিতে পারে।

'আরেকটা মন্ত্র আছে, যেটা উচ্চারণ করা মাত্র আমি মুক্ত হব সব ধরনের বাঁধন থেকে।

'পঞ্চম যে মন্ত্র জানি, সেটা পড়লে কী হবে বলব? বাতাস থেকে তুলে নিতে পারি ছুঁড়ে দেয়া তীর।'

অন্য রকম একটা গাম্ভীর্য খেলা করছে ভদ্রলোকের কণ্ঠে। একটু আগের আমুদে ভাব উধাও হয়ে গিয়েছে। এমনভাবে কথা বলছেন তিনি, যেন কোন ধর্মীয় বই থেকে পড়ছেন।

'ছয় নাম্বার মন্ত্রটা আমাকে কোন ব্যথা দেবে না। উল্টো ব্যথা পাবে আমার আঘাতকারী।

'আমি এমন এক মন্ত্র জানি, আগুনের দিকে মাত্র এক নজর তাকানো মাত্র যেটা নিভিয়ে দিতে পারে সবকিছু।

'আট নাম্বার মন্ত্রটা পড়ার সাথে সাথে, আমাকে ঘৃণা করা লোকটাও পরিণত হবে খুব কাছের বন্ধুতে।

'নয় নাম্বার মন্ত্র বাতাসকে শান্ত করার জন্য। ঝড় থেমে যায় সেই মন্ত্র শুনে।

'ওই নয়টা মন্ত্র শিখেছি আমি সবার আগে। নয় দিন ধরে একটা গাছে ঝুলছিলাম, আমার পাশে ঢুকে ছিল একটা বর্শার ফলা। ঠান্ডা বাতাস আমাকে দুলিয়েছে, যেমন দুলিয়েছে গরম বাতাস! আমার পান করার মতো পানি ছিল না, ছিল না খাওয়ার মতো কোন খাবার। নিজেকে উৎসর্গ করেছিলাম নিজেরই উদ্দেশ্যে। ফলশ্রুতিতে সারা দুনিয়া যেন খুলে গিয়েছিল আমার সামনে।

'দশম মন্ত্রটা আমি শিখেছিলাম ডাইনিদের তাড়িয়ে দেবার জন্য। ওদেরকে এমনভাবে ভুলিয়ে দিয়ে পারি সবকিছু যে নিজের ঘরের পথটাও চিনতে পারে না।

'এগারো নম্বর মন্ত্র যদি আমি যুদ্ধের মাঝখানে গাই, তাহলে সৈন্যরা বিন্দুমাত্র আঘাত সহ্য না করেই ফিরে আসে তাদের ঘরে।

'আমি এমন এক মন্ত্র জানি, যেটা আমাকে দেয় বিশেষ ক্ষমতা। ফাঁসি-কাষ্ঠ থেকে ঝোলা মানুষও আমাকে জানিয়ে দেয় মৃত্যুর ওপাশের গল্প।

'তেরো নাম্বার মন্ত্রটা পড়ে যদি কোন বাচ্চার মাথার উপর পানি ছিটিয়ে দেই, তাহলে সে বড় হয়ে অপরাজেয় এক সৈনিক হবে।

'চোদ্দ নাম্বারটা আমাকে মনে রাখতে সাহায্য করে সব দেবতার নাম। একেবারে সব!

'আমি নিজে স্বপ্ন দেখি ক্ষমতা, শৌর্য, জ্ঞানের। আর পনেরো নাম্বার মন্ত্রটা মানুষকে বাধ্য করে আমার স্বপ্নে বিশ্বাস করতে।'

ওয়েনসডের কণ্ঠ এতটা নিচু হয়ে গিয়েছে যে বিমানের আওয়াজ ছাপিয়ে সেটা শুনতে কষ্ট হচ্ছে শ্যাডোর।

'ষোলো নাম্বারটার কথা বলি-চাইলে যেকোন মেয়েকে পটাতে পারি আমি।

'সতেরো নাম্বার, একবার আমার সাথে প্রেম করার পর আর কেউ কোন মহিলাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না।

'আঠারো নাম্বার যে মন্ত্রটা জানি, সেটা অন্য সবগুলোর চাইতে সেরা। এই মন্ত্রের ব্যাপারে কাউকে কিছুই বলা যাবে না। কেউ জানে না এই রহস্য, কেননা এরচেয়ে শক্তিশালী আর কোন রহস্য নেই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করলেন তিনি।

শিহরিয়ে উঠল শ্যাডো, মনে হলো যেন এতক্ষণ জানালা দিয়ে অন্য কোন দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে ছিল। এমন কোন দুনিয়ার দিকে, যেখানে প্রতিটা চত্বরে বাতাসে ঝুলছে কোন না কোন লাশ; যেখানে রাতের অন্ধকারে শোনা যায় ডাইনির চিৎকার।

'লরা।' কেবল এতটুকুই বলতে পারল শ্যাডো।

মাথা ঘুরিয়ে শ্যাডোর চোখে চোখ রাখলেন ওয়েনসডে। 'কিন্তু আমিও তোমার স্ত্রীকে জীবিত করতে পারব না। কেন যে সে এখন হেটে-চলে-বেড়াচ্ছে, তাই জানি না।'

'আমি জানি সম্ভবত,' বলল শ্যাডো। 'আমার দোষ।'

ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন ওয়েনসডে।

'পাগলা সুইনি আমাকে একটা সোনার পয়সা দিয়েছিল। পরে দেখা হবার সময় হওয়া কথা থেকে যা বুঝলাম, ভুল পয়সাটা দিয়ে ফেলেছিল সে। অনেক বেশি ক্ষমতাবান কিছু একটা দিয়ে ফেলেছিল আমাকে! সেটা আবার আমি দিয়েছি লরাকে।'

ঘোঁত করে উঠলেন ওয়েনসডে, বুকের কাছে থুতনি ফেলে ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। 'হুম, তাহলে হতে পারে! যাই হোক, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব না। ফাঁকা সময়ে তুমি কী করো, তা তোমার একান্ত ব্যাপার।'

'এর মানে কী?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'এর মানে, তুমি যদি ঈগল-স্টোন বা থান্ডারবার্ড খুঁজে বের করতে চাও, তাহলে ফাঁকা সময়ে সেটা করতে পারো। আমার আশা, তুমি চুপচাপ লেকসাইডেই সময় কাটাবে। কারও নজরে পড়বে না, কাউকে বিরক্ত করবে না। ঝামেলা শুরু হলে আমাদের সবাইকে দরকার হবে।' খুব ভঙ্গুর আর দুর্বল দেখাল ভদ্রলোককে, চামড়াটা মনে হলো যেন স্বচ্ছ।

শ্যাডোর খুব করে ইচ্ছা হলো, ওয়েনসডের হাতে হাত রাখে। বলতে চাইল, সবকিছু ঠিক আছে। যদিও শ্যাডোর তা মনে হচ্ছিল না, কিন্তু ওয়েনসডেকে সান্ত্বনা জানাবার জন্য হলোও মিথ্যা বলত সে। জানে, দুনিয়াতে এখনও অপেক্ষা করছে ট্রেনে দেখা হওয়া ওই কিম্ভূতগুলো। জানে, হোঁতকা একটা ছেলে লিমোতে বসে টানছে সিগারেট। জানে, টেলিভিশন থেকে উঁকি দেয় এমন দেবতারা, যারা ওর ক্ষতি করতে চায় কেবল!

কিন্তু না, ওয়েনসডেকে স্পর্শ করল না ও। বলল না কিছুই।

সবকিছু শেষ হয়ে যাবার পর প্রায়ই ভাবত, হয়তো কাজটা করলে ভবিষ্যতের সব ঝামেলা কিছুটা হলেও কম হতো! জানে, হতো না। নিজেকেও তাই বোঝাত। কিন্তু তখনও আফসোস হতো ওর। ইচ্ছা হতো...অন্তত একটা ক্ষণের জন্যও যদি স্পর্শ করত ওয়েনসডের হাত!

ওয়েনসডে যখন শ্যাডোকে অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে নামিয়ে দিলেন, তখন দিনের আলো মরে যেতে শুরু করেছে। দরজা খোলা মাত্র ঠান্ডা বাতাস এসে কামড় বসালো ওর দেহে।

'ঝামেলা পাকিও না,' বললেন ওয়েনসডে। 'পারলে গর্তে মাথা ঢুকিয়ে রেখ।'

'সবসময়! এমনকি খাবার সময়েও?'

'আমার সাথে ঠাট্টা করার চেষ্টাও করো না, বাছা। তোমাকে এখানে নিরাপদে রাখতে আমার অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। অন্য কোন শহরে এক ঘণ্টাও টিকতে পারতে না।'

'ঠিক আছে, মাথা নত করে সাবধানে থাকব।' মন থেকেই কথাগুলো বলল শ্যাডো। এক জীবনের জন্য যথেষ্ট হয়েছে ঝামেলা। 'আপনি ফিরছেন কখন?' জানতে চাইল ও।

'দ্রুতই,' বলে লিংকন গাড়িটার এঞ্জিন চালু করে দিলেন ওয়েনসডে। জানালা তুলে দিতে হারিয়ে গেলেন রাতের আঁধারে।

অধ্যায় এগারো

তিনজনের মাঝে কোন কথা কেবল তখনই গোপন থাকে, যখন তাদের মাঝে দুইজন মৃত হয়।

–বেন ফ্র্যাঙ্কলিন, পুওর রিচার্ড'স অ্যালামানক।

ঠান্ডা আরও তিনটা দিন পার হলো। থার্মোমিটারের পারদ মাঝ-দুপুরেও শূন্যের উপর উঠতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে যেন। বিদ্যুত, তাপ কু-পরিবাহী মুখোশ আর হালকা, কিন্তু উষ্ণ জামা-কাপড় আবিষ্কার হবার আগে মানুষ কীভাবে শীতে বাঁচত-ভেবে কুল পেল না শ্যাডো।

ভিডিও-কাম-ট্যানিং সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও এখন। হিনজেলমান ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওকে তার বর্শার কালেকশন দেখাচ্ছেন। এরকম একটা কিছু যে এতটা আকর্ষণীয় হবে, তা বুঝতে পারেনি শ্যাডো। যাই হোক, বৃদ্ধ লোকটাকে শীত-সংক্রান্ত প্রশ্নটা করল ও।

'সত্যি সত্যি জানতে চাও?'

'জি।'

'আসলে আগেরকার দিনে মানুষ সবসময় পার পেত না, মাঝে মাঝে শীতে মারাও যেত। বিশেষ করে যদি বাড়ির চিমনীতে সমস্যা থাকত, অথবা স্টোভে গোলমাল থাকত তবে তো কোন কথাই নেই। বড় কঠিন সময় পার করতে হত তখন মানুষকে। সারা গ্রীষ্ম আর শরত কেটে যেত শীতের জন্য খাবার আর আগুন ধরাবার কাঠ সংগ্রহ করতে করতেই। সবচেয়ে বাজে ব্যাপারটা ছিল-পাগলামী। রেডিওতে অবশ্য শুনেছি, সেসবের জন্য দায়ী আসলে সূর্যের আলো। শীতের সময়ে যথেষ্ট আলো মেলে না বলেই এরকম হয়। আবার বাবার কাছে শুনেছি, রোগটার একটা নামই দিয়ে দিয়েছিলেন তারা-শৈত পাগলামী। লেকসাইডের কখনও বড় ধরনের সমস্যা হয়নি, তবে আশেপাশের সব শহর ততটা সৌভাগ্যবান ছিল না। আমার ছোট বেলার একটা প্রবাদ শোন-চাকরানী যদি ফেব্রুয়ারিতে তোমাকে খুন করার চেষ্টা না করে, তাহলেতার সাহস বলতে কিছু নেই। পাগলামীর ধরনটা বুঝতেই পারছ!

'গল্পের বইকে তখন সোনার গুঁড়ার চাইতেও দামি বলে ধরা হতো। আসলে শুধু গল্পের বই না, পড়ার মতো যেকোন কিছুর চাহিদাই ছিল আকাশছোঁয়া। তখন তো শহরে শহরে আজকের মতো লাইব্রেরি ছিল না। বাভারিয়া থেকে একবার আমার দাদার ভাই বই পাঠিয়েছিলেন। শহরের সব জার্মান এসে তখন ভিড় জমিয়েছিল টাউন হলে-শুনবে বলে। ফিন, আইরিশ আর অন্যান্য দেশের মানুষরাও আসত। তাদের গল্প শোনাত অন্য জার্মানরা।

'এখান থেকে বিশ মাইল দূরে, জিবওয়েতে, নগ্ন এক মাকে রাস্তায় হন্টনরত অবস্থায় পেয়েছিল কর্তৃপক্ষ। দুগ্ধপোষ্য শিশুটাকে বুকের কাছে লাগিয়ে রেখেছিল সেই মা। পাগলামি তাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে বাচ্চাটাকে নিজের কাছ থেকে সরাতেই দেয়নি মহিলা!' আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন হিনজেলমান। 'পরিস্থিতি খুব খারাপ হতো তখন। যাই হোক, কোন ভিডিও ভাড়া নিতে চাও? একদিন না একদিন এই শহরেও আধুনিকে কোন সিনেমা হল স্থাপন করা হবে, আমাদের দোকানও বন্ধ করে দিতে হবে তখন। তবে এখন আমাদের সংগ্রহ বেশ ভালো।'

হিনজেলমানকে মনে করিয়ে দিল শ্যাডো-ওর বাড়িতে না আছে কোন টেলিভিশন, আর না আছে কোন ভি.সি.আর.। হিনজেলমানের সঙ্গ, তার বলা অবিশ্বাস্য সব গল্প আর ঠোঁটের দুষ্টামি-মার্কা হাসি খুব পছন্দ হয়েছে তার। শ্যাডো যদি জানায় যে মাঝে-সাঝে টেলিভিশনের ভেতর থেকে তারকা ওর সাথে কথা বলে, তাহলে দুজনের মধ্যকার সম্পর্কটা দুর্বল হয়ে যেতে পারে!

ড্রয়ার হাতড়ে একটা পাতলা বাক্স বের করে আনল হিনজেলমান, সম্ভবত কোন ক্রিসমাস-বাক্স ওটা। চকোলেট বা কুকি বিস্কুট উপহার দেয়ার জন্য ওরকম বাক্স ব্যবহার করা হয়। ওটার ঢাকনি খুলে ভেতর থেকে একটা নোটবুক আর কয়েকটা টিকিটের তোড়া। শ্যাডোর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'কয়টা কিনবে?'

'কী কিনব?'

'ক্ল্যাংকার কখন ডুববে সেটার টিকিট। আজকে আমরা কোন নষ্ট গাড়িকে হ্রদের উপর রেখে আসব। তাই আজ থেকেই টিকিট বিক্রি চলছে। তোমাকে আন্দাজ করতে হবে ওটার পানিতে ডোবার সময়। এককেটা টিকিট পাঁচ ডলার, দশটার দাম চল্লিশ। আর বিশটা নিলে গুনতে হবে পঁচাত্তর টাকা। এককে টিকিটের বিনিময়ে পাবে পাঁচ মিনিট করে সময়। যে ওই গাড়ি, মানে ক্ল্যাংকার ডোবার সবচেয়ে কাছাকাছি সময়ের টিকিট কিনবে, সে পাঁচশ ডলার পাবে। আর যদি সময় খাপে-খাপ মিলে যায়, তাহলে পাবে এক হাজার ডলার! যত

তাড়াতাড়ি কিনবে, তত নিজের ইচ্ছামতো সময় বেছে নিতে পারবে। তুমি কি ওটার অতীত ইতিহাস দেখতে চাও?'

'অবশ্যই।'

শ্যাডোর দিকে একটা ফটোকপি করা কাগজ এগিয়ে দিলেন হিনজেলমান। বরাবরের মতো এবারও পুরনো একটা গাড়ির ইঞ্জিন আর ফুয়েল ট্যাঙ্ক সরিয়ে রেখে আসা হয়েছে হ্রদের উপরে। বরফ গলে যখন যন্ত্রটা পানিতে ডুবে যাবে, তখন শেষ হবে এই লটারি। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে আগে আগে ক্ল্যাংকার ডুবে ছিল সাতাশে ফেব্রুয়ারি (সেই ১৯৯৮ সালের শীতে। তবে ওটাকে শীত বলা যায় কিনা, তা নিয়ে হিনজেলমানের সন্দেহ আছে)। আর সবচেয়ে দেরি হয়েছিল ১৯৫০ সালের মে মাসে, ঠিক এক তারিখে। সাধারণত এপ্রিল মাসের মাঝামাঝিতেই বেশি ডোবে ওটা, তাও মধ্য বিকালের দিকে।

এপ্রিল মাসের মধ্য-বিকাল এরইমাঝে শেষ হয়ে গিয়েছে, তাই তেইশ মার্চের সকালের নয়টা থেকে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত সময় কিনল শ্যাডো। হিনজেলমানের দিকে এগিয়ে দিল ত্রিশ ডলার।

'ইস, শহরের সবাই যদি তোমার মতো বিনা যুদ্ধে টিকিট কিনত!' বললেন বৃদ্ধ।

'এখানে পা রাখার প্রথম রাতে আপনি যে সাহায্য করেছিলেন, তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি বলতে পারেন।'

'না, মাইক।' বললেন বৃদ্ধ। 'বরঞ্চ মনে করো, বাচ্চাদের জন্য কিনছ।' একমুহূর্তের জন্য গম্ভীর দেখাল তাকে, চেহারার সচরাচর আমুদে ভাবটা আর নেই। 'বিকালে চলে এসো, ক্ল্যাংকারটাকে হ্রদের উপর রেখে আসব।'

ছয়টা নীল রঙের কাগজ তিনি এগিয়ে দিলেন শ্যাডোর দিকে। পুরনো দিনের হাতের লেখা অনুসারে তারিখ আর সময় লেখা আছে ওতে। এরপর সেগুলো আবার নিজের নোটবুকে টুকে নিলেন হিনজেলমান।

'আচ্ছা,' আচমকা প্রশ্ন করল শ্যাডো। 'আপনি কখনও ঈগল স্টোনের নাম শুনেছেন?'

'রাইনডারল্যাণ্ডের উত্তরের এলাকাটা তো? না, না। ওটা তো ঈগল রিভার। উম...মনে হয় না।'

'থান্ডারবার্ড?'

'ফিফথ স্ট্রিটে থান্ডারবার্ড ফ্রেমিং গ্যালারি নামে একটা জায়গা ছিল বটে, কিন্তু এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ওরকম কিছু?'

'নাহ।'

'তাহলে এক কাজ করো, লাইব্রেরিতে চলে যাও। অবশ্য সামনে ওখানে ছাড়ে বই বিক্রি বলে সবাই এখন একটু ব্যস্ত। দালানটা চিনিয়ে দিয়েছিলাম না?'

নড করল শ্যাডো, বিদায় নিল সাথে সাথেই। লাইব্রেরির কথা নিজে মনে করল না কেন, তাই ভাবল একবার। বেগুনি ফোররানারটায় চড়ে দুর্গের মতো দালানটার সামনে আসতে বেশি সময় লাগল না। ভেতরে প্রবেশ করা মাত্র দেখতে পেল, বেযমেন্টের দিকে ইঙ্গিত করা একটা সাইনে লেখাঃ ছাড়ের বই। আসল লাইব্রেরিরা নিচতলায়।

গম্ভীর-মুখো এক মহিলা, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে জানতে চাইল কোন সাহায্য করতে পারবে কিনা।

'একটা লাইব্রেরি কার্ড দরকার,' জানাল শ্যাডো। 'থান্ডারবার্ডদের সম্পর্কে জানতে চাই।'

একটা তাক ভর্তি নেটিভ আমেরিকানদের ধর্ম-বিশ্বাস আর প্রথা সংক্রান্ত বই দেখিয়ে দেয়া হলো শ্যাডোকে। কয়েকটা বই নামিয়ে নিয়ে জানালার পাশে গিয়ে বসল শ্যাডো। কয়েক মিনিটের মাঝেই জানতে পারল, থান্ডারবার্ড আসলে পাহাড়ের শীর্ষে বাস করা পৌরাণিক এক বিশালদেহি পাখি। ওরা পাখা ঝাপটালেই সৃষ্টি হয় বজ্র। কিছু কিছু গোত্রের বিশ্বাস মতো, থান্ডারবার্ডরাই সৃষ্টি করেছে এই বিশ্বকে। আরও আধা-ঘণ্টা পড়েও নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারল না ও। ঈগল স্টোনের কথা খুঁজে পেল না কোথাও।

শ্যাডো যখন তাকে বইগুলো পুনরায় গুছিয়ে রাখছে, তখন নিজের উপর অন্য কারও নজর টের পেল ও। ছোট ছোট চোখের দৃষ্টি তাকের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে তারই দিকে। কিন্তু ঘুরে দাঁড়ান মাত্র উধাও হয়ে গেল সেই চোখের মালিক। শ্যাডো আবার তাকের দিকে ফিরতেই উঁকি দিল ছেলেটা।

পকেটে এখন রূপালী লিবার্টি ডলার আছে শ্যাডোর। ওটা পকেট থেকে বের করে ডান হাত দিয়ে উপরে তুলে ধরল। ছেলেটা যে পয়সা দেখতে পাচ্ছে, সেটা নিশ্চিত হবার পর লুকিয়ে ফেলল বাঁ হাতে। এরপর দুই হাত মেলে ধরে দেখাল শ্যাডো, দুটোই খালি। এরপর কাশি দেবার ভান করে মুখ থেকে বের করে আনল পয়সাটা।

চোখ বড় বড় করে এতক্ষণ বাচ্চাটা তাকিয়ে ছিল ওর দিকে, এবার কোথায় যেন চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই ফিরে এলো শক্ত মুখ করা মার্গারিতা ওলসেনকে সাথে নিয়ে। চোখে সন্ধেহ নিয়ে শ্যাডোর দিকে তাকিয়ে মহিলা বলল, 'কেমন আছ, মিস্টার আইনসেল? লিওন জানাল, তুমি নাকি ওকে জাদু দেখাচ্ছ?'

'এই একটু পয়সার খেলা দেখিয়েছি। তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। অ্যাপার্টমেন্টটা এখন বেশ আরামদায়ক গরম হয়ে উঠেছে।'

'খুব ভালো,' চেহারা এখনও শক্ত করে আছে মার্গারিতা।

'লাইব্রেরিটা দারুণ।'

'দালানটা সুন্দর। তবে এই শহরের দরকার দেখতে কম সুন্দর কিন্তু কাজে বেশি উপযোগী দালান। বেযমেন্টে যাচ্ছ?'

'যাওয়ার ইচ্ছা আছে।'

'যাও, মহৎ এক উদ্দেশ্যে ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'তাহলে অবশ্যই যাব।'

'হল ধরে নিচে গেলেই পাবে। তোমাকে দেখে খুশি হলাম, মিস্টার আইনসেল।'

'মাইক বলে ডেক আমাকে, ম্যাম।'

চুপ করে রইল মার্গারিতা। এরপর লিওনের হাত ধরে ওকে টেনে নিয়ে গেল বাচ্চাদের সেকশনের দিকে।

'কিন্তু, আম্মু,' ছেলেটাকে বলতে শুনল শ্যাডো। 'সত্যি সত্যি জাদু দেখিয়েছে লোকটা। আমি নিজ চোখে দেখেছি। পয়সাটা উধাও হয়ে গিয়েছিল, এরপর নাক দিয়ে বেরিয়েছে!'

দেয়াল থেকে ঝুলতে ঝুলতে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন আব্রাহাম লিংকন। মার্বেল আর ওক কাঠ দিয়ে বানানো সিঁড়ি বেয়ে নামল শ্যাডো। বেযমেন্টে পা রাখা মাত্র দেখতে পেল, অনেকগুলো টেবিল ভর্তি শুধু বই আর বই। নানা ধরনের বই অগোছালোভাবে রাখা-হার্ডকাভার, পেপারব্যাক, ফিকশন, নন-ফিকশন, সব একসাথে। এমনকি এনসাইক্লোপেডিয়া আর কিছু সময়পঞ্জিও আছে।

ঘরটার পেছন দিকে চলে এলো শ্যাডো। এখানে টেবিল ভর্তি চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা বই। প্রতিটার স্পাইনে সাদা রঙ দিয়ে একটা করে ক্যাটালগ নাম্বার লেখা। 'আজ এদিকে আপনি ছাড়া আর কেউ আসেনি,' ছোট্ট, ধাতব ক্যাশ বাক্সের পাশে বসে থাকা লোকটা ওকে দেখে বলল, 'আজকাল মানুষ শুধু থ্রিলার, বাচ্চাদের বই আর সস্তা প্রেমের উপন্যাসের প্রতিই আগ্রহ দেখায়। জেনি কারটন, ড্যানিয়েল স্টিল, এদের বইই বিক্রি করেছি বেশি।' লোকটা নিজে পড়ছিল আগাথা ক্রিস্টির দ্য মার্ডার অফ রজার অ্যাকরয়েড। 'ওই টেবিলে থাকা যেকোন বইয়ের দাম মাত্র পঞ্চাশ সেন্ট। এক ডলার দিয়ে তিনটা পাবেন।'

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্যাডো আবার বই বাছাইয়ে মন দিল। হেরোডোটাসের একটা ইতিহাসের বই খুঁজে পেল ও, জেলে ফেলে আসা পেপারব্যাক বইটার কথা মনে পড়ে গেল। পারপ্লেক্সিং পার্লার ইলিউশ্যনস নামের আরেকটা বই পছন্দ হলো ওর। ভাবল, ওখান থেকে ভালো দুয়েকটা পয়সার খেলা শেখা যেতে পারে। বই দুটো নিয়ে ক্যাশ বাক্সের দিকে এগিয়ে গেল ও।

'আরেকটা নিন, দাম সেই এক ডলারই আসবে।' বলল লোকটা। 'আর তাছাড়া, আরেকটা বই নিলে আমাদের উপকারই হবে। এমনিতেই জায়গার সংকট।'

আবার টেবিলের কাছে ফিরে গেল শ্যাডো। কোন বইটা কেউ কিনবে না, সেটা আন্দাজ করার চেষ্টা চালাল ও। দুটো বই পড়ল নজরে-মূত্রনালির রোগসমূহ (ছবি এবং একজন ডাক্তারের মন্তব্যসহ) আর মিনিটস অফ দ্য লেকসাইড সিটি কাউন্সিল ১৮৭২-১৮৮৪। প্রথম বইটার ছবি দেখে মনে হলো, সম্ভবত এই শহরে এমন কোন তরুণ আছে, যে এগুলো দেখিয়ে তার বন্ধুদেরকে হতবাক করে দেবে। তাই মিনিটস বইটা বেছে নিল ও।

ফেরার পথে পুরোটা সময় ওকে সঙ্গ দিয়ে গেল হ্রদের দৃশ্য। এমনকি ওর নিজের অ্যাপার্টমেন্টটাও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে যেন। ব্রিজের কাছে এসে দেখল, চার কি পাঁচজন মানুষ ঠেলে ঠেলে একটা গাড়ি বরফের উপর নিয়ে যাচ্ছে।

'মার্চ মাসের তেইশ তারিখ,' হ্রদটাকে বলল শ্যাডো। 'সকাল নয়টা থেকে সাড়ে নয়টার মাঝে।'

অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে দেখে, অফিসার চ্যাড মুলিগান ওর অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশের গাড়িটা দেখা মাত্র বুক ধরফর করতে শুরু করল শ্যাডোর। তবে লোকটাকে সামনের সিটে বসে কাগজপত্র ঘাঁটতে দেখে শান্ত হলো একটু।

গাড়িটার কাছে এগিয়ে গেল ও, বইয়ের প্যাকেটটা হাতেই ধরা।

শ্যাডোকে দেখতে পেয়ে জানালা নামাল মুলিগান। 'লাইব্রেরিতে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'দুই কি তিন বছর আগে লুডলামের কয়েকটা কিনেছিলাম। পড়ার ইচ্ছা আছে, আমার এক আত্মীয়া আবার লেখকের বড় ভক্ত। এখন তো মনে হয়, দ্বীপান্তরে না গেলে সম্ভবত আমার আর বইগুলো পড়া হবে না।'

'তোমাকে কোন ভাবে সাহায্য করতে পারি, চীফ?'

'নাহ। ভাবলাম, একবার দেখে যাই তোমাকে। কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা। চাইনিজ একটা প্রবাদ আছে-যদি কারও জীবন বাঁচাও, তাহলে সেই জীবনের দায়িত্ব সবসময়ের জন্য তোমার উপর এসে পড়ে। বলছি না যে গত সপ্তাহে তোমার জীবন বাঁচিয়েছি, তবে একবার খোঁজ নিতে মন চাইল। ভালো কথা, বেগুনি গাড়ি কেমন চলছে।'

'ভালো, বেশ ভালো।'

'শুনে খুশি হলাম।'

'লাইব্রেরিতে আমার প্রতিবেশীনী, মিস ওলসেনকে দেখলাম।' আচমকা বলল শ্যাডো। 'ভাবছিলাম...'

'সারাক্ষণ কোষ্ঠকাঠিন্যের রোগীর মতো মুখ গোমড়া করে থাকে কেন?'

'অনেকটা সেরকমই।'

'অনেক লম্বা কাহিনি। পুরোটা শুনতে হলে আমার সাথে একটু ঘোরাঘুরি করতে হবে।'

এক মুহূর্ত ভেবে নিল শ্যাডো। 'ঠিক আছে,' বলে উঠে পড়ল গাড়িতে। উত্তর দিকে রওনা দিল মুলিগান। এরপর ফাঁকা রাস্তা পেয়ে গাড়ি দাঁড় করাল।

'মার্জের সাথে ড্যারেন ওলসেনের দেখা হয়েছিল ইউ.ডব্লিউ. স্টিভেন্স পয়েন্টে। সাথে করে মেয়েটাকে এই লেকসাইডে নিয়ে এসেছিল ড্যারেন। মহিলা সাংবাদিকতা নিয়ে লেখা-পড়া করা। আর ড্যারেন তখন হোটেল ম্যানেজমেন্ট বা এই জাতীয় কিছু একটা নিয়ে পড়ছিল। এই ধরো তেরো, কী চোদ্দ বছর আগের কথা বলছি। মেয়েটা তখন ছিল অনিন্দ্য সুন্দরী। কালো চুল...' একটু বিরতি নিল চীফ। '...খুব অবাক হয়েছিল সবাই। ক্যামডেনের মোটেল আমেরিকা চালাত ড্যারেন, জায়গাটা এখান থেকে বিশ মাইল দূরে হবে। বুঝতেই পারছ, ক্যামডেনে আর কে যায়? তাই অতি সত্বর বন্ধ হয়ে গেল মোটেলটা। দুটো ছেলে ছিল ওদের। যখনকার কথা বলছি, তখন স্যান্ডির বয়স এগারো। ছোটটা, মানে লিওন তখনও কোলে।

'ড্যারেন ওলসেনকে আর যা-ই হোক, সাহসী বলা চলে না। হাই স্কুলে থাকতে বেশ ভালো ফুটবল খেলত। কিন্তু এছাড়া ওর বলার মতো আর কোন অর্জন নেই। যাই হোক, চাকরি খোয়ানোর কথাটা স্ত্রীকে বলার সাহস জুটাতে পারল না ও। তাই পরের দুই মাস, প্রতিদিন সকালে বেরিয়ে যেত ঘর থেকে। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে শোনাত মোটেল চালান কত কঠিন-সেই গল্প।'

'সময় কাটাত কীভাবে?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'নিশ্চিত জানা নেই। আমার ধারণা, আয়রনউড বা গ্রিন বেতে চলে যেত। প্রথম প্রথম চাকরির খোঁজ করত হয়তো। এরপর মদ খেয়েই পয়সা উড়াতে শুরু করল। কে জানে, পতিতাগমনও শুরু করেছিল কিনা। জুয়া খেললেও খেলতে পারে। এটুকু নিশ্চিত করে বলতে পারি, চাকরি হারাবার দশ সপ্তাহের মধ্যে জমানো সব টাকা ফুরিয়ে আসে ওদের। মার্জের জানাটা তাই ছিল শুধু সময়ের ব্যাপার-দাঁড়াও!'

আচমকা গাড়ি চালিয়ে দিল চীফ, সেই সাথে চালু করল সাইরেনও। আইওয়া স্টেটের প্লেট লাগান একটা গাড়ির চালকের পিলে চমকে দিল সে, সত্তর মাইল বেগে লোকটা গাড়ি চালাচ্ছিল।

আইওয়ার চালককে জরিমানা করার পর, মুলিগান আবার বলতে শুরু করল।

'কী যেন বলছিলাম? ওহ হ্যাঁ। মার্জ জেনে ফেলল, তালাক দেবার জন্য আদালতে আবেদন জানাল সে। বাচ্চাদের অধিকার কে পাবে, তা নিয়ে বেশ বাজে একটা ব্যাপার হলো আদালতে। তবে শেষ পর্যন্ত সেই অধিকার পেল মার্জই। ড্যারেন পেল মাঝে মাঝে এসে বাচ্চাদেরকে দেখার অনুমতি। তখনও লিওন ছোট, তবে স্যান্ডি একটু বড় হয়েছে। যে বয়সের বাচ্চারা বাপদেরকে নায়ক জ্ঞান করে, সেই বয়স হয়েছে ওর। মার মুখে বাপ সম্পর্কে একটাও মন্দ কথা সহ্য করতে পারত না সে। যাই হোক, বাড়িটাও বিক্রি করতে হলো মার্জকে, দুই ছেলে নিয়ে সে উঠে এলো ওই অ্যাপার্টমেন্টটায়। ড্যারেন শহর ছাড়ল, মাস ছয়েক পরপর এসে সবাইকে জ্বালিয়ে মারতে শুরু করল।

'প্রথম কয়েক বছর গেল এভাবেই। কয়েকদিন পরপর এসে বাচ্চাদের সাথে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আর মার্জকে কান্না উপহার দিয়ে বিদায় নিত ড্যারেন। আমরা অনেকেই প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলাম যেন লোকটা আর না আসে। অবসর নেবার পর লোকটার বাবা-মা ফ্লোরিডাতে চলে গিয়েছিলেন। গত বছর যখন এসেছিল, তখন বাচ্চাদেরকে ক্রিসমাসের জন্য ফ্লোরিডায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু মার্জ তা হতে দিলে তো! আরেকবার সৃষ্টি হলো অপ্রীতিকর একটা পরিস্থিতির। এমনকী আমাকেও একবার যেতে হয়েছিল ঝামেলা থামাতে। গিয়ে দেখি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে যা ইচ্ছা তাই বলে যাচ্ছে ড্যারেন। বাচ্চারা ভয়ে থর থর করে কাঁপছে, মার্জ কাঁদতে কাঁদতে লাল করে ফেলেছে চোখ।

'ড্যারেনকে সাবধান করে দিয়ে বললাম, আর কিছু বললে ওকে রাতটা জেলে কাটাতে হবে। লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছিল, আমাকে মেরে বসবে যেন। কিন্তু জাতে মাতাল হলেও, ব্যাটা তালে ঠিক। শহরের দক্ষিণে, ট্রেইলার পার্কে ওকে

নামিয়ে দিয়ে জানালাম-নিজেকে এবার একটু গুছিয়ে নেয়া উচিত ওর। যথেষ্ট জ্বালিয়েছে মেয়েটাকে...পরেরদিন বিদায় নিল ড্যারেন।

'এর দুই সপ্তাহ পরের কথা, আচমকা উধাও হয়ে গেল স্যান্ডি। স্কুলেও যায়নি সেদিন। সবচেয়ে কাছের বন্ধুটাকে বলেছিল, বাবার কাছে যাচ্ছে। ড্যারেন নাকি ওর জন্য বিশেষ একটা উপহার কিনে রেখেছে। এরপর আর কেউ ওকে দেখেনি। বাবা বা যখন বাচ্চাকে অপহরণ করে, তখন সেই বাচ্চার হদিস লাগান খুব কঠিন। বাচ্চাটা নিজেই চায় না যে তাকে খুঁজে বের করা হোক, বুঝতে পেরেছ?'

শ্যাডো জানাল, বুঝতে পেরেছে। আরও একটা জিনিস বুঝতে পারল সে, তবে মুখ ফুটে বলল না-চ্যাড মুলিগান আসলে মার্গারিতা ওলসেনকে ভালোবাসে।

আরেকটা গাড়ি বের করল মুলিগান, এবারের অপরাধী ষাট মাইল বেগে গাড়ি চালান কয়েকজন তরুণ। এদের জরিমানা করল না সে, কেবল 'ঈশ্বরের ভয়' ভেতরে ঢুকিয়ে দিল।

সেদিন সন্ধ্যায় শ্যাডো সময় কাটালো রান্নাঘরের টেবিলে বসে। রুপালী একটা ডলারকে পেনিতে পরিণত করার চেষ্টাতেই কাটল তার সময়। পারপ্লেক্সিং পার্লার ইলিউশ্যন্স বইটায় পেয়েছে এই খেলাটা। কিন্তু কীভাবে কী করতে হবে, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র নির্দেশনাও দেয়া নেই বইটায়। কেবল লেখা, 'এরপর স্বাভাবিক পদ্ধতিতে হাপিস করে দিন পয়সাটাকে।' এক্ষেত্রে 'স্বাভাবিক পদ্ধতিটা কী?' ভাবল শ্যাডো। হাতায় ফেলে দেব? নাকি চিৎকার করে বলল, 'আয়, হায়! একটা সিংহ!' যাতে সবাই ওদিকে তাকায় আর এই সুযোগে পয়সা 'হাপিস' হয়ে যায়?

উপরে ছুঁড়ে মারল শ্যাডো কয়েনটাকে, নিচে পড়তে শুরু করলে লুফে নিল। আয়নার সামনে গিয়ে অনুশীলন করার চেষ্টা করে দেখল ও, কিন্তু না কাজ হলো না। বুঝতে পারল, আসলে বইটাতেই ঠিকভাবে লেখা নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেটে ভরল সে পয়সাটার এরপর বসে পড়ল কাউচে। এবার অন্য বই, মানে দ্য মিনিটস অফ দ্য লেকসাইড সিটি কাউন্সিল ১৮৭২-১৮৮৪ খুলে বসল। ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে, দুই সারিতে ছাপা বইটা। পড়া দুষ্কর। পাতা উল্টে ওই সময়ের ছবি বের করল ও, লেকসাইড সিটি কাউন্সিলের সদস্যদের দেখতে পেল। লম্বা জুলফি আর মাটির পাইপ ঝুলছে কারও কারও ঠোঁটে। কারও মাথায় পুরনো হ্যাট তো কারও মাথায় নতুন। অনেকের চেহারাই পরিচিত বলে মনে হলো।

তাই ১৮৮২ সালের কাউন্সিলের মোটাসোটা সেক্রেটারিকে দেখে মনে হলো, একে তো এই একটু আগে দেখেছি! বিশ পাউণ্ড মেদ আর গালের দাড়িটুকু ঝরিয়ে ফেললেই, চ্যাড মুলিগানের সাথে সেক্রেটারি, প্যাট্রিক মুলিগানের কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। সম্ভবত পুলিশ চীফের পর-পরদাদা লোকটা। হিনজেলমানের দাদাও কি আছে ছবিতে? একবার ভাবল শ্যাডো। কিন্তু সম্ভবত গল্পের সেই দাদা সিটি কাউন্সিল চালাবার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। ছবি দেখার সময় একবার 'হিনজেলমান' দেখতে পেল বলে মনে হলো ওর। তবে খুঁজে পেল না আর, এদিকে ছোট ছোট অক্ষরগুলো পড়তেও কষ্ট হচ্ছে।

বইটা বুকের উপর রেখে চোখ বন্ধ করে ফেলল শ্যাডো। অবশ্য জানে, কাউচে ঘুমিয়ে পড়াটা অনুচিত হচ্ছে। শোবার ঘর মাত্র কয়েক পা দূরে। আমি তো আর ঘুমাব না, নিজেকেই বোঝাল ও। কেবল চোখ বন্ধ করব কিছুক্ষণের জন্য...

অন্ধকারের রাজত্বে এসে উপস্থিত হয়েছে শ্যাডো।

চারপাশে খোলা সমভূমি। মাটির ভেতর থেকে যেখানে বের হয়ে পা রেখেছিল, সেই জায়গাটার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে এখন। এখনও তারা খসে পড়ছে আসমান থেকে, প্রতিটা তারা লাল মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথে হয় পুরুষ আর নয়তো নারীতে পরিণত হচ্ছে। পুরুষদের লম্বা কালো চুল আর উঁচু হনু, মেয়েরা সবাই দেখতে মার্গারিতা ওলসেনের মতো। এরা হচ্ছে তারকালোকের মানুষ!

কালো, গর্বিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল তারা।

'আমাকে থান্ডারবার্ডসদের ব্যাপারে জানান,' অনুরোধ করল শ্যাডো। 'আমার নিজের জন্য জানতে চাইছি না, আমার স্ত্রীর জন্য দরকার।'

একে একে সবাই ওর দিকে পিঠ দিয়ে ঘুরল। তবে একেবারে শেষ জন, একেবারে শেষ মুহূর্তে পিছু ফিরে ইঙ্গিত করল লালচে আকাশের দিকে। মেয়েটার গলায় সাদা দাগ দেখতে পেল সে।

'নিজেই জিজ্ঞাসা করছ না কেন?' প্রশ্ন করল মেয়েটা। ক্ষণিকের জন্য বজ্রের আলোয় ঝলসে উঠল চারপাশ।

শ্যাডোর চারপাশে উঁচু উঁচু পাথর আর পাহাড় শীর্ষ। সবচেয়ে কাছেরটায় চড়তে শুরু করল ও। ক্ষয় হতে শুরু করা হাতির দাঁতের মতো রঙ পাথরটার। উপরে ওঠার জন্য ওতে হাত রাখতেই কেটে গেল! এটা পাথর না, ভাবল শ্যাডো। আসলে হাড়। পুরনো, শুষ্ক হাড়!

স্বপ্ন দেখছে ও, আর স্বপ্নে মানুষের যা ইচ্ছা তাই করার সুযোগ থাকে না খুব একটা। হয়তো সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ হয় না, আর নয়তো স্বপ্ন শুরু হবার আগেই সেই সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হয়ে থাকে। উপরে উঠতে শুরু করল শ্যাডো। হাতে ব্যথা পাচ্ছে, পায়ের নিচে পড়ে মুচমুচ করে ভেঙে যাচ্ছে হাড়। বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। কেবলমাত্র প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির জোরেই উঠতে পারছে ও।

পুরো পাহাড়টা একই হাড় বারবার ব্যবহার করে বানানো হয়েছে, প্রতিটাই শুষ্ক আর বলের মতো-যেন কোন বিশাল পাখির ডিমের খোলস! কিন্তু আরেকবার বজ্রপাতের আলো ওর ভুল ধরিয়ে দিল। হাড়গুলোর মাঝে রয়েছে চোখের ফোকর। আছে দাঁত, হাসছে ওকে দেখে। তবে সেই হাসিতে কোন আনন্দ নেই।

দূরে কোথাও ডাকাডাকি করছে পাখি, আস্তে আস্তে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করল ওর চেহারায়।

মাটি থেকে শত শত ফুট উপরে চলে এসেছে। উপরে, প্রায় শীর্ষের কাছাকাছি উড়ছে অনেকগুলো পাখি-বিশাল, কালো, শকুনের মতো। প্রতিটার গলায় সাদা সাদা ছোপ। একইসাথে রাজসিক আর ভীতিপ্রদ মনে হচ্ছে পাখিগুলোকে। পাখা ঝাপটানির শব্দ ডুবিয়ে দিচ্ছে বজ্রপাতের আওয়াজ।

পাথরটাকে কেন্দ্র করে উড়ছে ওগুলো।

এক পাখা থেকে আরেক পাখার দূরত্ব পনেরো...নাহ, বিশ ফুট হবে। ভাবল শ্যাডো।

আচমকা একটা পাখি উড়ে এলো ওকে লক্ষ্য করে, নীলচে বজ্র ওটার পাখাকে ঘিরে ধরেছে। পাথরের...নাকি হাড়ের বলব...একটা ফাটলে নিজেকে তুলল শ্যাডো। ওটা আসলে মাথার খুলি, সাদা দাঁতগুলো ওর দিকেই তাকিয়ে হাসছে। কিন্তু থামল না যুবক, টেনে-হিঁচড়ে নিজেকে নিয়ে চলল উপরে। ভয়, আতঙ্ক আর ঘেন্নার সামনে মাথা নত করল না সে।

আরেকটা পাখি উড়ে এলো ওর দিকে, হাতের সমান বড় একটা নখর এসে বসল ওর হাতে।

হাত বাড়িয়ে পাখিটার একটা পালক তোলার প্রয়াস পেল শ্যাডো। কেননা ওটা ছাড়া ফিরলে গোত্রের কাছে ও হাস্যাস্পদে পরিণত হবে। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে উপরে উঠে গেল পাখিটা, হারিয়ে গেল অন্ধকারে। আবার ওঠা শুরু করল যুবক।

এখানে নিশ্চয় হাজারখানেক খুলি আছে। ভাবল শ্যাডো। লাখখানেকও হতে পারে। তবে সবগুলো মানুষের না। অনেক...অনেকক্ষণ পর পাহাড়ের মাথায় উপস্থিত হতে পারল ও। থান্ডারবার্ড নামের বিশাল পাখিগুলো ওকে কেন্দ্র করে উড়ছে এখন।

একটা কণ্ঠ শুনতে পেল শ্যাডো, মহিষ-মানবের কণ্ঠ। ডাকছে ওকে। বলছে এই খুলিগুলো কাদের, সে কথা...

আচমকা ধ্বসে পড়তে শুরু করল পাথর, সবচেয়ে বড় পাখিটা বজ্রের গতিতে ছুটে এলো ওর দিকে। নিচের দিকে পড়তে শুরু করল শ্যাডো, খুলির পাহাড় থেকে নিচে...

চিৎকার করে উঠেছে টেলিফোন। ওটার যে সংযোগ আছে, তা-ও জানা ছিল না শ্যাডোর! ঘুমে আচ্ছন্ন অবস্থাতেই তুলে ধরল রিসিভার।

'এসব কী?' ওয়েনসডের চিৎকার শুনতে পেল শ্যাডো। এর আগে লোকটাকে কখনও এতটা খেপে উঠতে শোনেনি। 'কী বাল-ছাল করছ শুনি?'

'ঘুমাচ্ছিলাম।' বোকার মতো জবাব দিল ও।

'লেকসাইডের মতো বালের একটা জায়গায় পাঠালাম কেন, একবার ভেবে দেখেছ? ওখানে গিয়েও যদি মরা মানুষকে জাগিয়ে তোলার মতো চিল্লাপাল্লা করো, তাহলে হবে কী করে!'

'আমি স্বপ্নে থান্ডারবার্ড দেখছিলাম...' বলল শ্যাডো। 'আর খুলি...' কেন যেন স্বপ্নের বিবরণ পুনরায় দেয়াটা ওর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলো।

'তুমি কী স্বপ্ন দেখেছ, তা আমি জানি। শুধু আমি না, পৃথিবীর সবাই মনে হয় জানে। নিজের অবস্থান যদি এমন বিজ্ঞাপন করে জানাও, তাহলে লুকিয়ে রেখে লাভটা কী হলো?'

চুপ করে রইল শ্যাডো।

ওপাশেও নীরবতা বজায় রইল কিছুক্ষণ। এরপর ওয়েনসডে বললেন, 'সকালে আসছি।' মনে হলো যেন রাগ কমে গিয়েছে। 'আমরা স্যান ফ্রান্সিসকোতে যাব।' রেখে দিলেন রিসিভার।

কার্পেটের উপর ফোনটাকে নামিয়ে রেখে উঠে বসল শ্যাডো। সকাল ছয়টা বাজে ঘড়িতে, তবে বাইরে এখনও ঠান্ডা। কাঁপতে কাঁপতে সোফা থেকে নামল সে, জমে যাওয়া হ্রদের উপর দিয়ে চিৎকার করতে করতে প্রবাহিত হচ্ছে ঠান্ডা বাতাস। দেয়ালের ওপাশেই কেউ একজন কাঁদছে বলে মনে হলো। মার্গারিতা

ওলসেন বলেই মনে হচ্ছে শ্যাডোর, মহিলার মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ওঠাটা ওর মনে জন্ম দিল হাহাকার।

বাথরুমে গিয়ে তলপেট খালি করে নিল শ্যাডো। এরপর শোবার ঘরে গিয়ে বন্ধ করে দিল দরজা, সেই সাথে বন্ধ হয়ে গেল মহিলার কান্নার আওয়াজ। বাইরে এখনও শোঁ শোঁ শব্দে কেঁদে জ্বলছে বাতাস...

...যেন কোন বাচ্চা হারিয়ে ফেলা মা তীব্র শোকে কান্না করছে!

জানুয়ারির স্যান ফ্রান্সিসকো স্বাভাবিকের চাইতেও বেশি গরম, এতটাই যে শ্যাডোর ঘাড় বেয়ে গড়াতে শুরু করল ঘাম! ওয়েনসডের পরনে একটা ঘন নীল স্যুট, চোখের সোনালী রঙ্গা চশমাটা চেহারায় আইনজীবীর একটা ছাপ ফেলেছে।

হাইট স্ট্রিট ধরে হাঁটছে দুজন। রাস্তার লোক আর প্রতারকের দল তাকিয়ে তাকিয়ে তাদের চলে যাওয়া দেখছে। তবে কেউ পথ আটকে দাঁড়াল না, কেউ ভিক্ষা পর্যন্ত চাইল না!

শক্ত হয়ে আছে ওয়েনসডের চোয়াল। তিনি যে এখনও রেগে আছেন, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে শ্যাডো। সকালে অ্যাপার্টমেন্টের সামনে দাঁড়ানো কালো লিংকন গাড়িটায় ওঠার পর থেকে বিমানবন্দরে যাওয়া পর্যন্ত কোন কথা হয়নি তাদের মাঝে। ওয়েনসডে প্রথম শ্রেনিতে আর ও সাধারণে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে।

শেষ-বিকাল এখন। শ্যাডো সেই ছোটবেলার পর আর স্যান ফ্রান্সিসকোতে পা রাখেনি। তবে শহরটাকে পরিচিত মনে হলো দেখে অবাক হলো সে। কাঠের ঘরগুলোকে মনে হলো আলাদা কোন শিল্প। অচেনা কোন জায়গা বলে মনেই হচ্ছে না।

'লেকসাইড যে এই কাউন্টিতেই, সেটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে!' বলল ও।

ওয়েনসডে চোখ পাকিয়ে তাকাল ওর দিকে। তারপর বলল, 'কে বলেছে একই কাউন্টিতে? নিউ অর্লিন্স আর নিউইয়র্ককে একই কাউন্টিতে বলবে? মিয়ামি আর মিনিয়াপোলিসকে?'

'বলব না?'

'না। সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে মিল আছে হয়তো-মুদ্রা বা সরকারও এক। আর তাছাড়া, জমি তো একই। কিন্তু এই সবগুলোকে এক দেশের আবহ দিচ্ছে কে জানো? গ্রিনব্যাক, দ্য টু নাইট শো আর ম্যাকডোনাল্ডস।' রাস্তার শেষ মাথার কাছে এগিয়ে আসছে ওরা, সামনেই একটা পার্ক। 'এখন যে মহিলার কাছে

যাচ্ছি, তার সাথে ভালো ব্যবহার করো। তবে খুব ভালো ব্যবহার করার দরকার নেই।'

'ঠিক আছে।' বলল শ্যাডো।

ঘাসের উপর পা রাখল দুজন।

একটা ছোট্ট মেয়ে, চোদ্দের চাইতে একদিন বেশি হবে না বয়স, চুলগুলো সবুজ-কমলা-গোলাপি রঙে রাঙানো, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে। একটা কুকুর, জাতে মনগ্রেল, বসে রয়েছে ওর পাশে। মেয়েটাকে দেখে কুকুরটার চাইতে বেশি ক্ষুধার্ত বলে মনে হচ্ছে। ওদেরকে দেখে খ্যাঁক করে উঠল প্রানিটা, পরক্ষণেই লেজ নাড়াতে শুরু করল।

এক ডলারের একটা নোট মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিল শ্যাডো। এমনভাবে কাগজটার দিকে চেয়ে রইল মেয়েটা যেন কী করবে তা বুঝে উঠতে পারছে না। 'কুকুরটার জন্য খাবার কিনো।' বলল ও। হেসে মাথা দোলাল মেয়েটা।

'সরাসরি বলি,' বললেন ওয়েনসডে। 'মহিলার সাথে কথা বলার সময় সাবধানে থাকবে। তোমাকে তার পছন্দ হয়ে গেলে, বিপদ হবে!'

'আপনার প্রেমিকা-ট্রেমিকা নাকি?'

'পুরো চীনের মালিক বানিয়ে দিলেও আমি ওর সাথে প্রেম করব না।' শ্যাডোর মনে হলো, ওয়েনসডের রাগ হালকা হয়েছে। কে জানে, হয়তো ভবিষ্যতের জন্য তুলে রেখেছেন। ওয়েনসডের মতো মানুষের জন্য রাগ-ই হলো চালিকাশক্তি।

ঘাসের উপর এক মহিলাকে বসা দেখল ও, সামনে একটা কাগজের টেবিলক্লথ বিছান। নানা ধরনের তৈজসপত্র রাখা আছে ওতে।

মহিলা মোটা নন-বাড়তি মেদ বলতে কিচ্ছু নেই তার শরীরে। মাত্র একটা শব্দই মহিলার দেহের ব্যাপারে ব্যবহার করতে পারে শ্যাডো-নিখুঁত। চুল এতটা বর্ণহীন যে প্রায় সাদা হয়ে গিয়েছে। নায়িকারাও দেখে ঈর্ষান্বিত হবে, এমন লালচে কোমল ঠোঁট। বয়স পঁচিশ হতে পারে, আবার হতে পারে পঞ্চাশও!

সামনে রাখা অনেকগুলো রান্না করা ডিম মন দিয়ে দেখছেন মহিলা। ওয়েনসডের আগমন টের পেয়ে মুখ তুলে তাকালেন। 'হ্যালো, প্রতারক কোথাকার।' বললেন তিনি। তবে বললেন হাসিমুখে। ওয়েনসডে বাউ করে মহিলার হাত নিলেন নিজের হাতে। আলতো করে ঠোঁট ছুইয়ে বললেন, 'তোমাকে স্বর্গীয় লাগছে দেখতে।'

'এছাড়া আর কেমন লাগবে?' মুচকি হেসে জানতে চাইলেন মহিলা। 'যাই হোক, তুমি যে মিথ্যাবাদী, তা তো জানাই আছে। নিউ অর্লিয়ন্সে যাওয়াটা উচিত

হয়নি আমার, প্রায় ত্রিশ পাউন্ড চর্বি জমেছিল কোমরে। হাঁটতে গেলে দুই উরু এখন ঘষা খায়, জানো?' শ্যাডোর দিকে চেয়ে করা হলো প্রশ্নটা। উত্তরে কী বলবে, ভেবে পেল না ও। চেহারা লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছে।

আনন্দে হেসে উঠলেন মহিলা। 'লজ্জা পাচ্ছে দেখি! আরে, ওয়েনসডে, তুমি দেখি এক লজ্জাবতীকে সাথে করে নিয়ে এসেছ! নাম কী তোমার?'

'শ্যাডো,' বললেন ওয়েনসডে। যুবকের অস্বস্তি তিনি খুব উপভোগ করছেন। 'শ্যাডো, ইস্টারের সাথে পরিচিত হও।'

কিছু একটা বলল শ্যাডো, সেটা হ্যালো হতেও পারে আবার না-ও হতে পারে। ওর দিকে তাকিয়ে আবার হাসলেন ইস্টার। যুবকের মনে হলো, পাদ-প্রদীপের উজ্জ্বল আলো যেন ওর উপরে এসে পড়েছে। ত্রস্ত হরিণের মতো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে; না পারছে দাঁড়িয়ে থাকতে, আর না পারছে ছুটে পালাতে। জেসমিনের সুগন্ধ আসছে মহিলার দেহ থেকে, সেই সুগন্ধে নেশা ধরছে শ্যাডোর।

'সবকিছু ঠিক আছে?' জানতে চাইলেন ওয়েনসডে।

মহিলা, মানে ইস্টার, গলার ভেতর থেকে হেসে উঠলেন। হাসি যেন উপচে পড়ছে মহিলার দেহের প্রতিটা অংশ থেকেও। 'সব ঠিক,' বললেন তিনি। 'তোমার কী খবর, বুড়ো নেকড়ে?'

'তোমার সাহায্যের আশায় এসেছি।'

'সময় নষ্ট করেছ কেবল।'

'আমার কথা তো অন্তত শোন।'

'লাভ কী!'

শ্যাডোর দিকে তাকালেন মহিলা। 'বসো, খাবার খাও। সবকিছুই দারুণ স্বাদু। ডিম, রোস্ট আর রান্না করা মুরগী, চিকেন সালাদ, সবই আছে। এক কাজ করো, থালাটা দাও, আমি তুলে দিচ্ছি।' তাই করলেন মহিলা। এরপর ওয়েনসডের দিকে তাকালেন। 'খাচ্ছ না যে?'

'তোমার আমন্ত্রণ না পেয়েই?' বলল ওয়েনসডে।

'বাজে কথা দিয়ে ভর্তি তোমার পেট, বদহজম হয় না কেন তা কেবল ঈশ্বরই জানেন।' একটা খালি প্লেট এগিয়ে দিলেন মহিলা। 'নিয়ে খাও।'

পেছন থেকে পড়ন্ত সূর্যের আলোতে দারুণ দেখাচ্ছে ইস্টারের চুল। 'শ্যাডো,' তৃপ্তির সাথে মুরগীর রান চিবাতে চিবাতে বললেন তিনি। 'মিষ্টি নাম। এই নামে কেন?'

ঠোঁট ভিজিয়ে শুরু করল শ্যাডো। 'আমি যখন ছোট ছিলাম,' বলল সে। 'তখন পরিবারে ছিল কেবল আমি আর আমার মা। তিনি আসলে...অনেকটা সেক্রেটারির কাজ করতেন। নানা ইউ.এস. অ্যাম্বাসিতে কাজ করতে হতো তাকে, বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলোতে। তারপর একদিন আচমকা অসুস্থ হয়ে সময়ের আগেই অবসর নিতে হলো মাকে, আবার চলে এলাম আমেরিকায়। অন্য বাচ্চাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা হয়নি কখনওই। শুধু ছায়ার মতো বড়দের পেছনে ঘুরেছি। হয়তো সেজন্যই...আকারের ছিলাম ছোট-খাটো।'

'তাহলে তো বেশ বড় হয়েছ দেখছি!'

'হ্যাঁ।'

ওয়েনসডের দিকে ফিরলেন ইস্টার। 'এই ছেলেটাকে নিয়েই সবার মাথাব্যথা?'

'তুমিও শুনেছ?'

'কান তো খাড়াই থাকে।' বলে শ্যাডোর দিকে ফিরলেন। 'ঝামেলা এড়িয়ে চলবে। এখন দুনিয়াতে অগণিত গুপ্ত-সংঘ, এদের না আছে বিশ্বস্ততা, আর না আছে পারস্পারিক ভ্রাতৃত্ববোধ। সরকারি, বেসরকারি-প্রতিষ্ঠান যেমনই হোক না কেন, আদপে সব একই ঝাঁকের কই। এদের কোন কোনটা একেবারে অদক্ষ। আবার কোন কোনটা মাত্রাতিরিক্ত বিপদজনক। একটা কৌতুক শুনলাম সেদিন, সি.আই.এ. আর কেনেডিকে নিয়ে।'

'শুনেছি।' জানালেন ওয়েনসডে।

'আফসোসের কথা,' শ্যাডোর দিকে ফিরল ওর মনোযোগ। 'কিন্তু যে কিম্ভূতদের সাথে তোমার দেখা হয়েছিল, তাদের কথা আলাদা। ওরা আছে, কারণ সবাই জানে যে ওদের থাকার দরকার আছে!' কাপে চুমুক দিলেন মহিলা, এরপর উঠে দাঁড়ালেন। 'শ্যাডো নামটা ভালো। যাক গে, আমার মোকাচিনো দরকার। চলো, যাই।'

হাঁটতে শুরু করলেন তিনি। 'খাবারের কী হবে?' জানতে চাইলেন ওয়েনসডে। 'এভাবে রেখে যাবে?'

ওয়েনসডের দিকে তাকিয়ে হাসলেন ইস্টার। ক্ষুধার্ত মেয়ে আর কুকুরের দিকে ইঙ্গিত করলেন। এরপর হাত দুপাশে ছড়িয়ে যেন বোঝালেন সারা পৃথিবীকে। 'ওরা খাক।' আর দাঁড়ালেন না তিনি, ওয়েনসডেকে সাথে নিয়ে পিছু নিল শ্যাডো।

'মনে আছে,' হাঁটতে হাঁটতে ওয়েনসডেকে বললেন তিনি। 'আমি ধনী? আরামেই তো আছি। তোমাদেরকে সাহায্য করতে যাব কেন?'

'তুমি আমাদেরই একজন।' বললেন ওয়েনসডে। 'আমাদের সবার মতো তোমাকেও ভুলে গিয়েছে মানুষ। আগের মতো করে তাদের ভালোবাসা পাও না তুমি। তাই প্রশ্নটা হলো, আমাদের সাহায্য করবে না কেন?'

রাস্তার পাশের একটা কফিহাউজে এসে বসল ওরা। ওয়েট্রেস মাত্র একজন, নিজের পৌত্তলিক পরিচয় বোঝাবার জন্য একটা হলদে রিং পরে আছে ভ্রূতে। আরেকজন কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে কফি বানাবার কাজে ব্যস্ত। ওদের দিকে এগিয়ে এলো ওয়েট্রেস, মুখে বহুল প্রশিক্ষিত হাসি।

ওয়েনসডের চৌকোনা ধূসর হাতে হাত রাখলেন ইস্টার। 'কেবলই তো বললাম,' বললেন তিনি। 'আমি আরামেই আছি। আমার দিনটাকে এখনও ডিম আর খরগোশ ব্যবহার করে উদযাপন করা হয়। মানুষ মাথায় ফুলের মুকুট পরে, একে অন্যকে উপহার দেয় পুষ্পাহার। আর সবই করে আমার নামে। প্রতি বছর সংখ্যাটা আরও বাড়ছে।'

'তাদের ভালোবাসা আর পূজায় তুমি প্রতি বছর আরও মোটা হচ্ছ?' শুষ্ক কণ্ঠে বললেন ওয়েনসডে।

'বাজে ব্যবহার করো না।' আচমকা খুব ক্লান্ত মনে হলো ইস্টারকে, মোকাচিনোর কাপে চুমুক দিলেন তিনি।

'প্রশ্নটা গুরুতর। আমিও তোমার সাথে একমত, প্রতি বছর শত শত মানুষ তোমার নামে একে-অন্যকে উপহার দেয়। তোমার উৎসব উদযাপনের প্রায় সব প্রথাই অনুসরণ করে। কিন্তু কখনও সত্যিকার তোমাকে চিনে করে কাজটা? হুহ? এক্সকিউজ মি, মিস?' ওয়েট্রেসকে ডাকলেন তিনি।

মেয়েটা জানতে চাইল, 'আরেকটা এসপ্রেসো লাগবে?'

'না, সোনামণি। আমাদের তর্ক হচ্ছে, তোমাদের মতামত দরকার। 'ইস্টার' শব্দটা আসলে কী বোঝায়, বলো তো?'

এমনভাবে ওয়েনসডের দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটা, যেন চোখের সামনে দুনিয়ার অস্টমাশ্চার্য দেখছে! তারপর বলল, 'আমি পৌত্তলিক, খ্রিস্টানদের ব্যাপারে ধারণা নেই।'

কাউন্টারের পেছনে থাকা মহিলা বলল, 'আমার ধারণা শব্দটা ল্যাটিন। এর অর্থ-যীশুর পুনরুত্থান।'

'তাই?'

'হ্যাঁ, আমি মোটামুটি নিশ্চিত।' বলল মহিলা। 'সূর্য যেমন ইস্ট, মানে পূর্ব দিকে ওঠে।'

'পুনরুত্থিত যুবক, হুম...যুক্তিযুক্ত কথা।' ওয়েনসডের মন্তব্য শুনে হাসল মহিলা, এরপর মন দিল কফি মেশিনে। ওয়েট্রেসের দিকে তাকালেন প্রৌঢ়। 'আরেকটা এসপ্রেসো দিতে পারো। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করি। তুমি পৌত্তলিক, তাই না? কার উপাসনা করো?'

'উপাসনা?'

'হ্যাঁ, উপাসনা। অনেক দেবতাই তো আছেন। তা বিশেষ কার উদ্দেশ্যে ঘরে প্রার্থনার বেদী বানিয়েছ? কার সামনে মাথা নত করো? সকাল-বিকাল কাকে পূজা দাও?'

কোন শব্দ বেরোবার আগে কয়েকবার ঠোঁট নাড়ল মেয়েটা। 'মেয়েদের শক্তিকে, নারী ক্ষমতায়নের পূজা করি বলতে পারেন।'

'খুব ভালো। তা এই নারী-শক্তির কোন বিশেষ নাম আছে?'

'আমার পূজ্য আসলে আছেন সবার অন্তরে।' ভ্রূ কুঁচকে তাকাল মেয়েটা। 'তার কোন নামের দরকার নেই।'

'আহ,' মুচকি হেসে বললেন ওয়েনসডে। 'নিশ্চয় তার উদ্দেশ্যে নানা আচার পালন করো? পূর্ণিমার রাতে লাল ওয়াইন পান করো? নগ্ন হয়ে ডুব দাও ফেনার মাঝে? নাকি রুপালী মোমদানীতে লালচে মোম জ্বালাও?'

'ঠাট্টা করছেন আপনি।' বলল মেয়েটা। 'আমরা ওসব কিছুই করি না।' দীর্ঘ একটা শ্বাস টানল ওয়েট্রেস, শ্যাডোর মনে হলো মনে মনে দশ পর্যন্ত গুনছে বোধহয়। 'আর কফি দেব? ম্যাম, আপনার আরেক কাপ এসপ্রেসো লাগবে?' মেয়েটার মুখে সেই আড়ষ্ট হাসি ফিরে এসেছে।

মাথা নাড়ল সবাই, আরেক গ্রাহকের দিকে এগোল ওয়েট্রেস।

'বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়?' বিজয়ীর সুরে বললেন ওয়েনসডে। 'এবার তাহলে রাস্তায় যেতে চাও? ইস্টোরে অফ দ্য ডনের নামানুসারে যে ইস্টারেরনামকরণ করা হয়েছে, সেটা কজন জানে-বের করতে চাও? এসো, একটা বাজিও ধরে ফেলি। আমরা একশজনকে জিজ্ঞাসা করব। যতজন সঠিক উত্তরটা দেবে, আমার ততগুলো আঙুল কেটে ফেল তুমি। আর প্রতি বিশজন অজ্ঞকে পাবার বিনিময়ে আমার সাথে একরাত শোবে তুমি। এখানে, এই স্যান ফ্রান্সিসকোতে তোমার জন্য এরচেয়ে ভালো বাজির শর্ত হতে পারে না। এখানে রাস্তার মোড়ে মোড়ে খুঁজে পাওয়া যাবে পৌত্তলিক আর উইকানদের।'

সবুজ একজোড়া চোখ স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ওয়েনসডের দিকে। শ্যাডোর মনে হলো, সবুজ পাতার আড়াল থেকে বসন্তের সূর্যের উঁকি দেয়া দেখতে পাচ্ছে। কিছুই বললেন না ইস্টার।

'যাবে?' বলেই চলছেন ওয়েনসডে। 'তবে ফলাফল কী হবে তা এখনই বলে দিতে পারি। আমার সবগুলো আঙুলই অক্ষত থাকবে। আর তোমাকে পাঁচ রাত গরম করতে হবে আমার বিছানা। তাই তোমার উদ্দেশ্যে সবাই ভেট দেয়, তোমার দিন উদযাপন করে-এসব আমাকে বলো না। ওরা তোমার নাম মুখে নেয় বটে, কিন্তু তার প্রকৃত অর্থ না জেনেই!'

ইস্টারের চোখে পানি দেখা গেল। 'সে কথা জানি,' বললেন তিনি। 'বোকা নই আমি।'

'না,' একমত ওয়েনসডে। 'তা তুমি নও।'

প্রৌঢ় একটু বেশিই বলে ফেলেছেন, ভাবল শ্যাডো।

লজ্জিত ভঙ্গিতে নিচের দিকে তাকালেন ওয়েনসডে। 'আমি দুঃখিত।' বললেন তিনি। শ্যাডো তার কণ্ঠে সত্যতা খুঁজে পেল। 'আমাদের তোমাকে দরকার। তোমার প্রাণশক্তি দরকার, দরকার তোমার উচ্ছ্বাস। আসন্ন ঝড়ে আমাদের পাশে দাঁড়াবে?'

'হ্যাঁ।' কিছুক্ষণ ইতস্তত করে অবশেষে বললেন তিনি। 'দাঁড়াব।'

আন্তরিকতা আর সততার ভান করা শিখে নিলে, আর কোন কিছুই একজন প্রতারককে আটকাতে পারে না-ভাবল শ্যাডো। পরক্ষণেই ওয়েনসডে প্রতাবক ভাবায় অপরাধবোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল ওর মনে।

আঙুলের ডগায় চুমু খেয়ে, ইস্টারের গাল স্পর্শ করলেন ওয়েনসডে। ওয়েট্রেসকে ডেকে এনে তাদের কফির দাম চুকালেন, নোটগুলো গুনলেন খুব সাবধানতার সাথে। এরপর বিলের কাগজের সাথে মুড়িয়ে তুলে দিলেন ওয়েট্রেসের হাতে।

মেয়েটা চলে যাচ্ছিল, এমন সময় শ্যাডো বলল, 'ক্ষমা করবেন মিস, গুনতে মনে হয় ভুল হয়েছে!' মেঝে থেকে দশ-ডলারের একটা বিল তুলে ধরল সে।

'না তো!' বলল মেয়েটা, হাতে ধরে রাখা নোটের তাড়ার দিকে তাকিয়ে আছে।

'আমি পড়তে দেখেছি, ম্যাম।' ভদ্রভাবে বলল শ্যাডো। 'আরেকবার গুনে দেখবেন?'

হাতের নোটগুলো গুনল মেয়েটা, অবাক হয়ে বলল, 'হায় যীশু, আপনি ঠিক বলেছিলেন। দুঃখিত।' শ্যাডোর হাত থেকে দশ-ডলারের বিলটা নিল সে।

ওদের সাথে ফুটপাত পর্যন্ত হেঁটে এলেন ইস্টার। আলো মরতে শুরু করেছে, ওয়েনসডের দিকে তাকিয়ে নড করলেন তিনি, এরপর শ্যাডোর হাত স্পর্শ করে বললেন, 'গতরাতে কী স্বপ্ন দেখেছিলে?'

'থান্ডারবার্ড আর খুলির পাহাড়ের স্বপ্ন।

নড করলেন ইস্টার। 'ওগুলো কার খুলি, জানো?'

'স্বপ্নে একটা কণ্ঠ বলেছিল...'

কিছু না বলে অপেক্ষা করলেন ইস্টার।

'বলেছিল, খুলিগুলো আমার।' জনালা শ্যাডো। 'আমার পুরাতন খুলি। লাখ লাখ হবে সংখ্যায়।'

ওয়েনসডের দিকে তাকিয়ে ইস্টার বললেন, 'আগলে রাখার মতো একজনকে পেয়েছ দেখছি।' চারদিক উজ্জ্বল করে দেয়া হাসিটা হাসলেন তিনি। এরপর শ্যাডোর হাতে আলতো করে চাপড় দিয়ে হেঁটে গেলেন ফুটপাত ধরে। মহিলার দিকে তাকিয়ে রইল শ্যাডো। চেষ্টা করল মহিলার দুই উরু ঘষা খাবার দৃশ্যটা কল্পনা না করতে, কিন্তু ব্যর্থ হলো।

বিমানবন্দরে ফেরার পথে, ওর দিকে তাকিয়ে ওয়েনসডে বললেন। 'দশ ডলার নিয়ে ঝামেলাটা করলে কেন?'

'না করলে মেয়েটাকে নিজের বেতন থেকে টাকা দিতে হতো।'

'তাতে তোমার কী?' ওয়েনসডেকে বিরক্ত মনে হলো।

একটু ক্ষণের জন্য ভাবল শ্যাডো, জবাব দিল, 'আমি চাই না অমনটা আমার সাথে কেউ করুক। মেয়েটা তো কোন দোষ করেনি।'

'করেনি?' দূরে নজর দিলেন প্রৌঢ়। 'সাত বছর বয়সে, একটা বিড়ালের বাচ্চাকে ক্লজিটে আটকে রেখেছিল মেয়েটা। কয়েকদিন চুপচাপ বসে মিউ মিউ করতে শুনেছে। যখন মিউ মিউ বন্ধ হলো, তখন ক্লজিট খুলে লাশটাকে একটা জুতার বাক্সে নিয়ে বাড়ির পেছনে কবর দিয়েছিল। কাজটা কেন করেছিল, জানো? কারণ ওর কিছু একটা কবর দেবার ইচ্ছা হয়েছিল। যেখানেই কাজ করে, সেখান থেকেই কিছু না কিছু চুরি করে, তবে খুব অল্প পরিমাণে। গত বছর যখন দাদীকে নার্সিং হোমে দেখতে যায়, তখন তার বিছানার পাশের টেবিল থেকে একটা সোনার অ্যান্টিক ঘড়ি চুরি করে আনে। তারপর আরও কয়েক বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ঘরে গিয়ে চুরি করে টাকা আর কিছু দ্রব্য। ওগুলো নিয়ে কী করবে, তা বাসায় ফিরে বুঝতে পারেনি। তবে কেউ যদি ধরে ফেলে, এই ভয়ে নগদ বাদে বাকি সব ছুঁড়ে ফেলেছিল পানিতে।'

'বুঝতে পেরেছি।' বলল শ্যাডো।

'গনোরিয়াও আছে মেয়েটার, তবে তার কোন লক্ষণ এখনও প্রকাশ পায়নি।' বললেন ওয়েনসডে। 'নিজের এই রোগ আছে বলে সন্দেহ করে বটে, কিন্তু

কোন পরিক্ষা-নিরীক্ষা করেনি। মেয়েটার প্রাক্তন প্রেমিক যখন এ কথা বলেছিল, তখন নিজেকে অপমানিত মনে করে ছেলেটার সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলে সে।'

'বুঝতে পেরেছি,' জানাল শ্যাডো। 'আর কিছু বলার দরকার নেই। চাইলে যে কারও ব্যাপারেই শুধু খারাপ দিকগুলো বলা যায়, তাই না?'

'অবশ্যই। মানুষ সবসময়ভাবে, ওদের অপরাধ আলাদা। আগে কেউ কখনও তেমন কিছু করেনি। কিন্তু আসলে অপরাধ সবসময় একই থাকে।'

'এজন্য আপনার দশ ডলার চুরি করা ঠিক হয়ে গেল?'

ট্যাক্সির ভাড়া দিয়ে বিমান বন্দরের ভেতরে প্রবেশ করল দুজন। এখনও যাত্রী বোর্ডিং শুরু হয়নি। মুখ খুললেন ওয়েনসডে। 'এছাড়া আর কী করতে পারি আমি? আমার উদ্দেশ্যে এখন আর ভেড়া বা মহিষ উৎসর্গ করা হয় না। খুনি আর দাসদের আত্মা ভেট দেয় না কেউ। আমার অস্তিত্বের জন্য দায়ী মানুষ, আর ওরাই কিনা আমাকে ভুলে গিয়েছে? আমি ওদেরকে একটু শায়েস্তা করতে চাই, এই চাওয়াটা কি খুব বেশি কিছু? এটা কি অবিচার?'

'আমার মা প্রায়ই বলতেন,'জীবনে অনেকসময় অবিচারের মুখোমুখি হতে হয়।''

'মায়েরা এসব বলেই।' বললেন ওয়েনসডে। 'সেই সাথে এ-ও বলে, 'তোমার বন্ধুরা যদি দল বেঁধে পাহাড় থেকে ঝাঁপ দেয়, তাহলে কি তুমিও দেবে?''

'আপনি মেয়েটাকে ঠকাতে চেয়েছিলেন, আমি চাইনি।' একগুঁয়ের মতো জবাব দিল শ্যাডো। 'এটাই সঠিক কাজ ছিল।'

বিমান বন্দরের কেউ একজন ঘোষণা করল, ওদের বিমান শীঘ্রই ছাড়বে। উঠে দাঁড়ালেন ওয়েনসডে। 'আসা করি সুবিচার আর অবিচারের এই দৃষ্টিভঙ্গি তোমার মাঝে অটল থাকবে।'

শ্যাডোকে যখন ওয়েনসডে পরেরদিন অ্যাপার্টমেন্টের সামনে নামিয়ে দিলেন, তখন দিনের আলো এখনও ভালোভাবে ফোটেনি। লেকসাইড এখনও ঠান্ডার চাদরে নিজেকে মুড়ে রেখেছে, তবে আগের মতো সেই তীব্র ঠান্ডা নেই। এম অ্যান্ড আই ব্যাঙ্কের আলোকিত অংশটা একবার সময় দেখাচ্ছে ৩:৩০ এ.এম.,একবার দেখাচ্ছে তাপমাত্রা -৫০ ফারেনহাইট।

ঘড়িতে যখন সকাল সাড়ে নয়টা বাজে, তখন অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় নক করলেন পুলিশ চীফ চ্যাড মুলিগান। শ্যাডোকে জিজ্ঞাসা করলেন, ও অ্যালিসন ম্যাকগভার্ন নামে কোন মেয়েকে চেনে কিনা?

'মনে পড়ছে না,' ঘুম ঘুম গলায় জবাব দিল শ্যাডো।

'ছবিটা দেখ একবার।' হাইস্কুলের পোশাক পরা একটা ছবি দেখাল চ্যাড। সাথে সাথে মেয়েটাকে চিনতে পারল শ্যাডো, দাঁতে নীল রাবারের ব্যান্ড পরা এই মেয়েটিই গ্রেহাউন্ড বাসে ওর সামনে বসেছিল।

'ওহ, চিনি তো। আমার সাথে বাসে ছিল।'

'গতকাল তুমি কোথায় ছিলে, মিস্টার আইনসেল?'

শ্যাডোর মনে হলো, ওর দুনিয়া যেন পাক খেতে শুরু করেছে। অবশ্য বিবেকের দংশনে নীল হবার মতো কোন অপরাধ সে করেনি (তুমি পেরোল অমান্য করে ছদ্ম নামে এখানে আছ, ওর ভেতরের একটা কণ্ঠ বলল। এটাই কী আবার জেলে যাবার জন্য যথেষ্ট না?)।

'স্যান ফ্রান্সিসকো,' বলল সে। 'ক্যালিফোর্নিয়ায়। আমার চাচার সাথে ছিলাম।'

'টিকিটটা রেখেছ?'

'হ্যাঁ।' বিমানের টিকিট আর বোর্ডিং পাসের অংশ পকেটেই ছিল শ্যাডোর, সেটা বের করে দিল। 'কী হয়েছে?'

টিকিট পরীক্ষা করে দেখল চ্যাড মুলিগান। 'অ্যালিসন ম্যাকগভার্নকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়েটা লেকসাইড হিউমেইন সোসাইটির সদস্যা ছিল। পশুদেরকে খাবার খাওয়াত, কুকুর হাঁটাতে নিয়ে যেত। ক্লাস শেষ হবার পর কয়েক ঘণ্টার জন্য বাইরে বেরিয়েছিল মেয়েটা। হিউমেইন সোসাইটির প্রধান, ডলি নফ, প্রতিদিন রাতে মেয়েটাকে বাড়িতে পৌঁছে দিত। সে-ও ওকে দেখেনি গতকাল। তাই, বুঝতেই পারছ!'

'মেয়েটা উধাও হয়ে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ। ওর বাবা-মা আমাদেরকে গতকাল জানিয়েছে। বোকা মেয়েটা লিফট নিয়ে নিয়ে যেত হিউমেইন সোসাইটি অফিসে। ওটা একটু নির্জন এলাকাতেই, কাউন্টি ডব্লিউতে। অ্যালিসনের বাবা-মা না করত...কিন্তু এদিকে যে মানুষ-জন দরজাই বন্ধ করে না রাতে। তাই মেয়েটাও কানে তোলেনি। আর এমনিতেও, এসব কমবয়সী বাচ্চা-কাচ্চারা কারও কথা শুনতেই চায় না। আরেকবার দেখ ছবিটা।'

ছবির অ্যালিসন ম্যাকগভার্ন দাঁত বের করে হাসছে, তবে দাঁতে লাগান রাবারের ব্যান্ডটা লাল।

'সত্যি করে বলো, আসলেই কি তুমি এই মেয়েকে কিডন্যাপ করোনি? ধর্ষণের পর খুন করোনি তো?'

'আমি গতকাল স্যান ফ্রান্সিসকোতে ছিলাম। আর তাছাড়া, ওসব করার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। যাই হোক, মেয়েটাকে খুঁজতে সাহায্য করবে?'

'আমি?'

'হ্যাঁ, তুমি। আজ সকালে আমরা কুকুর ব্যবহার করে খুঁজেছিলাম, পাইনি কিছুই।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল চ্যাড। 'মাইক, আমার মনে হয় মেয়েটা কোন মাদকাসক্ত প্রেমিক জুটিয়েছে। তার সাথে হয়তো পালিয়ে গিয়েছে কোন বড় শহরে।'

'তোমার তাই মনে হচ্ছে?'

'সম্ভাবনা আছে। আমার সাথে খোঁজে যোগ দেবে?'

হেনিংস ফার্ম অ্যান্ড হোম সাপ্লাইযে মেয়েটাকে দেখার কথা মনে পড়ে গেল শ্যাডোর। তখন মনে হচ্ছিল, বয়স হলে দারুণ সুন্দরী হবে মেয়েটা। 'অবশ্যই।' বলল সে।

ফায়ার স্টেশনের লবিতে প্রায় দুই ডজন নারী-পুরুষের সাথে দেখা হলো ওর। হিনজেলমানকে চিনতে কষ্ট হলো না, আরও কয়েকজনের চেহারা পরিচিত বলে মনে হলো। দুজন পুলিশ অফিসারও আছে, লাম্বার কাউন্টির শেরিফ ডিপার্টমেন্টের উর্দি পরাও আছে কয়েকজন।

অ্যালিসন নিরুদ্দেশ হবার সময় কী পরে ছিল তা জানাল চ্যাড মুলিগান- একটা খয়েরী স্যুট, সবুজ গ্লাভস, নীল-রঙা উলের হ্যাট। স্বেচ্ছাসেবীদেরকে তিনটা দলে ভাগ করল চীফ। শ্যাডো, হিনজেলমান আর ব্রোগান নামের আরেকজনকে নিয়ে গঠিত হলো ওদের দলটা। সবাইকে মনে করিয়ে দেয়া হলো, আজকাল দিনের আলো বেশি থাকে না। এটাও বলা হলো-ঈশ্বর না করুন, যদি অ্যালিসনের মরদেহ পাওয়া যায়, তাহলে যেন কোন কিছু ধরা বা নাড়া-চাড়া না করা হয়। শুধু রেডিওতে জানালেই হবে। আর যদি জীবিত পাওয়া যায়, তাহলে সাহায্য আসার আগে দেহটাকে গরম রাখতে হবে।

কাউন্টি ডব্লিউতে নামিয়ে দেয়া হলো ওদের।

শ্যাডোর দলটা একটা বরফে জমাট বাঁধা পর্বত-গাত্র বরাবর শুরু করল খোঁজা। প্রত্যেক দলকেই একটা করে ওয়াকি-টকি দিয়ে দেয়া হয়েছে।

আকাশে নিচু হয়ে ভাসছে মেঘ, ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে চারপাশ। লাগাতার প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা ধরে তুষারপাত হচ্ছে। মাটিতে পড়ে থাকা তুষারে পায়ের ছাপ পড়লেও, বেশিক্ষণ থাকার সুযোগ পাচ্ছে না।

ব্রোগানকে দেখতে বয়স্ক, অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল বলে মনে হয়। সরু গোঁফ আর পাক ধরা চুল সেই ধারণাকেই আরও পোক্ত করে যেন। তবে শ্যাডোকে তিনি জানালেন, কর্মজীবনে ছিলেন স্কুলের প্রিন্সিপাল। 'বয়স তো হচ্ছে, এখনও অল্প-সল্প পড়াই। স্কুল নাটকটা পরিচালনাও করি। সেই সাথে মাঝে-সাঝে শিকার করা আর পাইক হ্রদের পাশে কেবিন তো আছেই।' চলতে চলতে আরও যোগ করলেন। 'মেয়েটাকে পাওয়া যাক, সেটাই আমার আশা। কিন্তু সেই সাথে এ-ও আশা করি, আমরা যেন খুঁজে না পাই। বুঝতে পেরেছ?'

অন্তর্নিহিত অর্থটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে শ্যাডো।

তিন জনের মাঝে কথা হলো না খুব একটা। চুপচাপ খুঁজে গেল ওরা। খয়েরী স্যুট বা সবুজ গ্লাভস বা নীল হ্যাটের খোঁজে। সেই সাথে চোখ খোলা রাখল সাদা একটা দেহের জন্যও। মাঝে মাঝেই ওয়াকি-টকিতে চ্যাড মুলিগানের সাথে যোগাযোগ করলেন ব্রোগান।

দুপুরের খাবারের সময় দলের অন্যান্যদের সাথে একটা স্কুল বাসে বসে হট ডগ আর গরম স্যুপ খেল ওরা। খাবার ফাঁকে ফাঁকে দাদার ট্রাম্পেট নিয়ে গল্প শোনালেন হিনজেলমান। শৈত্য-প্রবাহের সময় বার্নে গিয়ে বাজান শুরু করেছিলেন তিনি বাদ্যযন্ত্রটা, কিন্তু কোন শব্দই বেরোয়নি।

'তারপর ঘরে ফিরে, ওটাকে গরম করা জন্য স্টোভের পাশে রেখে দিয়েছিলেন। পরিবারের সবাই রাতে যখন ঘুমিয়ে ছিল, ঠিক তখনই...একেবারে আচমকা, ট্রাম্পেট থেকে বেরোতে শুরু করল বাজনা। আমার দাদী তো ভয় পেয়ে আরেকটু হলে হার্টফেল করে মরতেন!'

বিষণ্ন বিকালটা বিফলে গেল, আস্তে আস্তে মরে এলো দিনের আলো। দুনিয়া কিছুটা নীলচে বর্ণ ধারণ করা মাত্র শুরু হলো ঠান্ডা বাতাস, চেহারায় স্পর্শ করা মাত্র ব্যথার জন্ম দিতে শুরু করল সে। অন্ধকার গভীর হয়ে এলে মুলিগান রেডিওতে ওদের সবাইকে ফিরে আসার নির্দেশ দিল। একসাথে, একটা স্কুল-বাসে করে ফিরল সবাই ফায়ার স্টেশনে।

ফায়ার স্টেশনের পাশেই একটা বার, নাম-দ্য বাক স্টপস হেয়ার। অনুসন্ধানকারীদের প্রায় সবাই সেখানেই ভিড় জমালো। সারাদিনের ব্যর্থ পরিশ্রমের পর ক্লান্ত সবাই। ঠান্ডার প্রসঙ্গে, অ্যালিসন ম্যাকগভার্নের প্রসঙ্গে কথা বলছে সবাই। তাদের ধারণা, দুই-একের মাঝেই এসে হাজির হবে মেয়েটা। ওর অকস্মাৎ আত্মগোপনের কারণে যে ঝামেলা হচ্ছে, সে সম্পর্কে মনে হয় কিছু জানেই না!

'আশা করি এ জন্য শহরের ব্যাপারে তোমার মনে বাজে কোন চিন্তার উদ্রেক হয়নি,' বলল ব্রোগান। 'শহরটা বেশ ভালো।'

'লেকসাইড,' পাতলা একজন মহিলা বলল, শ্যাডোর সাথে পরিচয় হয়েছে সকালেই। তবে নাম ভুলে গিয়েছে ও। 'উত্তরের অন্যতম সেরা শহর। এখানকার কজন বেকার, জানো?'

'না।' বলল শ্যাডো।

'টেনে-টুনে বিশজন হবে কিনা সন্দেহ।' জানাল মহিলা। 'অথচ এই শহরে আর তার আশে-পাশে বাস করে কম করে হলেও বিশ হাজার মানুষ। আমরা ধনী না হতে পারি, কিন্তু বেকার বসে নেই কেউ। অথচ উত্তর-পূর্বের অধিকাংশ শহরের কথাই ধরো-ওদের অধিকাংশই এখন মরে গিয়েছে। ফার্মের উপর ভরসা করে গড়ে ওঠা শহরগুলো মরে গিয়েছে দুধের দাম বা শুয়োরের বাজারদর কমে যাওয়ায়। আমেরিকার মধ্য-পশ্চিম এলাকাগুলোতে কৃষকের সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয় কী সে, বলো তো?'

'আত্মহত্যা?' আন্দাজ করল শ্যাডো।

হতাশ দেখাল মহিলাকে। 'হ্যাঁ। আত্মহত্যা।' মাথা নাড়ল মহিলা। 'এদিকের অনেক শহর কেবল মাত্র পর্যটক আর শিকারিদের উপর নির্ভর করে বসে আছে। ওদের কাছ থেকে টাকা নেয়, আর বিনিময়ে দেয় ট্রফি। আছে অনেকগুলো কোম্পানির উপর ভর করে টিকে থাকা শহর। ওই কোম্পানি অন্য কোথাও কারখানা নিয়ে গেলেই, ধ্বসে যায় শহরটাও! মাফ করবে, তোমার নামটা ভুলে গিয়েছি।'

'আইনসেল,' বলল শ্যাডো। 'মাইক আইনসেল।' হাতে ধরা বিয়ারটা স্থানীয় হলেও, দারুণ সুস্বাদু। ঝর্ণার পানি ব্যবহার করে বানানো।

'আমি কেলি নফ,' নিজের পরিচয় আবারও দিল মহিলা। 'ডলির বোন।' ঠান্ডায় এখনও লাল হয়ে আছে তার চেহারা। 'যেটা বলছিলাম, লেকসাইডের আসলে কপাল ভালো। আমাদের কিছু কিছু করে সবকিছুই আছে-ফার্ম, কারখানা, পর্যটন, হস্ত-শিল্প। ভালো স্কুলও আছে।'

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে মহিলার দিকে তাকাল শ্যাডো। কেলির কথাগুলো কেমন যেন ফাঁপা ফাঁপা লাগছে। মনে হচ্ছে, দক্ষ কোন সেলসম্যানের বয়ান শুনতে পাচ্ছে। কে জানে, সম্ভবত শ্যাডোর চেহারায় সেই বিভ্রান্ত ভঙ্গিটা দেখতে পেল মহিলা। 'আমি দুঃখিত।' বলল সে। 'আসলে প্রিয় কোন বিষয় নিয়ে একবার কথা বলা শুরু হলে, আর থামতে চাই না আমি। যাই হোক, কী করো তুমি?'

'আমার চাচা দেশজুড়ে অ্যান্টিক জিনিস-পত্র কেনা বেচা করে। বড় আর ভারী জিনিসগুলো নড়াচড়া করার সময় ডাক পড়ে আমার। কাজটা ভালো, তবে সবসময় ব্যস্ত থাকতে হয় না।' একটা কালো বিড়াল, বারের মাসকট হবে, শ্যাডোর দুই পায়ের ফাঁকে এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ ওর বুটের সাথে মাথা ঘষে উঠে এলো ওর পাশে। বেঞ্চে শুয়ে আরাম করে ঘুমিয়ে পড়ল।

'অন্তত,' বলল ব্রোগান। 'ঘুরে বেড়াবার সুযোগ তো পাও। আর কিছু করো না?'

'তোমার কাছে কোয়ার্টার হবে আটটা?' জানতে চাইল শ্যাডো। পকেট হাতড়ে মাত্র পাঁচটা কোয়ার্টার বের করে আনল ব্রোগান। কেলি নফ দিল বাকি তিনটা।

আটটা পয়সা নিয়ে দুই সারিতে চারটা চারটা করে সাজাল শ্যাডো। টেবিলের নিচে বাঁ হাত রেখে, একটুও ইতস্তত না করে চারটা পয়সা নিচে নিয়ে এলো!

এরপর আটটার আটটাকেই ডান হাতে নিয়ে নিল ও। বাঁ দিকে থাকা একটা খালি গ্লাস ঢেকে দিল ন্যাপকিন দিয়ে। ডান হাত থেকে একটা একটা করে পয়সা ফেলল ও, আর ওগুলো গিয়ে জমা হলো গ্লাসের ভেতর। ডান হাত খুলে সবাইকে দেখাল সে-ভেতরটা একেবারে খালি। এরপর ন্যাপকিন সরানো মাত্র সবগুলো পয়সাকে গ্লাসের ভেতর দেখা গেল!

পয়সাগুলো ফিরিয়ে দিল শ্যাডো-তিনটা কেলিকে, আর পাঁচটা ব্রোগানকে। এরপর আবার একটা নিয়ে নিল ব্রোগানের হাত থেকে। ওটাকে ফুঁ দিয়ে বানিয়ে দিল একটা পেনি! ব্রোগানকে ওটা দেয়ার পর লোকটা অবাক হয়ে গুনে দেখল, হাতে এখনও পাঁচটা কোয়ার্টারই আছে!

'তুমি তো দেখি,' আনন্দিত কণ্ঠে বলল হিনজেলমান। 'হুডিনির সাক্ষাৎ ছোট ভাই!'

'আমি শিক্ষানবিশ।' বলল শ্যাডো। 'এখনও অনেকদূর যেতে হবে।' মুখে বললেও, ভেতরে ভেতরে গর্বিতবোধ করল ও। জীবনে এই প্রথম প্রাপ্তবয়স্ক একদল মানুষকে জাদু দেখাল।

ফেরার পথে খাবারের দোকান থেকে এক কার্টুন দুধ কিনল ও। চেক-আউট কাউন্টারের মেয়েটা পরিচিত লাগছে খুব, কাঁদতে কাঁদতে চোখ লাল করে ফেলেছে সে। চেহারায় ফুটি-ফুটি দাগ।

'তোমাকে আমি চিনি।' বলল শ্যাডো। 'তুমি হলে-' আরেকটু হলেই বলে বসেছিল-তুমি হলে আলকা-সেলটযার মেয়ে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'তুমি অ্যালিসনের বন্ধু। বাসে তোমাদেরকে একসাথে দেখেছি। আশা করি মেয়েটার কোন বিপদ হয়নি।'

নাক টানল মেয়েটা, নড করে বলল, 'আমিও তাই আশা করি।' মেয়েটার বুকের কাছে একটা ব্যাজ লাগান। ওতে লেখা-হাই! আমি সোফি! বিশ পাউন্ড ওজন কমাতে চাও? তাও আবার ত্রিশ দিনে? তাহলে আমাকে জিজ্ঞাসা করো।

'সারাটা দিন ওকে খুঁজে বেরিয়েছি আমরা। কপাল মন্দ, পাইনি।'

আবার নড করল সোফি, চোখ ছলছল করছে। দুধের কার্টুনটা একটা স্ক্যানারের সামনে ধরল ও, শ্যাডোকে দাম বলা মাত্র দুই ডলার এগিয়ে দিল সে মেয়েটার দিকে।

'আমি এই বালের শহরে আর থাকছি না,' প্রায় বসে যাওয়া কণ্ঠে আচমকা বলে উঠল মেয়েটা। 'অ্যাশল্যান্ডে আমার মা'র সাথে থাকব। এই বছর অ্যালিসন উধাও, গত বছর গিয়েছিল স্যান্ডি ওলসেন। তার আগের বছর জো মিং। সামনের বছর যদি আমার পালা আসে তো?'

'আমি তো ভেবেছিলাম, স্যান্ডি ওলসেন ওর বাপের সাথে চলে গিয়েছে!'

'হুম,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মেয়েটা। 'আর জো মিং পালিয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ায়। স্যারা লিন্ডকুইস্ট রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে পথ ভুল করেছে, তাই না? যাই হোক, আমি অ্যাশল্যান্ডে যেতে চাই।'

লম্বা করে একটা শ্বাস নিল মেয়েটা, তারপর শ্যাডোকে অবাক করে দিয়ে হাসল! অভিনয় বলে মনে হলো না শ্যাডো। সম্ভবত মেয়েটাকে নির্দেশ দেয়া আছে, কেনাকেটা শেষ করলে ক্রেতার দিকে তাকিয়ে হাসতে হবে। বাকি দিনটা ভালো কাটুক, এই বলে খুচরা পয়সা ওর দিকে এগিয়ে দিল মেয়েটা। এরপর মন দিল লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা পরের ক্রেতার দিকে।

দুধ নিয়ে ফিরতি পথ ধরল শ্যাডো। হ্রদের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ক্ল্যাংকার আর ব্রিজ পার হয়ে এসে পৌঁছাল অ্যাপার্টমেন্টে।

আমেরিকায় আগমন
১৭৭৮

এক ছিল মেয়ে, যার মামা তাকে বিক্রি করে দিয়েছিল, নিখুঁত হাতের লেখায় কাগজে লিখল মি. আইবিস।

গল্পটা আসলে এতটুকুই, বাকিটা কেবল বিস্তারিত বর্ণনা। এমন অনেকগল্প আছে, যেগুলো মন দিয়ে শুনলে বা পড়লে আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হবে। একজন মানুষের গল্প বলি। ভালো মানুষ, বন্ধুদের প্রতি দয়ালু। স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত, ছেলে-মেয়ে অন্ত:প্রাণ। দেশকে খুব ভালোবাসে, তাই দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে। দক্ষতার সাথে ইহুদীদের খুন করে লোকটা। তাদেরকে বলে, গোসল করতে যাবার সময় কিন্তু আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার ভোলা যাবে না। অনেকেই ভুলে যায়, আর তাই অন্যের পোশাক নিয়ে বেরিয়ে আসে ভুল করে। কথাটা শুনে সান্ত্বনা পায় ইহুদীরা, ভাবে-গোসলের পরেও বেঁচে থাকবে হয়তো। আমাদের এই লোক খুব সতর্কতার সাথে গ্যাসে প্রয়োগে মৃত ইহুদীদের দেহগুলো চুল্লিতে ঢুকিয়ে দেয়। লোকটার একমাত্র চিন্তা, কেন নরকের কীটগুলোকে হত্যা করার সময় ওর মন খারাপ হয়? যদি সত্যি সত্যি সে ভালো মানুষ হতো, তাহলে তো ওর আনন্দিত হবার কথা ছিল!

এক ছিল মেয়ে, যার মামা তাকে বিক্রি করে দিয়েছিল-গল্পটা তাই একদম সহজ...সরল!

কোন মানুষই, দাবী করেছিলেন ডন। আলাদা আলাদা ভাবে...দ্বীপের মতো বাস করতে পারে না। ভুল করেছিলেন তিনি। মানুষ যদি আলাদা দ্বীপ না হতো, তাহলে তো একে-অন্যের দুঃখের মাঝে ভরাডুবি হতো আমাদের। আমরা অন্যদের দুঃখ হতে ইনস্যুলেটেড (যে শব্দটা আভিধানিক অর্থ, দ্বীপে পরিণত করা)। আমাদের এই আলাদা দ্বীপে পরিণত হবার ক্ষমতা, আমাদের সবার গল্পের মিল-এসবই বাঁচিয়ে রেখেছে, সুস্থ রেখেছে সবাইকে। জীবনের গল্পের মূলটা কিন্তু একই-মানুষ জন্মায়, কিছুদিন বেঁচে থাকে আর তারপর একভাবে না একভাবে মারা যায়। বাকি বিরবরণটা ইচ্ছামত বসিয়ে নেয়া যায়। অন্যদের মতো হলেও, গল্পটা আলাদা আলাদা। জীবনটা যেন তুষারের ছোট ছোট টুকরার মতো, একের সাথে অন্যে মিলে স্বাভাবিক...অথচ আলাদা আলাদা নকশা তৈরি করে। ঠিক যেন একই ঝাঁকের কই (কই এক ঝাঁক হলেও, ভালোমতো কয়েক মিনিট দেখলে প্রতিটাকে আলাদা করা সম্ভব)।

ব্যক্তি কে ব্যক্তি হিসেবে কল্পনা না করলে, সে আসলে অনেক সংখ্যার ভিড়ে আরেকটা সংখ্যা কেবল-এক হাজার মৃত, এক লাখ মারা গিয়েছে, 'হতাহতের সংখ্যা দশ লাখ ছাড়াতে পারে।' কিন্তু জীবনের গল্প সেই সংখ্যাটা পরিণত করে মানুষে। তবে হ্যাঁ, সেই মানুষে পরিণত হওয়াটাও আসলে মিথ্যা। কেননা তারপরেও মানুষের দুঃখ-কষ্টের কোন পরিবর্তন আসে না। দুর্ভিক্ষে মারা যাওয়া কোন বাচ্চার কথাই ধরা যাক, ফোলা পেট নিয়ে পড়ে থাকে তার মরদেহ। দেহের চারপাশে ভনভন করে উড়তে থাকে মাছি। তার নাম, পরিচয়, বয়স, স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন জানলে কি মৃত্যুর দুঃখ কম অনুভূত হবে? যদি হয়, তাহলে কি তার ভাই বা বোন, যে মরে পড়ে আছে তারই পাশে, তার প্রতি অবিচার করা হবে না। যদি দুজনের প্রতিই করুণা জন্মে মনে, তাহলে সেই দুর্ভিক্ষের ফলে মাছির খাবার হবার অপেক্ষায় আপেক্ষমান বাকি হাজারো বাচ্চার চাইতে কি তারা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাবে?

এসব মুহূর্তগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য আমরা পরিণত হই একেকটা দ্বীপে, যেখানে দুঃখ আমাদেরকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। এজন্যই হয়তো গল্পের দিকে ধাবিত হই আমরা। বরং থেকে অন্য মানুষের মস্তিষ্কে প্রবেশ করার, অন্য কোন দ্বীপে যাবার সুযোগ করে দেয় আমাদেরকে। গল্পে আমাদের মৃত্যু হয়, অথবা অন্য কারও মৃত্যুর সাক্ষি হই। আর সেই দুনিয়ার বাইরে আসলে আমরা বন্ধ করে দেই বই। ফিরে যাই নিজের জীবনে।

জীবন সে রকমই, এক-অথচ আবার আলাদা।

আর সেই জীবনের সবচেয়ে সহজ সত্য হলো-এক ছিল মেয়ে, যার মামা তাকে বিক্রি করে দিয়েছিল।

মেয়েটার জন্ম যেখানে, সেখানে একটা কথা প্রচলিত আছে: কোন বাচ্চার পিতৃ-পরিচয় নিয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া অসম্ভব। তবে মায়ের পরিচয় ভুল করার কোন সুযোগ নেই। তাই সম্পত্তি আর বংশধারা মাতৃ-তান্ত্রিকভাবে হাত বদল হয়। ক্ষমতার ব্যাপারটা ভিন্ন, সেটা পুরুষই কুক্ষিগত করে রাখে। বোনের ছেলেমেয়ের মালিকানা থাকে পুরোপুরি তার ভাইয়ের হাতে।

আচমকা যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় দুই গ্রামের মাঝে। আসলে ওটাকে যুদ্ধ না বলে গ্রামের পুরুষদের মাঝে ঝগড়া বলাই ভালো। একদল জয়ী হয়, অন্যদল পরাজিত। জীবনে সেখানে পণ্য, মানুষ-পণ্য সম্পদ। ওখানকার হাজার বছরের সংস্কৃতিতে দাসত্ব জড়িয়ে রয়েছে আষ্টে-পৃষ্টে। আরব ব্যবসায়ীদের হাতে পতন ঘটেছে পূর্ব আফ্রিকার মহান সব সাম্রাজ্য। অবশ্য পশ্চিম আফ্রিকানরা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করেছে।

ওদেরকে এই বিক্রি করে দেয়াটা খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। অবশ্য যমজ ভাই-বোনকে ধরা হয় স্বর্গীয় আর জাদুময় আশীর্বাদ হিসেবে। তাই ভয় পেয়েছিল মামা, এতটাই যে বিক্রি করে দেয়াটার কথা জানায়নি ওদেরকে। পাছে তার কোন ক্ষতি করে ফেলে দুজন!

ভাই-বোনের বয়স ছিল বারো। মেয়েটার নাম ছিল উটুটু, দূত-পাখি। আর মৃত এক রাজার নাম অনুসারে ছেলেটার নাম রাখা হয়েছিল আগাসু। সুস্থ-সবল দুই বাচ্চা ছিল ওরা। যমজ বলে দেবতাদের নানা গল্প শোনানো হতো ওদেরকে। সেসব মন দিয়ে শুনত তারা, মনেও রাখত।

মামা লোকটা ছিল মোটাসোটা আর অলস। যদি তার গরু-ছাগল আরও বেশি থাকত, তাহলে হয়তো বাচ্চাদেরকে দাস বনতে হতো না। কিন্তু তা না থাকায়, ভাগ্নে-ভাগ্নিকে বিক্রি করে দিল সে। লোকটার কথা যথেষ্ট হয়েছে, এই গল্পে আর সে আসবে না। আমরা দুই যমজকেই অনুসরণ করব।

আরও কয়েকজন দাসের সাথে বারো মাইল হেঁটে একটা ছোট আউটপোস্টে এসে উপস্থিত হলো ওরা। এখানে আরও তেরোজনের সাথে বিক্রি করে দেয়া হলো ওদের, কিনে নিল ছয়জন মানুষ। হাতে বর্শা আর ছুরি নিয়ে ওদেরকে এই মানুষগুলো হাঁটিয়ে নিল পশ্চিমে, সমুদ্রের দিকে। সাগর পার ধরে অনেক পথ হাঁটতে হলো ওদেরকে। পনেরো জন দাসের সবার হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, একজনের গলার সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে আরেকজনের গলা।

উটুটু তার ভাইকে জিজ্ঞাসা করল, কী হবে ওদের?

'আমি জানি না,' বলল আগাসু। ছেলেটার মুখে আগে হাসি লেগেই থাকত, সাদা-নিখুঁত দাঁতগুলো দেখা যেত সবসময়। ভাইয়ের হাসি দেখে আনন্দ পেত উটুটু নিজেও। এখন অবশ্য হাসছে না আগাসু। বোনকে সাহস দেবার জন্য মাথা উঁচু আর বুক ফুলিয়ে হাঁটছে।

উটুটু পেছনে দাঁড়ান লোকটা, যার গালে লম্বা ক্ষতের দাগ, বলল, 'আমাদেরকে সাদা পিশাচের কাছে বিক্রি করে দেয়া হবে। তারা আমাদেরকে নিয়ে যাবে ওদের এলাকায়।'

'কী করবে নিয়ে গিয়ে?' জানার দাবী জানাল উটুটু।

কিন্তু লোকটা আর কিছুই বলল না।

'বললে না?' আবারও জানতে চাইল উটুটু। ঘাড়ের উপর দিয়ে প্রহরীদের দিকে তাকাবার প্রয়াস পেল আগাসু। হাঁটার সময় কথা বলা বা গান গাওয়া ওদের জন্য নিষিদ্ধ।

'সম্ভবত আমাদেরকে খেয়ে ফেলবে,' বলল লোকটা। 'অন্তত আমি তেমনটাই শুনেছি। এজন্যই ওদের এত দাস দরকার, সাদা পিশাচদের পেট কিছুতেই ভরে না।'

কেঁদে ফেলল উটুটু। আগাসু সান্ত্বনা দিলে বোনকে। 'কেঁদো না বোন, সাদা পিশাচরা তোমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না। আমি রক্ষা করব তোমাকে। আমাদের দেবতারা রক্ষা করবেন।'

কিন্তু কান্না থামল না উটুটুর, ভয়-রাগ-ব্যথা মনে নিয়ে হাঁটতে থাকল ও। এমন ভয় কেবল একজন বাচ্চাই অনুভব করতে পারেঃ নিখাদ, সর্বগ্রাসী। আগাসুকে সে বলতে পারল না, সাদা পিশাচদের খাদ্য হবার ভয়ে ভীত নয় ও। যে করেই হোক, নিজে সে বেঁচে থাকবে। কাঁদছে কারণ ওর ভয়, ভাইকে খেয়ে ফেলবে পিশাচরা। আর আগাসুকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হবে সে নিজে।

একটা ট্রেডিং পোস্টে ওদেরকে দশ দিন রাখা হলো। দশম দিনের সকালে ওদেরকে বের করা হলো এ কদিন কয়েদ করে রাখা কুঁড়ে-ঘর থেকে। শেষের দিকে আরও দাস আসায়, ভেতরটা একেবারে ভরে উঠেছিল। ওদেরকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো পোতাশ্রয় পর্যন্ত, ওখানে একটা জাহাজ দাসদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

জাহাজটা দেখে অবাক হয়ে গেল উটুটু, এত বড় কোন জলযান হয়! এরপর আবার চিন্তিত হয়ে ভাবল, এই জাহাজে তো ওরা সবাই আঁটবে না। পানিতে আলসে ভঙ্গিতে ভাসছে ওটা। ওখান থেকে একটা নৌকা এসে এসে নিয়ে যাচ্ছে দাসদের। নিচের ডেকে নাবিকরা গাদাগাদি করে ভরছে সবাইকে। নাবিকদের কারও কারও ত্বক লাল, আবার কারও কারও তামাটে। নাকগুলো তীক্ষ্ণ, দাড়ি দেখে কোন জন্তু বলে মনে হয়। কয়েক নাবিককে দেখে নিজের মতোই কালো বলে মনে হলো উটুটুর, ঠিক ওদেরকে সাগর পার পর্যন্ত নিয়ে আসা লোকদের মতো। পুরুষ, নারী আর বাচ্চাদের আলাদা আলাদা তিনভাগে ভাগ করে ডেকের আলাদা আলাদা অংশে রাখা হলো। দাসের সংখ্যা বেশি হওয়ায়, এক ডজন পুরুষকে শিকল পরিয়ে ফেলে রাখা হলো উন্মুক্ত ডেকেই।

উটুটুর স্থান হলো বাচ্চাদের সাথে, মেয়েদের সাথে না। শিকলও পরতে হয়নি ওকে, কয়েদ করে রেখেই নাবিকরা সন্তুষ্ট। তবে আগাসু, ওর ভাইকে মাছের মতো বেঁধে-ছেঁদে রাখা হলো পুরুষদের সাথে। নাবিকরা পরিষ্কার করলেও, নিচের ডেক থেকে ভেসে আসছে দুর্গন্ধ: ভয়, পিত্ত, ডায়রিয়া আর মৃত্যুর গন্ধ; আতঙ্ক, পাগলামি আর ঘৃণার ঘ্রাণ।

অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে গরম হোল্ডে বসে রইল উটুটু। দুই পাশে বাচ্চাদের ঘামের স্পর্শ পাচ্ছে ও। ঢেউয়ের ধাক্কায় পাশে বসা একটা ছোট্ট ছেলে এসে পড়ল ওর গায়ের উপর। এমন এক ভাষায় মাফ চাইল ছেলেটা যা উটুটু বুঝতে পারল না। আধা-অন্ধকারে হাসার প্রয়াস পেল মেয়েটা।

পানিতে ভাসল জাহাজ।

সাদা মানুষেরা যেখান থেকে এসেছে, সেই জায়গার কথা চিন্তায় এলো উটুটুর (অবশ্য এখন পর্যন্ত আসল সাদা চামড়া দেখা হয়নি ওর, সমুদ্রের জলে ভিজে আর রোদে পুড়ে নাবিকদের চামড়া তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে)। ওদের কি খাবারের এতই অভাব যে উটুটুর এলাকায় এসে মানুষকে ধরে নিয়ে যেতে হবে? নাকি কালো চামড়ার মাংসের স্বাদ আলাদা...বিশেষ কিছু? যেটা খাবার কথা ভাবলেই তাদের জিভে জল আসে?

দ্বিতীয় দিন ঝোড়ো বাতাসের পাল্লায় পড়ল জাহাজটা। ক্ষতি হলো না কোন, তবে কেঁপে কেঁপে উঠল জলযান। ফলে বমির গন্ধের সাথে যুক্ত হলো প্রস্রাব আর পায়খানার গন্ধ। দাসদের ডেকে বাতাস চলাচলের জন্য রাখা ফুটো দিয়ে প্রচুর পরিমাণে পানি এসে ভিজিয়ে দিল সবাইকে।

যাত্রা শুরু হবার এক সপ্তাহের মাথায়, যখন স্থলের আর চিহ্নও দেখা যায় না, দাসদের শিকল খুলে দেয়া হলো। তবে সাবধানও করা হলো, অবাধ্যতার শাস্তি হবে ভয়াবহ।

সকাল বেলা দাসদের খেতে দেয়া হতো শিমের বিচি আর বিস্কুট। সেই সাথে লেবুর রস। খাবারগুলো এত বাজে যে চেহারা বিকৃত হয়ে যেত সবার। কয়েকজন তো তিতা রস খেয়ে বমি করে ফেলত প্রায়। তবে মুখ থেকে ফেলে দিতে পারত না। ধরা পড়লে এই কাজের শাস্তি স্বরূপ খেতে হবে চাবুক।

রাতে খাবার বলতে ছিল নোনা মাংস। স্বাদ তো বাজে ছিলই, সেই সাথে ধূসর মাংসের উপর দেখা যেত রঙধনু রঙের আস্তর। এটা কিন্তু যাত্রা শুরুর দিকের কথা। আস্তে আস্তে আরও খারাপ হতে শুরু করল মাংসের অবস্থা।

সুযোগ পেলেই উটুটু আর আগাসু দুই মাথা এক করত। নিজ ভূমির কথা, মায়ের গল্প আর খেলার সাথীদের স্মৃতিচারণ করে সময় কাটাত তারা। কখনও কখনও মায়ের মুখে শোনা গল্পগুলো ভাইকে আবার বলত উটুটু। এলেগবার গল্প, দেবতাদের মাঝে সবচেয়ে বুদ্ধিধর এই দেবতা

হলেন দুনিয়াতে মহান মাউও'র চোখ আর কান। মাউও'র দূত হিসেবে কাজ করেন তিনি।

সন্ধ্যার দিকে ভ্রমণের বিরক্তি কাটাবার জন্য নাবিকরা বাধ্য করত দাসদের নাচ-গান করতে।

উটুটুর কপাল ভালো যে ওকে বাচ্চাদের সাথে আটকে রাখা হয়েছিল। একটা খাঁচায় পুরে নাবিকরা যেন ভুলে গিয়েছিল ওদের। তবে মেয়েদের কপাল অতটা ভালো ছিল না। কিছু কিছু দাসবাহী জাহাজে নাবিকরা বারবার ধর্ষণ করত মেয়েদের, ব্যাপারটা যেন ডাল-ভাত! কিন্তু এই জাহাজটা সেরকম না। তাই বলে যে ধর্ষণের ঘটনা একেবারেই ঘটেনি, তা কিন্তু নয়।

ডজনকে ডজন পুরুষ, নারী আর বাচ্চা ওই সফরে মারা গিয়েছিল। তাদের মৃতদেহগুলো ফেলে দেয়া হয়েছিল জাহাজ থেকে। আবার কিছু কিছু দাস মারা না গেলেও, মৃতপ্রায় বলে তাদের ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল সমুদ্রে।

ডাচ একটা জাহাজে ভ্রমণ করছিল উটুটু আর আগাসু, কিন্তু সে কথা তখন জানা ছিল না ওদের। জাহাজটা ব্রিটিশ, পর্তুগীজ, স্প্যানিশ বা ফ্রেঞ্চ হলেও হতে পারত।

জাহাজের কালো নাবিকেরা, যাদের ত্বক উটুটুর চাইতেও কালো, দাসদের নির্দেশনা দিত-কী করতে হবে, কোথায় যেতে হবে, এসব। একদিন সকালে উটুটু লক্ষ্য করল, এই কালো নাবিকদের একজন একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। সকালে যখন ও খাচ্ছে, তখন লোকটা এগিয়ে এলো ওর দিকে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ওর পাশে।

'এই কাজটা কেন করো?' জানতে চাইল মেয়েটা। 'সাদা পিশাচদের আদেশ পালন করো কেন?'

এমনভাবে হাসল লোকটা, যেন এরচাইতে মজার কোন প্রশ্ন আগে শোনেনি! আচমকা ঝুঁকে এলো নাবিক, উটুটুর কানে নিজের ঠোঁট প্রায় স্পর্শ করিয়ে বলল, 'আরেকটু বড় হলে তোমাকে দারুণ সুখ দিতাম আমি। কে জানে, আজ রাতে দিলে দিতেও পারি। আগে দেখি, কেমন নাচতে পারো তুমি।'

বাদামি চোখ জোড়া দিয়ে লোকটার চোখে চোখ রাখল উটুটু। মুচকি হেসে জবাব দিল, 'আমার নিচে আলাদা দাঁত আছে, ওখানে যদি তুমি প্রবেশ করো-তাহলে কেটে নেব। আমি ডাইনি মেয়ে!' লোকটার

চেহারায় ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল প্রায় সাথে সাথে, সেই ছাপ দেখে দারুণ আনন্দ পেল উটুটু। আর কিছু না বলে বিদায় নিল নাবিক।

শব্দগুলো উচ্চারণ করল বটে মেয়েটা, কিন্তু ওগুলো যেন ও নিজে বলেনি। আচমকা উপলব্ধি করতে পারল উটুটু, ধূর্ত এলেগবা ওর মুখ দিয়ে কথাগুলো বলেছেন। সে রাতে দেবতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঘুমালো সে।

দাসদের মধ্যে বেশ কয়েকজন খেতে অস্বীকৃতি জানালে, প্রচণ্ড প্রহার করা হলো তাদের; বাধ্য করা হলো খাবার খেতে। এত বেশি মারা হলো যে আঘাতের চোটে দুজন মৃত্যু বরণ করল পর্যন্ত! তবে কাজ হলো, জাহাজের আর কেউ না খাওয়ার ভুলটা করল না। একজন পুরুষ আর একজন মহিলা জাহাজ থেকে ঝাঁপ দেবার প্রয়াস পেল। মহিলা সফল হলেও, পুরুষের ভাগ্য এতটা ভালো ছিল না। তাকে উদ্ধার করে মাস্তুলের সাথে বেঁধে রাখা হলো, প্রায় একদিন ধরে ইচ্ছামতো পেটান হলো তাকে। রাতেও ওখানেই রইল লোকটা, না খাবার পেল আর না পান করার জন্য পানি। তৃতীয় দিনের মাথায় প্রলাপ বকতে শুরু করল সে। যখন সেটাও বন্ধ হয়ে গেল, তখন তাকে ছুঁড়ে ফেলা হলো সমুদ্রে। আত্মহত্যা প্রচেষ্টার পরবর্তী পাঁচ দিন সব দাসকে আটকে রাখা হলো শিকল দিয়ে।

লম্বা একটা সফর ছিল ওটা, দাসদের জন্য প্রচণ্ড কষ্টকর; নাবিকদের জন্যও। যদিও নিজেদের হৃদয়কে ততদিনে শক্ত করে নিয়েছিল তারা। নিজেদেরকে তারা ভাবত কৃষক হিসেবে, আর দাসদেরকে গবাদি পশু।

মন ভালো করা একটা দিনে ব্রিজপোর্ট, বার্বাডোজে এসে থামল ওদের জাহাজ। দাসদেরকে ছোট ছোট নৌকায় করে ফিরিয়ে আনা হলো সমুদ্রতটে। এরপর তাদেরকে দল বেঁধে নিয়ে যাওয়া হলো একটা মার্কেটে, লাইন ধরে দাঁড় করানো হলো তাদেরকে। আচমকা বেজে উঠল একটা ঘণ্টি, মার্কেটটা ভরে গেল মানুষে। লাল-মুখো অনেকগুলো মানুষ এসে খোঁচাতে শুরু করল ওদের। চিৎকার-চেঁচামেচি আর দর কষাকষির শব্দে ভরে উঠল চারপাশ।

উটুটু আর আগাসুকে আলাদা করে ফেলা হলো। খুব দ্রুত ঘটে গেল ব্যাপারটা-একটা বিশালদেহি লোক এসে আগাসুর মুখ খুলে দেখল ভেতর। এরপর হাতের মাংসপেশি টিপে-টুপে দেখে নড করল একবার। অন্য দুজন লোক সরিয়ে নিয়ে গেল ছেলেটাকে। যাবার সময় উটুটুর

দিকে তাকিয়ে ওর ভাই কেবল বলল, 'সাহস রাখো।' নড করল মেয়েটা, এরপর কেন যেন ঘোলা হয়ে গেল সবকিছু। বুক চিঁড়ে বেরিয়ে এলো চিৎকার! একত্রে ওরা যমজ, স্বর্গীয় আশীর্বাদ। আলাদা আলাদা হয়ে গেলে ওরা দুঃখ ভারাক্রান্ত দুই বাচ্চা ছাড়া আর কিছু নয়!

বেঁচে থাকতে আর কখনও ভাইকে দেখেনি উটুটু।

আগাসুর ভাগ্যে কী ঘটেছিল, তাই বলছি এখন। প্রথমে ওকে নিয়ে যাওয়া হলো মশলার একটা খামারে। সেখানে প্রত্যহ নিয়ম করে পেটানো হতো ওকে-যে সব অপরাধ ও করেছে, সেসবের জন্য তো বটেই; যেগুলো করেনি, সেগুলোর জন্যও। হালকা-পাতলা ইংরেজি শিখিয়ে ওর নাম দেয়া হল ইনকি জ্যাক। একবার যখন ছেলেটা পালাবার চেষ্টা করল, তখন কুকুর লেলিয়ে দেয়া হলো ওর পেছনে। ধরে নিয়ে এসে কেটে ফেলা হলো একটা আঙুল-আর কখনও যেন ভুল না হয় ওর, সেজন্য। না খেয়ে আত্মহননের চেষ্টাও করেছিল একবার, কিন্তু ওর সামনের দাঁতগুলো ভেঙ্গে জোড় করে নরম খাবার মুখে ঢুকিয়ে দেয়া হলো!

তখনকার দিনেও, দাসীর গর্ভে জন্ম নেয়া দাসদের পছন্দ করত মালিকরা। আফ্রিকা থেকে ধরে আনা দাসরা যেহেতু স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে আগে, তাই তাদেরকে পোষ মানানো কঠিন। তারা পালাবার চেষ্টা করে, আর তা না পারলে আত্মহননের। সফল হলেই, টাকা নষ্ট।

ইনকি জ্যাকের বয়স যখন ষোলো হলো, তখন আরও কয়েকজন দাসের সাথে একটা আখ প্ল্যান্টেশনের মালিকের কাছে বিক্রি করে দেয়া হলো তাকে। সেন্ট ডমিনিগের দ্বীপে ওর নাম হলো হায়াসিন্থ। নিজের গ্রামের এক বুড়ির সাথে প্ল্যান্টেশনে দেখা হলো ওর-মহিলা আগে বাড়ির কাজ করত, এখন বাতে ধরেছে আঙুলগুলো। বুড়ি জানালো, সাদা চামড়ার লোকেরা ইচ্ছা করে দাসগুলোকে আলাদা আলাদা রাখে, যেন একই গ্রাম বা এলাকার কাউকে দেখতে না পায়। এতে করে বিদ্রোহের সম্ভাবনা কমে যায়। দাসরা যখন নিজেদের মাঝে অচেনা ভাষায় কথা বলে, তখন ক্ষেপে যায় মালিকরা।

হায়াসিন্থ ফ্রেঞ্চ কিছু শব্দ শিখল, ওকে ক্যাথলিক চার্চের আদর্শ সম্পর্কেও শেখান হলো কিছু। প্রতিদিন সকালে আখ কাটতে যেতে হতো ওকে, সূর্য ওঠা থেকে ডোবা পর্যন্ত কাটত ক্ষেতেই।

বেশ কয়েকটা সন্তান জন্ম নিল ওর ঔরসে। অন্যান্য দাসদের সাথে রাতের আঁধারে বনে যাওয়া শুরু করল হায়াসিন্থ, যদিও কাজটা

একেবারেই নিষিদ্ধ। ডাম্বালা-ওয়েডু, সর্প-দেবতার উদ্দেশ্যে গান গাইল আর কালিন্ডা নাচ নাচল। গান গাইল এলেগবা, ওগু, শ্যাংগো, জাকা আরও অনেকের উদ্দেশ্যে। এই দেবতাদের নিজের সাথে করে এনেছে দাসরা, গোপনে, হৃদয়ের মণিকোঠায়।

সেন্ট ডমিনিগের আখ প্ল্যান্টেশনে কাজ করা দাসরা দশ বছরের বেশি খুব একটা বাঁচে না। ছুটি বলতে মধ্য দুপুরের দুই ঘণ্টা আর রাতের পাঁচ ঘণ্টা (রাত এগারোটা থেকে ভোর চারটা পর্যন্ত)। এই সময়ের মাঝেই ওদের নিজস্ব ক্ষেতের যত্ন নিতে হতো (মালিকরা খাবার দিত না, দিত এক টুকরা জমি। ওখানে চাষ করে নিজের খাবার ফলাতে হতো দাসদের)। বিশ্রাম নেবার সময় বলতেও কেবল এতটুকুই, স্বপ্ন দেখলেও দেখতে হবে এর মাঝেই! তারপরও সময় বের করে একসাথে নাচ-গান-উপাসনা করত ওরা। সেন্ট ডমিনিগের মাটি অনেক উর্বর; নাইজার, ডাহোমি আর কঙ্গোর দেবতারা তাই নতুন এই ভূমিতে শিকড় গাড়তে খুব একটা সময় নিলেন না।

পঁচিশ বছর বয়সের কথা, হায়াসিন্থের ডান হাতের চেটোতে কামড় বসালো একটা মাকড়সা। দ্রুতই পচন ধরল জায়গাটায়, আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল সারা হাত জুড়ে। পচা গন্ধ ছড়াতে শুরু করল হাতটা থেকে, ফুলে বেগুনি বর্ণ ধারণা করল ওটা।

কড়া রাম খেতে দেয়া হলো ওকে। এরপর মালিকপক্ষ একটা ম্যাচেটি নিয়ে আগুনে ফেলে গরম করল। লাল হয়ে গেলে, হাতটাকে কাঁধের কাছ থেকে কেটে ফেলল করাত দিয়ে। কাটা জায়গাটায় ঠেসে ধরা হলো উত্তপ্ত ম্যাচেটি। এক সপ্তাহ জ্বর নিয়ে পড়ে রইল লোকটা, তারপর ফিরল কাজে।

১৭৯১ সালের দাস-বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল হায়াসিন্থ নামের এক-হাতি দাস!

এলেগবা যেন নিজেই ভর করলেন হায়াসিন্থের উপরে, জঙ্গলে দখল করে নিলেন ওকে। হায়াসিন্থের মুখ থেকে নিজে উচ্চারণ করলেন শব্দ। কী বলেছিল, পরবর্তীতে তার খুব অল্প অংশই মনে করতে পারল সে। তবে সঙ্গীদের মুখে শুনতে পেল সবকিছু-ওদেরকে নাকি স্বাধীনতা এনে দেবার, দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবার প্রতিজ্ঞা করেছে সে! হায়াসিন্থের কেবল মনে আছে তীব্র উত্তেজনার কথা, যে উত্তেজনার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল সে। আসল হাতটা আর সেই সাথে কেটে ফেলা হাতটাও চাঁদের দিকে তুলে ধরার কথা বাদে আর কিছুই মনে করতে পারছে না সে।

হত্যা করা হলো একটা শুয়োর। প্ল্যান্টেশনের নারী-পুরুষেরা পান করল সেই উষ্ণ রক্ত। একই সঙ্ঘের সদস্য বলে নিজেদেরকে ঘোষণা করল তারা। প্রতিজ্ঞা করল, ওরা হবে স্বাধীনতার যোদ্ধা; যেসব এলাকা থেকে ওদেরকে লুট করে আনা হয়েছে, সেসব এলাকার দেবতাদের প্রতি নিজেদেরকে উৎসর্গ করল।

'আমরা যদি সাদাদের সাথে যুদ্ধে মারা যাই,' একে অন্যকে বলল তারা। 'তাহলে পুনর্জন্ম হবে আফ্রিকায়। নিজের গোত্রে...নিজের বাড়িতে।'

হায়াসিন্থের বর্তমান নাম বিশালদেহি এক-হাতি। বিদ্রোহ করল সেন্ট ডমিনিগের দাসরা। লড়াই করল আগাসু, প্রার্থনা করল, বলি দিল, পরিকল্পনা করল। চোখের সামনে বন্ধু আর প্রেমিকাকে খুন হতে দেখল সে। কিন্তু লড়াই বন্ধ করল না।

প্রায় বারো বছর ধরে চলল লড়াই। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ লড়ার জন্য ফ্রান্স থেকে সৈন্য নিয়ে আসা হলো। আর সবাইকে আশ্চর্য করে জয় হলো দাসদের।

১৮০৪ সালের জানুয়ারি মাসের এক তারিখে, স্বাধীনতা পেল সেন্ট ডমিনিগ। দ্রুতই নতুন এক নাম পেল এলাকাটা-দ্য রিপাবলিক অফ হাইতি। অবশ্য বিশালদেহি এক-হাতি দেখতে পেল না তার জন্ম। সে মারা গিয়েছিল ১৮০২ সালের আগস্টে, ফ্রেঞ্চ এক সৈন্যের বেয়োনেটের আঘাতে।

ঠিক যে মুহূর্তে মারা গেল বিশালদেহি এক-হাতি (যাকে আগে ডাকা হতো হায়াসিন্থ নামে, তার আগে ইনকি জ্যাক আর যে নিজেকে পরিচয় দিত আগাসু পরিচয়ে), ঠিক সেই মুহূর্তে ওর বোনের (যার আদি নাম ছিল উটুটু, প্রথম প্ল্যান্টেশনে মেরি, এরপর ডেইজি আর ল্যাভের পরিবারে সুকি) মনে হলো, পাঁজরের ভেতর দিয়ে বেয়োনেট ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ। নিউ অর্লিয়েন্সের নদীর ধারে, ল্যাভের পরিবারের বাড়িতে অদম্য কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সে। ওর কান্নার দমকে জেগে উঠল দুই যমজ কন্যা। সুকির এই বাচ্চাদের ত্বক ক্রিম-আর-কফি রঙ্গা, প্ল্যান্টেশনে থাকা অবস্থায় জন্ম নেয়া বাচ্চাদের মতো কালো নয়। তখন সে নিজেও ছিল একটা বাচ্চা। যাই হোক একজনের বয়স পনেরো আর অন্য জন্যের বয়স দশ হবার পর আর দুজনকে দেখেনি ও। এই দুইজনের মাঝেও জন্মেছিল আরেকজন, সুকিকে দ্বিতীয়বার বিক্রি করার এক বছর আগেই।

মাটিতে পা রাখার পর সুকিকে অগণিতবার বেত্রাঘাত করা হয়েছে। একবার তো লবণ মাখিয়ে দেয়া হয়েছিল কাঁচা ক্ষতে, আরেকবার

এতক্ষণ ধরে এত জোড়ে মারা হয়েছিল যে লম্বা সময় বসতে পারেনি সে; পিঠে ছোঁয়াতে পারেনি কিছুই। কম বয়সে অনেকবার ধর্ষিত হতে হয়েছে ওকে; কালো চামড়া, সাদা চামড়া-উভয়ের হাতেই। শিকল পরিয়ে রাখা হয়েছিল মেয়েটাকে। তখনও এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন দেয়নি সুকি। ভাইকে ওর কাছ থেকে কেড়ে নেবার পর, মাত্র একবার কেঁদেছে সে। নর্থ ক্যারোলিনায় ছিল তখন, দাস বাচ্চা আর কুকুরদের খাবার ঢালা হয়েছিল একই পাত্রে। ওর নিজের ছোট ছোট বাচ্চাগুলো কুকুরের সাথে হুটোপুটি করে খাবার কেড়ে নিচ্ছিল। আগেও অনেকবার এই দৃশ্য দেখেছে সুকি, দেখেছে পরেও। কিন্তু সেদিনের সেই দৃশ্যটা ওকে কাঁদিয়েছিল।

প্রথম কিছুদিন চেহারার কমনীয়তা ধরে রাখতে পেরেছিল মেয়েটা, পেরেছিল দেহের বাঁধন অক্ষুণ্ন রাখতেও। কিন্তু তারপর বহু বছরের কষ্ট আর দুর্দশা ভেঙ্গে দিয়েছিল ওকে। মেয়েটার চেহারা এখন ভাঁজ পড়া, বাদামি চোখে ব্যথা আর কষ্ট।

এগারো বছর আগে, যখন ওর বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ, ডান হাতটা আচমকা শুকিয়ে যায়। সাদা চামড়াদের কেউ তার কারণ আন্দাজও করতে পারেনি। হাড়ের মাংস যেন শুকিয়ে গিয়েছিল, হাতটা এখন লগব্যাগ করে ঝুলতে থাকে ওর দেহের সাথে জড়ানো যায় না। এই ঘটনার পর, প্ল্যান্টেশনের কাজ ছাড়িয়ে ওকে গৃহ-দাসী হিসেবে ব্যবহার করা হতে থাকে।

চেস্টারটন পরিবার, যারা ওই প্ল্যান্টেশনের মালিক ছিল, ওর রান্না আর গৃহস্থালি কাজের দক্ষতায় সন্তুষ্টই ছিল। কিন্তু মিসেস চেস্টারটনের কেন যেন অথর্ব হাতটা একদম সহ্যই হতো না। তাই ল্যাভের পরিবারের কাছে বিক্রি করে দেয়া হলো ওকে। মাত্র এক বছর পরেই লুইজিয়ানায় ফিরে যাবার কথা ছিল পরিবারটার। মি. ল্যাভের মোটা-সোটা, হাসি-খুশি মানুষ। রাঁধুনি আর গৃহদাসীর দরকার ছিল তার, ডেইজির অথর্ব হাতটা নিয়ে খুব একটা মাথা ব্যথা ছিল না। এক বছর পর যখন তারা লুইজিয়ানায় ফিরে গেল, তখন সুকিও গেল তাদের সাথে।

নিউ অর্লিয়েন্সে পা রাখার সাথে সাথে পুরুষ আর মহিলারা ভিড় জমাতে শুরু করল ওর কাছে। কেউ চায় আরোগ্য, কেউ প্রেমিক বা প্রেমিকাকে পটাবার জিনিস। কালো চামড়ার লোক তো এলোই, এলো সাদারাও। ল্যাভের পরিবার দেখেও না দেখার ভান করল, হয়তো সবাই ভয় করে আর সম্মান দেয় এমন এক দাসীর মালিক হতে পেরে তারা খুশিই হয়েছিল। তবে, সুকিকে তার স্বাধীনতা কিনে নেয়ার ক্ষমতা দেয়নি কখনও।

রাতের অন্ধকারে জলাভূমিতে যেতে শুরু করল সুকি। সেখানে কালিন্ডা আর বামবুওলা নাচ নাচল মন ভরে। যেমনটা নেচে ছিল সেন্ট ডমিনিগে দাসরা। জলাভূমিতে ওর সঙ্গী হলো বেশ কজন দাস। দেবতার অবতার হিসেবে তারা বেছে নিল একটা কালো সাপকে। তবে আফ্রিকার দেবতারা কিন্তু সেই সেন্ট ডমিনিগের দেবতাদের মতো ওদের কারও উপর ভর করলেন না। অবশ্য বার বার তাদের নাম ধরে প্রার্থনা জানাল সুকি।

সেন্ট ডমিনিগের বিদ্রোহ সম্পর্কে সাদাদের কাছ থেকেই শুনতে পেয়েছে সে। তাদের দাবী ছিল, অতি শীঘ্রই পতন ঘটবে সেন্ট ডমিনগোর (জায়গাটাকে এ নামেই ডাকত তারা)। 'ভাবা যায়! অসভ্য, মানুষখেকোদের একটা দেশ!' এরপর আচমকা, একদিন জায়গাটা নিয়ে বন্ধ হয়ে গেল ওদের কথা বলা।

অচিরেই সুকি লক্ষ্য করল, এমন আচরণ করছে সাদারা, যে সেন্ট ডমিনগো বলে কোন জায়গা কখনও ছিলই না। আর হাইতি-জায়গাটার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেনি কেউ! যেন পুরো আমেরিকা জাতি এক হয়ে ঠিক করেছে, বিশ্বাসের জোরেই একটা প্রমাণ আকারের ক্যারিবীয় দ্বীপকে বিশ্বের মানচিত্র থেকে উধাও করে দিতে পারবে!

সুকির মনে চমকপ্রদ সব গল্প শুনতে শুনতে বড় হলো ল্যাভেরদের একটা প্রজন্ম। একদম ছোট বাচ্চাটা 'সুকি' উচ্চারণ করতে পারত না বলে, ওকে ডাকত মামা যুযু বলে। নামটা টিকে গেল। ১৮২১ সালে মধ্য-পঞ্চাশে পা রাখল ও, কিন্তু দেখতে ওকে আরও বয়স্ক বলে মনে হয়।

বুড়ো স্যান্ডি ডিডি, যে ক্যালিবডোতে ক্যান্ডি বিক্রি করে, তার চাইতে অনেক বেশি রহস্য জানে মামা যুযু। বেশি জানে মেরি স্যালোপির চাইতেও, নিজেকে ভুডু রাণী বলে দাবী করত সে। ওদের দুজনই কালো হলেও স্বাধীন ছিল, কিন্তু মামা যুযু দাস। মারাও যাবে দাস হিসেবেও, অন্তত ওর মনিব তেমনটাই জানিয়েছে।

স্বামীর খোঁজ নেবার জন্য ওর কাছে যে মেয়েটা এলো, সে প্যারিস-বিধবার মতো পোশাক পরে ছিল। সুউন্নত বুক ছিল তার, ছিল যুবতী আর গর্বিত। মেয়েটার দেহে বইছিল আফ্রিকান রক্ত, সেই সাথে ভারতীয় আর ইউরোপিয়ান রক্তও। মেয়েটার ত্বক লালচে, চুল ঘন-কালো। মেয়েটার স্বামী, জাঁক প্যারিস, সম্ভবত মারা গিয়েছে। হিসেব করলে বের হবে, লোকটা আসলে তিন-চতুর্থাংশ সাদা। গর্বিত এক পরিবারের জারজ সন্তান সে। সেন্ট ডোমিনগো থেকে পালিয়ে আসা ইমিগ্রান্টদের মাঝে সে-ও ছিল একজন। যুবতী স্ত্রীর ন্যায় লোকটাও স্বাধীন।

'আমার জাঁক, ও কি মারা গিয়েছে?' জানতে চাইল মেয়েটা। কাজ করে দক্ষ নাপিতনীর, ঘর থেকে ঘরে গিয়ে। নিউ অর্লিয়ন্সের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত রমণীর ঘরে তার যাতায়াত।

মামা যুযু সামনে রাখা হাড়গুলোর অবস্থান পড়ল। এরপর মাথা নেড়ে বলল, 'লোকটা এখন একজন সাদা মেয়েমানুষের সাথে আছে, এখান থেকে অনেক উত্তরে কোথাও। মহিলার চুল লাল, বেঁচে আছে তোমার জাঁক।'

এজন্য অবশ্য জাদু করতে হলো না তাকে। নিউ অর্লিয়ন্সের সবাই জানে, জাঁক প্যারিস কার সাথে ভেগে গিয়েছে।

কিন্তু সদ্য আগত এই মেয়েটা তা জানে না বুঝতে পেরে, অবাক হলো মামা যুযু। নাকি জানে? এখানে ওর আসার পেছনে অন্য কোন কারণ আছে?

এরপর থেকে প্রতি সপ্তাহে এক বা দুইবার করে ওর কাছে আসত মেয়েটা। এক মাস পর, বৃদ্ধার জন্য উপহার নিয়ে এলো সে-চুলে বাঁধার ফিতা, কেক আর কালো একটা মোরগ।

'মামা যুযু,' বলল সে। 'আপনি যা যা জানেন, তা-তা আমাকে শেখাবার সময় হয়েছে।'

'হ্যাঁ,' বলল মামা। ঘটনা কোন দিকে যাচ্ছে, তা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে অনেক আগেই। আর তাছাড়া, প্যারিস-বিধবা জানিয়েছে, ওর দুইটি আঙুল জালের মতো চামড়া দিয়ে একে অন্যের সাথে যুক্ত। এর অর্থটা মামা যুযুর কাছে দিনের আলোর চাইতেও পরিষ্কার-মেয়েটার একটা যমজ ছিল, যাকে মায়ের পেটেই খুন করেছে সে। তাই না শিখিয়ে মামা যুযুর আর কোন উপায়ও ছিল না।

মেয়েটাকে আস্তে আস্তে শেখাতে শুরু করল সে। জানাল দুটো নাগমেট একটা সুতায় ঝুলিয়ে গলায় পড়লে হৃদপিণ্ডের অসুখ দূর হয়। কখনও ওড়েনি, এমন একটা কবুতরের পেট কেটে কোন রোগীর পাশে রাখলে, ভালো হয়ে যায় তার জ্বর। কীভাবে চাহিদা পূরণকারী থলে পাওয়া যায়, তা-ও শেখাল। একটা ছোট চামড়ার ব্যাগে তেরোটা পেনি, নয়টা তুলার বিচি আর কালো শুয়োরের শক্ত লোম রাখতে হবে। তারপর সেটাকে কীভাবে ঘষতে হবে, সেটাও বাদ পড়ল না।

মামা যুযু যা যা শেখাল, খুব মন দিয়ে শিখল প্যারিস-বিধবা। তবে দেবতাদের নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা ছিল না। ওর আগ্রহ ছিল পুরোটাই কাজ শেখা নিয়ে। বিশেষ করে কারও মনে প্রেম জন্মাবার জাদু শিখে দারুণ আনন্দ পেল সে। এজন্য প্রথমে একটা জীবন্ত ব্যাঙ চোবাতে হবে মধুতে। তারপর সেটাকে রেখে দিতে হবে পিঁপড়ার আস্তানায়। যখন

হাড় থেকে মাংসগুলোও খেয়ে ফেলবে তারা; তখন একটা সমতল, হৃদপিণ্ড-আকৃতির হাড় পাওয়া যাবে। তার পাশেই থাকবে হুক-ওয়ালা আরেকটা হাড়। এই হুক-ওয়ালা হাড়টা লাগিয়ে রাখতে হবে যাকে প্রেমে ফেলতে চাও, তার পোশাকে। আর হৃদপিণ্ড-আকৃতির হাড়টাকে রাখতে হবে সাবধানে। কেননা ওটা হারিয়ে ফেললে, প্রেমিক বা প্রেমিকার ভালোবাসা পরিণত হবে ঘৃণায়!

মেয়েটা আরও শিখল, সাপের দেহ থেকে বানানো শুকনো পাউডার যদি শত্রুর চেহারায় ব্যবহারের পাউডারের সাথে মিশিয়ে দেয়া যায়, তাহলে সে অন্ধ হয়ে যাবে। কাউকে চুবিয়ে মারতে চাইলে, তার অন্তর্বাসের একটা টুকরা উল্টো করে মাঝরাতে পাথর চাপা দেয়াই যথেষ্ট।

এসবই মেয়েটাকে শেখাল মামা যুযু। লুক্কায়িত জ্ঞান, প্রকৃত সত্য-এসবও শেখাতে চাইল। কিন্তু প্যারিস-বিধবা (এখন তার জন্য নাম ব্যবহার করছি, যে নামটা পরবর্তীতে বিখ্যাত...অথবা কুখ্যাত হয়েছিল-মেরি লেভিউ। তবে এই মেরি লেভিউ কিন্তু সবার পরিচিত সেই বিখ্যাত মেরি লেভিউ নয়, তার মা) অনেক দূরের কোন স্থানীয় দেবতার ব্যাপারে জানতে একদমই আগ্রহী ছিল না। সেন্ট ডমিনগোর জমি যদি আফ্রিকান দেবতাদের জন্য উর্বর হয়, তাহলে এই এলাকাটা শুষ্ক আর মৃত।

'মেয়েটা শিখতেই আগ্রহী না।' গোপন কথা যাকে বলে, সেই ক্লেমেনটাইনের কাছে অভিযোগ করল মামা যুযু।

'তাহলে না শেখালেই হয়।' বলল ক্লেমেইনটাই।

'আমি শেখাচ্ছি, কিন্তু মেয়েটা কেন যেন ওটার দাম বুঝতে পারছে না। ওর আগ্রহ সব কী করতে পারবে তা নিয়ে। আমি ওকে দিতে চাই হীরা, কিন্তু ওর মনোযোগ সব সুন্দর কাঁচের দিকে। খেতে দেই কোয়েল পাখি, কিন্তু ইঁদুর ছাড়া মেয়েটার মুখ কিছু রোচে না!'

'তাহলে এত চেষ্টার দরকার কী?' জানতে চায় ক্লেমেনটাইন।

শ্রাগ করল মামা যুযু। উত্তর জানে, কিন্তু দিতে পারবে না। ওর বলা উচিৎ-বেঁচে থাকার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেই ওর দরকার শেখানো। অনেককে মরতে দেখেছে সে। স্বপ্ন দেখে, 'ওই' জায়গাটার মতো সবখানেই বিদ্রোহ করবে দাসরা। কিন্তু মনে মনে এ-ও জানে, আফ্রিকার দেবতা, এলেগবা আর মাউও'র আশীর্বাদ ছাড়া সেটা সম্ভব হবে না কোনদিন। সাদাদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে ফিরতে পারবে না নিজের বাসভূমিতে।

সেই বিশ বছর আগে, যেদিন বেয়োনেটের শীতল স্পর্শ বুকের ভেতর অনুভব করে ঘুম ভেঙেছিল ওর, সেদিনই শেষ হয়ে গিয়েছে ওর জীবন। এখন সে এমন একজন, যে এখন আর বেঁচে না, কেবল ঘৃণা করে। কেন, তা জানতে চাইতে পারেন আপনি। কিন্তু সেই বারো বছর বয়সী মেয়েটার গন্ধযুক্ত জাহাজে থাকা অবস্থায় মনের ভেতরে যে ঘৃণা জন্মেছিল, সেটার কথা কী করে জানাবে সে? কী করে বলবে অগণিত বার ধর্ষিত আর শাস্তি পাবার ইতিহাস? কী করে ব্যাখ্যা করবে শত শত রাত শিকল বাঁধা অবস্থায় কাটানো আর একের পর এক সবাইকে হারাবার কষ্ট? ছেলের কথা জানাতে পারে সে। যে লিখতে পড়তে জানে বোঝার পর, মালিক তার বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে নিয়েছিল। মেয়ের কথাও বলতে পারে, বারো বছর বয়েসে যে ছিল আটমাসের পোয়াতি। লাল মাটিতে সাবধানে একটা গর্ত খুঁড়ে তাতে উল্টো করে শুইয়ে দেয়া হয়েছিল তার মেয়েটাকে, চাবুকের আঘাতে রক্ত বইতে শুরু করেছিল পিঠ থেকে। বাচ্চাটাকে তো হারিয়ে ছিলই, এক রবিবারের সকালে মারা গিয়েছিল সে নিজেও। সাদারা তখন বসেছিল তাদের চার্চে।

...এত শত দুঃখের কথা বলবে কীভাবে সে?

'ওদের উপাসনা করো,' মামা যুযু বলেছিল মেরিকে। মাঝরাতের এক ঘণ্টা পর, জলাভূমিতে দাঁড়িয়েছিল ওরা তখন। ঊর্ধ্বাংগ ছিল অনাবৃত, ঘাম ঝড়ছিল ফোঁটায় ফোঁটায়।

মেয়ের স্বামী, জাঁক (তিন বছর পর যার মৃত্যু ঘটেছিল অস্বাভাবিক কিছু আবহে), মেরিকে সেন্ট ডমিনগোর দেবতাদের ব্যাপারে অল্প কিছু বলেছিল বটে। তবে তাতে মন দেয়নি ও। মেরির বিশ্বাস, ক্ষমতা আসে আচারের মাধ্যমে-দেবতাদের কাছ থেকে না।

মাম যুযু আর মেরি একসাথে নাচতে শুরু করল জলাভূমিতে। মিলেমিশে যেন একাকার হয়ে গেল বৃদ্ধ দাসী আর দোআঁশলা অথচ স্বাধীন এক যুবতী।

'এসবের মাঝে তোমার সফলতার চাইতেও অনেক বড় কিছু লুকিয়ে আছে।' বলল মামা যুযু।

আচারের গানে ব্যবহৃত অনেক শব্দ, যেটা একদা সে আর তার ভাই জানত, ভুলে গিয়েছে বৃদ্ধা। সুন্দরী মেরিকে সে জানাল, শব্দে কিছু যায় আসে না। খেয়াল রাখতে হবে সুরের প্রতি। নাচতে নাচতে আচমকা দিব্য দৃষ্টি খুলে গেল ওর। বুঝতে পারল, এখানে...এই জলাভূমিতে থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে আফ্রিকার দেবতাদের সুর।

সুন্দরী মেরির দিকে ফিরল সে। যুবতীর চোখ দিয়ে যেন নিজেকে দেখতে পেল-দেখল এক কালো বৃদ্ধাকে, যার অথর্ব এক হাত ঝুলছে

দেহের পাশে। যে একদা নিজের বাচ্চাকে দেখেছে কুকুরের সাথে লড়াই করে খাবার খেতে। বুঝতে পারল, মেয়েটা ওকে কতটা ঘৃণা করে!

অট্টহাসি হেসে উবু হলো বৃদ্ধা, ভালো হাতটা দিয়ে তুলে নিল জাহাজের দড়ির মতো মোটা আর চারাগাছের মতো লম্বা একটা সাপ।

'এই নাও।' বলল সে। 'এই সাপটা হবে আমাদের ভুডন।'

চুপচাপ শুয়ে থাকা সাপটাকে মেরির বহন করা বাস্কেটে রেখে দিল সে।

চাঁদের আলোয় যেন দ্বিতীয় বারের মতো খুলে গেল ওর দিব্য দৃষ্টি। ভাই, আগাসুকে দেখতে পেল ও। ছেলেটা এখন আর বারো বছরের তরুণ নেই। এখন সে বিশালদেহি এক যুবক, টাক মাথার আর হাসিতে ভাঙ্গা দাঁত দেখাচ্ছে। এক হাতে একটা ম্যাচেটি ধরে রেখেছে, ডান হাতটা কাটা।

নিজের ভালো হাতটা এগিয়ে দিল উটুটু।

'আরেকটু অপেক্ষা করো,' বিড়বিড় করে বলল মেয়েটা। 'আমি আসছি। শীঘ্রই আসছি।'

মেরি প্যারিস ভাবল, বৃদ্ধা মহিলা ওর সাথেই কথা বলছে।

অধ্যায় বারো

আমেরিকা তার ধর্ম আর তার নৈতিকতা বিনিয়োগ করেছে নিশ্চিত লাভজনক খাতে। আশীর্বাদপ্রাপ্ত একটা দেশের রূপ ধরেছে সে, কেননা তার আশীর্বাদ পাওয়াই উচিৎ। তার অধিবাসীরা যে ঈশ্বরের উপরেই বিশ্বাস রাখুক না কেন, দিন শেষে রাষ্ট্রীয় এই ধারণাকেই বুকে নিয়ে রাখে।

–অ্যাগনেস রিপ্লিয়ার, টাইমস অ্যান্ড টেন্ডেনসিস।

পশ্চিম দিকে রওনা দিল শ্যাডো; উইসকনসিন আর মিনেসোটা পার হয়ে উত্তর ডাকোটায় প্রবেশ করল। ওখানকার পাহাড়গুলো বরফে ঢাকা, দেখে মনে হয় যেন বিশাল কোন ঘুমন্ত মহিষ ওটা। শত শত মাইল পার হয়ে গেল, কিন্তু শ্যাডো আর ওয়েনসডের মাঝে একটা বাক্যও বিনিময় হলো না। উত্তর ডাকোটা, রিজার্ভেশন এলাকার দিকে এগোচ্ছে গাড়ি।

লিংকন টাউন গাড়িটা বদলে একটা পুরাতন উইনিব্যাগো নিয়েছে ওয়েনসডে। লিংকনটা চালাতে ভালোই লাগতো শ্যাডোর, নতুন এটার ভেতর থেকে কেন যেন পুরুষ বিড়ালের গন্ধ আসছে! চালাতেও ভালো লাগছে না ওর।

মাউন্ট রাশমোরের প্রথম সাইনপোস্টটা নজরে পড়ল ওদের, এখনও একশ মাইল দূরে জায়গাটা। ওয়েনসডে ঘোঁত করে উঠলেন। 'এই জায়গাটা,' আঙুল দিয়ে দেখালেন তিনি। 'দারুণ পবিত্র।'

শ্যাডো ভেবেছিল, প্রৌঢ় ঘুমিয়ে পড়েছেন। যুবক বলল, 'আমি যতদূর জানি, ওটা ইন্ডিয়ানদের জন্য পবিত্র একটা এলাকা ছিল।'

'পবিত্র তো জায়গাটা এখনও,' বললেন ওয়েনসডে। 'আমেরিকার কাজ করার পদ্ধতিটাই এমন-মানুষ চায় উপাসনা করার অজুহাত পেতে। আজকাল শুধু পাহাড় দেখতে যাবার মাঝে সার্থকতা খুঁজে পায় না মানুষ। তাই মিস্টার গুটযেন বর্গলামের অসাধারণ সেই শিল্পকর্মের জন্ম। পাহাড়ের দেয়ালে প্রেসিডেন্টদের চেহারা খোদাই করার পর, মানুষ এখন শত শত মাইল গাড়ি চালিয়ে দেখতে আসে আগে বহুবার পোস্টকার্ডে দেখা চেহারা।'

'একজনকে চিনতাম, অনেকদিন আগে ব্যায়ামাগারে আসত। সে বলেছিল, ডাকোটা ইন্ডিয়ান যুবকেরা পাহাড়টা বেয়ে উঠত। এরপর অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়ে দল বেঁধে ঝুলে পড়ত চূড়া থেকে। কেন জানেন? যেন তারা প্রেসিডেন্টের নাকে মূত্র-ত্যাগ করতে পারে।'

ঘোঁত করে উঠলেন ওয়েনসডে। 'দারুণ! দারুণ! কোন প্রেসিডেন্টকে পছন্দ হয়েছিল তাদের?'

শ্রাগ করল শ্যাডো। 'বলেনি কখনও।'

চাকার নিচে অনেকগুলো মাইল পেছনে ফেলে এলো উইনিব্যাগোটা। শ্যাডোর মনে হচ্ছিল, ও বুঝি স্থির হয়ে আছে। আর চারপাশে আমেরিকার ভূমি ছুটছে ষাট মাইল প্রতি ঘণ্টা বেগে। কুয়াশা ঢেকে রেখেছে দূরের দিগন্ত।

গাড়ি চালাবার দ্বিতীয় দিনের কথা, মাঝ দুপুরে প্রায় পৌঁছে গেল ওরা। কী সব চিন্তা করে শ্যাডো বলল, 'গত সপ্তাহে লেকসাইড থেকে একটা মেয়ে উধাও হয়ে গিয়েছে। আমরা তখন স্যান ফ্রান্সিসকোতে ছিলাম।'

'মম?' আগ্রহী মনে হলো না ওয়েনসডেকে।

'মেয়েটার নাম অ্যালিসন ম্যাকগভার্ন। এর আগেও কয়েকজন বাচ্চা উধাও হয়ে গিয়েছিল। প্রতি শীতেই যায়।'

ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন ওয়েনসডে। 'শোকাবহ ঘটনা, তাই না? দুধের কার্টনের পেছনে ছাপা বাচ্চাদের চেহারা দেখতে মায়াই লাগে। এখন অবশ্য ফ্রি-ওয়ের রেস্ট এরিয়ায় লাগানো থাকে পোস্টারগুলো: 'আমাকে দেখেছেন কোথাও?' সামনের এক্সিট দিয়ে বেরিয়ে যাও।'

শ্যাডোর মনে হলো, মাথার উপর দিয়ে বুঝি একটা হেলিকপ্টার যাচ্ছে। কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন আকাশে মেঘ ভেদ করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

'লেকসাইডকেই কেন বেছে নিলেন আপনি?' জানতে চাইল ও।

'আগেই তো বলেছি। জায়গাটা তোমাকে লুকিয়ে রাখার জন্য ভালো। ওখানে তুমি আত্মগোপন করে রইবে।'

'কিন্তু কেন?'

'কেননা, এখন সেটা করাই গুরুত্বপূর্ণ। রাস্তার বাঁয়ে থেকো।' বললেন ওয়েনসডে।

শ্যাডো বাঁয়ে ঘোরাল গাড়ির নাক।

'ঝামেলা হবে মনে হচ্ছে।' বলল ওয়েনসডে। 'ধ্যাত্তেরিকা, গতি কমাও। কিন্তু একেবারে থেমো না।'

'আরেকটু ব্যাখ্যা করবেন?'

'ঝামেলা। অন্য কোন রাস্তা চেন?'

'নাহ্। উত্তর ডাকোটায় এই প্রথম এলাম।' বলল শ্যাডো। 'কোথায় যাচ্ছি, তা-ও তো জানি না।'

পাহাড়ের অন্য পাশ থেকে লাল একটা আলো ভেসে এলো, কুয়াশায় হালকা দেখাচ্ছে।

'রোডব্লক,' বললেন ওয়েনসডে। কোটের পকেটে এক হাত ঢোকালেন তিনি, তারপর আরেক পকেটে। কিছু একটা খুঁজছেন বলে মনে হচ্ছে।

'উল্টো দিকে যাব নাকি?'

'যাওয়া যাবে না, শত্রুরা আমাদের পেছনেই আছে।' বললেন ওয়েনসডে। 'গতি কমিয়ে দশ-পনেরো মাইলে নামাও।'

আয়নার দিকে তাকাল শ্যাডো, পেছনেও হেডলাইটের আলো দেখা যাচ্ছে। বেশ কাছেই, খুব বেশি হলে এক মাইল হবে। 'আপনি নিশ্চিত?' জানতে চাইল সে।

নাক টানলেন ওয়েনসডে। 'যতটুকু নিশ্চিত হওয়া সম্ভব।' বললেন তিনি। 'আহ, পেয়েছি!' একটা সাদা চক বের করে দেখালেন শ্যাডোকে।

পরক্ষণেই প্রৌঢ় দেবতা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ড্যাশবোর্ডে চক দিয়ে আঁকিবুঁকি করার কাজে। দেখে মনে হচ্ছিল যে তিনি কোন অ্যালজেবরার ধাঁধা মেলাবার চেষ্টা করছেন।

'এবার,' কিছুক্ষণ পর বললেন তিনি। 'এবার গতি বাড়িয়ে ত্রিশ করো, এরপর আর গতি কমিও না।'

পেছনের একটা গাড়ি সাইরেন বাজিয়ে গতি বাড়াল। 'থেমো না, গতিও কমিও না।' ওয়েনসডে আবারও বললেন। 'ওরা চায়, রোডব্লকের সামনে আমরা গতি কমাই।' আবার আঁকিবুঁকি শুরু করলেন তিনি।

পাহাড় ধরে নামতে শুরু করল ওরা, রোডব্লকটা আর মাত্র পৌনে এক মাইল দূরে।

বারোটা গাড়ি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রাস্তা বন্ধ করে আছে। এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা পুলিশের গাড়ি-কালো অনেকগুলো এস.ইউ.ভি.।

'কাজ শেষ,' বললেন ওয়েনসডে, চকটাকে সরিয়ে রাখলেন। উইনিব্যাগোর ড্যাশবোর্ড এখন অগণিত রুন-অক্ষরে ভর্তি। সাইরেন বাজানো গাড়িটা প্রায় কাছে চলে এসেছে। গতি কমিয়ে শ্যাডোদের গাড়ির সাথে তাল মিলিয়ে চলছে এখন। পেছন থেকে ভেসে আশা একটা উচ্চ আওয়াজ শুনতে পেল শ্যাডো–থামো! ওয়েনসডের দিকে তাকাল ও।

'ডানে যাও,' বললেন তিনি। 'রাস্তার ঠিক পাশেই।'

'এই গাড়ি রাস্তা ছাড়া চলবে না, উল্টে যাবে।'

'কোন অসুবিধা হবে না। ডানে যাও, এখুনি!'

প্রাণপণে ডান দিকে স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাল শ্যাডো। লাফিয়ে লাফিয়ে এগোল উইনিব্যাগো। এক মুহূর্তের জন্য ওর মনে হলো, সত্যি সত্যি গাড়িটা উল্টে যাবে! কিন্তু ঠিক তখনই উইন্ডশিল্ডের সামনের দৃশ্যটা উধাও হয়ে গেল, মনে হলো যেন পরিষ্কার কোন জলাধারে বাতাস দোলা দিয়েছে!

মেঘ উধাও হয়ে গেল, সাথে করে নিয়ে গেল তুষার, কুয়াশা আর দিনের আলো।

এখন মাথার উপরে রয়েছে তারা, যেন রাতের আকাশকে খোঁচা দিচ্ছে আলোর বর্শা।

'এখানেই থামো,' বললেন ওয়েনসডে। 'বাকি রাস্তাটা হেঁটে যেতে হবে।'

ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল শ্যাডো। উইনিব্যাগোর পেছন থেকে ওর কোট, বুট আর গ্লাভস বের করে নিল। এরপর বলল, 'চলুন, যাওয়া যাক।'

ওর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন ওয়েনসডে, সেই দৃষ্টিতে সম্ভবত কিছুটা বিরক্তি...অথবা গর্বও ছিল। 'কখনও তর্ক করো না কেন তুমি?' জানতে চাইলেন তিনি। 'কেন বলো না যে এসব অস্বাভাবিক? শান্তভাবে নাও কেন সবকিছু?'

'কারণ আপনি আমাকে প্রশ্ন করার জন্য টাকা দেন না।' বলল শ্যাডো। পরক্ষণেই টের পেল, মুখ থেকে সত্যটা বেরিয়ে এসেছে। 'যাই হোক, লরার ব্যাপারটার পর আর কোন কিছুই আমাকে অবাক করে না।'

'ওর পুনরায় জীবিত হবার পর?'

'ও যে রবির সাথে শুয়েছে, সেটা জানার পর। সেই ব্যাপারটায় কষ্ট পেয়েছি। বাকিগুলো খুব একটা গায়ে লাগেনি।'

কোন দিকে যেতে হবে, তা ইঙ্গিতে দেখালেন ওয়েনসডে। হাঁটতে শুরু করল ওরা, পায়ের নিচের মাটিটাকে মনে হলো পাথরের তৈরি। আগ্নেয়, মাঝে মাঝে কাঁচের মতো। বাতাসটা ঠান্ডা, তবে খুব বেশি না। কাত হয়ে একটা পাহাড় বেয়ে নামতে হলো ওদের। নামার রাস্তাটা রুক্ষ হলেও, সেটা ধরেই এগোল ওরা। পাহাড়ের নিচে নজর গেল শ্যাডোর।

'ওটা কী?' জানতে চাইল শ্যাডো। কিন্তু ওয়েনসডে ওর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করিয়ে দিলেন।

জিনিসটা দেখতে যান্ত্রিক একটা মাকড়সার মতো। নীল ধাতব, ঝকঝক করতে থাকা এলইডি লাইট। আকারে একটা ট্রাক্টরের সমান। পাহাড়ের নিচে

চুপচাপ বসে আছে। ওটার দুই পাশে হাড়ের স্তূপ। প্রতিটার ভেতরে একটা করে অগ্নিকুণ্ড, আকারে মোমের আগুনের চেয়ে খুব একটা বেশি বড় হবে না। দপদপ করছে ওটা।

শ্যাডোর দিকে ইঙ্গিত করে ওয়েনসডে বোঝালেন, ওগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। সাবধান হবার জন্য এক পা পাশে যাবার প্রয়াস পেল ও। আর ভুলটা করল সেখানেই, কাঁচের রাস্তায় মচকে গেল তার পা। তাল হারিয়ে গড়াতে শুরু করল ও, হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইল একটা পাথর। অবসিডিয়ানের ধারালো কোনা ওর হাতের চামড়ার গ্লাভসটা এমনভাবে ছিঁড়ে ফেলল, যেন ওটা কাগজের তৈরি।

শ্যাডোর গড়ান থামল পাহাড়ের নিচে এসে, যান্ত্রিক মাকড়সা আর হাড়ের স্তূপের মাঝে।

অনেক কষ্টে নিজেকে টেনে তুলল ও। খেয়াল করে দেখল, একটা উরুর হাড়ের উপর পড়েছে তার হাত। আর ও...

...আর ও দাঁড়িয়ে আছে দিনের আলোতে। ধূমপান করছে আর হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। চারপাশে অনেকগুলো গাড়ি, কিছু খালি। কিছু ভর্তি। কফির শেষ কাপটা খাবার জন্যে এখন আফসোস হচ্ছে ওর। তলপেট প্রতিবাদ জানাচ্ছে, এই মুহূর্তে খালি না করলেই নয়।

স্থানীয় আইন-বাহিনির একজন এগিয়ে এলো ওর দিকে, বিশালদেহি লোকটার গোঁফও বলার মতো। লোকটার নাম মনে করতে চাইল সে, কিন্তু পারল না।

'কীভাবে পালাল, বুঝতে পারছি না,' বলল বিশালদেহি, ক্ষমা প্রার্থনার সুর কণ্ঠে।

'দেখার ভুল,' মন্তব্য করল ও। 'এরকম অদ্ভুত আবহাওয়া ওরকম ভুল হতেই পারে। কুয়াশার কারণে মরীচিকা দেখেছ আরকি। নিশ্চয় অন্য কোন রাস্তা ধরে যাচ্ছিল ওই গাড়িটা। আমরা ভেবেছিলাম, তারা এদিকেই আছে।'

বিশালদেহিকে হতাশ বলে মনে হলো। 'ওহ, আমি তো ভাবলাম আবার এক্স-ফাইলসের মতো কিছু হলো নাকি!'

'তেমন উত্তেজনাকর কিছু হলে তো ভালোই হতো।' বর্তমানের ওর পাইলসের সমস্যা আছে। চুলকাচ্ছে এখন জায়গাটা, মনে হচ্ছে সামনেই ঝামেলা শুরু হবে। গাড়িতে ফিরে যেতে মন চাচ্ছে ওর...মন

চাচ্ছে কোন গাছের পেছনে গিয়ে খালি হয়ে আসতে। সিগারেট রাস্তায় ফেলে পা দিয়ে পিষে ফেলল আগুন।

স্থানীয় বিশালদেহি পুলিশ গাড়িগুলোর একটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, ওটার ড্রাইভারের সাথে কী যেন বলাবলি করল সে।

লোকটা ফোন বের স্পর্শ করল মেন্যু লেখা জায়গাটা, নিচে নেমে খুঁজে বের করল 'লন্ড্রি' লেখা নামটা। ফোন করল সে।

একটা মেয়ে ধরল। 'বলছি।'

'মিস্টার টাউন বলছি, মিস্টার ওয়ার্ল্ডকে চাই।'

'দাঁড়ান, দেখি তিনি ফ্রি আছেন কিনা।'

বেশ কিচ্ছুক্ষণ বজায় রইল নীরবতা। আড়াআড়ি হয়ে দাঁড়াল সে, বেল্টটা টেনে তুলল কোমরের উপরে–কমপক্ষে দশ পাউন্ড ওজন কমাতে হবে। সেই সাথে মুত্রথলির উপর চাপও কমবে কিছুটা। আচমকা ফোনে ভেসে এলো একটা কণ্ঠ, 'হ্যালো, মিস্টার টাউন।'

'আমরা ওদেরকে হারিয়ে ফেলেছি,' বলল টাউন। ঘৃণার একটা দলা পাকিয়ে উঠল ওর পাকস্থলীতে। এই হারামজাদারা উডি আর স্টোনকে খুন করেছে। লোক দুজন খুব ভালো ছিল। অবশ্য মিসেস স্টোনকে বিছানায় নিতে উদগ্র হয়ে আছে সে। বুঝতে পারছে না, আরও অপেক্ষা করবে...নাকি এখনই নেবে প্রথম পদক্ষেপ। এখন প্রতি সপ্তাহে–দুই সপ্তাহে মহিলাকে বাইরে খাওয়াতে নিয়ে যায় ও। ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ হিসেবেই দেখে ব্যাপারটাকে। একদিন না একদিন মহিলা নিশ্চয় বুঝতে পারবে...

'কীভাবে?'

'আমি জানি না। আমরা রোডব্লকের ব্যবস্থা করেছিলাম। পালাবার কোন উপায় ছিল না ওদের, কিন্তু তারপরেও কীভাবে যেন পালিয়ে গেল।'

'জীবনের ছুঁড়ে দেয়া অনেক রহস্যের একটা হবে। দুশ্চিন্তা করো না, স্থানীয়দের শান্ত করেছ তো?'

'হ্যাঁ। মরীচিকা বলে বুঝিয়েছি।'

'ওরা মেনে নিয়েছে?'

'সম্ভবত।'

মি. ওয়ার্ল্ডের গলাটা কেমন যেন পরিচিত বলে মনে হয়–ভাবনাটা নিজের কাছেই অদ্ভুত বলে মনে হলো টাউনের। সরাসরি দুই বছর হলো

লোকটার অধীনে কাজ করে সে, প্রায় প্রতিদিন কথা হয়। পরিচিত তো মনে হবেই।

'এতক্ষণে নিশ্চয় অনেক দূরে চলে গিয়েছে ওরা।'

'রিজার্ভেশনে লোক পাঠাব?'

'খাজনার চাইতে বাজনা বেশি হয়ে যাবে। কর্তৃপক্ষের সাথে গোলমাল করে লাভ নেই, এক দিনের জন্য যথেষ্ট হয়েছে। আমাদের হাতে সময়ের অভাব নেই। ফিরে এসো। পলিসি মিটিং ঠিকঠাকভাবে শেষ করা নিয়ে ব্যস্ত আমি।'

'কোন সমস্যা?'

'হচ্ছে কিছু।'

'আমি কোন সাহায্যে আসতে পারি?'

'এখনও দরকার নেই। আশা করি সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারব।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

'বিদায়, টাউন।'

ফোন কেটে গেল।

টাউনের মনে হলো, একটা সোয়াট টিম নিয়ে ওই উইনিব্যাগোকে আটকাতে পারলেই ভালো হতো। আর তা হলে রাস্তায় ল্যান্ড মাইন বিছিয়ে দিলেও মন্দ হতো না। ওই হারামজাদাদের বুঝিয়ে দেয়া যেত, কতটা সিরিয়াস টাউনরা। মি. ওয়ার্ল্ড একদিন ওকে বলেছিল, আগুনের অক্ষর ব্যবহার করে আমরা ভবিষ্যতের গল্প লিখছি। মি. টাউনের মনে হলো, এখনই প্রস্রাব না করলে সম্ভবত ওর একটা কিডনি নষ্ট হয়ে যাবে...

...শ্যাডোর হাতের মুঠোর আঙুলগুলো একটা একটা করে খুলল কেউ একজন, উরুর হাড়টা সরিয়ে নিল কেউ।

প্রস্রাবের চাপটা আর নেই; এতক্ষণে উপলব্ধি করতে পারল ও-লোকটা অন্য কেউ ছিল। এই মুহূর্তে শ্যাডো দাঁড়িয়ে আছে খোলা আকাশের নিচে, পাথুরে একটা জমিতে।

শ্যাডোকে আবার চুপ করার ইঙ্গিত দিলেন ওয়েনসডে, তারপর হাঁটতে শুরু করলেন। পিছু নিল ও।

যান্ত্রিক মাকড়শাটা গুঙিয়ে উঠল হঠাৎ, চমকে উঠলেন ওয়েনসডে। থমকে দাঁড়াল শ্যাডো। যন্ত্রটার গায়ে জ্বলে উঠল লাল আলো। শ্বাস নিতেও যেন ভুলে গেল বেচারা।

একটু আগে ঘটা ঘটনাটা মনে করল শ্যাডো, মনে হচ্ছিল যেন অন্য কারও মনের ভেতরটায় বাসা গেঁড়ে বসেছে সে। তারপর ভাবল, মি. ওয়ার্ল্ড। আমার কাছে তার গলা পরিচিত বলে মনে হচ্ছিল। চিন্তাটা এসেছিল আমার চিন্তায়, টাউনের না। এজন্যই ব্যাপারটা অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছিল। অনেক ভেবেও, কণ্ঠটা কার তা মনে করতে পারছিল না।

মনে পড়বে, ভাবল শ্যাডো। আজ হোক আর কাল, মনে পড়বেই।

লাল আলো পরিণত হলো নীলে, তারপর আবার লালে। শেষ পর্যন্ত হালকা লাল হয়ে শান্ত হলো যান্ত্রিক মাকড়শা। সামনে এগোতে শুরু করলেন ওয়েনসডে, তারার নিচে একাকী একটা অবয়ব। মাথায় হ্যাট, বাতাসে পতপত করে উড়ছে আলখাল্লা। হাতের ছড়িটা পাথুরে মাটিতে ঠক ঠক করছে।

যান্ত্রিক মাকড়শাটাকে অনেক পেছনে ফেলে আসার পর, ওয়েনসডে মুখ খুললেন। 'এখন কথা বললে কোন অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।'

'আমরা কোথায়?'

'দৃশ্যপটের পেছনে।' বললেন ওয়েনসডে।

'মানে?'

'ধরে নাও এই জায়গাটা দৃশ্যপটের পেছনে থাকে, নাট্যমঞ্চের পেছনের দরজা দিয়েই কেবল যেখানে প্রবেশ করা যায়। আমরা এতক্ষণ ছিলাম দর্শকদের সারিতে, এবার চলে এসেছি পেছনে।'

'যখন ওই হাড়টা স্পর্শ করলাম, তখন টাউন নামের এক লোকের মনের ভেতর চলে গিয়েছিলাম আমি। লোকটা কিম্ভূতদের একজন, আমাদেরকে প্রচন্ড ঘৃণা করে।'

'হুম।'

'ওর বসের নাম মিস্টার ওয়ার্ল্ড। আমাকে যেন কার কথা মনে করিয়ে দেয় এই মিস্টার ওয়ার্ল্ড, কিন্তু ধরতে পারছি না। আমি সম্ভবত টাউনের মন দখল করে নিয়েছিলাম। নিশ্চিত নই যদিও।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি, তা কি সে জানে?'

'আপাতত আমাদের পিছু ধাওয়া করা বন্ধ করছে। রিজার্ভেশনে যেতে চায় না বলে। আমরা কোন রিজার্ভেশনে যাচ্ছি?'

'হয়তো,' ছড়ির উপর ভর দিয়ে একটু বিশ্রাম নিলেন ওয়েনসডে। তারপর আর হাঁটতে শুরু করলেন।

'ওই মাকড়শার মতো জিনিসটা কী ছিল?'

'সার্চ ইঞ্জিন, প্যাটার্ণ ম্যানিফেসটেশন।'

'বিপদজনক?'

'আমার সমান বয়সী হতে হলে, সবসময় বাজে ধারণাটাই আগে করতে হয়।'

হাসল শ্যাডো। 'কত বয়স?'

'আমার জিহ্বার যত বয়স, তত।' বললেন ওয়েনসডে। 'তবে আমার দাঁতের চাইতে কয়েকমাস বেশি।'

'আপনার মুখ খোলানো খুব কঠিন।' বলল শ্যাডো।

ওয়েনসডে ঘোঁত করলেন কেবল।

এরপর পথে পড়া প্রতিটা পাহাড় চড়া কঠিন থেকে কঠিনতর হতে শুরু করল।

মাথা ব্যথা শুরু হলো শ্যাডোর। পরবর্তী পাহাড়টার নিচে হোঁচট খেল সে, কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলল বটে। কিন্তু শব্দ বের না হয়ে বেরিয়ে এলো বমি!

ওয়েনসডে কোটের ভেতরের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট ফ্লাস্ক বের করে আনলেন। 'একটা চুমুক দাও। সাবধান, মাত্র এক চুমুক।'

ঝাঁঝালো স্বাদ তরলটা। মুখে দেওয়ামাত্র এমনভাবে উধাও হয়ে গেল, যেমনটা যায় কোন ভালো মানের ব্র্যান্ডি। তবে মদ বলে মনে হলো না জিনিসটাকে। ফ্লাস্কটা সরিয়ে নিয়ে আবার পকেটে ভরলেন ওয়েনসডে। 'দর্শকদের আসলে নাট্যমঞ্চের পেছনে যাওয়া ঠিক না। সেজন্যই তোমার অসুস্থবোধ হচ্ছে। তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরোতে হবে আমাদেরকে।'

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল ওরা। ওয়েনসডের কোন অসুবিধা হচ্ছে না, তবে শ্যাডো মাঝে মাঝে হোঁচট খাচ্ছে। তরলটা পান করার পর থেকে কিছুটা ভালো লাগছে ওর।

ওয়েনসডে ওর হাত ধরলেন। 'ওই যে,' বাঁ দিকের দুটো একই রকম দেখতে পাথর-কাঁচের স্তূপের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'ওই দুই স্তূপের ভেতর দিয়ে যেতে হবে আমাদের। পাশেই থেকো।'

হাঁটল ওরা, ঠান্ডা বাতাস আর দিনের উজ্জ্বল আলো মাঝে মাঝেই এসে পড়ল শ্যাডোর চেহারায়।

একটা পাহাড়ের মাঝামাঝিতে আছে ওরা এখন, কুয়াশার কোন হদিস নেই। রৌদ্রজ্জ্বল একটা দিন, আকাশ নীল। পাহাড়ের পাদদেশে একটা খোয়া বিছানো রাস্তা। লাল একটা স্টেশন ওয়্যাগন ঝাঁকি খেতে খেতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। কাছের একটা দালান থেকে বেরোচ্ছে জ্বলন্ত কাঠের ধোঁয়া। মনে হচ্ছে, কেউ

যেন একটা মোবাইল হোম নিয়ে এসে বছর ত্রিশেক আগে ওই পাহাড়ের ধারে ফেলে রেখেছে। পরবর্তী সময়ে অনেকবার মেরামত করা হয়েছে ওটাকে।

মোবাইল হোমটার কাছে ওরা পৌঁছান মাত্র, খুলে গেল দরজাটা। মাঝ বয়সী তীক্ষ্ণ চোখ আর মুখ বিশিষ্ট এক লোক ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হুম, শুনলাম যে দুজন সাদা মানুষ আমার সাথে দেখা করতে আসছে। তা-ও একটা উইনিব্যাগোতে চড়ে। আরও শুনলাম, রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে তারা! আসলে রাস্তার পাশে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে না রাখলে সাদা মানুষ কিছু খুঁজেই পায় না। যাক, অন্তত আসতে তো পেরেছ! এই মুহূর্তে লাকোটা জমিতে দাঁড়িয়ে আছ তোমরা, জানো?' লোকটা চুল অনেক লম্বা...আর ধূসর।

'তুমি আবার লাকোটা হলে কবে? প্রতারক কোথাকার।' বললেন ওয়েনসডে। এখন তার দেহে একটা কোট আর মাথায় ক্যাপ! অথচ এই একটু আগেই আলখাল্লা আর মাথায় হ্যাট ছিল তার। 'শোন, হুইস্কি জ্যাক। আমার ক্ষুধা লেগেছে। আর আমার এই বন্ধু একটু আগে বমি করে উগড়ে দিয়েছে সকালের নাস্তা। ভেতরে আমন্ত্রণ জানাবে কিনা বল।'

বগল চুলকালো হুইস্কি জ্যাক। পরনে তার নীল জিন্স আর ধূসর একটা আন্ডারশার্ট। পায়ে রয়েছে মোকাসিন, ঠান্ডা কাবু করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। আচমকা লোকটা বলল, 'আমার জায়গাটা পছন্দ। যাই হোক, ভেতরে এসো।'

ট্রেইলারের ভেতরে সম্ভবত বাতাস কম আর ধোঁয়া বেশি। আরেকজন মানুষ বসে আছে টেবিলে। এই লোকটার পরনে বাকস্কিন, পা খালি। দেহের রঙ বাদামি।

ওয়েনসডে খুব খুশি বলে মনে হলো। 'হুম,' বললেন তিনি। 'দেরী করে লাভই হয়েছে দেখছি। হুইস্কি জ্যাক আর আপেল জনি। এক ঢিলে দুই পাখি!'

টেবিলে বসে থাকা লোকটা, আপেল জনি, ওয়েনসডের দিকে তাকাল। তারপর যৌনাঙ্গ আঁকড়ে ধরে বলল, 'আবারও ভুল করেছ। কেবলি পরখ করে দেখলাম, আমার আপেল জায়গামতোই আছে।' শ্যাডোর দিকে তাকিয়ে হাত তুলল সে, তালু বাইরের দিকে। 'আমি জন চ্যাপম্যান। তোমার বস আমার সম্পর্কে কী বলে, সে কথায় কান দিও না। লোকটা একটা হাড়-হারামি। আজীবন তাই ছিল, সবসময় তাই থাকবে। কেউ কেউ তেমনই হয়।'

'আমি মাইক আইনসেল।' বলল শ্যাডো।

খোঁচা খোঁচা দাড়ি ওঠা থুতনি চুলকাল চ্যাপম্যান। 'আইনসেল,' বলল সে। 'নামটা খুব একটা ভালো না, তবে কাজ চলবে। তোমার আসল নাম কি?'

'শ্যাডো।'

'আমিও তোমাকে শ্যাডো বলেই ডাকব। ওই, হুইস্কি জ্যাক-' কানে শব্দটা ওরকম শোনালেও, আসলে লোকটা 'হুইস্কি জ্যাক' বলছে না, বুঝতে পারল শ্যাডো। 'খাবারের অবস্থা কী?'

হুইস্কি জ্যাক এগিয়ে একটা লোহার পটের ঢাকনা তুলল। 'খাওয়া যাবে।'

চারটা প্লাস্টিকের পেয়ালা নিয়ে পটের ভেতরের খাবারগুলো তাতে ঢালল সে। ওগুলো টেবিলের উপর রেখে দিয়ে পা রাখল বাইরের তুষারে। বরফের ভেতরে পুতে রাখা একটা প্লাস্টিকে জগ বের করে আনল, ওটাকে ভেতরে নিয়ে এসে চারটা গ্লাসে ঢালল হলদে-বাদামি তরল। টেবিলে রাখা পেয়ালাগুলোর পাশে রাখল গ্লাসগুলো। একদম শেষে রাখল চারটা চামচ। তারপর অন্যদের সাথে টেবিলে বসল ও।

চোখে সন্দেহ নিয়ে গ্লাসটার দিকে তাকালেন ওয়েনসডে। 'দেখে তো পেশাব বলে মনে হয়।'

'এখনও ওগুলো পান করো নাকি?' জানতে চাইল হুইস্কি জ্যাক। 'তোমরা...সাদা মানুষেরা আসলে পাগল। এইটা অনেক ভালো এক পানীয়।' তারপর শ্যাডোর দিকে ফিরে বলল, 'বুনো টার্কির স্ট্যু ওটা, অ্যাপলজ্যাক এনেছে জন।'

'অ্যাপেলজ্যাক আসলে হালকা অ্যাপল সাইডার।' বলল জন চ্যাপম্যান। 'মদের প্রতি আমার কখনওই খুব একটা বিশ্বাস ছিল না। ওটা মানুষকে পাগল করে তোলে।'

দারুণ সুস্বাদু ছিল স্ট্যুটা, পানীয়ও কম যায় না। নিজেকে জোর করে নিয়ন্ত্রণ করল শ্যাডো, নইলে হয়তো ঢক ঢক করে গিলে ফেলত। এক পেয়ালা শেষ করে আরেক পেয়ালা স্ট্যু নিল ও, সেই সাথে আরেক গ্লাস অ্যাপল সাইডার।

'গুজব শুনতে পাচ্ছি যে তুমি নাকি সবার সাথে কথা বলছ। যে যা চাইছে, তাকে তা-ই দেবার প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছ? যুদ্ধের দামামা বাজাবে নাকি?' জানতে চাইল জন চ্যাপম্যান। শ্যাডো আর হুইস্কি জ্যাক পেয়ালা-গ্লাস ধোয়া আর বেঁচে যাওয়া স্ট্যু তুলে রাখার কাজে ব্যস্ত।

'গ্রীষ্মে ঘটা ঘটনাগুলো সংক্ষেপে বললে অমনটাই হবে।' বললেন ওয়েনসডে।

'ওরাই জিতবে,' সরাসরি বলল হুইস্কি জ্যাক। 'আসলে এরইমধ্যে জিতে গিয়েছে। আর তুমি হেরেছ। যেমনটা হয়েছিল আমার লোক আর সাদাদের ভেতরে। অধিকাংশ সময় জিতেছে তারাই, আর যখন হেরেছে তখন চুক্তি

করেছে। তারপর সময় সুযোগ বুঝে ভেঙ্গে ফেলেছে সেই চুক্তি। আরেকটা অহেতুক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কোন ইচ্ছা নেই আমার।'

'আর আমার সাহায্য চেয়ে কোন লাভ নেই।' বলল জন চ্যাপম্যান। 'আমি তোমাদের হয়ে লড়তে চাইলেও, কাজে আসব না কোন। আর লড়তে আমি চাই-ও না। আমাকে ভুলে গিয়েছে সবাই।' একটু থমকে যোগ করল। 'পল বানিয়ান।' মাথাটা হালকা করে নাড়িয়ে আবার বলল, 'পল বানিয়ান।' দুই শব্দে এতকিছু প্রকাশ করতে আগে কখনও শোনেনি শ্যাডো।

'পল বানিয়ান,' বলল সে। 'এই লোক আবার কী করল?'

'মাথার ভেতরের জায়গা দখল করেছে,' ওয়েনসডের কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরাল হুইস্কি জ্যাক।

'উদাহরণ দেই। হামিংবার্ডরা তাদের ওজন নিয়ে বা দাঁত ক্ষয় নিয়ে চিন্তিত বলে, তাদের খাবারে চিনি দেয়া বন্ধ করে দিল কিছু মানুষ।' ব্যাখ্যা করলেন ওয়েনসডে। 'বদলে দিল নিউট্রাসুইট। পাখিগুলো তা খেয়ে মরতে শুরু করে একে একে। কেননা ওদের পেট ভর্তি খাবার থাকলেও, সেই খাবারে কোন ক্যালরি নেই! পল বানিয়ানও তাই। কেউ পল বানিয়ানের ব্যাপারে প্রচলিত গল্পগুলো কাউকে বলিনি। নেই তার কোন অস্তিত্বও! সেই ১৯১০ সাথে আচমকা পাদ-প্রদীপের আলোতে তার আগমন। এরপর আর কী, জাতির পেট এখন ক্যালোরি বিহীন খাবারে ভর্তি!'

'আমার কিন্তু পল বানিয়ানকে বেশ পছন্দ,' বলল হুইস্কি জ্যাক। 'মল অফ আমেরিকায় কয়েক বছর আগে গিয়েছিলাম। ওকে নিয়ে আমার কোন আপত্তি নেই। সে কল্পিত হলেও না। অন্তত কল্পিত হলে আমরা ধরে নিতে পারি, কখনও গাছ কাটতে হয়নি ওকে! মন্দের ভালো বলা যায়।'

'এক নাগাড়ে অনেক কথা বলে ফেললে দেখি।' বলল জনি চ্যাপম্যান।

ওয়েনসডেও সিগারেট ধরিয়েছেন, ধোঁয়া ছাড়লেন তিনি। আস্তে আস্তে বাতাসে মিলিয়ে গেল ধোঁয়া। 'হুইস্কি জ্যাক, তোমার কী মত?'

'আমি তোমাকে সাহায্য করব না,' বলল হুইস্কি জ্যাক। 'গোহারা হারার পর, যদি কখনও চাও ফিরে এসো। আমি এখানেই থাকলে তোমাকে খাবার রেঁধে খাওয়াব।'

'ভেবে চিন্তে বলছ তো?' বললেন ওয়েনসডে। 'বিকল্পটা কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর।'

'বিকল্পটা যে কী, তা তুমি নিজেও জানো না।' বলল হুইস্কি জ্যাক। শ্যাডোর দিকে তাকিয়ে যোগ করলো। 'তুমি কিছু একটা খুঁজছ।'

'নাহ, কাজ করছি।' বলল শ্যাডো।

মাথা নাড়ল হুইস্কি জ্যাক। 'সেই সাথে কিছু একটা খুঁজছ। কারও কোন ঋণ শোধ করতে চাও।'

লরার নীল ঠোঁট আর হাতে লেগে থাকা রক্তের কথা মনে পড়ে গেল শ্যাডো, নড করল ও।

'একটা গল্প শোন। প্রথমে দুনিয়াতে এসেছিল একটা শেয়াল, তার ভাই ছিল নেকড়ে। শেয়াল বলল, মানুষ চিরদিন বেঁচে থাকবে। যদি মারাও যায়, তবুও ফিরে আসবে খুব দ্রুতই। নেকড়ে বলল, নাহ। মানুষকে মারা যেতে হবে, জীবিত সবকিছুকেই মরতে হবে। নইলে সারা দুনিয়া দখল করে বসবে তারা। সব স্যামন, ক্যারিবু আর মহিষ খেয়ে ফেলবে। ভুট্টা আর যবও বাদ যাবে না। একদিন মারা গেল নেকড়ে, শেয়ালকে অনুরোধ করল তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু শেয়াল জবাব দিল, না। মৃতকে মৃতই থাকতে হবে। তোমার কথা আমাকে প্রভাবিত করেছে। কথাগুলো বলার সময় চোখ দিয়ে পানি বইছিল বেচারার। তাই এখন নেকড়ে চালায় মৃতদের দুনিয়া। আর শেয়াল বাস করে সূর্য আর চাঁদের আলোতে, এখনও আফসোস করে ভাইয়ের মৃত্যুর।'

ওয়েনসডে বললেন, 'রাজি না হলে, রাজি হবে না। আমরা সামনে এগিয়ে যাব।'

হুইস্কি জ্যাকের চেহারা ভাবলেশহীন। 'আমি এই যুবকের সাথে কথা বলছি।' বলল সে। 'তুমি আমাদের সাহায্যের বাইরে চলে গিয়েছ। কিন্তু এই ছেলেটা যায়নি।' শ্যাডোর দিকে ফিরল সে। 'তোমার স্বপ্নের কথাটা বলো।'

শ্যাডো বলল, 'দেখলাম, আমি খুলির একটা পাহাড় বেয়ে উপরে উঠছি। অনেকগুলো বিশাল বিশাল পাখি উড়ছিল ওটাকে কেন্দ্রে রেখে। ওদের পাখায় ভর করেছিল বিদ্যুৎ। আমাকে আক্রমণ করল তারা, ধ্বসে পড়ল পাহাড়।'

'সবাই স্বপ্ন দেখে,' বললেন ওয়েনসডে। 'এবার আমরা রওনা দিতে পারি?'

'সবাই ওয়াকিনাইয়ু, থান্ডারবার্ডের স্বপ্ন দেখা না।' বলল হুইস্কি জ্যাক। 'আমরা এখান থেকেও তা টের পেয়েছি।'

'আমিই তো তোমাকে বললাম!' বললেন ওয়েনসডে।

'পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় কিছু থান্ডারবার্ড আছে।' জানাল চ্যাপম্যান। 'সংখ্যায় বেশি না হলেও কিছু মেয়ে আর একটা বুড়ো পুরুষ তো আছেই। একজোড়া সন্তান-ধারণক্ষম দম্পতিও আছে। অবশ্য কখনওই সংখ্যায় ওরা খুব বেশি ছিল না।'

লাল কাদার মতো দেখতে একটা হাত বাড়িয়ে শ্যাডোর চেহারা স্পর্শ করল হুইস্কি জ্যাক। 'থান্ডারবার্ড শিকার করলে তোমার স্ত্রীকে ফেরত আনতে পারবে।

তবে এখন ওর মালিক নেকড়ে, তার স্থান মৃতদের মাঝে; জীবিতদের মাঝে নয়।'

'তুমি তা কীভাবে জানো?' জানতে চাইল শ্যাডো।

ঠোঁট না নাড়িয়েই জানতে চাইল হুইস্কি জ্যাক। 'মহিষ-মানব কী বলেছে?'

'বিশ্বাস রাখতে।'

'শুনবে তার কথা?'

'উম...হ্যাঁ,' শব্দ উচ্চারণ না করেই কথা বলছে তারা। শ্যাডো একবার ভাবল, অন্য দুজন কি ওদেরকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছে? আর দেখলেও, কতক্ষণের জন্য? এক হৃৎস্পন্দন? নাকি আরও বেশি?

'তোমার গোত্রকে খুঁজে বের করে,' বলল হুইস্কি জ্যাক। 'আমার কাছে ফিরে এসো। আমি সাহায্য করতে পারব।'

'আসব।'

হুইস্কি জ্যাক হাত সরিয়ে নিল। তারপর ওয়েনসডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার হো চাঙ্কের কী হবে?'

'আমার কী?'

'হো চাঙ্ক। উইনিব্যাগোরা নিজেকে সে নামেই ডাকে।'

মাথা নাড়ল ওয়েনসডে। 'নিয়ে আসাটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়, সমস্যায় পড়ার সম্ভাবনা আছে। ওটাকে খুঁজছে সবাই।'

'চুরি করা নাকি?'

আহত মনে হলো ওয়েনসডেকে। 'একদম না। কাগজ সামনের গ্লাভ কম্পার্টমেন্টেই আছে।'

'চাবি?'

'আমার কাছে।' বলল শ্যাডো।

'আমার ভাতিজা, হ্যারি ব্লুজে-র একটা বুইক আছে। ১৯৮১ সালের, অদল-বদল করবে?'

শিষ দিলেন ওয়েনসডে। 'এটা কেমন ব্যবসা হলো?'

শ্রাগ করল হুইস্কি জ্যাক। 'যেখানে তোমাদের গাড়ি ফেলে এসেছ...ওখান থেকে ওটা ফিরিয়ে নিয়ে আসা করত কষ্ট হবে, ভেবেছ? আমি বরঞ্চ তোমার উপকারই করছি। প্রস্তাব নিলে নাও, না নিলে না নাও। আমার কিছু যায় আসে না।'

ওয়েনসডেকে দেখে রাগান্বিত মনে হলো, তারপর সেই রাগ পরিণত হলো আমোদে। 'শ্যাডো, লোকটাকে উইনিব্যাগোর চাবি দিয়ে দাও।' তাই করল ও।

'জনি,' বলল হুইস্কি জ্যাক। 'এই লোকগুলোকে হ্যারি ব্লুজের কাছে নিয়ে যাবে। ওকে বলো, আমি এদেরকে ওর গাড়িটা দিয়ে দিতে বলেছি।'

'অবশ্যই।' বলল জন চ্যাপম্যান। উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেল দরজার কাছে। পাশেই থাকা একটা ছোট বারলাপ স্যাক তুলে নিয়ে দরজা খুলে বাইরে পা রাখল। শ্যাডো আর ওয়েনসডে তার পিছু নিল। দোড়গোরায় দাঁড়িয়ে বিদায় দিল হুইস্কি জ্যাক। 'ওই,' ওয়েনসডেকে বলল সে। 'আর ফিরে এসো না। এখানে তোমাকে কেউ চায় না।'

আসমানের দিকে আঙুল তুলে ইঙ্গিত করলেন ওয়েনসডে। 'উচ্ছন্নে যাও।'

তুষার ঠেলে নিচের দিকে যেতে শুরু করল ওরা। চ্যাপম্যান সামনে দাঁড়িয়ে। তার নগ্ন পা বরফে ছাপ রেখে এগোচ্ছে। 'ঠান্ডা লাগে না?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'আমার স্ত্রী চকতো ইন্ডিয়ান ছিল।' জানাল চ্যাপম্যান।

'তোমাকে ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচার কোন জাদু শিখিয়ে গিয়েছে?'

'না। ওর ধারণা ছিল, আমি পাগল।' বলল চ্যাপম্যান। 'সব সময় বলত, 'জনি, বুট পরে নিলেই তো হয়।'' পাহাড়ের ঢাল আচমকা খাড়া হয়ে গেলে, কথা বলা বন্ধ করল ওরা। হোঁচট খেতে খেতে এগোল তিনজন। নিজেদেরকে সামলাবার জন্য পাশে থাকা বার্চ গাছগুলো ধরতে হলো তাদের, নইলে আছাড় খেত হয়তো। পথ একটু সমতল হলে চ্যাপম্যান বলল, 'এখন আর বেঁচে নেই মহিলা। তার মৃত্যুর সাথে সাথে আমি কিছুটা উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম বলতে পারো। ব্যাপারটা যে কারও সাথে ঘটতে পারে, এমনকি তোমার সাথেও।' শ্যাডোর হাতে চাপড় দিল সে। 'হে যীশু, তুমি তো দেখি বিশালদেহি এক মানুষ!'

'লোকে তাই বলে।' বলল শ্যাডো।

প্রায় আধ-ঘন্টা পাহাড় বেয়ে নিচে নামল ওরা। এরপর এগোতে শুরু করল খোয়া বিছান একটা পথ ধরে। যে দালানগুলোর দিকে এগোচ্ছে, সেগুলো পাহাড় থেকেই দেখা যাচ্ছিল। আচমকা একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল ওদের পাশে। যে মহিলা ওটা চালাচ্ছিল, সে জানালার কাছ নামিয়ে জানতে চাইল, 'তোমাদের সাহায্য দরকার?'

'আপনাকে অনেক দয়া, ম্যাডাম।' বলল ওয়েনসডে। 'আমরা মিস্টার হ্যারি ব্লুজে-কে খুঁজছি।'

'ওকে রেক হলে পাবে।' বলল মহিলা, বয়স চল্লিশের ঘরে হবে। 'উঠে পড়ো।'

প্যাসেঞ্জার সিটে বসল ওয়েনসডে। জন চ্যাপম্যান আর শ্যাডো চরল পেছনে। শ্যাডো এতটা লম্বা যে পা ভাঁজ করেও বসতে বেগ পেতে হলো ওকে। যাই হোক, ঝাঁকি খেতে খেত এগোল গাড়িটা।

‘তোমরা তিনজন কোত্থেকে এলে?’ জানতে চাইল মহিলা।

‘এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম।’ উত্তরে বললেন ওয়েনসডে।

‘পেছনের ওই পাহাড়ে বাস করে।’ যোগ করল শ্যাডো।

‘পাহাড়? কোন পাহাড়?’ জানতে চাইল মহিলা।

গাড়ির রেয়ার উইন্ডো দিয়ে পেছনে তাকাল শ্যাডো। কিন্তু না, কোন পাহাড় নেই ওখানে। কেবল মেঘ আর মেঘ।

‘হুইস্কি জ্যাক।’ নামটা উচ্চারণ করল ও।

‘আহ,’ বলল ড্রাইভার। ‘আমরা ওকে ইনকটমি বলে ডাকি। আমার ধারণা, দুজন একই। দাদার কাছে তার ব্যাপারে অনেক গল্প শুনেছি।’ রাস্তায় ঝাঁকি খেয়ে লাফিয়ে উঠল গাড়ি, গাল বকল মহিলা। ‘তুমি ঠিক আছ?’

‘জি, ম্যাম।’ বলল জনি চ্যাপম্যান। দুই হাতে সিট ধরে আছে সে।

‘রেজের রাস্তা,’ বলল মহিলা। ‘আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।’

‘সবগুলোই এমন?’ জানতে চাইল শ্যাডো।

‘মোটামুটি। এখানকারগুলো এমনই। ক্যাসিনোর টাকা কোথায় যায়, সেই প্রশ্ন করো না। এমন একটা জায়গায় আসবেটা কে?’

‘আমি দুঃখিত।’

‘তার দরকার নেই।’ গিয়ার পরিবর্তন করল মেয়েটা। ‘এখানকার সাদা মানুষদের সংখ্যা ক্রমেই কমছে। শহরের পর শহর জন-শূন্য হচ্ছে দিন দিন। টেলিভিশনের পর্দায় একবার নজর রাখার পর, খামারে তাদেরকে আটকে রাখবে কীভাবে? আমাদের কাছ থেকে সাদারা আমাদেরই জমি কেড়ে নিয়েছিল, আবাস গেড়েছিল। আর এখন আবার চলেও যাচ্ছে। ওদের অধিকাংশই যায় দক্ষিণে। কিছু যায় পশ্চিমে। আমার তো মনে হয়, আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে যুদ্ধ ছাড়াই ফিরিয়ে নিতে পারব আমাদের জমি।’

‘আমার শুভকামনা রইল।’ বলল শ্যাডো।

রেক হলে, পুল টেবিলে খুঁজে পাওয়া গেল হ্যারি ব্লুজে-কে। মেয়েদেরকে পটাবার জন্য পুল খেলায় দক্ষতা দেখাচ্ছে। ডান হাতের পেছনে একটা ব্লুজে ট্যাটু করে রেখেছে সে। ডান কানে দুল পরেছে অনেকগুলো।

‘হো হোকা, হ্যারি ব্লুজে।’ বলল জন চ্যাপম্যান।

'চুলায় যাও,' এমনভাবে বলল হ্যারি যেন কথাটা কোন গুরুত্বই রাখে না। 'তোমাকে দেখলেই বিতৃষ্ণা জন্মে মনে।'

ঘরের অন্য পাশে বয়স্ক কিছু লোক বসে আছে। কয়েকজন তাস খেলছে, কয়েকজন কথা-বার্তা বলতে ব্যস্ত। হ্যারির বয়সীও আছে বেশ কজন, নিজেদের পালার জন্য অপেক্ষা করছে। পুল টেবিলটা সচরাচর আকৃতির, একপাশে চটে গিয়েছে। রূপালী ডাক্ট টেপ ব্যবহার করে ঢেকে রাখা হয়েছে ওটা।

'তোমার চাচার কাছ থেকে একটা ম্যাসেজ এনেছি।' পাত্তা না দিয়ে বলল চ্যাপম্যান। 'তোমার গাড়িটা এই দুজনকে দিয়ে দিতে বলেছে।'

হলে কম করে হলেও ত্রিশ বা চল্লিশজন মানুষ আছে, সবাই এখন হয় তাদের তাসের দিকে...আর নয়তো পায়ের দিকে...অথবা আঙুলের দিকে তাকিয়ে আছে তীব্র মনোযোগে। এমনভান করছে যেন কিছু শোনেনি।

'লোকটা আমার চাচা নয়।'

দাঁত বের করে হাসল চ্যাপম্যান, এমন বাজে দাঁত আগে কোন মানুষের মুখে দেখেনি শ্যাডো। 'তোমার চাচাকে বলব কথাটা? সে তো বলে, একমাত্র তোমার জন্যই সে লাকোটায় আছে।'

'হুইস্কি জ্যাক অনেক কিছুই বলে।' ঠাট্টার সুরে বলল হ্যারি ব্লুজে। অবশ্য এই ছেলেটাও 'হুইস্কি জ্যাক' উচ্চারণ করেনি। খুব সম্ভব 'উইসকাডজাক' বলেছে।

শ্যাডো বলল, 'আরেকটা কথাও বলেছে, বিনিময়ে তুমি আমাদের উইনিব্যাগো পাবে।'

'কই সেটা?'

'এখানে নেই, হুইস্কি জ্যাক আনবে পরে।' বলল জন চ্যাপম্যান। 'ওর কথায় বিশ্বাস রাখা যায়।'

একটা ট্রিক শট খেলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো হ্যারি ব্লুজে, ওর হাত কাঁপছে। 'আমি ওই বুড়ো শেয়ালের ভাতিজা নই। লোকটা আর কাউকে এই কথা না বললেই খুশি হতাম।'

'মৃত নেকড়ের চাইতে জীবিত শেয়াল ভালো।' গভীর কণ্ঠে বললেন ওয়েনসডে। 'তোমার গাড়ি দেবে কিনা বলো।'

কেঁপে উঠল হ্যারি ব্লুজে। 'অবশ্যই,' বলল সে। 'আমি তো শুধু দুষ্টামি করছিলাম। সারাক্ষণই করি।' খেলার ছড়িটা টেবিলে নামিয়ে একটা পুরু জ্যাকেট হাতে নিল ও। 'আগে আমার জিনিসগুলো বের করে নেই।'

বার বার আড়চোখে ওয়েনসডের দিকে তাকাচ্ছিল সে, যেন ভয় পাচ্ছে প্রৌঢ়কে!

হ্যারি ব্লুজের গাড়িটা মাত্র একশ মাইল দূরে। ওদিকে যেতে যেতে পথে একটা সাদা চুনকাম করা গির্জা পড়ল। যাজকের পোশাক পরা একজন দরজার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মুখে সিগারেট তার, তবে চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না যে ওটা টেনে মজা পাচ্ছে সে।

'আপনার দিনটা সুখে কাটুক, ফাদার!' চিৎকার করে উঠল জনি চ্যাপম্যান। কিন্তু যাজক ভদ্রলোক জবাব দিল না কোন। বরঞ্চ পায়ের নিচে সিগারেটটা পিষে, অবশিষ্টাংশ তুলে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

হ্যারি ব্লুজের গাড়ির দুইপাশের আয়না নেই, চাকাগুলোর বয়সও হয়েছে অনেক। হ্যারি ব্লুজের মুখে শুনতে পেল, গাড়িটা প্রচণ্ড তেল খায়। তবে এছাড়া আর কোন সমস্যা নেই। নিজের জিনিসগুলো একটা কালো ময়লার ব্যাগে ভরে নিল সে (এদের মাঝে ছিল আধা-ভর্তি কমদামি বিয়ারের বোতল, গাঁজার কয়েকটা পুটলি, দুই ডজন কান্ট্রি আর ওয়েস্টার্ন গানের ক্যাসেট আর একটা হলদে হতে শুরু করা স্ট্রেঞ্জার ইন আ স্ট্রেঞ্জ ল্যান্ড বইয়ের কপি)।

'একটু আগের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইছি,' হ্যারি ব্লুজে বলল ওয়েনসডেকে। 'উইনিব্যাগোটা পাব কবে?'

'তোমার চাচাকে জিজ্ঞাসা করো, এই দালালি তো সে-ই করেছে।'

'উইসাকেডজাক আমার চাচা না।' বলে ব্যাগটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে একেবারে কাছের বাড়িটায় ঢুকে পড়ল হ্যারি ব্লুজে, লাগিয়ে দিল দরজা।

জনি চ্যাপম্যানকে সু ফলসে, একটা খাবারের দোকানের সামনে নামিয়ে দিল ওরা।

যাত্রাপথে চুপ করে রইলেন ওয়েনসডে। হুইস্কি জ্যাকের ওখান থেকে বেরোবার পর হতেই মুখ গোমড়া করে আছেন তিনি। সেন্ট পলের বাইরে, একটা পারিবারিক রেস্তোরায় খেতে বসলেন ওরা দুজন। কারও ফেলে যাওয়া খবরের কাগজ পড়তে শুরু করল শ্যাডো। কাগজের একটা পাতা পড়েই সেটা দেখাল ওয়েনসডেকে। 'এই দেখুন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেখলেন ওয়েনসডে। 'আমি আনন্দিত যে এয়ার-ট্রাফিক-কন্ট্রোলারদের ঝামেলা বিনা সমস্যায় শেষ হয়েছে।'

'ওটা না, আজকের তারিখটা দেখুন।' বলল শ্যাডো। 'চৌদ্দই ফেব্রুয়ারি!'

'ভ্যালেন্টাইন'স ডে শুভ হোক।'

'আমরা জানুয়ারি বিশ বা একুশ তারিখে রওনা দিয়েছিলাম। তারিখ খুব একটা বেশি লক্ষ্য করি না কখনওই, কিন্তু জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহ ছিল ওটা-এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তাহলে আজ চোদ্দই ফেব্রুয়ারি হয় কী করে?'

'কারণ আমরা নাট্যমঞ্চের পেছনে প্রায় এক মাস ধরে হেঁটেছি।'

'আমি তো ভেবেছিলাম, শর্টকাট নিচ্ছি!'

কাগজটা সরিয়ে রাখলেন ওয়েনসডে। 'জনি অ্যাপলসিড উচ্ছন্নে যাক। যখনই দেখা হয়, তখনই কেবল পল বানিয়ানের ব্যাপারে কথা বলে। জীবিতাবস্থায় চ্যাপম্যানের চোদ্দটা আপেল বাগান ছিল। হাজার হাজার একর জমি চাষ করত সে। কিন্তু ওর ব্যাপারে যে সব গল্প প্রচলিত আছে, তাতে এক বিন্দুও সত্যি নেই। যাই হোক, পত্রিকা-ওয়ালারা যেমন বলে-সত্যটা ছাপার মতো বড় না হলে, পৌরাণিক কাহিনিই ছাপ। এই দেশের কিংবদন্তি দরকার। কিন্তু কিংবদন্তিরাও তাদের অবস্থা বুঝতে অক্ষম।'

'সেটা একমাত্র আপনিই ধরতে পেরেছেন?'

'আমি অতীতের পাতায় হারিয়ে যাওয়া একজন। আমাকে কে পাত্তা দেয়?'

নম্র স্বরে বলল শ্যাডো। 'আপনি দেবতা।'

তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকালেন ওয়েনসডে। কিছু একটা বলবেন বলে মনে হলো, কিন্তু পরক্ষণেই আবার চেয়ারে গা ছেড়ে দিলেন। মেন্যুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তো?'

'দেবতা হওয়া তো ভালো।' বলল শ্যাডো।

'তাই?' জানতে চাইলেন ওয়েনসডে। এবার শ্যাডোর নজর ফিরিয়ে নেবার পালা।

লেকসাইড থেকে পঁচিশ মাইল দূরের একটা গ্যাস স্টেশনে, রেস্ট রুমের দেয়ালে অ্যালিসন ম্যাকগভার্নের সাদা-কালো একটা ছবি দেখতে পেল শ্যাডো। ওটার উপরে একটা প্রশ্ন লেখাঃ আমাকে দেখেছ? ছবির মেয়েটা আত্মবিশ্বাসের সাথে হাসছে, উপরের দাঁতের সারিতে নীল রঙের রাবার ব্যান্ড। বড় হয়ে যে মেয়েটা পশুদের নিয়ে কাজ করতে চায়, সেই মেয়েটাকে যেন দেখতে পাচ্ছে ও।

আমাকে দেখেছ?

একটা স্নিকারস বার, এক বোতল পানি আর এক কপি দ্য লেকসাইড নিউজ কিনল শ্যাডো। প্রধান গল্পটা মার্গারিতা ওলসেনের লেখা, একটা যুবক আর একটা বয়স্ক লোকের ছবির নিচে লিখেছে। বরফে মাছ ধরতে গিয়েছিল

এই দুজন, শিকারকে মাঝখানে ধরে দাঁত বের করে আসছে। হেডলাইনে লেখাঃ পিতা-পুত্র মিলে ধরল স্থানীয় ইতিহাসের সবচেয়ে বড় নর্দান পাইক। বিস্তারিত ভেতরে।

গাড়ি চালাচ্ছিলেন ওয়েনসডে। বললেন, 'পত্রিকায় বলার মতো কিছু পেলে জানিও।'

সাবধানতার সাথে পুরো পত্রিকায় নজর বোলাল শ্যাডো, কিন্তু জানাবার মতো কিছু পেল না।

অ্যাপার্টমেন্টের বাইরের ড্রাইভওয়েতে ওকে নামিয়ে দিলেন ওয়েনসডে। ঘরে প্রবেশ করার আগে হ্রদের দিকে তাকাল শ্যাডো। এখানে সেখানে সবুজ আর বাদামি বিন্দু দেখা যাচ্ছে, ওগুলো মাছ-শিকারিদের কুঁড়ে। অনেকেই পাশে গাড়ি পার্ক করে রেখেছে। ব্রিজের কাছেই গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো, সবুজ ক্ল্যাংকারটা। 'মার্চ মাসের তেইশ তারিখে,' ওটাকে উৎসাহ দিল শ্যাডো। 'সকাল সোয়া নয়টার দিকে ডুবলেই হবে। তার আগে গাঁট মেরে বসে থাকো।'

'অসম্ভব,' পাশ থেকে একজন মহিলা বলে উঠল। 'এপ্রিলের তিন তারিখ, সন্ধ্যা ছয়টায়। সেই দিন পানিতে ডুববে সে।' হাসল শ্যাডো। স্কি স্যুট পরে সামনেই দাঁড়িয়ে আছে মার্গারিতা ওলসেন। অ্যাপার্টমেন্ট ডেকের অন্যপাশে দাঁড়িয়ে আছে সে, পাখির জন্য খাবার ঢালছে ফিডারে।

'নর্দান পাইক নিয়ে লেখা তোমার খবরটা পড়লাম।'

'উত্তেজনাকর, কী বলো?'

'হুম, শিক্ষামূলক বলা চলে।'

'আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি আর ফিরছ না।' বলল মেয়েটা। 'অনেকদিন ছিলে না।'

'চাচার সাথে কাজে ছিলাম,' বলল শ্যাডো। 'সময় কোন দিক দিয়ে চলে গেল, বুঝতেই পারিনি।'

খাবার ভরা শেষ করল মার্গারিতা। এতক্ষণ ধৈর্য ধরে বসে ছিল কয়েকটা গোল্ডফিঞ্চ, কিচির-মিচির করতে শুরু করল তারা।

'কাগজে অ্যালিসন ম্যাকগভার্নের ব্যাপারে কিছু দেখলাম না।'

'লেখার মতো কিছু নেই। এখনও পাওয়া যায়নি মেয়েটাকে। কেউ কেউ বলছিল, মেয়েটাকে ডেট্রয়টে দেখা গিয়েছে, তবে তার কোন সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'বেচারি।'

'মেয়েটা মারা যাক-আমি সেই প্রার্থনাই করি।' নিঃস্পৃহ কণ্ঠে বলল মার্গারিতা।

'কেন?' চমকে গিয়েছে শ্যাডো।

'কেননা তা না হলে ওর যে দুর্ভাগ্য সইতে হচ্ছে, তা আরও ভয়াবহ।'

তুমি অ্যালিসনের কথা ভাবছ না, মনে মনে বলল শ্যাডো। নিজের সন্তানের কথা, স্যান্ডির কথা ভাবছ।

'তোমার সাথে কথা বলে ভালো লাগল।' কেবল এতটুকুই বলল সে।

'হুম। আমারও।'

ফেব্রুয়ারি মাসটা কেটে গেল চুপচাপ। দিনগুলো ছিল ধূসর; কোন কোন দিনে তুষারপাত হলেও, অধিকাংশ দিনেই হলো না। আবহাওয়া একটু উষ্ণ হলো, শূন্যের উপরেও উঠল তাপমাত্রার কাটা। তবে নিজের অ্যাপার্টমেন্টেই বেশিরভাগ সময় কাটাল শ্যাডো, একসময় তো মনে হলো যেন জেলে বন্দি হয়ে আছে! একঘেয়েমি ভাবটা কাটাবার জন্যই হাঁটাহাঁটি করতে শুরু করল ও।

দিনের বেশিরভাগ সময় হেঁটেই কাটিয়ে দিল ও, এমনকি শহরের বাইরেও যেতে শুরু করল। একা একা হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল উত্তরে বা পশ্চিমে বন পর্যন্ত, আবার কোন কোন দিন গিয়ে উপস্থিত হলো দক্ষিণের ভুট্টা খেত গুলোতে। লাম্বার কাউন্টির বুনো পথ ধরে বেড়াল, বাদ গেল না পুরনো রেলরোডের রাস্তাগুলোও। দুই একবার জমে থাকা হ্রদটার পাশ দিয়ে উত্তর-দক্ষিণেও হেঁটেছে। স্থানীয় লোক অথবা পর্যটকদের সাথে দেখাও হয়েছে ওর। কাউকে চিনতে না পারলেও, হাত নাড়তে ভুল করেনি। অধিকাংশ সময় দেখা হলো না কারও সাথেই, কেবল কাক আর ফিঞ্চপাখি হলো ওর সঙ্গী। অবশ্য কয়েকবার গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া র‍্যাকুন বা পোসামের দেহ ভক্ষণরত একটা বাজপাখিও দেখতে পেয়েছে।

শ্যাডো আবিষ্কার করল, হাঁটার সময় কোন কিছু ভাবতে হয় না ওকে। ব্যাপারটা ভালো লাগলো শ্যাডোর। চিন্তাগুলো কেন যেন নিয়ন্ত্রণে থাকতে চায় না, অস্বস্তিকর সব জায়গা আর পরিস্থিতির মাঝে ফেলে দেয় সবসময়। তাই ক্লান্তিকে দুই হাত বাড়িয়ে সম্ভাষণ জানায় সে। ক্লান্তি যখন চরমে পৌঁছে, তখন আর লরার চিন্তা ভিড় করে না ওর মাথায়; দেখতে হয় না দুঃস্বপ্ন। হাঁটার পর ঘরে ফিরে সুন্দর ঘুম হয় ওর, স্বপ্ন এসে বাগড়া দেয় না।

নাপিত জর্জের দোকানে পুলিশ চীফ চ্যাড মুলিগানের সাথে দেখা হয়ে গেল একদিন। চুল কাটানো নিয়ে শ্যাডো বাড়তি আগ্রহবোধ করলেও, প্রতিবার দেখা

যায়-আগের পরের চেহারায় খুব একটা পার্থক্য নেই! কেবল চুলটা একটু ছোট, এই যা। শ্যাডোর পাশের সিটেই বসেছিল চ্যাড। চেহারার ব্যাপারে খুব সাবধান মনে হলো লোকটাকে। চুল কাটা শেষ হলে, আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল সে, এমনভাবে মুখ বাঁকাল যেন জরিমানা করবে কিনা ভাবছে।

'খারাপ লাগছে না।' শ্যাডো বলল চ্যাডকে।

'তুমি যদি মেয়েমানুষ হতে, তাহলে ভালো লাগত?'

'সম্ভবত।'

চুল কাটানো শেষে একসাথে ম্যাবেলের দোকানে গেল ওরা। হট চকলেটের অর্ডার দিয়ে চ্যাড বলল, 'আচ্ছা মাইক, পেশা হিসেবে আইনকে বেছে নেবার কথা কখনও চিন্তা করেছ?'

'নাহ,' শ্রাগ করল শ্যাডো। 'অনেক কিছু জানতে হয়, নইলে...'

মাথা নাড়ল চ্যাড। 'এরকম কোন জায়গায় পুলিশের কাজ বলতে কী বোঝায় শুনবে? মাথা ঠান্ডা রাখতে শেখা। মাঝে মাঝে অযাচিত ঘটনা ঘটে। কেউ কেউ খুনের হুমকি দেয়। মাথা ঠান্ডা রেখে বোঝাতে পারলেই...কেল্লা ফতে। বলবে, ঝামেলা মেটাবার জন্য বাইরে নিয়ে যেতে চাও। ব্যস।'

'তারপর, বাইরে বেরোলে ঝামেলা মিটে যাবে?'

'হাতকড়া পরাবার সাথে সাথেই সাধারণ সব মিটে যায়। যাই হোক, চাকরি চাইলে বলো আমাকে। নতুন নিয়োগ দেয়া হচ্ছে, তোমার মতো মানুষই আমাদের দরকার।'

'মনে থাকবে। চাচার সাথে যদি টিকতে না পারি, তাহলে অবশ্যই তোমাকে জানাব।'

হট চকলেটের কাপে চুমুক দিল ওরা। আচমকা মুলিগান বলে উঠল, 'আচ্ছা মাইক, তোমার যদি কোন বিধবা আত্মীয়া থাকে, যে হঠাত করে তোমাকে ফোন দিতে শুরু করে, তাহলে কী করবে?'

'ফোন করতে শুর করে মানে?'

'মেয়েটা অনেক দূরে থাকে, তাই লং-ডিসট্যান্স কল করে।' লাল হয়ে গেল মুলিগানের গাল। 'গত বছর একটা বিয়েতে দেখা হয়েছিল ওর সাথে। তখন বিবাহিতা ছিল মেয়েটা, স্বামী বেঁচেও ছিল। খুব একটা কাছের আত্মীয় নয়, দূর সম্পর্কের।'

'তোমার পছন্দ?'

আরেকটু লাল বর্ণ ধারণ করল গাল। 'ঠিক জানি না।'

'তাহলে অন্যভাবে বলি, তোমাকে মেয়েটার পছন্দ?'

'ফোনে কথা বলার সময় দু-একটা কথা এমন বলেছে যে...দারুণ সুন্দরী মেয়েটা।'

'এখন কী করতে চাও?'

'ওকে এখানে আসতে বলতে পারি। আসলে কথাটা সে-ও বলেছে, আসতে চায়।'

'তোমরা দুজনেই প্রাপ্ত বয়স্ক। আমি বলব, আমন্ত্রণ জানাও।'

নড করল চ্যাড, গালের লালচে অংশটা একবার ওকে দেখিয়ে আবার নড করল।

শ্যাডোর অ্যাপার্টমেন্টের ফোনটা সংযোগহীন অবস্থায় পড়ে আছে। কয়েকবার ওটাকে চালু করার কথা ভেবেছে সে। কিন্তু করেই বা লাভ কী? ফোন করবেটা কাকে? কোন এক গভীর রাতে রিসিভার তুলে কানে ঠেকিয়েছিল ও। মনে হচ্ছিল যে একদল মানুষের আলোচনা শুনতে পাচ্ছে। নাহ, ঠিক শুনতে নয়। কেননা মানুষগুলো এত আস্তে কথা বলছে যে ফিসফিসানি ছাড়া আর কিছুই কানে আসছে না। 'হ্যালো,' বলেছিল সে। 'কে কথা বলে?' কিন্তু কোন উত্তর পায়নি। কেবল আচমকা একটা হাসির শব্দ শুনতে পেয়েছিল, যেন অনেক দূর থেকে আসছে। এতটাই হালকা যে সত্যি সত্যি শুনেছে না পুরোটাই একটা কল্পনা, সে ব্যাপারে সন্দিহান শ্যাডো।

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ওয়েনসডের সাথেই কাটাতে হলো ওকে।

রোড আইল্যান্ডের একটা রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে একবার। শুনতে হয়েছে ওয়েনসডে সাথে এক মহিলার ঝগড়া। মহিলা বিছানা থেকে উঠবেই না, আবার ওদেরকে চেহারাও দেখাবে না! ফ্রিজে প্লাস্টিকের ব্যাগ ভর্তি ঝিঁঝিঁ পোকা পেয়েছিল শ্যাডো, আরেকটা ভর্তি ছিল বাচ্চা ইঁদুরের লাশে।

সিয়াটলের একটা রক ক্লাবে শ্যাডো দেখেছে ওয়েনসডেকে এক যুবতী মেয়ের সাথে কথা বলতে। মেয়েটার মাথা ভর্তি ছোট ছোট লাল চুল আর সারা দেখে নীল রঙের ট্যাটু। আলোচনা নিশ্চয় সফল হয়েছিল, কেননা হাসিমুখে ক্লাব থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন ওয়েনসডে।

এই ঘটনার পাঁচ দিন পর, ভাড়া করা একটা গাড়িতে বসে ওয়েনসডের জন্য অপেক্ষা করছে শ্যাডো। ভ্রূ কুঁচকে ডালাসের একটা দালান থেকে বেরিয়ে এলেন প্রৌঢ়। শব্দ করে দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইলেন তিনি, চেহারা রাগে লাল হয়ে গিয়েছে। 'চালাও,' আদেশ দিলেন তিনি। 'বালের আলবেনিয়ান, মরুক গে ওরা।'

এর তিনদিন পর বোল্ডারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ওরা, পাঁচজন কমবয়সী জাপানিজ মহিলার সাথে দুপুরের খাবার খেল। শান্ত, সমাহিত পরিবেশে শেষ হয় খাওয়া-দাওয়া। ওয়েনসডের কাজ হয়েছে কিনা, তা বুঝতে পারেনি শ্যাডো। তবে লোকটাকে খুশি বলেই মনে হচ্ছিল।

লেকসাইডে ফেরার জন্য উতলা হয়ে উঠেছে শ্যাডো। ওখানে শান্তি আছে, আছে ফিরে আসার শুভকামনা-ওগুলো তার ভালো লাগে।

কাজ না থাকার দিনগুলোতে ব্রিজ পার হয়ে টাউন স্কয়ারে যায় সে, ম্যাবেলের দোকান থেকে দুটো প্যাস্টি কিনে নেয়। একটা খেয়ে ফেলে ওখানে, সাথে পান করে কফি। কেউ খবরের কাগজ ফেলে গেলে একটু দেখে নেয় ওটা। তবে নিজে থেকে কখনও কাগজ কেনার ইচ্ছা হয়নি ওর।

অন্য প্যাস্টিটা পার্সেল করে নেয়, লাঞ্চ হিসেবে খাবার জন্য।

একদিন সকালে বসে বসে ইউ.এস.এ. টুডে পড়ছিল, এমন সময় ম্যাবেল জানতে চাইল। 'আচ্ছা, মাইক। আজ তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

হালকা নীল সাজে আজ সেজেছে আকাশ। সকালের কুয়াশা অবশ্য গাছের মাথায় তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ রেখে গিয়েছে। 'আমি জানি না।' উত্তর দিল শ্যাডো। 'বুনো পথ ধরতে পারি।'

কফির কাঁপে তরল ঢালল ম্যাবেল। 'তুমি কাউন্টি কিউ এর পূবে গিয়েছ কখনও? বেশ দূরে অবশ্য। ওখানে যাবার একটা ছোট রাস্তা আছে, টুয়েন্টিয়েথ অ্যাভিনিউয়ের পাশে।'

'নাহ, যাইনি কখনও।'

'যেতে পারো,' বলল ও। 'জায়গাটা সুন্দর।'

আসলেই দারুণ সুন্দর! শ্যাডো শহরের বাইরে গাড়ি পার্ক করে, পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলল। গ্রাম্য রাস্তাটা পেঁচালো, শহরের পূব দিকে অবস্থিত পাহাড়গুলোর ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। প্রায় প্রতিটা পাহাড়েই পাতাবিহিন ম্যাপেল গাছের সারি। সেই সাথে রয়েছে সাদা বার্চ, কালো ফির আর পাইন।

হাঁটার মাঝেই, একটা ছোট বিড়াল ওর পাশে চলতে শুরু করল। কাঁদার মতো ওটার গায়ের রঙ, সামনের থাবাগুলো সাদা। ওটার কাছে গেল শ্যাডো, কিন্তু প্রানিটা ভয় পেল না। গেল না পালিয়েও।

'হাই, বিড়াল,' আনমনে বলল শ্যাডো।

একদিকে মাথা কাত করল বিড়ালটা, সবুজাভ চোখ দিয়ে তাকাল ওরই দিকে। তারপরই হিসিয়ে উঠল ওটা। নাহ-শ্যাডোকে উদ্দেশ করে নয়, রাস্তার

পাশে থাকা কিছু একটা লক্ষ্য করে। তবে সেটা কী, তা দেখতে পেল না শ্যাডো।

'শান্ত হ,' বলল শ্যাডো। রাস্তা পার হয়ে ওপাশে ভুট্টা খেতের মাঝে হারিয়ে গেল বিড়ালটা।

পরবর্তী বাঁকটা ঘোরার সাথে সাথে একটা ছোট কবরস্থানে এসে পৌঁছাল শ্যাডো। মাথার কাছের ফলকগুলো ক্ষয়ে গেছে, তবে কয়েকটার পাশে এখনও তাজা ফুল রাখা দেখতে পেল। কবরস্থানটাকে অবশ্য কোন দেয়াল ঘিরে নেই, আছে কেবল ছোট ছোট কিছু মালবেরি গাছ। নেই কোন দরজাও, কেবল দুটো পাথুরে গেটপোস্ট দিয়ে ঢোকার পথটা চিহ্নিত করা আছে। ভেতরে পা রাখল ও।

ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল ভেতরে, ফলকগুলো দেখছে। ১৯৬৯ সালের পর আর কোন তারিখ ফলকগুলোই নজরে পড়ল না। আস্ত আছে, এমন একটা গ্রানাইটের দেবমূর্তির গা থেকে তুষার সরাল ও, তারপর হেলান দিল।

পকেট থেকে পার্সেল বের করে খুলল শ্যাডো। প্যাস্টিটা বের করে আনতেই শীতল বাতাস ভরে উঠল যেন সুবাসে। কামড় বসাল ওতে।

পেছনে নড়ে উঠল কেউ। শ্যাডো ভেবেছিল, বিড়ালটা বোধহয় ফিরে এসেছে। কিন্তু পরক্ষণেই পারফিউমের গন্ধ ভেসে এলো নাকে, সেই সাথে কিছু একটা পচারও।

'আমার দিকে তাকিও না,' পেছন থেকে বলে উঠল একটা নারী কণ্ঠ।

'হ্যালো লরা।'

ইতস্তত শোনাল মেয়েটার গলা, কিছুটা ভয়ার্তও। 'হ্যালো, পাপি।'

এক টুকরা প্যাস্টি ভাঙ্গল শ্যাডো। 'খাবে?'

ওর ঠিক পেছনে এসে দাঁড়াল লরা। 'নাহ। তুমিই খাও। আমার এখন খাওয়ার দরকার হয় না।'

সুস্বাদু প্যাস্টিটা শেষ করল শ্যাডো। 'আমি তোমাকে দেখতে চাই।'

'ভালো লাগবে না।'

'প্লিয?'

সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। দিনের আলোয় লরাকে দেখতে পেল শ্যাডো। কিছু কিছু জিনিস সেই একই আছে, এই যেমন ওর চোখ, মুখের বাঁকানো হাসিটা। আবার পরিবর্তনও এসেছে অনেক। তবে মেয়েটা যে মৃত, সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। উঠে দাঁড়াল শ্যাডো, পার্সেলের প্যাকেট থেকে প্যাস্টির লেগে থাকা টুকরাগুলো ফেলে পকেটে ভরল ওটাকে।

কায়রোর ফিউনারেল হোমে কাটানো সময়টা কাজে আসছে এখন, মৃত লরার উপস্থিতিতে খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না ওর। কিন্তু কী বলবে, তা বুঝতে পারছে না।

লরার ঠান্ডা হাত খুঁজে নিল ওর হাত, প্রত্যুত্তরে হালকা করে চাপ দিল শ্যাডো। বুকের ভেতর দৌড়াতে থাকা হৃদপিণ্ডটার উপস্থিতি টের পাচ্ছে পরিষ্কার। ভয় পাচ্ছে ও, ভয় পাচ্ছে এই মুহূর্তটার স্বাভাবিকত্বকে। মনে হচ্ছে এভাবেই অনন্তকাল কাটিয়ে দিতে পারবে!

লরাকে পাশে নিয়ে!

'আমি তোমার অভাব খুব বোধ করি।' মেনে নিল শ্যাডো।

'আমি এখানেই আছি।'

'এই মুহূর্তগুলোতেই তোমার অভাব বেশি করে বোধ হয়। যখন তুমি পাশে থাকো না, তখন তোমাকে পুরনো কোন জীবনের স্বপ্ন ভাবতে কষ্ট হয় না। কিন্তু যখন থাকো...'

আলতো করে ওর আঙুলে চাপ দিল লরা।

'তো,' জানতে চাইল শ্যাডো। 'মৃত্যু আসলে কেমন?'

'কঠিন।' যুবকের কাঁধে মাথা রাখল লরা, আরেকটু হলেই নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসত শ্যাডো। 'একটু হাঁটবে নাকি?'

'অবশ্যই,' মৃত চেহারাটায় বাঁকা হাসি খেলে গেল।

ছোট্ট কবরস্থান থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, পথে উঠল। হাতে হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে শহরের দিকে। 'কোথায় ছিলে?' জানতে চাইল লরা।

'এখানেই।' জবাব দিল শ্যাডো।

'ক্রিসমাসের পর থেকে,' বলল লরা। 'তোমাকে খুঁজে বের করতে কষ্ট হচ্ছিল। কখনও কখনও, অল্প সময়ের জন্য খুঁজে পেতাম তোমাকে। তারপরই আবার উধাও হয়ে যেতে।'

'লেকসাইড নামে একটা ছোট শহরে ছিলাম আমি।' বলল শ্যাডো। 'ছোট হলেও ভালো।'

'ওহ।'

মেয়েটার পরনে কবর দেয়ার সময়কার সেই নীল স্যুটটা নেই আর। এখন কয়েকটা সোয়েটার পড়ে আছে, সেই সাথে একটা লম্বা স্কার্ট। পায়ে শোভা পাচ্ছে বার্গান্ডি বুট। ওটার দিকে শ্যাডোর নজর দেখে হাসল লরা। বলল, 'দারুণ না? শিকাগোর একটা দোকান থেকে কিনেছি।'

'শিকাগো থেকে এতদূরে এলে যে?'

'শিকাগোতে বেশিদিন কাটাইনি, পাপি। আমি দক্ষিণে যাচ্ছিলাম। ঠান্ডাটা খুব ভোগাচ্ছিল। মৃতদের অবশ্য ঠান্ডা পছন্দই হবার কথা। কিন্তু কেন জানি আমার কাছে একে ঠিক ঠান্ডা বলে মনে হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল কোন শূন্যতা। একজন মৃত মানুষ আসলে কোন জিনিসটাকে ভয় পায় জানো? এই শূন্যতাকে। টেক্সাসের পথ ধরেছিলাম আমি। ভেবেছিলাম শীতকালটা গ্যালভেস্টনেই কাটিয়ে দেব। ছোট বেলায় তাই করতাম।'

'তাই নাকি?' বলল শ্যাডো। 'কখনও বলোনি যে?'

'বলিনি? তাহলে হয়তো অন্য কেউ কাটাত। এখন আর নিশ্চিত করে কিছুই জানি না আমি। সিগালের কথা মনে আছে আমার, রুটি ছুঁড়ে দিতাম। মাঝে মাঝে উপরে ছুঁড়ে দিলে ওরা উড়ে এসে লুফে নিত।' একটু বিরতি নিল সে। 'হয়তো অন্য কারও স্মৃতি আমার মাথায় ভর করেছে।'

একটা গাড়ি এলো ওদের কাছে, ড্রাইভার হাত নাড়ল। হাত নাড়ল শ্যাডোও, ক্ষণিকের জন্য ওর মনে হলো, স্ত্রীকে সাথে নিয়ে হাঁটছে। এর চাইতে স্বাভাবিক আর কী হতে পারে?

'ভালো লাগছে।' যেন ওর মন পড়তে পেরেই বলল লরা।

'হ্যাঁ।'

'যখন ডাক এলো, তখন তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। টেক্সাসে কেবলমাত্র পা রেখেছি তখন।'

'ডাক?'

ওর দিকে তাকাল লরা। গলায় পরে থাকা সোনালী পয়সা ঝিকিয়ে উঠল। 'সেরকমই মনে হয়েছিল। তোমার কথা মনে পড়তে শুরু করল আচমকা। উদগ্র হয়ে উঠল তোমাকে দেখার বাসনা।'

'তুমি জানতে যে আমি এখানে আছি?'

'হ্যাঁ,' বলেই থমকে দাঁড়াল লরা। ভ্রূ কুঁচকে চেপে ধরল নিচের ঠোঁট। মাথা একদিকে কাত করে বলল, 'আচমকা কীভাবে যেন জেনে গেলাম। মনে হচ্ছিল, তুমি আমাকে ডাকছ! ভুল মনে হয়েছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি আমাকে দেখতে চাওনি।'

'ব্যাপারটা তা নয়,' একটু ইতস্তত করল শ্যাডো। 'নাহ, আমি তোমাকে দেখতে চাইনি। তোমাকে দেখা মাত্র কষ্ট পাই খুব।'

পায়ের নিচে বরফ কুঁচি শব্দ করে ভাঙতে শুরু করল, তাতে সূর্যের আলো পড়ে সৃষ্টি হলো হীরের ঝলক।

'বাঁচতে না পারাটা,' বলল লরা। 'খুব কষ্টের নিশ্চয়।'

'দেখ, তোমাকে কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায়, সেই চেষ্টায় ব্যস্ত আমি। সম্ভবত একটা উপায় পেয়েছি-'

'না।' ওকে থামিয়ে দিল মেয়েটা। 'আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। চাই তুমি সফল হও। অনেক খারাপ কাজ করেছি...' মাথা নাড়ল সে। 'তবে আমি তোমার কথা বলছিলাম।'

'আমি তো বেঁচেই আছি!' বলল শ্যাডো।

'তুমি মৃত নও,' বলল লরা। 'তাই বলে বাঁচছ, সেটাও আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না।'

আলাপচারিতা এই দিকে মোড় নিল কীভাবে? ভাবল শ্যাডো।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' নিঃস্পৃহ কণ্ঠে বলল মেয়েটা। 'তুমি আমার পাপি। কিন্তু মানুষ যখন মৃত চোখ দিয়ে দেখে, তখন অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে যায়। মনে হয় যেন চোখের সামনে থেকে কোন পর্দা উঠে গিয়েছে। তুমি এই বিশ্বের বুকে পুরুষাকৃতির একটা গর্ত।' ভ্রূ কুঁচকাল মেয়েটা। 'আমরা যখন একসাথে ছিলাম, তখনও তাই ছিলে। তোমার সাথে থাকতে আমার ভালো লাগত। তুমি বলতে গেলে আমার পূজা করতে; যা চাইতাম, তাই এনে দিতে। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন রুমে ঢুকতাম, তখন মনে হতো যেন ওখানে কেউ নেই। তারপর বাতি জ্বালানো মাত্র দেখতে পেতাম তোমাকে। চুপচাপ বসে আছ, না টিভি দেখছ...আর না কিছু পড়ছ। কিছুই না করে যে এভাবে বসে থাকা যায়, তা আগে জানতাম না।'

আচমকা আলিঙ্গন করল ও শ্যাডোকে, যেন এতে করে তার কথার বিষটা শুষে নিচ্ছে। 'রবির সবচেয়ে ভালো দিকটা ছিল, ওর অস্তিত্ব আমি অনুভব করতে পারতাম। মাঝে মাঝে খুব খারাপ ব্যবহার করত, বোকা-সোকাও ছিল। কিন্তু ও জীবন্ত ছিল, পাপি। চাহিদা ছিল ওর। বিশ্বের বুকে থাকা গর্ত পূরণ করত।' হঠাত থমকে দাঁড়াল সে। 'আমি দুঃখিত, আমার কথায় কষ্ট পেলে?'

কথা বলল না শ্যাডো। জানে, মুখ খুললে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। তাই মাথা নেড়ে না করল কেবল।

'ভালো,' বলল লরা। 'খুব ভালো।'

গাড়িটা যেখানে পার্ক করেছিল শ্যাডো, সেটার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে ওরা। যুবকের মনে হলো, এখন কিছু একটা বলা দরকার-যেও না, আমি তোমাকে ভালোবাসি। অথবা, আমি দুঃখিত। অথচ যখন মুখ খুলল তখন বেরিয়ে এলো, 'আমি মৃত নই।'

'হয়তো না।' বলল মেয়েটা। 'কিন্তু বাঁচছ কী?'

'আমার দিকে তাকাও।'

'এটা কোন উত্তর হলো না।' ওর মৃতা স্ত্রী জবাব দিল। 'উত্তরটা তুমি নিজেই আবিষ্কার করতে পারবে।'

'এখন কী করবে?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'তোমার সাথে দেখা হলো,' বলল মেয়েটা। 'এখন আবার দক্ষিণে যাব।'

'কোথায়? টেক্সাসে?'

'গরম কোথাও। জায়গায় কিছু যায় আসে না।'

'আমার এখানেই অপেক্ষা করতে হবে,' জানাল শ্যাডো। 'বসের দরকার হতে পারে।'

'একে বাঁচা বলে না।' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল লরা। পরক্ষণে হাসি দেখা গেল মুখে। যে হাসিটা শ্যাডোর মনে দোলা দিয়ে যায় সবসময়, সেই হাসিটাই!

হাত বাড়িয়ে মৃতা স্ত্রীকে আলিঙ্গন করতে চাইল শ্যাডো। কিন্তু মাথা নেড়ে দূরে সরে গেল লরা। চুপচাপ বসে রইল তুষারে ঢাকা একটা পিকনিক টেবিলের উপরে।

শ্যাডোর চলে যাবার পরেও বসে রইল সে।

মধ্যরঙ্গ

যুদ্ধ যে অনেক আগেই শুরু হয়েছে, তা কেউ টেরই পাইনি। যেমন টের পায়নি অবশ্যম্ভাবী ঝড়ের আগমন।

ম্যানহাটনের রাস্তায় গার্ডার পড়ে মারা গেল দুজন পথচারী, এক আরব ট্যাক্সি ড্রাইভার আর তার প্যাসেঞ্জার। সেই সাথে দুই দিন বন্ধ রইল রাস্তায় যান চলাচল।

ডেনভারের এক ট্রাক ড্রাইভারকে নিজ গৃহে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। খুনের অস্ত্র হলো মাথার এক দিক বাঁকানো একটা হাতুড়ি। লাশের পাশে মেঝেতেই ফেলে রাখা হয়েছিল অস্ত্রটা। ড্রাইভারের চেহারা স্পর্শও করা হয়নি, তবে মাথার পেছনটা গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বাথরুমের আয়নায় বাদামি লিপস্টিক দিয়ে লেখা হয়েছে অদ্ভুত কিছু অক্ষর।

ফিনিক্স, অ্যারিজোনার পোস্টাল সর্টিং স্টেশনে পাগল হয়ে গেল একজন পুরুষ কর্মচারী। টেরি 'দ্য ট্রল' ইভেনসন, এক মোটা-সোটা, হোঁতকা লোককে খুন করল সে। বেচারা টেরি একাই থাকত, একটা ট্রেলারে। অনেককে উদ্দেশ্য করেই ছোঁড়া হয়েছিল গুলি, তবে মারা গিয়েছে কেবল একজনই। খুনিকে ধরা যায়নি; এমনকী সে কে, তা-ও বের করতে পারেনি পুলিশ।

'সত্যি বলতে কী,' টেরি 'দ্য ট্রল' ইভেনসনের সুপারভাইজার নিউজ অ্যাট ফাইভকে বলল। 'আমাদের ধারণা ছিল এখানকার কেউ পাগল হলে হবে টেরি। কাজ ভালো করে, কিন্তু একটু অদ্ভুত লোকটা। যাক, মানুষের রূপ দেখে তার ভেতরটা আসলে আন্দাজ করা যায় না।'

মন্টানায় কর্তৃপক্ষ খুঁজে পেল নয়জন সন্ন্যাসীর লাশ। রিপোর্টারদের ধারণা, একসাথে আত্মহত্যা করেছে এই নয়জন। কিন্তু অচিরেই জানা গেল, পুরনো ফার্নেস থেকে নির্গত হওয়া কার্বন মনো-অক্সাইড তাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

কী ওয়েস্ট করবস্থানে কেউ একজন অপবিত্র করল একটা ক্রিপ্ট।

আইডাহোতে একটা ইউ.পি.এস. ট্রাকের সাথে যাত্রীবাহী ট্রেনের আঘাতে মারা গেল ট্রাকের ড্রাইভার। আরোহীদের অবশ্য তেমন বড় কোন ক্ষতি হয়নি।

স্নায়ু যুদ্ধ...নকল যুদ্ধ চলছে এখনও। এসব লড়াইতে না কোন কিছু জেতা যায়, আর না কিছু হারা।

ঝড় আসছে।

শেবার রানিকে সবাই অর্ধ-পিশাচ বলেই জানে। ডাইনি, জ্ঞানী আর রানী এই মহিলা শেবায় সেই সময় রাজত্ব করেছিল, যখন দেশটা ছিল স্মরণকালের সবচাইতে ধনী সাম্রাজ্য! ওখান থেকে মসলা, মণি-মুক্তা আর সুগন্ধি কাঠ নৌকায় আর উটের পিঠে করে নিয়ে যাওয়া হতো সারা বিশ্বে। জীবিত থাকা অবস্থাতেই সবার পূজা পেত সে, এমনকী সবচেয়ে জ্ঞানী সম্রাটরাও তার উপাসনা করত জীবিত দেবী হিসেবে। আজ...ভোর দুইটার সময়...সেই শেবার রানি হাঁটছে সানসেট বুলেভার্ডের ফুটপাত ধরে। এমনভাবে, যেন ফুটপাত ওর সাম্রাজ্য। আর রাত? প্রজা।

সরাসরি কেউ ওর দিকে তাকালে ঠোঁট নাড়ায় মেয়েটা, যেন কিছু একটা বলছে। আর যখন গাড়ি ভর্তি মানুষ পাশ দিয়ে চলে যায়, তখন তাদের চোখে চোখ রেখে হাসে।

লম্বা একটা রাত পার হচ্ছে।

লম্বা একটা সপ্তাহ ছিল।

লম্বা ছিল বিগত চার হাজার বছরও!

কারও কাছে তার কোন ঋণ নেই-এ ব্যাপারটা নিয়ে গর্বিত সে। রাস্তার অন্যান্য বেশ্যাদের দালাল আছে, আছে অভ্যাস, বাচ্চা-কাচ্চা; আছে এমন অনেকে যারা তাদের ইনকামে ভাগ বসায়। কিন্তু এসব থেকে মুক্ত মেয়েটা।

আসলে ওর পেশায় এখন আর পবিত্র কিছুই অবশিষ্ট নেই।

এক সপ্তাহ আগে, আচমকা বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে লস অ্যাঞ্জেলসে। ভেজা রাস্তায় বেড়ে গিয়েছে দুর্ঘটনার সংখ্যা। বৃষ্টির পানি পাহাড় বেয়ে নিচে নামার সময় সাথে করে নিয়েছে এসেছে কাদা স্রোত। সেই স্রোতের মুখে পড়ে বাড়ি-ঘর সব গিয়ে পড়েছে ক্যানিয়নে। নদীর কংক্রিট চ্যানেলে আস্তানা গেঁড়ে বসা ভবঘুরে আর গৃহহীনদের চুবিয়ে মেরেছে পানি। লস অ্যাঞ্জেলসে যখন বৃষ্টি আসে, তখন অধিবাসীদেরকে চমকে দিয়ে আসে।

গত সপ্তাহটা গৃহে অন্তরীন হয়ে কাটাতে হয়েছে বিলকীসকে। ফুটপাতে দাঁড়াতে পারেনি বলে নিজের বিছানায় শুয়েই কাটিয়েছে দিনগুলো। তবে একেবারে অর্থহীনভাবে কাটায়নি সপ্তাহটা। অ্যাডাল্টফ্রেন্ডফাইন্ডার.কম, এলএ-এস্কর্টস.কম, ক্ল্যাসিহলিউডবেবস.কম-এসব সাইটে নিজের প্রোফাইল খুলেছে। ওর

সাথে সংযুক্ত করা যাবে না, এমন একটা ই-মেইল অ্যাড্রেসও খুলে নিয়েছে। নতুন সাগরে জাহাজ ভাসাতে পেরে গর্বিত বিলকীস, তবে সেই সাথে ভয়ও পাচ্ছে। কাগুজে ঝামেলা এড়াচ্ছে ও বহুদিন ধরে। এমনকি এল.এ. উইকলির পাতায় বিজ্ঞাপনও দেয়নি কোনদিন। নিজের খদ্দেরদের নিজেই বেছে নিতে পছন্দ করে ও। চোখ দিয়ে দেখে, গন্ধ শুঁকে আর হাত দিয়ে স্পর্শ করে উপাসকদের বেছে নেয় সে।

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে আচমকা উপলব্ধি করল, যেসব বেশ্যাদেরকে ও ঘৃণা করে, তাদের মতো ওরও একটা বাজে অভ্যাস আছে। দুশ্চিন্তা করতে শুরু করল বিলকীস, ঠোঁট নাড়িয়ে কী সব বলতে শুরু করেছে। যদি কেউ ওই লালচে ঠোঁটের কাছে কান পাতে তো শুনতে পাবে।

'আমি এখন উঠব আর হাঁটব শহরের রাস্তা জুড়ে। খুঁজে বের করব আমার প্রেমাস্পদকে। রাতের বেলা বিছানায় খুঁজব তাকে, যে আমার অন্তরে বাস করে। তাকে চুমু খেত দেব, চুমু খাব আমিও। আমার ভালোবাসা কেবলই আমার, যেমন আমি কেবলই আমার ভালোবাসার।'

মেয়েটার আশা, বৃষ্টি বন্ধ হলে ফিরে আসবে খদ্দেররা। অধিকাংশ সময় সানসেট বুলেভার্ডের নির্দিষ্ট একটা বা দুইটা রাস্তায় দোকান বসায় সে। মাসে একবার এল.এ.পি.ডি.র এক অফিসারকে হপ্তা দিয়ে আসে। এই অফিসারের আগেরজন, জেরি লেবেক আচমকা উধাও হয়ে গিয়েছিল। ডিপার্টমেন্টে এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অবসান হয়নি আজও। লোকটা বিলকীসের ব্যাপারে পাগল হয়ে গিয়েছিল, এমনকী মেয়েটার পিছু নেয়াও শুরু করেছিল সে। একদিন বিকাল আচমকা ঘুম ভেঙ্গে যায় মেয়েটার। দরজা খুলে দেখে, সিভিলিয়ান পোশাক পরে দরকার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে জেরি লেবেক। মাথা নিচু করে অপেক্ষা করছে ওরই আসার। যে আওয়াজটা বিলকীস শুনেছিল, তা হলে কাঠের সাথে লোকটার মাথা ঠোকার আওয়াজ।

জেরির চুলে হাত বুলিয়ে ওকে ভেতরে নিয়ে এসেছিল বিলকীস। পরে তার কাপড়-চোপড় একটা কালো ময়লার ব্যাগে ভরে কয়েক ব্লক দূরের একটা আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। অফিসারের বন্দুক আর ওয়ালেট আরেকটা ব্যাগে ভরে তার উপর ঢেলে দিয়েছিল নষ্ট হওয়া খাবার। এই ব্যাগটাকে ফেলেছিল একটা বাস স্টপে।

স্যুভনির রাখার পক্ষপাতী নয় বিলকীস।

দূর-পশ্চিমের রাতের কমলা আকাশ দেখে বোঝা যাচ্ছে, ওদিকের কোনখানে বজ্রপাত হচ্ছে। সম্ভবত সমুদ্রের উপরে কোথাও। বিলকীস জানে, অচিরেই শুরু হতে যাচ্ছে বৃষ্টি। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। বৃষ্টিতে ভেজার কোন ইচ্ছাই ওর নেই, এরচেয়ে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাওয়াই ভালো। গোসল করে, পায়ের লোম কামিয়ে নেবে। তারপর-ঘুম!

পার্শ্ব একটা রাস্তা ধরে চলতে শুরু করল ও, পাহাড়ের পাশে গাড়ি রেখে এসেছে।

হঠাত পেছন থেকে ভেসে এলো একজোড়া হেডলাইট। গতি একটু কমিয়ে পেছন ফিরে হাসল বিলকীস। সাদা লিমোটা দেখা মাত্র যেন মুখেই জমে গেল হাসিটুকু। লিমোর খদ্দেররা লিমোতেই যা করার তা করে ফেলতে চায়। এতে কোন লাভ নেই ওর। তারপরও, ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ হিসেবে চেষ্টা করে দেখা যায়।

গুঞ্জন করে নেমে এলো জানালা। বিলকীস মুখে হাসি ধরে রেখেই এগিয়ে গেল লিমোর দিকে। 'হাই, হানি। কিছু চাই?'

'ভালোবাসা চাই, ভালোবাসা।' লিমোর পেছন থেকে ভেসে এলো কণ্ঠটা। খোলা দরজা দিয়ে যতটা ভেতরে তাকানো যায়, তাকাল বিলকীস। সাবধানের মার নেই, পাঁচজন মাতাল ফুটবল খেলোয়াড়ের সাথে একবার লিমোতে চড়েছিল এক মেয়ে। সেবার অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তার। কিন্তু এই লিমোতে মাত্র একজন বসে আছে, বয়সও কম। একে উপাসক বানানো যাবে বলে মনে হয় না। তবে এই বয়সে যার লিমো আছে, তার টাকা-পয়সার অভাব হবার কথা না। বারাকা, একদা এই নামেই ডাকা হতো এই হস্তান্তর হওয়া অর্থকে। আর সত্যি বলতে কী, এখন যা পায়, তা-ই দরকার বিলকীসের।

'কত?' জানতে চাইল ছেলেটা।

'নির্ভর করে কী চাই, আর কতক্ষণের জন্য চাই তার উপরে।' উত্তর দিল বিলকীস। 'পোষাতে পারবে কিনা, সেই ব্যাপারটাও আছে।' ভেতর থেকে অদ্ভুত একটা গন্ধ ভেসে আসছে। যেন তার পুড়ছে কোথাও। ভেতর থেকে দরজা খুলে দিল কেউ।

'যা চাই, তা কেনার ক্ষমতা আমার আছে।' বলল খদ্দের। গাড়িতে বসে চারপাশ দেখে নিল বিলকীস, আর কেউ নেই ভেতরে। কেবল খদ্দের, ফোলা-ফোলা মুখের ছেলেটার বয়স এতই কম যে মদ পানের বয়স হয়েছে বলেও মনে হয় না।

'মালদার নাকি?' জানতে চাইল ও।

'মালদারদের মাঝেও মালদার।' জানাল খদ্দের, ওর দিকে এগিয়ে এলো ছেলেটা। ভঙ্গিমায় কেমন ইতস্তত একটা ভাব। মুচকি হাসল বিলকীস।

'উম, পয়সা আমাকে উত্তেজিত করে, প্রিয়।' বলল সে। 'ডট কম বিলিওনিয়ার নাকি?'

'হ্যাঁ। আমি টেকনিক্যাল বয়।' বলল খদ্দের, এদিকে গাড়ি চলতে শুরু করেছে।

'তাহলে বিলকীস,' কিছুক্ষণ পর বলল সে। 'চুষে দিতে কত নেবে?'

'কী নামে ডাকলে আমাকে?'

'বিলকীস,' আবারও বলল খদ্দের।

হাসি উধাও হয়ে গেল বিলকীসের চেহারা থেকে। 'কী চাই তোমার?'

'আগেই বলেছি, ভালোবাসা চাই।'

'যা চাও, পাবে।' বলল মেয়েটা, যে করেই হোক ওকে এই লিমো থেকে বের হতেই হবে। গাড়িটা খুব দ্রুত চলছে, নইলে ঝাঁপ দেয়ার একটা চেষ্টা করত। ঘটনা যেভাবে এগোচ্ছে, তা পছন্দ হচ্ছে না ওর।

'আমি কী চাই, হুম।' একটু বিরতি নিল ছেলেটা, জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে বলল। 'আমি চাই পরিষ্কার একটা দুনিয়া। আমি চাই আগামীর উপর রাজত্ব করতে, চাই বিবর্তন...চাই বিপ্লব। আমি চাই আমাদেরকে সবার অলক্ষ্য থেকে সরিয়ে এনে সবার সামনে রাখতে। তোমরা অতীত দিনের ভুলে যাওয়া গল্প, তোমাদের সাথে পাদ-প্রদীপের আলো কেন ভাগাভাগি করতে হবে আমাদেরকে?'

'আমার নাম আয়েশা,' বলল বিলকীস। 'তুমি কী বলছ, তার একবিন্দুও বুঝতে পারছি না আমি। আরেকটা মেয়ে আছে অবশ্য, ওর নাম বিলকীস। সানসেটে ফিরে চলো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি...'

'ওহ, বিলকীস,' নাটকীয় ভঙ্গিমায় দীর্ঘশ্বাস ফেলল ছেলেটা। 'চারপাশে বিশ্বাসের পরিমাণ সীমিত। তার সবটাই আমাদের দরকার।' গতি না কমিয়েই বাঁক ঘুরল গাড়িটা, বিলকীসকে সিটের সাথে ঠেসে ধরল খদ্দের। ড্রাইভার আর ওদের মাঝে একটা কালো কাঁচ, দেখা যায় না। আচমকা মেয়েটার মনে হলো, গাড়িটা আপনা-আপনিই চলছে। কেউ চালাচ্ছে না ওটাকে!

ঠিক তখনই হাত বের করে ড্রাইভারের কাঁচে নক করল খদ্দের।

গতি কমে গেল গাড়ির। পুরোপুরি বন্ধ হবার আগেই দরজায় ধাক্কা দিল বিলকীস। কিছুটা লাফিয়ে আর কিছু আছাড় খেয়ে বেরিয়ে এলো গাড়ি থেকে। পাহাড়ি একটা রাস্তায় চলছিল গাড়ি, ওটার ডান দিকে খাদ আর বা দিকে খাড়া পাহাড়। তাই পথ বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল ও।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল লিমোটা, নড়ল না এক বিন্দুও।

বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। পায়ের হাই হিলগুলো পিছলা খাচ্ছে বার বার। লাথি মেরে ওগুলো পা থেকে খুলল সে, ভেজা শরীর নিয়েই দৌড়াচ্ছে। ভয় পেয়েছে বিলকীস, ক্ষমতা ওর আছে বটে। কিন্তু তা যৌনতার ক্ষমতা। এই দেশে সেই ক্ষমতা ওকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে, তবে অন্য সব কিছুর জন্য নিজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, মন, উচ্চতা আর ব্যক্তিত্বকে ব্যবহার করতে হয় ওর।

ডান দিকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা একটা গার্ড-রেইল আছে। গাড়ি যেন খাদ বেয়ে নিচে না পড়ে, তার জন্য সুরক্ষা হিসেবে বসান হয়েছে ওটাকে। বৃষ্টি এখন ভারি বর্ষণের রূপ নিয়েছে, বিলকীসের পায়ের পাতা ছিলে বের হতে শুরু করেছে রক্ত।

অদূরেই লস অ্যাঞ্জেলসের আলো দেখতে পাচ্ছে ও। ওখানে পৌঁছালেই মিলবে আশ্রয়, নিরাপদ আশ্রয়। আচমকা রাতের অন্ধকার ছিঁড়ে ছুটল বজ্রের ত্রিশূল, চমকে উঠে আছাড় খেল বিলকীস। দৌড়াবার তাল সামলাতে না পেরে কয়েক ফুট হেচড়িয়ে এগোল ওর দেহ, সাথে সাথে রক্ত বেরোতে শুরু করল পা আর কনুই থেকে। কোন রকমে উঠে দাঁড়াচ্ছে, এমন সময় দেখতে পেল একটা গাড়ির হেডলাইট। ওর দিকেই ভেসে আসছে।

প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসছে ওটা, কোনদিকে যাবে বুঝে উঠতে পারল না মেয়েটা। মূল্যবান কয়েকটা মুহূর্ত খরচ করার পর ছুটল রাস্তার ওপাশে-পাহাড় বেয়ে ওঠার চেষ্টা করবে। সাদা লিমোটাকে যখন দেখতে পেল ও, তখন কম করেও হলেও আশি মাইল বেগে চলছে ওটা...বেশিও হতে পারে। তাড়াহুড়ো বেড়ে গেল বিলকীসের, গাছ-গাছড়া বেয়ে ওঠার প্রয়াস বেড়ে গেল।

কিন্তু হায়, বৃষ্টিতে নরম হয়ে গিয়েছে মাটি। কাদার ধ্বস ওকে ঠেলে যেন নামিয়ে দিল রাস্তায়।

এত জোড়ে আঘাত হানল গাড়িটা যে পুতুলের মতো উড়ে গেল বিলকীসের দেহ। লিমোর পেছনের রাস্তায় গিয়ে পড়ল দেহটা। প্রথম আঘাতেই কোমর আর খুলির হাড় ভেঙ্গে গেল ওর।

খুনিকে অভিশাপ দেবার প্রয়াস পেল সে, তবে চুপিচুপি। কেননা ঠোঁট নাড়াবার সাধ্য নেই এখন তার। অভিশাপে জর্জরিত করল সে খদ্দেরকে, এমনসব অভিশাপ যা কেবল কোন অর্ধ-পিশাচই দিতে পারে।

থেমে গিয়েছে গাড়ি, কেউ একজন এগিয়ে আসছে ওর দিকে। 'তোমরা সব বেশ্যা। সবাই।'

শব্দ করে গাড়ির দরজা বন্ধ করার আওয়াজ শুনতে পেল বিলকীস।

পেছন দিকে রওনা হলো লিমো, প্রথমবার আস্তে আস্তে গেল ওর দেহের উপর দিয়ে। চাকার নিচে মটমট করে ভাঙল হাড়গুলো। তারপর...দ্বিতীয়বার...গতি জমা করে ছুটে এলো গাড়িটা।

অকুস্থল থেকে বিদায় নিল ওটা, পেছনে ফেলে গেল লালচে একতাল মাংসপিণ্ড। ওটাকে মানুষ বলে চেনার কোন উপায় নেই।

কে জানে, হয়তো অল্প কিছুক্ষণের মাঝেই লস অ্যাঞ্জেলসের বৃষ্টি যতটুকু অবশিষ্ট আছে সেটাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

মধ্যরঙ্গ-দুই

'হাই, সামান্থা।'

'ম্যাগস নাকি?'

'আর কে হবে?'

'লিওন বলল, গোসল করার সময় নাকি ওর স্যামি খালা ফোন করেছিল।'

'হুম, অনেকক্ষণ কথা হলো ওর সাথে। খুব মিষ্টি একটা ছেলে।'

'ঠিক, ভাবছি ওকে রেখেই দেই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল দুইজন। অস্বস্তিকর নীরবতাটুকু বেশি হবার আগেই, 'স্যামি, স্কুলের কী খবর?'

'এক সপ্তাহের ছুটি পাচ্ছি, ফার্নেস নিয়ে সমস্যা। তোমার ওখানকার অবস্থা বলো।'

'হুম, নতুন এক প্রতিবেশী পেয়েছি। পয়সার খেলা জানে। লেকসাইড নিউজের চিঠি-পত্র কলামটা আপাতত খুব ভালো চলছে। আমার উপর দায়িত্ব পড়েছে একটা সম্পাদকীয় লেখার। পুরনো গোরস্থানের জায়গাটা নতুন কোন কাজে লাগান উচিৎ হবে কিনা, সে নিয়ে লিখতে হবে। এমনভাবে যেন কেউ আহত না হয়, আবার আমাদের অবস্থানও কারও কাছে পরিষ্কার না হয়।'

'দারুণ মজা মনে হচ্ছে।'

'একদম না। গত সপ্তাহে জিলি আর স্ট্যান ম্যাকগভার্নদের বড় মেয়ে, অ্যালিসন ম্যাকগভার্ন উধাও হয়ে গিয়েছে। মেয়েটা ভালো ছিল, লিওনের জন্য কয়েকবার বেবি-সিটিং-ও করিয়েছিলাম।'

কিছু একটা বলার জন্য মুখ খোলা হলো, কিন্তু তা না বলে আবার বন্ধ হয়ে গেল ওটা। বরঞ্চ বলল, 'খুব খারাপ।'

'হুঁ।'

'তো...' এখন যাই বলা হোক না কেন, কষ্ট কাউকে না কাউকে পেতেই হবে। তাই প্রসঙ্গ পাল্টাবার প্রয়াসে, 'লোকটা দেখতে কেমন?'

'কে?'

'প্রতিবেশী।'

'লোকটার নাম আইনসেল, মাইক আইনসেল। ভালোই, তবে আমার পছন্দের তুলনায় বয়স কম। বিশালদেহি...দেখে মনে হয়...'

'কী?'

'বিবাহিতা। সেই সাথে একটু উদ্ভ্রান্তও।'

'রহস্যময় নিশ্চয়?'

'খুব একটা না। অসহায়ের মতো চলাফেরা করে। কীভাবে জানালায় সীল লাগাবে, সেটাও জানে না। এখন দেখে মনে হয়, পথ ভুলে লেকসাইডে চলে এসেছে। মাঝে মাঝে লম্বা সময়ের জন্য উধাও হয়ে যায়!'

'ব্যাঙ্ক ডাকাত হবে হয়তো।'

'হুম। আমিও তাই ভাবছিলাম।'

'না, ম্যাগস। এই ভাবনাটা আমার ছিল। শোন, কেমন আছ তুমি? সব ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'সত্যি?'

'না।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর, 'আমি আসছি।'

'স্যামি, তার কোন দরকার নেই।'

'স্কুল খোলার আগেই আসব, খুব মজা হবে। কাউচে একটা বিছানা করে দিলেই হবে। আর সেই সাথে তোমার রহস্যময় প্রতিবেশীকে একদিন রাতে খাবারের দাওয়াত দাও।'

'স্যামি, ঘটকালী করতে চাইছ?'

'ঘটকালী কে করে? ক্লডিন-হারামজাদীর পর, ভাবছি কয়দিন প্রেমিকা না খুঁজে প্রেমিক খুঁজলে মন্দ হয় না। এই ক্রিসমাসেই তো হিচ-হাইকিং করার সময় একটা ভালো ছেলের সাথে পরিচয় হলো।'

'ওহ, স্যাম। এই হিচ-হাইকিং করাটা বন্ধ করতে হবে।'

'তাহলে লেকসাইডে আসব কীভাবে?'

'অ্যালিসন ম্যাকগভার্ন উধাও হবার সময় হিচ-হাইকিং করছিল। এরকম একটা শহরেও কাজটা নিরাপদ না। আমি টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'লাগবে না, আমার কিছু হবে না।'

'স্যামি।'

'টাকা পাঠালে শান্তি পাবে? ভালো ঘুম হবে রাতে?'

'তা তো হবেই।'

'ঠিক আছে, ম্যাগস। টাকা পাঠিয়ে দাও। লিওনকে চুমু খেয়ে বলো, ওর স্যামি খালা আসছে। এবার যেন আমার বিছানায় খেলনা না লুকায়।'

'বলব, তবে কাজ হবে বলে মনে হয় না। যাই হোক, আসছ কবে?'

'কালকে রাতেই। বাস স্টেশনে আসতে হবে না তোমাকে। হিনজেলমানকে বলব, তিনি যেন টেসিতে করে আমাকে পৌঁছে দেন।'

'দেরী করে ফেলেছ, টেসি শীতনিদ্রায় গিয়েছে। তবে হিনজেলমান তোমাকে পছন্দ করে। ওর গল্পগুলো শোন যে, তাই। যেভাবেই হোক তোমাকে পৌঁছে দেবে সে।'

'আমার তো মনে হয়, লোকটাকে দিয়ে তোমাদের সম্পাদকীয় লেখানো উচিৎ। 'পুরনো গোরস্থানের জমির প্রসঙ্গে বলছি। সেই অমুক সালের এক শীতে আমার দাদা একটা হরিণকে গুলি করেছিল, জায়গাটা ছিল পুরনো গোরস্থানের পাশেই। গুলি ছিল না তার সাথে। তাই ব্যবহার করেছিল আমার দাদীর দেয়া চেরি-স্টোন। গুলিটা লেগেছিল বটে, কিন্তু হরিণটা মরেনি। এই ঘটনার দুই বছর পর যখন দাদা ওদিক দিয়ে যাচ্ছিল, তখন দেখতে পেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। বিশালাকার একটা হরিণ মাথার উপর একটা চেরি গাছ নিয়ে দৌড়াচ্ছে। এবার আর ভুল হয়নি তার, গুলি করে মেরেছিল সে ওটাকে। আর দাদী এত চেরি পাই বানিয়েছিল যে পরবর্তী স্বাধীনতা দিবসেও তা শেষ হয়নি...''

হাসিতে ফেটে পড়ল দুই বোন।

মধ্যরঙ্গ-তিন
জ্যাকসনভিল, ফ্লোরিডা, রাত দুইটা

'বাইরে দেখলাম, সাহায্য চাই লেখা?'

'আমরা সবসময় কর্মচারী নেই।'

'আমি শুধু রাতের শিফটে কাজ করতে পারব। কোন সমস্যা?'

'হবার কথা না। যাই হোক, একটা অ্যাপ্লিকেশন পূরণ করে জমা দিতে হবে। আগে কখনও কোন গ্যাস স্টেশনে কাজ করেছ?'

'নাহ, তবে কত আর কঠিন হবে?'

'হুম, ব্যাপারটা খুব কঠিন কিছু না। ম্যাম, কিছু মনে করো না। তোমাকে দেখে ঠিক সুস্থ মনে হচ্ছে না।'

'আমি জানি। আমার একটা রোগ আছে। দেখে যেমন মনে হয়, আসলে তত গুরুতর নয়।'

'ঠিক আছে। অ্যাপ্লিকেশনটা আমাকে দিয়ে যাও। আমাদের রাতের শিফটে আসলে লোকবল অনেক কম। এখানে সবাই ওটাকে জম্বি-শিফট বলে। যাক গে, নামটা কী? লোরনা?'

'লরা।'

'হুম, লরা। আশা করি পাগল-ছাগলদের সামলাতে পারবে। রাতে ওদের প্রকোপ বেড়ে যায়।'

'পারব।'

অধ্যায় তেরো

হে মোর বন্ধু,
বলবে কী কিছু?
করবে কি ঠিক সবকিছু?
দেবে কি নতুন মাত্রা বন্ধুত্বে?

কেন এমন গম্ভীর?
একসাথে আছি, থাকব সর্বদা।
তুমি, আমি আর সে-
জীবন লাগিয়েছি যে বাজিতে।

-স্টিফেন সোনহেইম, 'ওল্ড ফ্রেন্ডস'

শনিবার সকালে, নক শুনে দরজা খুলল শ্যাডো।

মার্গারিতা ওলসেন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে! ভেতরে প্রবেশ করল না মেয়েটা, গম্ভীর চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। 'মিস্টার আইনসেল...?'

'মাইক বলে ডেকো, প্লিয।'

'আচ্ছা, মাইক। আজ রাতে, এই ধরো ছয়টার দিকে, আমার বাড়িতে তোমার দাওয়াত। বেশি কিছু খাওয়াতে পারব না অবশ্য, কেবল স্প্যাগেটি আর মিটবল।'

'স্প্যাগেটি আর মিটবল আমার পছন্দ।'

'তবে যদি অন্য কোন কাজ থাকে তো...'

'নেই।'

'তাহলে ছয়টার সময়?'

'ফুল আনব?'

'চাইলে আনতে পারো। তবে এই আমন্ত্রণটা কিন্তু সামাজিক, রোমান্টিক নয়।'

গোসল সেরে হাঁটতে বেরল শ্যাডো। ব্রিজে পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলো আবার। সূর্য উঠেছে। আকাশের অনেকটা উজ্জ্বল করে রেখেছে সে। বাসায় ফিরে যুবক

লক্ষ্য করল, ঘামে ভেজা ওর কোটটা! ফোররানারটা বের করে চলে গেল ডেভের দোকানে, ওখান থেকে এক বোতল ওয়াইন কিনে নিল। দাম বাইশ ডলার, শ্যাডোর মনে হলো-এই দামের ওয়াইন ভালো না হয়ে যায় না।

উপহার হিসেবে কিনল একটা চারাগাছ। ওটার পাতাগুলো সব সবুজ, ফুল ধরেনি। এই উপহারের মাঝে চাইলেও রোমান্টিক কিছু খুঁজে বের করা সম্ভব না।

সেই সাথে কিনল এক কার্টন দুধ, যদিও জানে যে ওটায় কখনও চুমুক দেয়া হবে না। সেই সাথে কিনল কিছু ফল, ওগুলোও কখনও খাওয়া হবে না।

ম্যাবেলের দোকানে গিয়ে লাঞ্চে খাবার জন্য প্যাস্টি কিনল একটা, ওকে দেখা মাত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠল ম্যাবেলের চেহারা। 'হিনজেলমান বলেছে তোমাকে?'

'আমি তো জানতামই না যে তিনি আমাকে খুঁজছেন।'

'গরু খোঁজা খুঁজছে, তোমাকে নিয়ে নাকি বরফে মাছ ধরতে যাবে। চ্যাড মুলিগানও খুঁজছিল। জানো, ওর এক আত্মীয়া এসেছে বাইরে থেকে। খুব ভালো মেয়ে, তোমার পছন্দ হবে।' বলতে বলতে একটা বাদামি প্যাকেটে প্যাস্টিটা ভরল ম্যাবেল, গরম রাখার জন্য মুড়ে দিল প্যাকেটের উপরের দিকটা।

অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরল শ্যাডো, গাড়ি চালাতে চালাতেই এক হাতে শেষ করল প্যাস্টিটা। ফোররানারের মেঝে আর ওর জিনিসের সামনের দিকটা ভরে গেল প্যাস্টির ছোট ছোট টুকরায়। ফেরার পথে লাইব্রেরির সামনের রাস্তাটা ধরল। বরফে আচ্ছাদিত শহরটাকে সাদা-কালোতে আঁকা কোন ছবি বলে মনে হচ্ছে। বসন্ত এখনও অনেক দূরের কোন বিষয়। শ্যাডোর মনে হলো, ওই ক্ল্যাংকারটা আজীবন জমাট বাঁধা হ্রদের উপরেই বসে থাকবে, চারপাশে থাকবে মাছ-শিকারিদের তাঁবু আর ট্রাক।

অ্যাপার্টমেন্টে পৌছে গাড়ি পার্ক করল সে, এরপর কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। গোল্ডফিঞ্চ আর নাটহ্যাচ পাখি ভিড় করেছে খাবার জন্য। ওদের চোখের সামনে দিয়েই ঘরে ঢুকল শ্যাডো, চারাগাছটায় পানি ঢেলে ভাবল-ওয়াইনটা ফ্রিজে রাখবে কিনা।

ছয়টা বাজতে এখনও অনেক দেরী।

টেলিভিশন দেখতে পারলে ভালো হত, আফসোসের সাথে ভাবল শ্যাডো। চুপচাপ বসে থাকা মানেই নানা চিন্তাকে মাথায় ঢোকার আমন্ত্রণ জানানো। সেটা চায় না ও। চায় বিনোদিত হতে, চুপচাপ বসে টিভির ছবি আর শব্দের মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে। লুসির দুধ দেখতে চাও? স্মৃতির গহীন থেকে লুসির কণ্ঠে বলে উঠল কেউ। মাথা ঝাঁকাল শ্যাডো, যদিও আর কেউ নেই ঘরে।

নার্ভাসবোধ করছে, বুঝতে পারল আচমকা। অন্যদের সাথে, স্বাভাবিক মানুষদের সাথে এই হতে চলছে ওর প্রথম সামাজিক যোগাযোগ। যারা জেলের কয়েদি না, নয় কোন দেবতা বা কিংবদন্তীর নায়ক। শেষ এমন কিছু হয়েছিল তিন বছর আগে। তখন ওর নাম ছিল শ্যাডো, কিন্তু আজ মাইক আইনসেল হয়ে ওকে কথা চালাতে হবে।

ঘড়ির দিকে তাকাল একবার, আড়াইটা বাজে। মার্গারিতা ওলসেন বলেছিল, ছয়টার দিকে যেতে। ছয়টা মানে কি কাঁটায় কাঁটায় ছয়টা? একটু আগে গেলে কি খুব অসুবিধা হবে? নাকি একটু দেরী করে যাবে? অনেক চিন্তা-ভাবনার পর ঠিক করল, ছয়টা পাঁচে যাবে ও।

আচমকা বেজে উঠল শ্যাডোর টেলিফোন।

'হুম?' রিসিভার তুলে বলল ও।

'এভাবে কেউ ফোনে কথা বলে?' গর্জে উঠলেন যেন ওয়েনসডে।

'যখন সংযোগ নেব, তখন ভদ্রভাবে কথা বলব নাহয়,' উত্তর দিল শ্যাডো। 'আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারি?'

'আমি জানি না,' বললেন ওয়েনসডে। একটু বিরতি নিয়ে যোগ করলেন। 'দেবতাদের এক করা আর একগাদা বিড়ালকে সোজা লাইনে হাঁটানো একই কথা। এই জিনিসটা তাদের স্বভাবে নেই।' ওয়েনসডের কণ্ঠে ক্লান্তির আভা শুনতে পেল শ্যাডো, এই প্রথম।

'কী হয়েছে?'

'কঠিন। কাজটা একটু বেশিই কঠিন। তারচেয়ে বড় কথা, এতে কাজ হবে কিনা, সেটাও নিশ্চিতভাবে জানা নেই। এরচেয়ে নিজের গলা নিজেই কেটে ফেলা ভালো।'

'এভাবে বলতে নেই।'

'হুম।'

'তবে হ্যাঁ,' দুষ্টামি করে ওয়েনসডেকে একটু চাঙ্গা করার প্রয়াস পেল শ্যাডো। 'নিজের গলা নিজে কাটলে, ব্যথা লাগার সম্ভাবনা কম।'

'লাগবে। আর আমার মতো অস্তিত্বদের জন্যও, ব্যথা ব্যথাই। যদি কেউ বস্তুগত এই দুনিয়াতে কিছু করে, তাহলে বস্তুগত দুনিয়াও তার উপর প্রভাব ফেলে। ব্যথা কষ্ট দেয়, ঠিক যেমনটা মাতাল করে তোলে লোভ আর পোড়ায় আসক্তি। হয়তো আমরা সহজে মরি না, কিন্তু মরি বটে। যদি আমাদেরকে কেউ ভালোবেসে স্মরণ করে, তাহলে আমাদের মতোই কিছু একটা এসে আমাদেরই

ফাঁকা জায়গা দখল করে নেয়। আবার প্রথম থেকে শুরু হয় সবকিছু। আর যদি ভুলে যাওয়া হয়...তাহলে সব শেষ।'

কী বলবে, বুঝে পেল না শ্যাডো। 'তা কোত্থেকে ফোন করেছেন?'

'তোমার জেনে কাজ কী?'

'মাতাল হয়েছেন নাকি?'

'এখনও হইনি। থরের কথা মনে পড়ছে। তোমার সাথে দেখা হয়নি কখনও। বিশালদেহি ছিল, ঠিক তোমারই মতো। সাদা মনের মানুষ, খুব একটা চালাক না। কিন্তু চাইলে নিজের পরনের পোশাকও খুলে দেবে। আত্মহত্যা করেছিল থর। সেই ১৯৩২ সালে ফিলাডেলফিয়ায়, বন্দুকের নল মুখে পুরে টিপে দিয়েছিল ট্রিগার। এইভাবে কি কোন দেবতার মারা যাওয়া উচিৎ?'

'আমি দুঃখিত।'

'তোমার আসলে কিছু যায় আসে না, বাছা। অনেক দিক দিয়েই তোমার মতো ছিল ও। বড়-সড়, বোকা।' চুপ হয়ে গেলেন ওয়েনসডে, কাশলেন খক খক করে।

'কোন সমস্যা?' দ্বিতীয়বারের মতো জানতে চাইল শ্যাডো।

'ওরা যোগাযোগ করেছে।'

'কারা?'

'প্রতিপক্ষ।'

'কী চায়?'

'শান্তি চুক্তি। নিজে বাঁচো আর অন্যকে বাঁচতে দাও টাইপ।'

'এখন কী হবে?'

'অত্যাধুনিক কিছু হারামজাদার সাথে ক্যানসাস সিটির এক মেসনিক হলে বাজে স্বাদের কফি পান করতে হবে।'

'ঠিক আছে। আপনি আমাকে তুলে নেবেন? নাকি কোথাও আসব?'

'যেখানে আছ, সেখানেই থাকো। মাথা নিচু করে রাখবে, কারও যেন নজরে না পড়। ঠিক আছে?'

'কিন্তু-'

ক্লিক করে একটা শব্দ হলো কেবল, ওপাশ থেকে আর কোন কথা শুনতে পেল না শ্যাডো। ডায়াল টোনও নেই, অবশ্য কখনও ছিলও না।

সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই এখন। ওয়েনসডের সাথে হওয়া কথোপকথন শ্যাডোকে নাড়া দিয়ে গিয়েছে। হাঁটার জন্য উঠে দাঁড়াল সে, কিন্তু রাত নামতে শুরু করেছে দেখে বসে পড়ল আবার।

মিনিটস অফ দ্য লেকসাইড সিটি কাউন্সিল ১৮৭২-১৮৮৪ বইটার পাতা উল্টাতে শুরু করল ও, চোখ বোলাচ্ছে কেবল। পড়ছে না কিছুই, মাঝে মাঝে চোখে উল্লেখযোগ্য কিছু আটকে গেলে থামছে কেবল।

১৮৭৪ সালের জুলাই মাসে, শ্যাডো জানতে পারল, কিছু বহিরাগত কাঠুরে পা রেখেছিল শহরে। থার্ড স্ট্রিট অ্যান্ড ব্রডওয়ের এক কোনায় বানানো হয়েছিল একটা অপেরা হাউজ। স্থানীয় মিলের পুকুরটাকে হ্রদে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল সেই বছরেই। আর ক্ষতি পূরণ হিসেবে কোন এক মি. স্যামুয়েল স্যামুয়েলসকে দেয়া হয়েছিল সত্তর ডলার। সেই সাথে আশেপাশের জমি অধিগ্রহণের জন্য মি. হেইকি সালমিনেনকে দেয়া হয়েছিল পঁচাশি ডলার।

শ্যাডো ধারণাও করতে পারেনি যে হ্রদটা মনুষ্য-নির্মিত। যদি শহরে কোন হ্রদ না-ই থাকে, তাহলে সেটার নাম লেকসাইড দেবার কী মানে?

পড়ে চলল ও। ব্যাভারিয়া থেকে আগত, হুডেনমুহলেন, যে এখানে এসে মি. হিনজেলমান নাম নিয়েছে, হ্রদ-প্রকল্পের দায়িত্বে ছিল। সিটি কাউন্সিলের পক্ষ থেকে এজন্য তাকে দেয়া হয়েছিল মোট তিনশ সত্তর ডলার, আরও কিছু লাগলে সেটা অধিবাসীদের দান থেকে নিতে হবে। একটা টিস্যু পেপার ছিঁড়ে সেটাকে বুকমার্ক হিসেবে বইয়ের ভেতরে রাখল ও। এই জায়গাটা বর্তমানের হিনজেলমানকে দেখালে সে খুশিই হবে। লোকটা এ ব্যাপারে জানে কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ আছে ওর। পাতা উল্টে চলল শ্যাডো, হ্রদের ব্যাপারে আর কিছু পায় কিনা খুঁজছে। ১৮৭৬ সালের বসন্ত মাসে প্লাবিত করা হয়েছিল হ্রদটা।

ঘড়ির দিকে তাকাল শ্যাডো, সাড়ে পাঁচটা বাজে। বাথরুমে গিয়ে দাড়ি কামিয়ে নিল ও, চুল আঁচড়ে পালটে নিল পোশাকও। বাকি সময়টা কেটে গেল যেন চোখের পলকেই। ওয়াইন আর চারাগাছটা নিয়ে পাশের দরজার সামনে দাঁড়াল সে।

নক করতেই মার্গারিতা ওলসেন এসে খুলে দিল দরজা। মেয়েটাকে দেখে ওর মতোই নার্ভাস বলে মনে হচ্ছে। উপহার দুটো নিয়ে ধন্যবাদ জানাল শ্যাডোকে। টেলিভিশনে 'ওজের জাদুকর' দেখাচ্ছে। ডরোথি এখনও ক্যানসাসে, বসে আছে প্রফেসর মার্ভেলের ওয়্যাগনে। বুড়ো প্রতারক মেয়েটার মন পড়ার ভান ধরছে। শান্ত হয়ে বসে আছে ডরোথি, অতি-সত্বর যে একটা ঝড় আসছে সে ব্যাপারে অজ্ঞ। লিওন বসে আছে পর্দার সামনে, একটা খেলনা ফায়ার-ট্রাক নিয়ে খেলছে। শ্যাডোকে দেখে হাসিতে ভরে উঠল ওর চেহারা, দৌড়ে শোবার ঘরে চলে গেল ও। এক মুহূর্ত পর একটা কোয়ার্টার হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো।

'দেখ, মাইক আইনসেল!' চিৎকার করে দুই হাত বন্ধ করল সে, এমনভান করল যেন পয়সাটাকে ডান হাতে নিয়েছে। এরপর খুলে বলল, 'দেখ, পয়সা নেই! মাইক আইনসেল, দেখ!'

'খুব ভালো,' বলল শ্যাডো। 'খাওয়া শেষ হলে যদি আম্মু অনুমতি দেয়, তাহলে আরও সহজে কীভাবে কাজটা করা যায় তা দেখাব।'

'চাইলে এখনও দেখাতে পারো।' বলল মার্গারিতা। 'আমরা সামান্থার জন্য অপেক্ষা করছি। টক-দই আনার জন্য বাইরে পাঠিয়েছি ওকে। কখন আসবে, কে জানে?'

যেন ওর কথা শুনতে পেয়েই, কাঠের ডেকে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কাঁধের ধাক্কায় দরজা খুলল কেউ একজন। প্রথম দেখায় চিনতে মেয়েটাকে পারল না শ্যাডো। কিন্তু মেয়েটা যখন বলল, 'কোন ধরনের আর কোন স্বাদের দই চেয়েছিলে সেটা বুঝতে পারিনি বলে নিজের মত করে একটা নিয়ে এসেছি।' ঠিক সেই মুহূর্তে মেয়েটাকে চিনতে পারল ও, কায়রো যাবার পথে একেই লিফট দিয়েছিল গাড়িতে।

'অসুবিধা নেই,' বলল মার্গারিতা। 'স্যাম, আমার প্রতিবেশীর সাথে পরিচিত হও, ইনি মাইক আইনসেল। আর মাইক, এ সামান্থা ব্ল্যাক ক্রো, আমার বোন।'

আমি তোমাকে চিনি না, মরিয়া হয়ে ভাবল শ্যাডো। তোমার সাথে আমার আগে কখনও দেখা হয়নি। আমরা একে-অন্যের অপরিচিত। একবার কেবল ভেবে ভেবেই তুষারপাত ঘটিয়েছিল ও, তাই চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? হাত বাড়িয়ে বলল, 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

চোখ পিটপিট করে ওর দিকে তাকাল মেয়েটা। এক মুহূর্ত বিভ্রান্তির পর, পরিচিতির আবহ খেলে গেল ওর চোখে, মুখে হালকা হাসি নিয়ে বলল, 'হ্যালো।'

'খাবার তৈরি কিনা দেখে আসি,' বলল মার্গারিতা।

কোট-হ্যাট খুলে ফেলল স্যাম। 'তুমিই তাহলে সেই রহস্যময় প্রতিবেশী? কে ভেবেছিল।' নিচু গলায় বলল ও।

'আর তুমি হচ্ছে,' উত্তরে বলল শ্যাডো। 'মেয়ে-স্যাম। আমরা কি এসব নিয়ে পরে কথা বলতে পারি?'

'কী হচ্ছে এখানে, তা যদি জানাও তো আমার আপত্তি নেই।'

'জানবে।'

শ্যাডোর প্যান্ট ধরে টান দিল লিওন। 'এখন দেখাবে?' কোয়ার্টারটা তুলে ধরে জানতে চাইল বাচ্চাটা।

'ঠিক আছে,' বলল শ্যাডো। 'তবে মনে রাখবে, জাদুকর কিন্তু ওর জাদুর রহস্য আর কাউকে বলে না। তুমিও বলতে পারবে না।'

'করলাম প্রতিজ্ঞা।' আর তর সইছে না লিওনের।

পয়সাটা বাঁ হাতে নিল শ্যাডো, এরপর লিওনের ডান হাত নাড়াল। কীভাবে পয়সাটাকে জায়গামতো রেখে হাত পরিবর্তন করার ভান করা যায়, শেখাল তাই। এরপর কয়েকবার লিওনকে দিয়ে পুনরাবৃত্তি করালো।

বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর, সফল হলো ছেলেটা। 'অর্ধেক শিখলে,' বলল শ্যাডো। 'বাকি অর্ধেক বলি এখন। পয়সাটা কোথায় থাকা উচিৎ, সেদিকে মনোযোগ দেবে এরপর। যেখানে থাকা উচিৎ, সেখানে আছে বলে মনে করবে। যদি এমনভান করো যে পয়সাটা তোমার ডান হাতে, তাহলে কেউ তোমার বাঁ হাতের দিকে ভুলেও তাকাবে না।'

এক দিকে মাথা কাত করে সব দেখল স্যাম, বলল না কিছু।

'খাবার তৈরি!' রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া-ওঠা স্প্যাগেটির বাটি নিয়ে বেরোতে বেরোতে বলল মার্গারিতা। 'লিওন, হাত ধুয়ে এসো যাও।'

গার্লিক ব্রেড, ঘন সস আর রসালো মিটবলও ছিল টেবিলে। খেতে খে' প্রশংসা করল শ্যাডো।

'পারিবারিক রেসিপি। পরিবারের কর্সিকান দিকটা থেকে পেয়েছি।'

'আমি তো জানতাম, তোমরা নেটিভ আমেরিকান।'

'বাবা চেরোকি,' বলল স্যাম। 'ম্যাগসের নানা কর্সিকা থেকে এসেছে। ম্যাগসের বয়স যখন দশ, তখন ওর মাকে পরিত্যাগ করে বাবা। এর ছয় মাস পর আমি জন্মাই। ডিভোর্সটা আনুষ্ঠানিক মর্যাদা পেলে বিয়ে করে আমার বাবা-মা। আমার বয়স যখন দশ, তখন সে আমাদেরকেও ছেড়ে চলে যায়। এখন তো মনে হচ্ছে, বাবার দশ বছরের বেশি মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষমতা নেই।'

'ওকলাহোমায় আছে এখন, তা-ও দশ বছর হয়ে গিয়েছে মনে হয়।' বলল মার্গারিতা।

'আমার নানা পরিবার ইহুদী, ইউরোপ থেকে আগত।' বলে চলছে স্যাম। 'দেশটা সম্ভবত আগে কমিউনিস্ট ছিল, এখন সেখানে অরাজকতা। আমার ধারণা, চেরোকির বউ হবার খুব ইচ্ছা ছিল আমার মার।' ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিল সে।

'স্যামের মা অন্যরকম মহিলা। কিছুটা অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়।' মার্গারিতার কণ্ঠে বিরাগ।

'এখন কোথায় আছে, জানো?' জিজ্ঞাসা করল স্যাম। মাথা নাড়ল শ্যাডো। 'অস্ট্রেলিয়ায়। ইন্টারনেটে এক পুরুষের সাথে পরিচয় হয়েছে, হোবার্টে থাকে। সামনা সামনি যখন প্রথম দেখা হলো, তখন লোকটাকে কেমন কেমন মনে হয়েছিল মার। কিন্তু তাসমানিয়াতে থাকার আগ্রহ পেয়ে বসেছিল ওকে। তাই এখন ওখানেই বাস করছে। বাটিকের জামা না কী সব শেখাচ্ছে ওখানকার মেয়েদের। তা-ও আবার এই বয়সে! দারুণ না?'

আসলেই দারুণ, একমত হলো শ্যাডো। প্লেটে তুলে নিল আরও কিছু মিটবল। তাসমানিয়ার আদি নিবাসীদেরকে যে ব্রিটিশরা বিলুপ্ত করে দিয়েছে, সেটা ওদেরকে জানাল স্যার। শেষের দিকে এসে সবাই মিলে ঘিরে ধরেছিল জায়গাটা, কিন্তু পেয়েছিল কেবল এক বৃদ্ধ আর এক অসুস্থ ছেলেকে। তাসমানিয়ার ব্যাপারে আরও অনেক কিছু বলল ও-কিভাবে ওখানকার কৃষকেরা থাইলাসিনস, মানে তাসমানিয়ান বাঘকে দেখা মাত্র খুন করত! ১৯৩০ সালের দিকে যখন রাজনীতিবিদরা থালাসিনসদের বাঁচাবার জন্য পদক্ষেপ নিলেন, ততদিনে ওগুলো বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বলতে বলতে দুই গ্লাস ওয়াইন শেষ করে ফেলেছে স্যাম, এবার তিন নাম্বার গ্লাসে চুমুক দিল।

'তা, মাইক,' আচমকা বলল স্যাম, লজ্জায় গাল লাল হয়ে গিয়েছে। 'তোমার পরিবারের সম্পর্কে কিছু বলো। আইনসেলরা কেমন?' মুখে দুষ্টামির হাসি দেখে গেল তার।

'আমরা পরিবার হিসেবে বিরক্তিকর।' বলল শ্যাডো। 'আমাদের কেউ এখন পর্যন্ত তাসমানিয়ায় যায়নি। তুমি ম্যাডিসনের স্কুলে পড়? জায়গাটা কেমন?'

'আলাদা কিছু না। ইতিহাস পড়ছি আর তামা দিয়ে টুকি-টাকি জিনিস বানানো শিখছি।'

'আমি বড় হলে,' বলল লিওন। 'জাদু নিয়ে পড়ব। পুফ। আমাকে শেখাবে, মাইক আইনসেল?'

'অবশ্যই, তবে তোমার আম্মুর অনুমতি লাগবে।'

'ম্যাগস,' আচমকা মুখ খুলল স্যাম। 'খাওয়া শেষে মাইককে নিয়ে একটু বারে যাব। এই ঘণ্টা দুয়েক থাকব বড়জোর।'

কেবল শ্রাগ করল মার্গারিতা, সেই সাথে একটা ভ্রূ উপরে উঠল একটু।

'আমার কাছে ওকে রহস্যময় মনে হচ্ছে।' বলল স্যাম। 'কিছু কথা বলতে চাই।'

শ্যাডোর দিকে তাকাল মার্গারিতা, ও তখন চিবুক থেকে কাল্পনিক সস মোছার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। 'তোমরা দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক,' এমনভঙ্গিতে বলল মেয়েটা যেন তা না হলেই সে খুশি হত।

ডিনার শেষে থালা-বাসন ধোয়ার কাজে স্যামকে সাহায্য করল শ্যাডো। এরপর লিওনকে শেখাল পয়সার একটা খেলা। অবাক হয়ে খেলা দেখল বাচ্চাটা। তারপর মাকে জিজ্ঞাসা করতে থাকল, 'কাজটা করল কীভাবে, মামা? কীভাবে করল?'

শ্যাডোর দিকে ওর কোট বাড়িয়ে ধরল স্যাম। 'চলো, যাই।' তিন গ্লাস ওয়াইনের প্রভাবে মেয়েটার গাল লাল হয়ে গিয়েছে।

বেশ ঠান্ডা বাইরে।

বেরোবার আগে ঘরের ভেতর থেকে দ্য মিনিটস অফ দ্য লেকসাইড সিটি কাউন্সিলের বইটা নিয়ে এলো শ্যাডো। হিনজেলমান বারে থাকলেও থাকতে পারেন, বৃদ্ধকে তার দাদার ব্যাপারে লেখাটা দেখাতে চায় ও।

পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল দুজন।

গ্যারেজের দরজা খুলল যুবক, সাথে সাথে হাসিতে ফেটে পড়ল স্যাম। 'হায়, ঈশ্বর!' ফোররানারটাকে দেখা মাত্র বলল সে। 'পল গুন্থারের গাড়ি। তুমি পলের গাড়ি কিনেছ!'

গাড়ির দরজা খুলে ধরল শ্যাডো, এরপর ড্রাইভারের সিটে বসে বলল, 'গাড়িটা পরিচিত নাকি?'

'বছর দুয়েক আগে ম্যাগসের সাথে থাকতে এসেছিলাম, তখন আমার জোরাজুরিতেই গাড়িটাকে বেগুনি রঙ করা হয়।'

'ভালো,' বলল শ্যাডো। 'দোষ দেবার জন্য একজনকে পাওয়া গেল।'

রাস্তায় গাড়িটা নামাল শ্যাডো, এরপর উঠে দাঁড়িয়ে বন্ধ করল গ্যারেজের দরজা। যখন আবার ফিরে এলো, তখন স্যামের চোখে অদ্ভুত একটা দৃষ্টি দেখতে পেল ও। মেয়েটার আত্মবিশ্বাসের ফানুসে যেন ছিদ্র হয়েছে, আস্তে আস্তে চুপসে যাচ্ছে সে। কিছুক্ষণের চেষ্টায় নিজেকে ধাতস্থ করে নিয়ে জানতে চাইল। 'কাজটা একেবারে বোকার মতো হয়ে যাচ্ছে, তাই না? এক বদ্ধ উন্মাদ, খুনির সাথে গাড়িতে উঠে বসেছি!'

'গতবার কিন্তু নিরাপদেই বাড়িতে ফিরেছিলে।'

'দুইজন মানুষকে খুন করেছ তুমি,' বলল স্যাম। 'এফ.বি.আই. তোমাকে খুঁজছে। ছদ্মনাম নিয়ে আমারই বোনের পাশের অ্যাপার্টমেন্টে আস্তানা গেঁড়েছ! নাকি মাইক আইনসেল তোমার আসল নাম?'

'না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল শ্যাডো। 'আমার আসল নাম না।' অস্বস্তিবোধ হলো কথা বলতে, মনে হলো মাইক আইনসেলকে অস্বীকার করা মানে নিজেকেই অস্বীকার করা।

'তুমি ওই দুজনকে খুন করেছ?'

'না।'

'আমার বাড়িতে এসেছিল লোকগুলো, বলল যে আমাদেরকে একসাথে দেখে গিয়েছে। তোমার একটা ছবিও দেখিয়েছিল আমাকে। কী যেন নাম ছিল লোকটার...মি. হ্যাট? নাহ, মিস্টার টাউন। ঠিক যেন দ্য ফিউজিটিভ ছবির স্ক্রিপ্ট। কিন্তু আমি বলেছি, তোমাকে চিনি না।'

'ধন্যবাদ।'

'তাহলে সবকিছু খুলে বলো। তুমি আমার কথা গোপন রাখলে, আমিও তোমার কথা গোপন রাখব।'

'আমি তো তোমার কোন গোপন কথা জানি না।' বলল শ্যাডো।

'তুমি তো জানো যে আমার কথা শুনেই গাড়িটার এই হাল হয়েছে। ফলশ্রুতিতে পল গুন্থারকে আশেপাশের কয়েক কাউন্টির হাস্যাস্পদে পরিণত হতে হয়েছে। বাধ্য হয়ে শহর ছেড়েই চলে গিয়েছে বেচারা। আসলে আমরা মাতাল ছিলাম তখন।'

'আমার মনে হয় না ব্যাপারটা খুব একটা গোপন আছে,' বলল শ্যাডো। 'মাতাল না হলে কেউ নিজের গাড়ির গায়ে এই রকম বেগুনি রঙ চড়ায় না।'

নিচু কিন্তু দ্রুত কণ্ঠে বলে উঠল স্যাম। 'যদি আমাকে খুন করতেই চাও, তাহলে দয়া করে ব্যথা দিও না। আমার আসলে তোমার সাথে আসা উচিৎ হয়নি। বোকা, একেবারে হদ্দ বোকা আমি। চাইলেই তোমাকে ধরিয়ে দিতে পারি! হায় যীশু!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল শ্যাডো। 'আমি এই জীবনে কখনও কাউকে খুন করিনি। তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি বারে,' বলল ও। 'সেখানে কয়েকটা বিয়ার খাব। যদি কথা দাও পুলিশকে বলবে না, তাহলে খুশি মনে ফিরিয়ে নিয়ে যাব বাড়িতে। আর নইলে অখুশি মনে। তবে বাড়ি তুমি ফিরবে।'

ব্রিজ পার হবার সময় নীরব রইল দুজনেই।

'তাহলে কে খুন করেছে লোকগুলোকে?' জানতে চাইল স্যাম।

'বলতে পারি, কিন্তু বিশ্বাস করবে না।'

'করব,' রাগান্বিত মনে হলো মেয়েটাকে। ওয়াইন আনাটা ঠিক হয়নি বলেই এখন মনে হচ্ছে শ্যাডোর।

'বিশ্বাস না করলেও দোষ দেব না।'

'আমি,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল স্যাম। 'যেকোন কিছু বিশ্বাস করতে পারি। তোমার কোন ধারণাই নেই।'

'তাই?'

'আমি বিশ্বাস করতে পারি সত্যকে; আবার যেগুলো বানানো, সেগুলো বিশ্বাস করতেও আমার আপত্তি নেই। যেসব সত্য না মিথ্যা তা কেউ জানে না, ওগুলোকেও বিশ্বাস করি। সান্তা ক্লজ, ইস্টার বানি, মেরিলিন মনরো, দ্য বিটলস, এলভিস-সবার উপরেই বিশ্বাস আছে আমার। আমার বিশ্বাস, মানুষকে নিখুঁত করা সম্ভব, জ্ঞানের কোন সীমা নেই, দুনিয়া পরিচালনা করে গোপন কিছু সংঘ, মাঝে মাঝে ভিনগ্রহের অধিবাসীরা আসে আমাদের এখানে। ওদের মাঝে যারা ভালো, তারা লেমুরের মতো দেখতে। আর যারা খারাপ, তারা আমাদের পশুপালকে হত্যা করে, আমাদের পানি আর মেয়েমানুষকে ধরে নিয়ে যেতে চায়। আমার বিশ্বাস ভবিষ্যৎ অন্ধকার, আমার বিশ্বাস ভবিষ্যৎ চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল। আমি বিশ্বাস করি, একদিন সাদা মহিষ-মানবী ফিরে এসে সবাইকে শায়েস্তা করবে। ছেলেদেরকে যদি কেবল আকারে বড় হওয়া বাচ্চা বলো-তাও আমি বিশ্বাস করব। বিশ্বাস করব যদি বলো রাজনীতিবিদরা নীতি-বিহীন চোর ছাড়া আর কিছুই না। আবার এ-ও বিশ্বাস করব যে ওদেরকে সরালে যারা আসবে, তারা আরও খারাপ। আমি বিশ্বাস করি শেষ বন্যাটা যখন শুরু হবে, তখন ক্যালিফোর্নিয়া ডুবে যাবে পানির তলে। তখন ফ্লোরিডার উপর ভর করবে পাগলামি আর ওটার রাস্তায় রাস্তায় দেখা যাবে অ্যালিগেটর আর বিষাক্ত আবর্জনা। আমার বিশ্বাস, অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল সাবান আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে, তাই একদিন সাধারণ ঠান্ডা লেগেই সবাই মারা যাব-যেমনটা মারা গিয়েছিল ওয়ার অফ দ্য ওয়ার্ল্ডসের ভিনগ্রহের প্রানিরা। আমি বিশ্বাস করি, গত শতাব্দীর সেরা কবি হলেন এডিথ সিটওয়েল আর ডন মার্কুই। জেড পাথর যে আসলে ড্রাগনের জমাট বাঁধা বীর্য, সেটা বিশ্বাস করতে আমার কোন আপত্তি নেই। কেউ যদি বলে, হাজার বছর আগের কোন এক পূর্ব জীবনে আমি ছিলাম একহাতি একজন সাইবেরিয়ান শামান, তাহলে সেটা মেনে নিতে আমার কোন বাঁধা নেই। মানবজাতির ভবিষ্যৎ তারকালোকে-এ কথা আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি, ছোটবেলায় ক্যান্ডির স্বাদ অনেক বেশি ভালো লাগত। আলো একই সাথে তরঙ্গ আর কণা...বিশ্বাস করি। কোথাও কোন একটা বাক্সে একটা বিড়াল একই সাথে জীবিত আর মৃত...বিশ্বাস করি (তবে যদি অতিসত্বর কেউ বেচারাকে খেতে না দেয়, তাহলে দুইভাবেই বেচারা মৃত হবে কিন্তু)।

আমার বিশ্বাস, ব্যক্তিগত এক ঈশ্বর আছে আমার, যে শুধু আমাকে নিয়েই ভাবে আর আমার ভালাই দেখে। আবার এমন এক বৈশ্বিক ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি, যে মহাবিশ্ব বানিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছে। আমি যে আছি, সেটাই হয়তো খেয়াল নেই তার। আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর-বিহীন এক বিশ্বে, যেখানে রাজত্ব কেবল বিশৃঙ্খলার। বাকি সব কিছু যেখানে মৌমাছির গুঞ্জনের মতো তুচ্ছ। আমি বিশ্বাস করি পরম সততায় আর ক্ষতিহীন মিথ্যায়। আমি বিশ্বাস করি, মেয়েদের নিজের মতো করে বেছে নেবার অধিকার আছে, বাচ্চার আছে বাঁচার অধিকার। মানব জীবনের চাইতে দামি কিছু হয় না, তবে কর্তৃপক্ষের উপর ভরসা রাখতে পারলে দরকার আছে মৃত্যুদণ্ডেরও। তবে আমার বিশ্বাস, বোকার হদ্দও সেই ভরসা করতে পারে না। বিশ্বাস করি, জীবন আসলে এক খেলা; বিশ্বাস করি, জীবন একটা জঘন্য ঠাট্টা; বিশ্বাস করি, জীবনকে উপভোগ করাই জীবনের মূলমন্ত্র।' অবশেষে থামল মেয়েটা, দম ফুরিয়ে গিয়েছে।

আরেকটু হলেই হাততালি দেবার জন্য স্টিয়ারিং হুইল থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছিল শ্যাডো। বদলে বলল, 'ঠিক আছে। তাহলে আশা করি পুরোটা শুনেও আমাকে উন্মাদ ভাববে না।'

'আগে বলো তো।'

'যদি বলি, দুনিয়াতে আমরা যত দেবতাকে কল্পনা করেছি তাদের সবার অস্তিত্ব আছে, তাহলে বিশ্বাস করবে?'

'...হয়তো।'

'সেই সাথে যোগ দিয়েছে নতুন কিছু দেবতা-কম্পিউটার আর টেলিফোনের দেবতা টাইপ। এদের ধারণা, এক বনে দুই বাঘ থাকা মানায় না। তাই সামনে যুদ্ধ আসছে।'

'এই দেবতারা ওই দুজনকে খুন করেছে?'

'নাহ, আমার স্ত্রী করেছে।'

'তুমি না বললে যে তোমার স্ত্রী মৃত!'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে কি মারা যাবার আগে খুন করেছে?'

'নাহ, পরে। বিস্তারিত জানতে চেও না।'

হাত তুলে কপালের উপর থেকে চুল সরাল স্যাম।

মেইন স্ট্রিটে উঠে এলো ওরা, কিছুক্ষণের মাঝে পৌঁছে গেল বারে। গাড়ি থেকে নামল দুজনেই।

'যুদ্ধ হবে কেন?' জানতে চাইল স্যাম। 'অহেতুক মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা? যুদ্ধে জিতে কার কী লাভ হবে?'

'আমি জানি না।' বলল শ্যাডো।

'দেবতাদের উপর বিশ্বাস রাখার চাইতে ভিনগ্রহ বাসীদের উপর বিশ্বাস রাখা সহজ। হয়তো মিস্টার টাউন আর মিস্টার ছাতা-মাতা-কিছু একটা আসলে ভিনগ্রহ বাসী!'

বারের ঠিক সামনের ফুটপাতে এসে থমকে দাঁড়াল স্যাম। শ্যাডোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেবল এতটুকু বলো যে তুমি ভালোদের পক্ষে।'

'পারলে বলতাম,' বলল শ্যাডো। 'কিন্তু তা সম্ভব না। তবে আমি চেষ্টা করছি।'

ওর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল স্যাম। 'চলবে, তোমাকে ধরিয়ে দেব না আমি। তবে বিনিময়ে আমাকে বিয়ার কিনে দিতে হবে।'

বারের দরজা খুলে ধরল শ্যাডো, সাথে সাথে গরম আর সুরের একটা ধমকা হাওয়া যেন ধাক্কা দিল ওকে। ভেতরে পা রাখল দুজন।

পরিচিত মুখ দেখে নড করল শ্যাডো, স্যাম নাড়ল কয়েকজন বন্ধুকে উদ্দেশ করে। বারকীপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে চ্যাড মুলিগান, হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে লাল-চুলো এক মেয়ের কাঁধ। এই মহিলার কথাই বলেছিল, বুঝতে পারল ও। মেয়েটার চেহারা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না, ওর দিকে পিঠ দিয়ে আছে। তবে চ্যাড দেখতে পেল শ্যাডোকে, স্যালুট ঠুকল একটা। মুচকি হাসল সে, হাত নাড়ল চীফের দিকে। হিনজেলমানের খোঁজে চারপাশে তাকাল শ্যাডো, কিন্তু পেল না লোকটাকে। পেছন দিয়ে একটা ফাঁকা টেবিল দেখে সেদিকে রওনা দিল।

ঠিক মুহূর্তেই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল কেউ একজন।

চিৎকার গা শিহরানো, নিজের চোখে কোন ভূত দেখলেই কেবল এমন চিৎকার করতে পারে কেউ। চুপ হয়ে গেল সবাই। ঘুরে দাঁড়াল শ্যাডো, কেউ খুন হয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু উপলব্ধি করতে পারল, সবাই এক দৃষ্টিতে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। এমনকি জানালার পাশে দিনের বেলায় যে বিড়ালটা ঘুমিয়ে থাকে, সেটাও দাঁড়িয়ে পড়েছে...তাকিয়ে আছে ওরই দিকে।

সময় যেন স্তব্ধ হয়ে গেল।

'ওকে ধরো!' হিস্টিরিয়াগ্রস্ত এক মহিলা কণ্ঠ বলে উঠল। 'ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বলছি, কেউ ওকে ধরো! পালাতে দিও না! প্লিয!' কণ্ঠটা পরিচিত মনে হলো তার।

এক বিন্দু নড়ল না কেউ, কেবল তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। নড়ল না শ্যাডোও।

লোকজন সরিয়ে সামনে এগিয়ে এলো চ্যাড মুলিগান, মেয়েটা তার পেছনেই। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে আছে, যেকোন মুহূর্তে আবার চিৎকার করতে শুরু করবে। একে চেনে শ্যাডো। খুব ভালো করেই চেনে।

হাতে বিয়ারের বোতল ধরে আছে চ্যাড, সেটা একটা টেবিলের উপর রেখে দিল। 'মাইক।'

'চ্যাড।'

অড্রি বার্টন আঁকড়ে ধরল চ্যাডের শার্টের হাতা। মেয়েটার চেহারা সাদা হয়ে গিয়েছে, চোখে দেখা যাচ্ছে অশ্রু। 'শ্যাডো,' বলল সে। 'হারামজাদা, খুনি!'

'একে চেন তুমি?' জানতে চাইল চ্যাড, অস্বস্তি খেলা করছে ওর চোখে-মুখে।

মুখ খুলল অড্রি বার্টন। 'চিনি মানে! রবির হয়ে অনেকদিন কাজ করেছে এ। ওর ছিনাল স্ত্রী আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিল। শ্যাডো জেল খাটা কয়েদি, খুনের অভিযোগ কর্তৃপক্ষ ওকে খুঁজছে।' কেঁপে কেঁপে উঠছে মেয়েটার গলা, জোর করে যেন হিস্টিরিয়াকে আটকে রাখছে সে। কিন্তু কান্নার ফাঁকে ফাঁকে ঠিক বলছে কথা।

বারের কেউ একটা শব্দও উচ্চারণ করছে না। চ্যাড মুলিগান চোখ তুলে শ্যাডোর দিকে তাকাল। 'তোমার ভুল হচ্ছে সম্ভবত। সমস্যা নেই, ঝামেলা মিটে যাবে আশা করি।' বারের দিকে তাকাল ও। 'সব ঠিক আছে, চিন্তা করার মতো কিছু নেই।' এরপর শ্যাডোর দিকে ফিরল সে। 'বাইরে চলো, মাইক।' লোকটার পেশাদারিত্বে মুগ্ধ না হয়ে পারল না ও।

'অবশ্যই।'

ঘুরে দাঁড়াতে যাবে, এমন সময় হাতে নরম একটা স্পর্শ পেল শ্যাডো। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে, স্যাম ওর দিকে তাকিয়ে আছে। নির্ভরতার হাসি হেসে মেয়েটাকে শান্ত করার প্রয়াস পেল সে।

শ্যাডোর দিকে একবার তাকাল মেয়েটা, তারপর তাকাল উপস্থিত সবার দিকে। সবার মনোযোগ ওদের দিকেই। অড্রি বার্টনকে উদ্দেশ করে বলল সে। 'তুমি কে, তা আমি জানি না। তবে বলি, তুমি একটা হারামজাদী।' আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে, শ্যাডোকে নিজের দিকে টেনে আনল সে। এরপর চুমু খেলে প্রচণ্ড তীব্রতায়। শ্যাডোর মনে হলো, কয়েক মিনিট ধরে চুমু খাচ্ছে যেন। তবে প্রকৃতপক্ষে সময়টা পাঁচ সেকেন্ড হলেও অবাক হবার কিছু নেই।

বেশ অদ্ভুত ছিল চুমুটা। ঠোঁটে ঠোঁট লাগানো চুমু কেবল, তবে ওটার উদ্দেশ্য শ্যাডোর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন নয়। বারের অন্যান্যদের বোঝাবার জন্য ছিল চুমুটা-স্যাম তার পক্ষ বেছে নিয়েছে। মেয়েটা যে ওকে ভালোবাসে না, সেটা পরিষ্কার।

তবে অনেক অনেক আগে, একটা গল্প পড়েছিল শ্যাডো। তখন একদম বাচ্চা ছিল ওঃ গল্পটা এক অভিযাত্রীর। বেচারা পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়ে গিয়েছে। উপরে ওর জন্য অপেক্ষা করছে নরখেকো বাঘ, নিচে অতল খাদ। পড়তে পড়তে কোনক্রমে পাহাড়ের খাঁজ আঁকড়ে ধরে নিজেকে সামলাল লোকটা। পাশেই ঝুলছে স্ট্রবেরি, উপরে মৃত্যু। মৃত্যু নিচেও। কী করা উচিৎ এখন লোকটার? এখন প্রশ্ন সেটাই।

উত্তরটা হলোঃ স্ট্রবেরি খাওয়া।

ছোটবেলায় গল্পটার অর্থ বুঝতে কষ্ট হয়েছিল শ্যাডোর, কিন্তু এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে। তাই চোখ বন্ধ করে চুমুর মাঝে ডুবিয়ে দিল নিজেকে। বুনো স্ট্রবেরির স্বাদ নিচ্ছে যেন।

'চলো, মাইক।' জোরাল কণ্ঠে বলল চ্যাড মুলিগান। 'চলো, বাইরে যাই।'

পিছিয়ে এলো স্যাম, জিহ্বা দিয়ে চাটল ঠোঁট। হাসল একটু, হাসিটা আরেকটু হলেই যেন চোখে পৌঁছাত। 'খারাপ না,' বলল সে। 'ছেলে হিসেবে একদম মন্দ নয়। যাও, বাইরে খেলতে যাও।' বলে অড্রি বার্টনের দিকে তাকাল সে। 'তবে তুমি হারামজাদী, হারামজাদীই আছ।'

স্যামের দিকে চাবি ছুঁড়ে দিল শ্যাডো, একহাতে লুফে নিল মেয়েটা। বারের দরজা দিয়ে বাইরে বেরোল সে, পিছু পিছু বেরোল চ্যাড মুলিগান। হালকা তুষারপাত শুরু হয়েছে। 'কিছু বলবে?' জানতে চাইল চ্যাড।

অড্রিও ওদের পেছন পেছন বাইরে এসেছে। ওকে দেখা মনে হচ্ছে যেন আবার চিৎকার করতে শুরু করবে। বলল, 'ওই লোকটা দুজন মানুষকে খুন করেছে, চ্যাড। এফ.বি.আই. ওর খোঁজে আমার বাড়িতে এসেছিল। লোকটা উন্মাদ। চাইলে তোমার সাথে স্টেশনে আসতে পারি।'

'তুমি যথেষ্ট ঝামেলা করেছ, ম্যাম।' বলল শ্যাডো, নিজের কাছেই কণ্ঠটা ক্লান্ত বলে মনে হলো। 'দয়া করে এবার বিদায় হও।'

'চ্যাড, শুনেছ? আমাকে হুমকি দিয়েছে!' বলল অড্রি।

'ভেতরে যাও, অড্রি।' বলল চ্যাড। মনে হচ্ছিল, মেয়েটা বোধহয় তর্ক করবে। কিন্তু না, নিজেকে সামলে নিয়ে বারের ভেতরে ছিলে গেল সে।

'এবার কিছু বলবে?' জানতে চাইল চ্যাড।

'আমি কাউকে খুন করিনি।'

নড করল চ্যাড। 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।' বলল সে। 'আশা করি এইসব অভিযোগ ধোপে টিকবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি কি কোন ঝামেলা করবে, মাইক?'

'একদম না।' বলল শ্যাডো। 'ভুল হচ্ছে কোথাও।'

'ঠিক,' বলল চ্যাড। 'তাহলে চলো, অফিসে গিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলি।'

'আমাকে কি গ্রেফতার করা হয়েছে?' জানতে চাইল সে।

'না,' উত্তর দিল চীফ। 'তুমি ঝামেলা না করলে গ্রেফতার করার কোন কারণও নেই।'

শ্যাডোর দেহে হাত বুলালো চ্যাড, কোন অস্ত্র পেল না। এগিয়ে গিয়ে মুলিগানের গাড়ি বসল ওর দুজন। পেছনের সিটে বসে গরাদের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকাল শ্যাডো। *সাহায্য, এস.ও.এস.*, মুলিগানকে প্রভাবিত করতে চাইল ও; যেমনটা করেছিল শিকাগোর এক পুলিশকে। *তোমার বন্ধু মাইক আইনসেল বসে আছে পেছনে। এই লোকের জান বাঁচিয়েছ তুমি। কেমন বোকার মতো কাজ হয়ে যাচ্ছে না? পুরোটা ভুলে গেলেই ভালো হয়।*

'তোমাকে ওখান থেকে বের করে আনা দরকার ছিল।' বলল চ্যাড। 'কোন বলদ যদি একবার খালি মুখ ফসকে বলে ফেলত যে তুমি অ্যালিসন ম্যাকগভার্নের খুনি, তাহলে আর দেখতে হতো না। লোকজন উত্তেজিত হয়ে হয়তো তোমাকেই ঝুলিয়ে বসল!'

'যুক্তি আছে তোমার কথায়।'

লেকসাইড পুলিশ অফিসে পৌঁছাবার আগে আর কোন বাক্য বিনিময় হলো না ওদের মাঝে। গাড়ি থেকে নামার সময় চ্যাড জানাল, জায়গাটা আসলে কাউন্টি শেরিফের ডিপার্টমেন্টের সম্পত্তি। স্থানীয় পুলিশ কোনরকমে কাজ চালিয়ে নেয়। অতিসত্বর নতুন একটা দালান দেয়া হবে ওদেরকে।

ভেতরে পার রাখল ওরা।

'উকিল ডাকব?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'তোমাকে কোন কিছুর জন্য অভিযুক্ত করা হয়নি।' বলল মুলিগান। 'তাই তোমার ইচ্ছা।' একটা চেয়ার দেখাল সে। 'ওখানে বসো।'

দেখান কাঠের চেয়ারে বসল শ্যাডো। নিজেকে বোকা আর অবশ বলে মনে হচ্ছে। নোটিশ বোর্ডে কয়েকটা ছোট ছোট পোস্টার ঝোলান আছে। 'নিরুদ্দেশ' লেখা আছে উপরে, পোস্টারের ছবিটা অ্যালিস ম্যাকগভার্নের।

কাঠের একটা টেবিলের উপর স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেড আর নিউজউইকের পুরনো কপি পড়ে আছে। আলোও নেই বেশি। দেয়ালটা হলদে রঙ করা, তবে এককালে সেটা সাদা হলেও হতে পারত।

মিনিট দশেক পর, ভেন্ডিং মেশিন থেকে এক কাপ গরম চকলেট এনে দিল চ্যাড। শ্যাডোর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'ব্যাগে কী?' প্রথমে বুঝতে পারল না যুবক প্রশ্নটা। পরে উপলব্ধি করল, এখন হাতে দ্য মিনিটস অফ লেকসাইড সিটি কাউন্সিল বইটা ধরে আছে।

'পুরাতন একটা বই,' উত্তর দিল ও। 'তোমার দাদার ছবিও আছে। পরদাদাও হতে পারে অবশ্য।'

'তাই নাকি!'

টাউন কাউন্সিলের ছবিটা বের করে দেখাল শ্যাডো। মুচকি হাসল চ্যাড।

আস্তে আস্তে পার হতে লাগল সময়, সেকেন্ড পরিণত হলো মিনিটে। মিনিট ঘণ্টায়। দুটো স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেড পড়া শেষ করে নিউজউইক হাতে নিল ও। মাঝে মাঝে এসে চ্যাড দেখে যাছে ওকে, জানতে চাইছে-বাথরুমে যাবার প্রয়োজন আছে কিনা। একবার এসে তো হ্যাম রোল আর পটেটো চিপসও এগিয়ে দিল।

'ধন্যবাদ,' জিনিস দুটো হাতে নিয়ে বলল শ্যাডো। 'গ্রেফতার হয়েছি না হইনি?'

মুখ দিয়ে শ্বাস টানল চ্যাড। 'এখনও না,' বলল সে। 'তবে সম্ভবত তোমার নাম আইনানুগ ভাবে মাইক আইনসেলে পরিবর্তন করা হয়নি। প্রতারণা না করা হলে, ভিন্ন নাম ব্যবহার করা আমাদের এই স্টেটে শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। একটু ধৈর্য ধরো।'

'আমি কি একটা ফোন করতে পারি?'

'লোকাল কল?'

'নাহ, লং-ডিসট্যান্স।'

'তাহলে আমার কলিং কার্ড ব্যবহার কর। নইলে কোয়ার্টার দিতে দিতে ফতুর হয়ে যাবে।'

হুম, তাই করি-ভাবল শ্যাডো। আর তুমি নাম্বারটা জেনে যাও? আমার তো মনে হয়, এক্সটেনশন ব্যবহার করে শুনবেও।

'ভালোই হয় তাহলে,' বলল ও। একটা ফাঁকা অফিস ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো শ্যাডোকে। কায়রো, ইলিনয়ের ফিউনারেল হোমের নাম্বার দিল সে চ্যাডকে। ফোন ডায়াল করে ওর দিকে রিসিভার বাড়িয়ে চীফ বলল, 'আমি বাইরে আছি।'

কয়েকবার রিং বাজার পর ওপাশ থেকে ফোন তোলা হলো। 'জ্যাকুয়েল অ্যান্ড আইবিস থেকে বলছি। কী ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

'হাই, মিস্টার আইবিস। আমি মাইক আইনসেল। কয়েকদিন তোমাদের ওখানে ছিলাম।'

একটু ইতস্তত করার পর জবাব এলো, 'মনে পড়েছে। তা কেমন আছ, মাইক?'

'খুব একটা ভালো না, মিস্টার আইবিস। একটু সমস্যায় আছি। গ্রেফতার হতে যাচ্ছি। আমার চাচাকে দেখলে একটু একটা ম্যাসেজ পৌঁছে দিতে পারবে?'

'অবশ্যই পারব, দাঁড়াও। মাইক, একজন তোমার সাথে কথা বলতে চায়।'

অন্য কেউ ধরল ফোন। এক আকর্ষণীয় মহিলা কণ্ঠ বলল, 'হাই, সোনামণি। তোমাকে মিস করছি।'

কণ্ঠটা আগে কখনও শুনেছে বলে মনে হয় না। কিন্তু একে চেনে ও...অবশ্যই চেনে।

ছেড়ে দাও, এবার শ্যাডোর মনের মাঝে যেন কথা বলে উঠল মেয়েটা। সবকিছু ছেড়ে দাও।

'কাকে চুমু খাচ্ছিলে, প্রিয়? আমাকে ঈর্ষাকাতর বানাতে চাচ্ছ নাকি?'

'মেয়েটা আমার ভালো বন্ধু।' উত্তর দিল শ্যাডো। 'আমার ধারণা, কিছু একটা প্রমাণ করার জন্য আমাকে চুমু খেয়েছিল ও। ভালো কথা, ব্যাপারটা তুমি জানলে কী করে?'

'আমার লোকেরা যেখানে তাকে, সেখানেই আমি থাকি।' বলল মেয়েটা। 'ভালো থেকে, সোনামণি...' এক মুহূর্তের নীরবতার পর আবার মি. আইবিসের কণ্ঠ শোনা গেল। 'মাইক?'

'জি।'

'তোমার চাচাকে খুঁজে পাচ্ছি না, ব্যস্ত মনে হয়। তবে তোমার আন্টি, ন্যান্সির কাছে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। শুভকামনা রইল।' বলে ফোন রেখে দিল লোকটা।

চুপচাপ বসে রইল শ্যাডো, চ্যাডের আগমনের অপেক্ষায়। ফাঁকা অফিসটায় সময় কাটান মুশকিল, মন অন্যদিকে নেবার মতো কিছু পেলে মন্দ হতো না। কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্য মিনিটসটা আবার হাতে তুলে নিল ও। আন্দাজে মাঝখানটা খুলে পড়তে শুরু করল।

ফুটপাত আর সরকারী দালানে থুথু অথবা তামাক ফেলা বন্ধ করার জন্য ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বরে একটা প্রজ্ঞাপন জারি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। লেমি

হাউটালা বয়স সে বছর মাত্র বারো হয়েছিল। 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে উন্মাদনার বশবর্তী হয়ে' বেচারি ১৩ ডিসেম্বর, ১৮৭৬ সালে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। 'সাথে সাথে একটা সার্চ পার্টির আয়োজন করা হলেও, প্রচণ্ড তুষারপাতের জন্য সেই পার্টি খোঁজ চালাতে পারেনি।' তাই সবার সম্মতিক্রমে, কাউন্সিলের পক্ষ থেকে হাউটালা পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

পরবর্তী সপ্তাহে ওলসেনদের স্টেবলে ধরা আগুন কোন ধরনের সমস্যা ও হতাহতের ঘটনা ছাড়াই নিভিয়ে ফেলা সম্ভব হয়।

মন দিয়ে পরবর্তী কয়েক পাতা পড়ল শ্যাডো, কিন্তু তাতে লেমি হাউটালার কোন উল্লেখ খুঁজে পেল না।

অনেকটা অবচেতন মনেই, ১৮৭৭ সালের শীত কালে চলে গেল শ্যাডো। জানুয়ারি মাসে পেয়ে গেল যেটা খুঁজছিল–জেসি লোভাট, বয়স অনুল্লিখিত, 'এক নিগ্রো বাচ্চা', ডিসেম্বর মাসের ২৮ তারিখে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, 'ভ্রাম্যমাণ অভিযাত্রীদের কেউ মেয়েটিকে কিডন্যাপ করেছে।' তবে লোভাট পরিবারের প্রতি সমবেদনা পাঠাবার কোন উল্লেখ দেখা গেল না।

১৮৭৮ সালের মিনিটগুলো দেখছে, এমন সময় চ্যাড মুলিগান নক করে ঘরে প্রবেশ করল। লোকটার চেহারায় কেমন একটা লজ্জা-লজ্জা ভাব, যেন কোন ছোট বাচ্চা বাজে রিপোর্ট কার্ড দেখাতে এসেছে তার অভিভাবককে।

'মিস্টার আইনসেল,' বলল সে। 'মাইক, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমি তোমাকে পছন্দই করি। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, বুঝতে পেরেছ?'

মাথা নাড়ল শ্যাডো, বুঝতে পেরেছে।

'আমার করার কিছু নেই,' বলল চ্যাড। 'পেরোল অমান্য করার জন্য তোমাকে গ্রেফতার করতেই হবে।' বলে শ্যাডোকে ওর অধিকারগুলো জানাল চীফ। এরপর কিছু কাগজপত্র তৈরি করে তাতে শ্যাডোর হাতের ছাপ নিল। এরপর দালানের অন্য পাশে, কাউন্টি জেলের দিকে নিয়ে গেল ওকে।

ঘরটায় এক পাশে একটা লম্বা কাউন্টার আর অনেকগুলো দরজা, অন্য পাশে দুটো হোল্ডিং সেল। একটা সেল কয়েদি আছে, লোকটা সিমেন্টের বিছানায় পাতলা কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমাচ্ছে। অন্যটা খালি।

কাউন্টারের পেছনে ঘুম-ঘুম চোখে বসে আছে বাদামি উর্দি পরিহিত এক মহিলা। এক চোখ দিয়ে ছোট একটা পোর্টেবল টিভিতে জে লেনো দেখছে। চ্যাডের কাছ থেকে কাগজগুলো নিয়ে, তাতে সই করল মহিলা। আরও কিছু কাগজপত্র পূরণ করল চ্যাড, এরপর শ্যাডোর দেহ হাতরিয়ে সব কিছু নিয়ে নিল। ওয়ালেট, পয়সা, অ্যাপার্টমেন্টের দরজা, বই, হাতঘড়ি-কিছুই বাদ গেল না। এরপর ওগুলোকে কাউন্টারে রেখে শ্যাডোর হাতে ধরিয়ে দিল কমলা রঙের পোশাক ভরা একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ। খালি সেলে গিয়ে ওগুলো পরে নিয়ে বলা হলো ওকে, তবে

চাইলে মোজা আর আন্ডারওয়্যার রাখতে পারবে বলেও জানান হলো। কথা মতো কাজ করল শ্যাডো, সেলের ভেতরটা বাজে রকমের দুর্গন্ধে ভরা। কমলা পোশাকটার পেছন দিকে বড় হাতের অক্ষরে লাম্বার কাউন্টি জেল লেখা।

সেলের ধাতব টয়লেটটা কাজ করছে না। একেবারে কোনা পর্যন্ত ওটা তরল মল আর হলদে প্রস্রাবে ভর্তি!

কাপড় পরিবর্তন শেষ হলে, বাইরে বেরিয়ে এলো ও। মহিলার হাতে ওর পরনের স্বাভাবিক পোশাক তুলে দিলে, সে ওগুলোকে আরেকটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে শ্যাডোর অন্যান্য জিনিসপত্রের সাথে তুলে রাখল। ওয়ালেট দেবার আগে অবশ্য একটু দোনোমনো করেছিল যুবক। 'সাবধানে রেখ,' মহিলাকে ওটা দিয়ে বলল সে। 'আমার সারাটা জীবন ওটার ভেতরে।' পাথুরে চেহারায় ওয়ালেটটা নিল মহিলা, জানাল-নিরাপদেই থাকবে সবকিছু। চ্যাডের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, ঠিক বলেছে কিনা। কাগজে মুখ গুঁজে ছিল লোকটা, এবার শ্যাডোর দিকে তাকিয়ে জানাল, ঠিক বলেছে লিয। এখন পর্যন্ত কোন কয়েদির জিনিস-পত্র হারাবার ঘটনা ঘটেনি।

চারটা একশ ডলারের বিল আগেই ওয়ালেট থেকে বের করে হাতের ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছিল। পোশাক পরিবর্তন করার সময় সেটাকে মোজার ভেতর ঢুকিয়ে রেখেছে, সেই সাথে রেখেছে রুপালী লিবার্টি ডলারটাও।

'আচ্ছা,' জানতে চাইল শ্যাডো। 'বইটা শেষ করতে সমস্যা আছে কোন?'

'দুঃখিত, মাইক। নিয়ম তো নিয়মই।'

শ্যাডোর জিনিসপত্রগুলো একটা ব্যাগে ভরে পেছনের ঘরে নিয়ে গেল লিয। চ্যাড জানাল, অফিসার বাউটের দক্ষ হাতে ওকে ছেড়ে দিচ্ছে সে। লিযকে দেখে মনে হলো না যে এই প্রশংসা খুব একটা প্রভাব ফেলেছে ওর উপরে। বিদায় নিল চ্যাড, এর কিছুক্ষণের মাঝেই বেজে উঠল টেলিফোন। লিয, মানে অফিসার বাউট, ফোন ধরল। 'ঠিক আছে,' বলল সে। 'ঠিক আছে। কোন সমস্যা নেই। ঠিক আছে, কোন সমস্যা নেই। ঠিক আছে।' ফোন রেখে দিয়ে মুখ বিকৃত করল সে।

'কোন সমস্যা?'

'হ্যাঁ, না। মানে একটু। মিলওয়াকি থেকে তোমাকে নেবার জন্য লোক আসছে।'

'এতে কোন সমস্যা?'

'তিন ঘণ্টা তোমাকে পাহারা দিয়ে রাখতে হবে এখন।' বলল লিয। 'আর ওই সেলটা,' কয়েদি রাখাটার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ভর্তি। আত্মহত্যা করতে চায় লোকটা। ওর সাথে তোমাকে এক সেলে রাখতে চাই না। কাগজপত্রের ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই।' মাথা নাড়ল সে। 'আর ওটা,' অন্যটা দেখাল ইঙ্গিতে। 'নষ্ট, ভয়াবহ দুর্গন্ধ। তাই না?'

'হ্যাঁ। ঘেন্না লাগে।'

'মানবিকতার খাতিরেই তোমাকে ওখানে রাখা যাবে না। যত তাড়াতাড়ি নতুন ফ্যাসালিটিতে যাওয়া যায়, তত ভালো। তাই ভাবছি, তোমাকে হাতকড়া পরিয়ে এখানেই রেখে দেই। নাকি সেলে যাবে? তোমার ইচ্ছা।'

'হাতকড়া ভালো লাগে না খুব একটা।' বলল শ্যাডো। 'তবে আপাতত মেনে নিয়েই হচ্ছে।'

কোমরের বেল্ট থেকে একজোড়া হাতকড়া বের করে আনল মহিলা, এরপর সেমি-অটোমেটিকটায় আলতো চাপড় বসাল। শ্যাডোর মনে হলো, ওকে দেখানোর জন্যই করল কাজটা। 'হাত পেছনে নাও।'

কাফগুলো একটু বেশিই শক্ত বলে মনে হলো, শ্যাডোর কব্জিগুলো বেশ মোটা। এরপর পায়ে শিকল বেঁধে কাউন্টারের অন্য পাশের বেঞ্চে বসিয়ে দিল। 'কান খুলে শোন,' বলল মহিলা। 'তুমি আমাকে জ্বালিও না, আমিও তোমাকে জ্বালাব না।' টিভিটা একটু বাঁকাল সে, যেন শ্যাডো দেখতে পায়।

'ধন্যবাদ।'

'আমরা নতুন অফিস পেলে,' বলল লিয। 'এসব ঝামেলা আর থাকবে না।'

দ্য টু নাইট শো শেষ হবার পর, চিয়ার্স শুরু হলো। শ্যাডো আগে চিয়ার্সের মাত্র একটা এপিসোড দেখেছে-সেখানে কোচের মেয়ে বেড়াতে এসেছিল বারে। ওই একই এপিসোডটা বেশ কয়েকবার দেখেছে সে। ব্যাপারটা আসলেই অদ্ভুত, ভাবল ও। মানুষ যখন কোন সিরিজের একটা মাত্র এপিসোড দেখে, তখন কেন যেন বারবার ওটার মাত্র একটাই এপিসোড দেখা হয়!

অফিসার লিয বাউট চেয়ারে হেলান দিল। দেখে মনে হয় না যে ঘুমাচ্ছে, তবে জেগে যে নেই তা-ও নিশ্চিত। তাই চিয়ার্সের অভিনেতারা যখন কৌতুক করা বাদ দিয়ে শ্যাডোর দিকে তাকাল, ব্যাপারটা ধরতেই পারল না সে!

ডায়ান, স্বর্ণকেশী যে বারমেইড নিজেকে আঁতেল ভাবে, প্রথম মুখ খুলল। 'শ্যাডো,' বলল সে। 'তোমাকে নিয়ে আমরা দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। আচমকা কোথায় ডুব দিয়েছিলে, বলো তো! যাই হোক, আবার দেখতে পেয়ে প্রীত হলাম। যদিও কমলা রঙ আর হাতকড়া তোমাকে ঠিক মানায় না।'

কিছুই বলল না শ্যাডো।

'চুপ কেন?' বলল ডায়ান। 'তোমাকে খুঁজে পেতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে, জানো?'

মুখ ঘুরিয়ে নিল শ্যাডো। অফিসার লিয আস্তে আস্তে নাক ডাকতে শুরু করেছে। কার্লা, ছোট-খাটো ওয়েট্রেস মহিলা, ক্ষেপে গেল। 'ওই, বেয়াদ্দপ! তোমার প্যান্ট খারাপ করিয়ে দেয়ার জন্য এসেছি আমরা, বুঝেছ? এখন তৈরি হও।'

আচমকা কালো হয়ে গেল পর্দা। বাঁ দিকের নিচের কোনায় 'সরাসরি সম্প্রচার' লেখাটা ফুটে উঠল। সেই সাথে ভেসে এলো অদৃশ্য এক মেয়ের কণ্ঠ। 'এখন দল

পরিবর্তনের সময় শেষ হয়ে যায়নি। অবশ্য চাইলে যে দলে আছ, সে দলেও থাকতে পারো। আমেরিকান হবার অর্থই তো তাই! বিশ্বাসের স্বাধীনতার মাঝে ভুল আদর্শে বিশ্বাসও পরে কিন্তু। ঠিক যেমন বাক-স্বাধীনতার মধ্যে পরে চুপ করে থাকার স্বাধীনতা।'

পর্দায় এখন একটা রাস্তা দেখা যাচ্ছে। নড়তে নড়তে এগোচ্ছে ক্যামেরা, একমাত্র ডকুমেন্টারি ভিডিও করার সময়ই ক্যামেরার এমন কাজ দেখা যায়।

টাক পড়তে শুরু করা মাথা, বাদামি চামড়া আর কিছুটা গর্বিত চেহারা নিয়ে একজন এসে উপস্থিত হলো পর্দায়। একটা দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে, হাতে ধরা আছে প্লাস্টিকের কাপ ভর্তি কফি। সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে লোকটা বলল, 'সন্ত্রাসীরা মুক্তিযোদ্ধা টাইপের গাল-ভরা বুলির পেছনে লুকিয়ে থাকে। তুমি জানো, আমিও জানি-ওরা আসলে খুনি-বেজন্মা ছাড়া আর কিছু না। নিজেদের জীবন ঝুঁকিতে ফেলে আমরা ভবিষ্যতের জন্য লড়ছি।'

কণ্ঠটা চিনতে পারল শ্যাডো, কেননা একদা ও মি. টাউনের মাথার ভেতরে প্রবেশ করেছিল। কণ্ঠটা বাইরে থেকে আরও ভরাট বলে মনে হলো ওর।

ক্যামেরা পেছনে এলে সে দেখতে পেল, মি. টাউন একটা ইট নির্মিত দালানের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। দরজার উপরে চৌকানা করে 'জি' অক্ষরটা লেখা।

'তৈরি।' অদৃশ্য কারও কণ্ঠ ভেসে এলো।

'দেখা যাক, ভেতরের কোন ক্যামেরা কাজ করছে কিনা।' মহিলা কণ্ঠটা বলে উঠল।

পর্দার বাঁ কোনায় এখনও সরাসরি সম্প্রচার লেখা ভাসছে। তবে এখন ওতে দেখা যাচ্ছে একটা ছোট্ট হলের ভেতরের দৃশ্য। ঘরটায় আলো কম। এক পাশে দুজন মানুষ বসে আছে, মুখোমুখি...মাঝখানে একটা টেবিল। ওদের একজনের পিঠ ক্যামেরার দিকে। জুম করল ক্যামেরা, এক মিনিটের জন্য ফোকাসের বাইরে চলে গেল লোক দুটো। তবে ফিরে এলো পরক্ষণেই। ক্যামেরার দিকে মুখ করে থাকা লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল, যেমনটা কোন শিকল পরানো ভালুক হাঁটে। ওয়েনসডেকে চিনতে পারল শ্যাডো। দেখে মনে হচ্ছে যেন ব্যাপারটা তিনি উপভোগই করছেন।

ক্যামেরার দিকে পিঠ দিয়ে থাকা লোকটা বলল, '-আমরা এই অর্থহীন কর্মকাণ্ড বন্ধের একটা সুযোগ দিতে চাচ্ছি। আর কোন রক্তপাত চাই না, চাই না হতাহতের কোন ঘটনা। পারস্পারিক শত্রুতা বন্ধ করে দিতে চাই। এজন্য কিছুটা হলেও ছাড় তো তোমাকেও দিতে হবে।'

ওয়েনসডে হাঁটা বন্ধ করে ঘুরলেন। রাখে তার নাক ফুলে আছে। 'প্রথমত,' বললেন তিনি। 'তোমাকে বুঝতে হবে যে তুমি চাইছ আমি আমাদের সবার হয়ে

কথা বলি। এটা অসম্ভব। আর দ্বিতীয়ত, তোমরা তোমাদের প্রতিজ্ঞা রাখবে-এ নিশ্চয়তা কোথায়?'

অন্য লোকটা মাথা নাড়ল। 'নিজেকে ছোট করে দেখছ তুমি। তোমাদের কোন নেতা নেই, এ কথা মানলাম। কিন্তু তোমার কথাই সবাই শোনে...মানে। আর আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার কথা বলছ? এসব কিছু রেকর্ড করা হচ্ছে, সেই সাথে সরাসরি সম্প্রচারও।' ক্যামেরার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'তোমার অনুসারীদের কেউ কেউ সেটা দেখছে-শুনছে। অন্যরাও দেখবে। ক্যামেরা মিথ্যা বলে না।'

'মিথ্যা? সেটা সবাই বলে।' বললেন ওয়েনসডে।

অন্য লোকটার কণ্ঠ চিনতে পারল শ্যাডো-মিস্টার ওয়ার্ল্ড।

'তোমার বিশ্বাস হয় না,' বললেন মি. ওয়ার্ল্ড। 'যে আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা রাখব?'

'আমার ধারণা, তোমরা ভাঙ্গার জন্যই প্রতিজ্ঞা করো। তবে আমি কথা দিলে কথা রাখি।'

'এটা যে শান্তিচুক্তির জন্য মিটিং,' বলল মি. ওয়ার্ল্ড। 'সেটা ঠিক করেই আমরা এক হয়েছি। তবে বলে রাখি, তোমার শিষ্য কিন্তু আবার আমাদের হাতে এসেছে পড়েছে।'

ঘোঁত করলেন ওয়েনসডে। 'নাহ, পড়েনি।'

'আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করছি। পারস্পারিক শত্রুতাটা কি খুব জরুরী?'

ওয়েনসডেকে অবাক দেখাল। 'আমার ক্ষমতায় যতটুকু কুলায়, ততটুকু দিয়ে...'

টেলিভিশনের পর্দায় দেখা ওয়েনসডের ছবিতে অদ্ভুত কিছু একটা আছে, বুঝতে পারল শ্যাডো। লাল একটা ডট ফুটে উঠেছে তার বাঁ চোখে, নকল ওটা। তিনি নড়া মাত্র লাল ডটটা তার উপস্থিতি পর্দায় জানান দিচ্ছে। তবে ওয়েনসডে নিজে বুঝতে পারছেন বলে মনে হলো না। 'বিশাল একটা দেশ এটা,' বললেন তিনি। মাথা উপরে তুললেন বলে লাল ডটটা তার গালে দেখা গেল, তারপর আবার নকল চোখের উপর স্থির হলো ওটা। 'যথেষ্ট জায়গা আছে-'

'ব্যাং'-শব্দ হলো একটা, সাথে সাথে বিস্ফোরিত হলো ওয়েনসডের মাথা। পেছন দেখে আছড়ে পড়ল তার দেখ।

উঠে দাঁড়াল মি. ওয়ার্ল্ড, এখনও টেলিভিশনের দিকে পিঠ দিয়ে আছে। হেঁটে পর্দার বাইরে চলে গেল সে। 'আবার দেখব আমরা, এবার আস্তে আস্তে।' ওকে জানাল যেন মহিলা কণ্ঠ।

সরাসরি সম্প্রচার এখন পুনঃপ্রচার হয়ে গিয়েছে। আস্তে আস্তে লাল ডটটা ওয়েনসডের কাঁচের চোখের উপর স্থির হলো। আরও একবার তার চেহারার বাঁ দিকটা পরিণত হলো রক্তের মেঘে। পর্দায় স্থির হয়ে রইল সেই দৃশ্যটাই।

'এখন এই দেশ দেবতার নিজের দেশ,' বলল মহিলা কণ্ঠ। 'কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোন দেবতার?'

আরেকটা কণ্ঠ, শ্যাডোর মনে হলো যেটা মি. ওয়ার্ল্ডের, বলল, 'এখন আমরা আবার আমাদের নিয়মিত প্রোগ্রামে ফিরে যাচ্ছি।'

পর্দা দখল করে নিল চিয়ার্সের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা।

আচমকা বেজে উঠল টেলিফোন, অফিসার লিয চমকে উঠে পড়ল। রিসিভার তুলে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ।' এরপর ফোন রেখে দিয়ে শ্যাডোর কাছে এসে বলল, 'তোমাকে সেলে আটকে রাখতে হবে। টয়লেট ব্যবহার করো না। ল্যাফিতি শেরিফের ডিপার্টমেন্ট শীঘ্রই এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।' কাফ আর পায়ের শিকল খুলে সেলের ভেতরে ঢোকাল সে শ্যাডোকে। গন্ধটা আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে এতক্ষণে।

কংক্রিটের বিছানার উপর বসে পড়ল যুবক, মোজা থেকে বের করে আনল লিবার্টি ডলারটা। নিজেকে শান্ত রাখার জন্য শুরু করল অনুশীলন। কিচ্ছু ভাবতে চাইছে না এখন, মাথাকে ব্যস্ত রাখতে চাইছে অন্য চিন্তায়।

আচমকা তীব্রভাবে ওয়েনসডেকে মিস করতে শুরু করেছে ও। লোকটার আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্ব-সব।

হাতের পয়সাটার দিকে তাকাল শ্যাডো। কিছুক্ষণ রুপালী আভা দেখে শক্ত করে চেপে ধরল। ভাবল, যারা যারা বিনা অপরাধে যাবজ্জীবন পায়, তাদের একজন হতে চলেছে ও। অবশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত টিকলে তবেই। মি. ওয়ার্ল্ড আর মি. টাউনের ক্ষমতা যা দেখল, তাতে জেল থেকে ওকে বের করে নিয়ে যেতে খুব একটা কষ্ট হবে না। কে জানে, হয়তো পরবর্তী ফ্যাসিলিটিতে যাবার আগেই দুর্ভাগ্যজনক কোন পরিস্থিতি বরণ করতে হবে ওকে। ক্রসফায়ারও হতে পারে, অসম্ভব কিছুই না।

কিছুক্ষণ পর শ্যাডো উপলব্ধি করতে পারল, অফিস ঘরে মানুষজন নড়াচড়া করতে শুরু করেছে! আসলেই তাই, অফিসার লিয খুলে দিল সদর দরজা। মহিলার অলক্ষ্যে পয়সাটা আবার ঢুকিয়ে রাখল অর মোজার ভেতরে। এদিকে বাদামি উর্দি পরা এক ডেপুটি শেরিফ সদ্য খোলা দরজা দিয়ে প্রবেশ করে অফিসার লিযের দিকে কিছু কাগজ বাড়িয়ে ধরেছে। ওগুলো পড়ে নিয়ে সই করে দিল সে, এলো চ্যাড মুলিগানও। সদ্য আগত লোকটার সাথে কিছু কথা বলে শ্যাডোর সেলের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল।

'তোমাকে নিতে কয়েকজন লোক এসেছে। তোমার সাথে নাকি জাতীয় নিরাপত্তা জড়িত। তাই নাকি?'

'দ্য লেকসাইড নিউজের প্রথম পাতায় খবর হবার যোগ্য ব্যাপারটা।'

ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল চ্যাড। 'ভবঘুরে এক পেরোল অমান্যকারীকে পুলিশ ধরেছে। এতে খবরের কী আছে?'

'তাই নাকি?'

'এদের মতে তো আমাকে তাই বলতে হবে।' এবার সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল শ্যাডো, সেভাবেই হাতকড়া বাঁধল চ্যাড। বাদ গেল না পায়ের শিকলও।

শ্যাডো ভাবল, আমাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে। পাতলা কমলা পোশাক আর হাতকড়া-শিকল সত্ত্বেও পালাবার ঝুঁকি নেব নাকি? নিজের চিন্তার অসারতা নিজেই বুঝতে পেরে ক্ষান্ত দিল।

ওকে অফিসে নিয়ে এলো চ্যাড, লিয এতক্ষণে টিভিটা বন্ধ করে দিয়েছ। কালো চামড়ার ডেপুটি বুঝে নিল শ্যাডোকে। 'বিশালদেহি দেখি!' চ্যাডকে বলল সে, বলতে বলতেই সই করে দিল লিযের দেয়া কাগজে।

একবার শ্যাডোর দিকে, আর আরেকবার ডেপুটির দিকে তাকাল চ্যাড। তারপর নিচু, তবে শ্যাডো শুনতে পাই এমন কণ্ঠে বলল, 'সরাসরি বলি, আমার ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না।'

নড করল ডেপুটি। 'আপনাকে ব্যাপারটা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে, স্যার। আমাদের কাজ শুধু কয়েদি আনা-নেয়া করা।'

মুখ বাঁকাল চ্যাড। শ্যাডোকে বলল, 'যাও বাইরে যাও, গাড়ি বাইরেই আছে।'

দরজা খুলে দিল লিয। 'কয়েদির পোশাক ফিরিয়ে দিতে ভুলো না।' ডেপুটিকে বলল মহিলা। 'আগের যে কয়েদীকে তোমরা নিয়ে গিয়েছিলে, তার পোশাক আর ফেরত পাইনি। আমাদের খরচ হয় তো, নাকি?' গাড়ির কাছে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো শ্যাডোকে। ওটাকে শেরিফ ডিপার্টমেন্টের গাড়ি বলে মনে হলো না ওর। গাড়িটা কালো, টাউন গাড়ি। আরেক ডেপুটি, বয়সের ভারে গোঁফ যার ধূসর বরফ, বাহনটার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। আরাম করে সিগারেট ফুঁকছিল এতক্ষণ, ওদেরকে আসতে দেখে পায়ের নিচে ফেলে নিভিয়ে ফেলল। শ্যাডোর জন্য খুলে দিল পেছনের দরজা।

অদ্ভুত ভঙ্গিমায় নড়ে-চড়ে ভেতরে ঢুকল শ্যাডো, হাতকড়া আর শিকল ঝামেলা করছে। সামনের আর পেছনের সিটের মাঝে কোন গরাদ দেখতে পেল না ও। ভেতরে ঢুকে বসল দুই ডেপুটিও। কালো ডেপুটি চালু করল ইঞ্জিন।

চ্যাড মুলিগান জানালায় নক করল, ড্রাইভারের দিকে একবার তাকিয়ে জানালা নামাল বয়স্ক ডেপুটি। 'ব্যাপারটা কেমন যেন ঠিক মনে হচ্ছে না,' বলল চ্যাড। 'এতটুকুই বলতে চাচ্ছিলাম।'

'আপনার মন্তব্য আমরা আমলে নিলাম, কর্তৃপক্ষকে জানান হবে।' উত্তর দিল ড্রাইভার।

এখন তুষারপাত হচ্ছে, হেডলাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তুষারের ভেসে বেড়ান। অপেক্ষা না করে অ্যাক্সিলেটরে পা বসাল ড্রাইভার, কিছুক্ষণের মাঝেই ওরা উঠে এলো প্রধান সড়কে।

'ওয়েনসডে খবর শুনেছ?' বলল ড্রাইভার। পরিচিত শোনাল লোকটার কণ্ঠ। 'মারা গিয়েছে।'

'হুম, জানি।' বলল শ্যাডো। 'টিভিতে দেখেছি।'

'সবগুলো হারামজাদা।' বয়স্ক ডেপুটি এই প্রথম কথা বলল, এর কণ্ঠটাও পরিচিত।

'আমাকে নিতে আসার জন্য ধন্যবাদ।' বলল শ্যাডো।

'ব্যাপার না।' অন্য পাশ থেকে আগত একটা গাড়ির আলোতে ড্রাইভারের চেহারা কিছুক্ষণ আগের চাইতে বয়স্ক বলে মনে হলো। এর আগের বার যখন শ্যাডোর সাথে এর দেখা হয়েছিল, তখন তার পরনে ছিল হলদে গ্লাভস আর একটা চেক জ্যাকেট। 'আমরা মিলওয়াকিতে ছিলাম। আইবিসের ফোন পেয়ে পাগলের মতো গাড়ি চালিয়ে এসেছি।'

'তোমার কি মনে হয়, তোমাকে ওরা মৃত্যুদণ্ড দেবে, আর আমি বসে বসে দেখব? তোমার মাথার মালিকানা আমার।' সাদা ডেপুটি সিগারেটের খোঁজে পকেট হাতড়াল। লোকটার কণ্ঠে পূর্ব-ইউরোপিয়ান টান।

'ঘণ্টা দুয়েকের বেশি সময় পাবো না।' বলল মি. ন্যান্সি। 'আসল ডেপুটিরা তখন তোমাকে নিতে আসবে। আমরা অবশ্য ততক্ষণে হাইওয়েতে ৫৩-তে উঠে যাব। তবে আগে কোথাও থেমে ওই শিকল খুলতে হবে। পোশাকও পাল্টাতে হবে তোমাকে।' হাতকড়ার চাবি দেখিয়ে হাসল চেরনোবোগ।

'গোঁফটা বেশ মানিয়েছে।' বলল শ্যাডো।

'ধন্যবাদ।' তা দিতে দিতে বলল লোকটা।

'ওয়েনসডে কি আসলেই মারা গিয়েছেন?' জানতে চাইল শ্যাডো। 'নিশ্চয় কোন খেলা খেলছেন তিনি! এসবই ধোঁকা।'

শ্যাডো বুঝতে পারল, মনের ভেতর একটা আশা লালন করছিল ও। কিন্তু ন্যান্সির চেহারা দেখে উপলব্ধি করল, সে আশা মিথ্যা।

আমেরিকায় আগমন
১৪০০ খ্রিস্টপূর্ব

যখন স্বপ্নাবিভাব হলো যাজিকার, তখন অন্ধকার তার রাজত্ব বিস্তার করেছে চারদিকে। সেই সাথে ঠান্ডাও প্রচণ্ড। অবশ্য সুদূর উত্তরে মধ্য-দুপুরের আগে সূর্যের দেখা পাবার আশা করাও বৃথা। সদা উপস্থিত অন্ধকারের মাঝে এক চিলতে আলো হওয়া ছাড়া যেন ওটার কোন ভূমিকা নেই।

গোত্র হিসেবে ওদেরটাকে, মানে উত্তরাঞ্চলের এই যাযাবরদের কোনভাবেই বড় বলা যাবে না। ওদের দেবতা হচ্ছে একটা ম্যামথের খুলি এবং ম্যামথের চামড়া দিয়ে বানানো একটা আলখাল্লা। নুনইয়ুননিনি নামে ডাকে ওরা তাকে। যখন চলার উপরে থাকে না, তখন একটা কাঠের ফ্রেমের উপর রাখা হয় খুলিটাকে...এক মানুষ উচ্চতায়।

মহিলা গোত্রের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, খুলির সব রহস্যের রক্ষক। নাম তার আতসুলা, গোত্রের ভাষায়-শিয়াল। চলার সময় ভালুকের চামড়া পরে নুনইয়ুননিনির দুই বাহকের সামনে হাঁটে ও।

তুন্দ্রা অঞ্চলে গোত্রটার আবাস, বাস করে তাঁবুতে। সেরা মানের তাঁবু বানানো হয় ক্যারিবুর চামড়া দিয়ে। এই মুহূর্তে পবিত্র তাঁবুর ভেতরে বসে আছে চারজন- যাজিকা আতসুলা, গোত্র-প্রধান গুগউই; প্রধান যোদ্ধা ইয়ানু আর সন্ধানী কালানু। স্বপ্নাবিভাব হবার পরেরদিন সবাইকে ডেকেছে আতসুলা।

চুল থেকে কয়েকটা উকুন বের করে আগুনে ছুঁড়ে দিল আতসুলা, তার শুকিয়ে আসতে থাকা বাঁ হাত দিয়ে ঢেলে দিল কিছু শুকনো পাতা। ধোঁয়ার দমকে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে আসার যোগাড়, সেই সাথে অদ্ভুত একটা গন্ধও আসছে। কাঠের বেদি থেকে একটা কাঠের কাপ নিল মেয়েটা, এগিয়ে দিল গুগউই-এর দিকে। কাপটার ভেতরে ঘন হলদে তরল।

কয়েকটা পাঞ্চ মাশরুম খুঁজে পেয়েছে ও-প্রতিটা সাতটা করে দাগ। যাজিকা ছাড়া আর কারও পক্ষে সাত দাগওয়ালা মাশরুম খুঁজে বের করা সম্ভব না। অমাবস্যার সময় তুলতে হয়েছে ওগুলো, তারপর শুকাতে হয়েছে হরিণের তরুণাস্থির উপর রেখে।

আগেরদিন ঘুমাবার আগে, তিনটা মাশরুম খেয়েছিল ও। ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্নটা ওকে বিভ্রান্ত করেছে, করে তুলেছে ভীত। উজ্জ্বল আলোকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখেছে সে, দেখেছে পাথুরে পর্বতকে বরফে

আচ্ছাদিত হতো। কাঁপতে কাঁপতে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে ওর, তলপেটে অনুভব করেছে প্রচণ্ড চাপ। কাঠের কাপটা নিয়ে ভেতরে প্রস্রাব করেছে আতসুলা, এরপর সেটাকে তাঁবুর বাইরে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে আবার।

ঘুম থেকে উঠে, কাঠের কাপটা থেকে বরফে টুকরা সরিয়ে ফেলেছে ও। ফলে রয়ে গিয়েছে কেবল ঘন তরল।

সেটাই এখন একে একে সবার হাতে ঘুরছে। প্রথমে গুগউই, এরপর ইয়ানু আর শেষে কালানু। সবাই লম্বা করে চুমুক দিল কাপে, একদম শেষে এলো আতসুলার পালা। পান করা শেষে যতটুকু বাকি আছে, সেটা মাটিতে ফেলে দিল ও; দেবতা নুনইয়ুননিনি সামনে।

তাঁবুতে চুপচাপ বসে রইল চারজন, দেবতার কথা বলার অপেক্ষা করছে।

কালানু, যে পুরুষের মতো পোশাক পরলেও আদপে নারী, পিট পিট করে তাকাল কিছুক্ষণ। তারপর এগিয়ে গেল খুলির দিকে। ম্যামথের চামড়া দিয়ে বানানো আলখাল্লাটা নিজের গায়ে জড়িয়ে এমনভাবে দাঁড়াল যেন ওর মাথাটা খুলির ভেতরে থাকে।

'এই ভূমিতে পা রেখেছে অশুভ,' কালানুর কণ্ঠে বলে উঠল নুনইয়ুননিনি। 'এমন অশুভ যে এখানে থাকলে তোমরা, তোমাদের মায়েরা আর তোমাদের মায়েদের মায়েরা-কেউ রেহাই পাবে না।'

ঘোঁত করে উঠল তিন শ্রোতা।

'দাস ব্যবসায়ীরা নাকি? নাকি নেকড়ের পাল?' জানতে চাইল গুগউই, লম্বা আর সাদা তার চুল; চেহারা কুঞ্চিত।

'দাস ব্যবসায়ী না।' জানাল নুনইয়ুননিনি। 'নয় নেকড়ের পালও।'

'তাহলে কি দুর্ভিক্ষ?'

চুপ করে রইল নুনইয়ুননিনি, কালানু বেরিয়ে এসে ওদের সাথে যোগ দিল।

এবার গুগউই প্রবেশ করল আলখাল্লার ভেতরে।

'এমন এক দুর্ভিক্ষ,' বলল নুনইয়ুননিনি। 'যেটাকে ঠিক তোমাদের পরিচিত দুর্ভিক্ষের সাথে মেলান যাবে না। তবে হ্যাঁ, তেমন দুর্ভিক্ষও আসছে।'

'তাহলে কী?' জানতে চাইল ইয়ানু। 'আমি ভীত নই, দরকার হলে সেই অশুভের বিরুদ্ধে লড়াই করব। আমাদের বর্শা আছে, আছে ছুঁড়ে মারা মতো পাথর। আমাদের বিরুদ্ধে এক শত বীর যোদ্ধা লড়াই করলেও, জয়ী হব আমরাই। জলাভূমিতে নিয়ে গিয়ে একে একে খুন করব সবাইকে।'

'মানুষরূপী কিছু না।' গুগউইয়ের কণ্ঠে বলল নুনইয়ুনানিনি। 'এই অশুভ আসবে আকাশ থেকে। তোমাদের পাথর বা বর্শা, কোনটাই কাজে আসবে না।'

'তাহলে আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করব কী করে?' জানতে চাইল আতসুলা। 'আমি আকাশে আগুন দেখেছি। শুনেছি দশটা বজ্রের চাইতেও উঁচু একটা আওয়াজ। দেখেছি বনকে শুয়ে পড়তে, দেখেছি নদীর পানিকে ফুটতে।'

'আই...' আর কিছু বলল না নুনইয়ুনানিনি। গুগউই বেরিয়ে এলো আলখাল্লার ভেতর থেকে।

কিছুক্ষণ বজায় রইল নীরবতা। আতসুলা আরও কিছু পাতা ঠেলে দিল আগুনে। ধোঁয়ায় চোখ থেকে বেরিয়ে এলো পানি।

এবার ইয়ানু মাথা ঢোকাল আলখাল্লায়। গম গম করে উঠল ওর কণ্ঠ। 'তোমাদেরকে পথে নামতে হবে।' বলল নুনইয়ুনানিনি। 'সূর্যের দিকে এগোবে তোমরা। যেখান সূর্য উদয় হয়, সেখানেই পাবে নিরাপদ একটা আবাসস্থল। অনেক লম্বা সময় যাত্রা করতে হবে তোমাদের। দুইবার পূর্ণিমা হবে, দুইবার দেখতে হবে আমাবস্যা। আর পথে মুখোমুখি হতে হবে দাস ব্যবসায়ী আর হিংস্র পশুর। তবে সূর্যের দিকে এগোলে, আমি তোমাদেরকে পথ দেখাব।'

মেঝেতে থুথু ফেলল আতসুলা। 'না,' বলল ও। অনুভব করতে পারল, দেবতার ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন। 'না, তুমি খারাপ দেবতা। আমরা সূর্যোদয়ের দিকে রওনা হলে দলে দলে মারা পড়ব। তোমাকে বহন করার, তোমার তাঁবু গাড়ার, তোমার দাঁতে চর্বি মাখার কে থাকবে তখন?'

কিছুই বলল না দেবতা। আতসুলা আর ইয়ানু জায়গা পরিবর্তন করল। এখন যাজিকার মাথা খুলির ভেতরে।

'আতসুলা অবিশ্বাসী।' নুনইয়ুনানিনি আতসুলার কণ্ঠে বলল। 'নতুন এই আবাসস্থলে পা রাখার আগেই সে মারা যাবে। তবে তোমরা, বাকিরা বেঁচে থাকবে। আমার প্রতি বিশ্বাস রাখো। পুবে এমন একটা জায়গা আছে, যেখানে কোন মানুষ নেই। এই এলাকায় হবে তোমাদের নতুন বাসস্থান। তোমাদের বাচ্চারা, তাদের বাচ্চারা...এভাবে সাতে সাত প্রজন্ম থাকবে ওখানে। আতসুলার অবিশ্বাস না করলে, চিরদিনই থাকতে পারতে। সকালে তোমাদের তাঁবু আর তোমাদের সম্পত্তি গুছিয়ে নেবে। রওনা করবে পূর্ব দিকে।'

গুগউই, ইয়ানু আর কালানু বাউ করল নুনইয়ুননিনি উদ্দেশ্যে, প্রশংসা করল তার ক্ষমতা আর জ্ঞানের।

পূর্ণিমা এলো, এলো অমাবস্যা। একবার না...দুবার। গোত্রের সবাই পূর্বদিকে, সূর্যোদয়ের দিকে দিকে হেঁটে চলল। ঠান্ডা বাতাস, যেটা তাদের চামড়াকে পর্যন্ত জমিয়ে দিচ্ছে, ওদেরকে থামাতে পারল না। সত্য হলো নুনইয়ুননিনি প্রতিজ্ঞা, গোত্রের কেউ মারা গেল না পথে। কেবল এক মা বাচ্চা প্রসব করতে গিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। আর সবাই জানে, প্রসব-সংক্রান্ত সব ক্ষমতা চন্দ্রের, নুনইয়ুননিনির সেখানে অধিকার নেই।

সকাল হতেই সামনে এগিয়ে গিয়েছে কালানু। আকাশ এখন কালো, অথচ সে ফিরে আসেনি! তবে রাতের আকাশে খেলা করছে নানা রঙের আলো, জ্বলছে...নিভছে...এঁকে-বেঁকে এদিক-ওদিক যাচ্ছে। সাদা, সবুজ, বেগুনি আর লাল আলো। আতসুলা আর ওর গোত্রের লোকে উত্তরা আলো আগে দেখেছে বটে, কিন্তু এমন কিছু কখনও দেখেনি।

অনেকক্ষণ পর ফিরে এলো কালানু। 'মাঝে মাঝে মনে হয়,' আতসুলাকে বলল সে। 'দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে নিজেকে ছেড়ে দিলেই আকাশে শুয়ে পড়ব।'

'তুমি যে আমাদের সন্ধানী, তাই,' বলল যাজিকা। 'যখন মারা যাবে, তখন তোমার স্থান হবে আকাশে। তারা হয়ে আমাদেরকে পথ দেখাবে।'

'পূর্বে উঁচু উঁচু বরফাবৃত পাহাড়।' দাঁড়কাককে হার মানানো কালো চুলগুলো লম্বা কালানুর, যেরকম পুরুষরা রাখে। 'আমরা চড়তে পারি, কিন্তু সময় লাগবে অনেক।'

'তুমি আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিরাপদে নিয়ে যাবে।' বলল আতসুলা। 'তবে আমি পাহাড়ের পাদদেশেই মারা যাব। হবো তোমাদের নিরাপদ যাত্রার প্রার্থনায় উৎসর্গ।'

ওদের পশ্চিম দিক থেকে, যেখান থেকে ওরা এসেছে, যেখানে সূর্য ডুবেছে অনেক আগেই, আচমকা অসুস্থ এক হলদে আলো দেখা গেল। প্রতি মুহূর্তে উজ্জ্বল হচ্ছে ওটা, যেন দিনের আলোকেও হার মানাবে। গোত্রের সবাই হাত দিয়ে চোখ ঢাকল, চিৎকার করে উঠল ভয়ে। বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজে ভরে উঠল চারপাশ।

'নুনইয়ুননিনি এই পরিণতির ব্যাপারেই আমাদেরকে সাবধান করেছিলেন।' বৃদ্ধ গুগউই বলল। 'তিনি নিঃসন্দেহে এক ক্ষমতাশালী আর জ্ঞানী দেবতা।'

‘তিনি সব দেবতার মাঝে সেরা।’ বলল কালানু। ‘আমাদের নতুন আবাসে আমরা তাকে রাখব সবার উপরে। মাছের তেল আর পশুর চর্বি ঘষব দাঁতে। আমাদের বাচ্চাদের, তাদের বাচ্চাদের আর তাদেরও বাচ্চাদের শোনাব নুনইয়ুনানিনির ক্ষমতার গল্প। তাকে কেউ কোনদিন ভুলে যাবে না।’

‘দেবতারা অসাধারণ,’ বলল আতসুলা। এমন ভঙ্গিমায় যেন কোন গোপন কথা বলছে। ‘তবে আমাদের হৃদয় আরও বড়। কেননা সেখান থেকেই তারা আসেন, আর সেখানেই তারা ফিরে যাবেন...’

আতসুলার এই ঈশ্বর-দ্রোহিতা আরও কতক্ষণ চলত, কে জানে? কিন্তু এমন একভাবে তা বন্ধ হয়ে গেল, যা নিয়ে কোন তর্ক চলে না।

পশ্চিম দিক থেকে যে গর্জনটা ভেসে এলো, সেটা এতই প্রবল যে রক্ত বইতে শুরু করল কান থেকে। পরবর্তী অনেকক্ষণ কিছু না শুনতে পেল মানুষ, না দেখতে পেল। তবে বেঁচে রইল তারা, পশ্চিমের অন্যান্য গোত্রদের যে সেই সৌভাগ্য হয়নি তা জানে।

‘বেশ বেশ।’ বলল আতসুলা, কিন্তু নিজের উচ্চারিত শব্দ সে নিজেই শুনতে ব্যর্থ হলো।

বসন্তের সূর্য তখন তার শীর্ষে উঠল, সেদিন মারা গেল আতসুলা। নতুন আবাস দেখার সৌভাগ্য হলো না ওর। গোত্রও এগিয়ে চলল কোন যাজিকা ছাড়া।

পাহাড় পার হয়ে দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকে এগোল গোত্র, থামল মিঠা পানি প্রবাহিত হচ্ছে এমন একটা উপত্যকা খুঁজে পাবার পর। সেই সাথে খুঁজে পেল মাছ ভর্তি নদী। খুঁজে পেল এমন সব হরিণ, যেগুলো আগে কখনও মানুষ দেখেনি। ওগুলো এত শান্ত যে খুন করার আগে তাদের আত্মার কাছে ক্ষমা চাইতে হলো শিকারিদের।

এলো শীতল সময়, আবার চলেও গেল। গোত্রটা বড় হতে শুরু করল, আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল চারিদিকে। নতুন নতুন গোত্র তৈরি হলো, তাদের জন্য বেছে নেয়া হলো নতুন নতুন টোটেম–শকুন, শেয়াল, স্লথ, বিড়াল আর মহিষ। একেকটা টোটেম একে গোত্রের প্রতিনিধি, একেক গোত্রের দেবতা।

নতুন এই এলাকার ম্যামথগুলো আগের চাইতে বড়। সেই সাথে স্লথ আর সাইবেরিয়ার ম্যামথদের চাইতে বোকা। নতুন এলাকায় খুঁজে পাওয়া গেল না সাত দাগ বিশিষ্ট কোন পাঞ্চ মাশরুম। নুনইয়ুনানিনিও আর কোনদিন কথা বলল না গোত্রের সাথে।

কালানুর নাতী-নাতনীদের যুগে, একদল যোদ্ধা ফিরে এলো। আরেকটা বড় আর ক্রম-বর্ধনশীল গোত্রের সদস্য ছিল ওরা, উত্তরে গিয়েছিল দাস ধরে আনতে। কালানুদের গোত্রের উপত্যকাটা খুঁজে পেল তারা। অধিকাংশ পুরুষদের হত্যা করে, মহিলা আর বাচ্চাদের বন্দী করল।

এই বাচ্চাদের একজন, ক্ষমা লাভের আশায় যোদ্ধাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল একটা গুহায়। ওখানে তারা আবিষ্কার করল একটা ম্যামথের খুলি, ছেঁড়া-ফাটা ম্যামথ চামড়ার আলখাল্লা, কাঠের একটা কাপ আর আতসুলার মমিকৃত মস্তক।

নতুন এই গোত্রের কয়েকজন যোদ্ধা এসব পবিত্র জিনিস সাথে নিয়ে যেতে চাইছিল। ওদের ধারণা, এতে আরেকটা গোত্রের ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে পারবে। অন্যরা আবার তার বিপক্ষে। কেননা নতুন দেবতাকে বয়ে নিয়ে গেলে ওদের আদি দেবতা রুষ্ট হতে পারেন (এই গোত্রের দেবতা ছিল শকুন, আর কে না জানে যে শকুন দেবতারা সহজেই ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েন?।)

তাই পবিত্র দ্রব্যাদি ছুঁড়ে ফেলা হলো পাহাড়ের পার্শে, গভীর একটা খাদের ভেতর। প্রথম গোত্রের বন্দীদের সাথে নিয়ে যোদ্ধারা রওনা দিল দক্ষিণে। আস্তে আস্তে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল এই শকুন গোত্র আর শেয়াল গোত্ররা।

নুনইয়ুনিনি পুরোপুরি হারিয়ে গেল স্মৃতির অতলে।

পর্ব তিন

ঝড়ের আগমন

অধ্যায় চৌদ্দ

অন্ধকারে ডুবছে মানুষ,
জানা নাই করার কি আছে,;
আমার কাছে আছে লণ্ঠন,
তাও যে নিভে গেছে।
হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি আমি,
তুমিও দিবে আশা করি ,
অন্ধকারে চাই যে তোমায়,
হতে আমার সঙ্গী।

–গ্রেগ ব্রাউন, 'ইন দ্য ডার্ক উইথ ইউ'

ভোর পাঁচটায় মিনিয়াপোলিসের বিমান বন্দরের পার্কিং-লটে গাড়ি পরিবর্তন করে নিল ওরা। একেবারে উপরের তলা পর্যন্ত উঠে গেল, এখানকার কোন লটের উপরের তলায় ছাদ নেই।

কমলা পোশাক, হাতকড়া আর পায়ের শেকল নিয়ে একটা বাদামী কাগজের ব্যাগে ভরল শ্যাডো। এরপর ওটাকে ফেলে দিল আস্তাকুঁড়ে। প্রায় মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর, বন্দরের দরজা খুলে ওদের দিকে এগিয়ে এলো এক যুবক। ছেলেটা বার্গার কিং-এর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাচ্ছে, বুকটা অনেকটাই ব্যারেলের মতো। দেখামাত্র তাকে চিনতে পারল শ্যাডো–হাউজ অন দ্য রক থেকে ফেরার পথে ওর গাড়িরই পেছনের সিটে বসেছিল ছেলেটা, গুনগুন করে গান গাইছিল। এখন অবশ্য তার চোয়ালে হালকা দাড়ি দেখা যাচ্ছে, চেহারায় একটা ভারিক্কী ভাব এনে দিয়েছে ওটা।

হাতের তেলটুকু জিনসের সাথে মুছল যুবক, শ্যাডোর দিকে এক হাত বাড়িয়ে দিল। 'সর্ব-পিতার মৃত্যু খবর শুনেছি,' বলল সে। 'এর মূল্য ওদেরকে চুকাতে হবে...কড়া মূল্য।'

'ওয়েনসডে তোমার বাবা ছিলেন নাকি?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'তিনি সর্ব-পিতা।' বয়সের তুলনায় গম্ভীর শোনাল যুবকের কণ্ঠ। 'সবাইকে জানিয়ে দিও, দরকারের সময় আমার লোকদের সবাইকেই পাওয়া যাবে।'

দাঁতের ফাঁক থেকে এক টুকরা তামাক বের করে আনল চেরনোবোগ, থুথুর সাথে ফেলে দিয়ে বলল। 'তোমার লোক কজন বাকি আছে এখন? দশ? বিশ?'

যুবকের চেহারা লাল হয়ে গেল। 'আমাদের দশজন কি বিপক্ষের একশ জনের সমতুল্য নয়? যুদ্ধক্ষেত্রে কে আমার লোকদের সামনে দাঁড়াবার সাহস রাখে? যাই হোক, বেশ অনেকেই আছে। কয়েকজন আছে অন্য শহরে, কিছু আছে পাহাড়ে। ফ্লোরিডাতেও আছে কিছু। সবাই যার যার কুঠার ধারাল করে রেখেছে। আমি ডাকলেই চলে আসবে।'

'তাই করো, এলভিস,' বলল মি. ন্যান্সি। ঠিক এলভিস বলল কিনা লোকটা, তা নিশ্চিত নয় শ্যাডো। তবে ওর কাছে তেমনটাই মনে হলো। ডেপুটির উর্দি ছেড়ে পুরু বাদামী কার্ডিগান গায়ে দিয়েছে এখন বৃদ্ধ। সেই সাথে কর্ডরয়ের ট্রাউজার্স আর বাদামী চপ্পল। 'ডাকো সবাইকে। বুড়ো লোকটার তাই ইচ্ছা ছিল।'

'এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করল! এভাবে কেড়ে নিল তার প্রাণ? আমি ওয়েনসডের কথা শুনে হেসেছিলাম, এখন বুঝতে পারছি যে ভুল হয়েছিল। আমাদের কেউই আসলে নিরাপদ নয়।' এলভিসের মতো শোনাল, এমন নামের অধিকারী যুবক বলল। 'তবে আপনারা আমাদের উপর নির্ভর করতে পারেন।' শ্যাডোর পিঠে হালকা চাপড় দিল ও। শ্যাডোর মনে হলো, যেন উল্টে পড়বে! ভারি মুগুর দিয়ে আঘাত হানলেও এতটা জোরাল হতো না।

চেরনোবোগ পার্কিং-লটটার উপর নজর বুলাচ্ছিল। 'আচ্ছা, আমাদের জন্য কোন গাড়িটা ঠিক করেছ?'

এলভিস নামের যুবক দেখাল। 'ওই যে।'

ঘোঁত করে উঠল চেরনোবোগ। 'ওটা?'

১৯৭০ ভি.ডব্লিউ. মডেলের একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে সামনে, পেছনের কাচে রঙধনুর স্টিকার।

'গাড়িটা ভালো। আর তাছাড়া তোমরা যে এমন একটা জিনিস চালাচ্ছ, সেটা কারও মাথাতেই আসবে না।'

বাহনটার কাছে গেল চেরনোবোগ। আচমকা বুড়ো ধূমপায়ী মানুষের মতো খক-খক করে কাশতে শুরু করল। থুথু ফেলে, শ্লেষ্মা টেনে, এমনকি বুক হাতড়িয়েও কমানো গেল না কাশির দমক। 'হুম, তা করবে না। কিন্তু যদি পুলিশ আমাদেরকে আটকায় তো? আমরা কারও নজরে পড়তে চাই না, চাই লুকিয়ে থাকতে।'

যুবক বাসের পেছনের দরজা খুলে ধরল। 'আটকালে আটকাক না। তোমরা তো আর হিপ্পি নও, বেআইনি কিছু বহনও করছ না। এক নজর দেখেই তোমাদেরকে ছেড়ে দেবে। যাই বলো না কেন, এর চাইতে ভালো ছদ্মবেশ আর

হয় না। তারচেয়ে বড় কথা, বিনা নোটিশে আর কিছু জোগাড় করাও আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।'

চেরনোবোগকে দেখে মনে হচ্ছে, আরও ঝগড়া করার ইচ্ছা আছে তার। কিন্তু মি. ন্যান্সি দক্ষতার সাথে পরিস্থিতি সামাল দিল। 'এলভিস, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা দারুণ কৃতজ্ঞ। আমরা যেটায় এসেছি, সেটা শিকাগোতে ফিরিয়ে দিতে হবে।'

'আমরা ওটাকে ব্লুমিঙ্গটনে ছেড়ে আসব।' জবাব দিল এলভিস। 'বাকি কাজ নেকড়েরাই সারবে। ওসব নিয়ে ভাববেন না।' শ্যাডোর দিকে ফিরল সে। 'আমার সমবেদনা নাও, তোমার ব্যথা আমি বুঝতে পারছি। শুভ কামনা রইল। আর শোক পালনের দায়িত্ব যদি তোমার ঘাড়ে এসে পড়ে, তাহলে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আর সহানুভূতি জেনো।' শ্যাডোর হাতে চাপ দিল সে, শ্যাডোর মনে হলো যেন হাতের হাড়গুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। 'সর্ব-পিতার লাশ দেখলে তাকে জানিও-ভিনডালফের পুত্র আলভিসস তার ভরসার সম্মান জানাবে।'

বাসটার ভেতর থেকে পাতচৌলি, পুরনো সুগন্ধি আর তামাক পাতার গন্ধ ভেসে আসছে। মেঝে আর দেয়ালের সাথে লাগিয়ে রাখা হয়েছে রঙ জ্বলা একটা গোলাপি কার্পেট।

'লোকটার পরিচয় কী?' ইঞ্জিন চালু করতে করতে জানতে চাইল শ্যাডো।

'বললই তো-ভিনডালফের পুত্র আলভিসস। বামনদের রাজা; দুনিয়ার সব বামনের মাঝে সবচেয়ে লম্বা, সবচেয়ে শক্তিশালী, আর সর্বশ্রেষ্ঠ।'

'কিন্তু লোকটা তো পাঁচ-আট বা পাঁচ-নয় হবেই।' যুক্তি দেখাল ও। 'বামন হয়ে কীভাবে?'

'এজন্যই তো বামনদের মাঝে সবচেয়ে লম্বা।' পেছন থেকে চেরনোবোগ জবাব দিল। 'সারা আমেরিকায় ওর সমান বামন নেই।'

'আর শোক পালনের কথা কী যেন বলল?'

দুই বয়স্ক মানুষ কিছুই বলল না। ন্যান্সির দিকে তাকাল শ্যাডো, কিন্তু সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

'শোক পালনের কথা যে বলেছে, তা তো আপনারাও শুনতে পেয়েছেন।'

চেরনোবোগ মুখ খুলল। 'তোমাকে কাজটা করতে হবে না।'

'কোন কাজটা?'

'শোক পালন। বামনটা একটু বেশিই বলে ফেলেছে। অবশ্য ওর দোষ দিয়েই বা লাভ কী? ওর জাতিটাই এমন-কথা বলছে তো বলছেই। যাক গে, ওসব নিয়ে ভাববার দরকার নেই। শোক পালনের কথা ভুলে যাও।'

উত্তর দিকে যাওয়া মানে যেন ভবিষ্যৎ সময়ের দিকে অগ্রসর হওয়া। চলতে চলতে উধাও হয়ে যেতে শুরু করল তুষার, কেন্টাকিতে পরেরদিন পৌঁছাবার পরে তার আর হদিসও পাওয়া গেল না। কেন্টাকিতে শীত প্রায় শেষ, বসন্ত আসি আসি করছে। শ্যাডোর মনে হলো, কোন সমীকরণ দিয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হওয়া দূরত্ব আর সময়ের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় কিনা। এই যেমন প্রতি পঞ্চাশ মাইল সামনে এগোনো মানে এক দিন ভবিষ্যতে চলে যাওয়া।

তত্ত্বটা নিয়ে আলোচনা করতে চাইল ওর মন, কিন্তু মি. ন্যান্সি সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে ঘুমাচ্ছে। আর এদিকে চেরনোবোগ নাক ডাকাচ্ছে পেছনে সিটে শুয়ে।

সময়কে এই মুহূর্তে বড় নমনীয় বলে মনে হচ্ছে, থমকে যাচ্ছে যেন থেকে থেকে। চারপাশের সব পাখি আর পশুকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওঃ রাস্তার দুইপাশের আর বাসের সামনের রাস্তায় বসে থাকা কাক দেখতে পাচ্ছে, দুর্ঘটনায় মৃত পশুর মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে ওরা; আকাশে প্রায় পরিচিত আকৃতি নিয়ে উড়ে যাচ্ছে একদল পাখি; একদৃষ্টিতে ওরই দিকে তাকিয়ে আছে একটা বিড়াল।

ঘোঁত করে ঘুম ভাঙ্গল চেরনোবোগের। আস্তে আস্তে উঠে বসে বলল, 'অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলাম।' বলল সে। 'দেখলাম, আমি আসলে বিয়েলবোগ। পৃথিবীর সবাই সর্বদা কল্পনা করে এসেছে, আমরা আসলে দুই জন। একজন শুভর দেবতা আর আরেকজন অশুভের। কিন্তু এখন যখন আমরা দুজনেই বুড়ো, তখন যেন আমি একমাত্র অস্তিত্ব! আমিই মানুষকে নানা কিছু উপহার দেই, আবার আমিই নেই ছিনিয়ে।' কথা বন্ধ করে একটা সিগারেট ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিল সে।

নিজের দিকে জানালার কাঁচ নামিয়ে দিল শ্যাডো।

'ফুসফুস-ক্যান্সারের ভয় পান না?' জানতে চাইল ও।

'আমিই তো ক্যান্সার।' বলল চেরনোবোগ। 'নিজেকে আর ভয় কী?'

ন্যান্সি মুখ খুললেন এবার। 'আমাদের মতো অস্তিত্বদের ক্যান্সার হয় না। আমাদের হৃদরোগ হয় না, সিফিলিস বা পার্কিনসন্স রোগে আমরা ভুগি না। আমাদের হত্যা করা কঠিন।'

'ওয়েনসডেকে কিন্তু হত্যা করা হয়েছে।'

আর কথা হলো না, তেল নেবার জন্য গাড়ি থামাল শ্যাডো। এরপর একটা রেস্তোরার পাশে থামল নাস্তা খাবার জন্য। ওরা দোকানে ঢোকার আগেই, সদর দরজার কাছে অবস্থিত পে-ফোনটা বেজে উঠল ঝন ঝন শব্দে।

বয়স্কা এক মহিলাকে খাবারের অর্ডার দিল ওরা। মহিলা বসে বসে হোয়াট মাই হার্ট মেন্ট পড়ছিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল সে, ফোন কাছের গিয়ে

তুলল ওটা। 'হুম,' একবার বলেই ঘরের ভেতরে নজর বুলালো। 'আছে বলেই তো মনে হচ্ছে, একটু দাঁড়ান।' এই বলে সে চলে এলো মি. ন্যান্সির কাছে। 'আপনার জন্য।'

'আচ্ছা,' বলল মি. ন্যান্সি। 'ম্যাম, দয়া করে ফ্রাইটা ভালো করে ভাঁজবেন।' বলে পে-ফোনের কাছে চলে গেল সে। 'বলছি।'

' '

'আমাকে এতটাই বোকা মনে হয় যে তোমার কথা বিশ্বাস করব?'

'

'আমি জানি ওটা কোথায়।'

'

'অবশ্যই চাই,' কিছুটা রাগান্বিত শোনাল তার গলা। 'তুমিও জানো যে আমরা ওটা চাই। আর আমি জানি যে তুমি ওটা থেকে মুক্তি চাও। তাই এসব ছাতার কথা বলে লাভ নেই।' ফোন রেখে দিয়ে সে ফিরে এলো টেবিলে।

'কে?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'নাম বলেনি।'

'কী চায়?'

'শান্তিচুক্তি, ওয়েনসডের লাশটা ফিরিয়ে দিতে চায়।'

'মিথ্যা কথা,' বলল চেরনোবোগ। 'টোপ ফেলে আমাদেরকে ফাঁদে পা দিতে বাধ্য করবে। তারপর খুন করে ফেলবে। ঠিক যেমনটা ওয়েনসডের সাথে করেছে...যেমনটা আগে আমি করতাম।' শেষের বাক্যটা উচ্চারণ করার সময় গর্ব খেলে গেল তার কণ্ঠে।

'সত্যি সত্যি নিরপেক্ষ একটা জায়গায় যেতে বলেছে।' বলল ন্যান্সি।

মুচকি হাসল চেরনোবোগ, আওয়াজ শুনে মনে হলো যেন কোন ধাতব অস্ত্র কোন খুলির বারোটা বাজাচ্ছে। 'আমিও এই একটা বলতাম। কোন নিরপেক্ষ জায়গায় এসো। তারপর সবাইকে খুন করতাম। দিন ছিল বটে তখন।'

শ্রাগ করল মি. ন্যান্সি। বাদামী ফ্রাইয়ে কামড় দেয়া মাত্র হাসি ফুটে উঠল তার চেহারায়। 'দারুণ।' বলল সে।

'আমরা ওদেরকে বিশ্বাস করতে পারি না।' বলল শ্যাডো।

'দেখ বাছা, আমি তোমার চাইতে বয়স্ক, তোমার চাইতে চালু আর অবশ্যই তোমার চাইতে অনেক বেশি সুদর্শন।' কেচাপের বোতল ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল ন্যান্সি। 'এক বিকালে যত মেয়ে পটাতে পারব, সারা বছরে তুমি তত জনকে পটাতে পারবে না। আমি দেবদূতের মতো নৃত্যে পারঙ্গম, কোণঠাসা ভালুকের মতো নৃশংস যোদ্ধা, শেয়ালের চাইতে ধূর্ত...'

'বুঝলাম। তো?'

শ্যাডোর চোখে চোখ রাখল ন্যান্সির বাদামী চোখ। 'আমাদের যেমন লাশটা দরকার, ওদেরও তেমন লাশটাকে হস্তান্তর করা দরকার।'

'কিন্তু সত্যিকারের নিরপেক্ষ জায়গা বলে তো কিছু নেই।' বলল চেরনোবোগ।

'আছে, একটা।' বলল মি. ন্যান্সি। 'কেন্দ্র।'

কোন কিছুর প্রকৃত কেন্দ্র নির্ধারণ করাটা খুব কঠিন। আর মানুষের মতো জীবিত...অথবা মহাদেশের মতো বিশাল কিছুর কেন্দ্র বের করাটা তো একেবারেই অসম্ভব। কেননা মানুষের কেন্দ্র আবার কী? স্বপ্নের কি কোন কেন্দ্র থাকা সম্ভব? আর যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটা দেশের কেন্দ্র বের করার সময় কি আলাস্কাকে হিসাবে আনতে হবে? অথবা হাওয়াইকে?

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ইউ.এস.এ.র একটা বিশাল প্রতিকৃতি বানানো হলো। কার্ডবোর্ড দিয়ে বানানো প্রতিকৃতিটায় ছিল নিচের আটচল্লিশটা স্টেট। উদ্দেশ্য ছিল ওটার কেন্দ্র আবিষ্কারের। একটা পিনের উপর বসিয়ে দেয়া হয়েছিল প্রতিকৃতিটাকে।

যা বোঝা গেল তা হলো, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্র জায়গাটা অবস্থিত লেবানন, ক্যানসাস থেকে কয়েক মাইল দূরে; জনি গ্রিবের শুয়োর খামারে। ১৯৩০ সালের দিকে লেবাননের অধিবাসীরা ওই খামারের ঠিক মাঝখানে একটা বিশাল বড় স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করার সব প্রস্তুতি পর্যন্ত সেরে ফেলল! কিন্তু বাদ সাধল জনি। হাজার হাজার পর্যটক এসে ওর শুয়োরদের বিরক্ত করুক, তা সে চায় না। তাই স্মৃতিস্তম্ভটার স্থান হলো দুই মাইল পাশের শহরে। এজন্য আলাদা একটা পার্কই বানিয়ে ফেলল তারা। এরপর লোহা আর পিতল দিয়ে বানানো স্মৃতিস্তম্ভটা সেখানে স্থাপন করল। এরপর মোটেল আর ভালো রাস্তা বানিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল পর্যটকের।

কিন্তু এলো না কেউ!

এখন পার্কটা দাঁড়িয়ে আছে মন খারাপ করা একাকীত্বকে সঙ্গী করে। ওখানে আছে একটা চ্যাপেল, এতটাই ছোট যে অল্প কজনও আঁটবে না। আর আছে একটা মোটেল, যেটার জানালাগুলোকে মৃত মানুষের চোখ বলে ভ্রম হয়।

'এ জন্যই,' ঘোষণা করল যেন মি. ন্যান্সি, মিসৌরির হিউম্যানসভিলে ওদের গাড়ি প্রবেশ করছিল তখন। 'আমেরিকার কেন্দ্র হচ্ছে একটা ছোট, প্রায়-ধ্বংসপ্রাপ্ত পার্ক, একটা শূন্য চার্চ, কয়েকটা পাথরের স্তূপ আর একটা পরিত্যক্ত মোটেল।'

'আর শুয়োরের খামার?' বলল চেরনোবোগ। 'এই মাত্র না একটা শুয়োরের খামারের কথা বললে! ওটার কী হলো?'

'সবই তো কাল্পনিক,' উত্তর দিল মি. ন্যান্সি। 'এমনকী এই কেন্দ্রটাও। খামার খামারের মতোই আছে। দুনিয়াতে কাল্পনিক জিনিস নিয়েই মাতামাতি বেশি। সবাই কেবল ওসব নিয়েই কামড়া-কামড়ি করে।'

'সবাই বলতে কি আমরা, মানুষেরা?' জানতে চাইল শ্যাডো। 'নাকি আপনারা, দেবতারা?'

ন্যান্সি উত্তর দিল না। অদ্ভুত একটা শব্দ করে উঠল চেরনোবোগ, সেটা মুচকি হাসিও হতে পারে, আবার ঘোঁত করাও হতে পারে।

বাসের পেছনে আরাম করে শোয়ার প্রয়াস পেল শ্যাডো, পুরোটা রাস্তায় খুব অল্পই ঘুমাতে পেরেছে ও। অশুভ কিছু একটা আশঙ্কা করছে সে, মনে হচ্ছে যেন কেউ একজন ওর তলপেট খামচে ধরে আছে। জেলে থাকতেও এমন তীব্র হয়নি অনুভূতিটা, লরা যখন ওকে ব্যাঙ্ক ডাকাতির ব্যাপারে রাজি করাতে এলো-তখনও না। খুব বাজে ধরনের কিছু একটা অপেক্ষা করছে সামনে। এমনকী ওর ঘাড়ের লোমগুলোও উঠে দাঁড়িয়েছে, অসুস্থ বোধ করছে সে। ঢেউয়ের মতো করে বারে বারে আসছে ভয়।

হিউম্যানসভিলে গাড়ি থামাল ন্যান্সি, একটা সুপারমার্কেটের সামনে দাঁড়াল। একসাথে ভেতরে ঢুকল সে আর শ্যাডো। চেরনোবোগ ব্যস্ত পার্কিং-লটে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফোঁকার কাজে।

নাস্তার সিরিয়াল যে তাকে রাখা হয়, সেটার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক ছেলে, চেহারা দেখে বাচ্চাই মনে হয়।

'হাই,' বলল মি. ন্যান্সি।

'হাই,' উত্তর দিল ছেলেটা। 'কথাটা কি সত্যি? তিনি কি খুন হয়েছেন?'

'হ্যাঁ,' জানাল মি. ন্যান্সি। 'তাকে খুন করা হয়েছে।'

ঝটকা দিয়ে সিরিয়ালের কয়েকটা বাক্স শেলফে রেখে দিল ছেলেটা। 'ওদের ধারণা, আমাদেরকে তেলাপোকার মতোই পিষে মারতে পারবে।' বলল সে, হাতে একটা রূপালী ব্রেসলেট। 'এত সহজে মরছি না আমরা, তাই না?'

'নাহ।' বলল মি. ন্যান্সি। 'এত সহজে না।'

'আমি আপনাদের সাথে আছি।' বলল ছেলেটা, চোখ জ্বলজ্বল করছে।

'আমি জানি তুমি সাথে আছ, গিডিওন।' বলল মি. ন্যান্সি।

কয়েক বোতল আর.সি. কোলা কিনলেন মি. ন্যান্সি। সেই সাথে কিছু টয়লেট পেপার, এক প্যাকেট কালো সিগারেল্লো, এক কাঁদি কলা আর সেই সাথে একটা ডাবলমিন্ট চুয়িং গাম। 'ছেলেটা ভালো, সপ্তম শতাব্দীতে ওয়েলশ থেকে এসেছে।'

প্রথমে কিছুক্ষণ পশ্চিম দিকে এগিয়ে, এরপর উত্তরে গেল। বসন্তকে হটিয়ে আবার চারপাশ দখল করে নিল শীত। রেডিও স্টেশন ঘোরাবার ব্যাপারে দক্ষ

হতে শুরু করেছে শ্যাডো। মি. ন্যান্সি চায় ড্যান্স মিউযিক আর টক রেডিও শুনতে। এদিকে চেরনোবোগ আবার পছন্দ করে ক্ল্যাসিকাল মিউযিক, যত গম্ভীর হয় তত ভালো। শ্যাডো নিজে পছন্দ করে পুরনো দিনের গান।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল হতে শুরু করেছে, চেরনোবোগের অনুরোধে চেরিভিল, ক্যানসাসের (জনসংখ্যা-২৪৬৪) ঠিক বাইরেই দাঁড়াল ওরা। তুষারে এখনও গাছের ছায়া পড়ছে, ঘাসগুলো কাদা-রঙের।

'এখানে অপেক্ষা করো,' গাড়ি থেকে নেমে কিছুদূর হাঁটার পর বলল চেরনোবোগ। একা একা এগিয়ে গেল সে, দাঁড়াল তৃণভূমির মাঝখানে। ফেব্রুয়ারির বাতাসে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর কার সাথে যেন কথা বলতে শুরু করল!

'মনে হচ্ছে যেন কারও সাথে কথা বলছে!' বলল শ্যাডো।

'আত্মারা,' জানাল মি. ন্যান্সি। 'ওর সাথে ফিসফিসিয়ে কথা বলে। এখানে প্রায় একশ বছর আগেও ওর উপাসনা করত তারা। রক্ত-বলি দিত, হাতুড়ির আঘাতে গুঁড়িয়ে দিত খুলি। কিছুদিন পর শহরবাসীরা বুঝতে পারল, কেন এখানে যারা আসে তারা আর ফিরে যায় না!'

চেরনোবোগ ফিরে এলো, এখন ওর গোঁফ আগের চাইতেও কালো বলে মনে হচ্ছে। সাদা চুলের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে কালো রঙ। দাঁত বের করে হাসল লোকটা। 'ভালো লাগছে। আহ, কিছু কিছু জিনিস তাদের অস্তিত্বের ছাপ রেখে যায়। রক্ত তাদের মাঝে একটা।'

গাড়ির দিকে ফিরে চলল ওরা। সিগারেট ধরাল চেরনোবোগ, তবে কাশল না আর আগের মতো। 'আমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার সময় হাতুড়ি ব্যবহার করত সবাই। ভোটান বলত ফাঁসি-কাঠ আর বর্শার কথা। কিন্তু আমার জন্য অস্ত্র বলতে কেবল একটাই...' নিকোটিনের পরত পড়া একটা আঙুল দিয়ে শ্যাডোর কপালের ঠিক মাঝখানে টোকা দিল সে।

'দয়া করে এসব করবেন না।' ভদ্রভাবে বলল শ্যাডো।

'দয়া করে এসব করবেন না।' ভেঙচি কাটল চেরনোবোগ। 'একদিন আমার হাতুড়ি দিয়ে তোমার ওই মাথা গুঁড়িয়ে দেব, নাকি ভুলে গেছ ব্যাপারটা?'

'মনে আছে,' বলল শ্যাডো। 'কিন্তু আমার কপালে টোকা দিলে, হাত ভেঙে দেব।'

ঘোঁত করে উঠল চেরনোবোগ, তারপর বলল। 'এখানকার লোকজনের আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ। এখান থেকেই জন্ম নিয়েছে চরম এক শক্তি। আমার লোকদের আত্মগোপনে বাধ্য করার ত্রিশ বছর পরও, এই জায়গাটা থেকে এসেছে ইতিহাসের সেরা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী।'

'জুডি গারল্যান্ড?' জানতে চাইল শ্যাডো।

ঝট করে মাথা নাড়ল চেরনোবোগ।

'ও লুইসি ব্রুকসের কথা বলছে,' বলল মি. ন্যান্সি।

লুইসি ব্রুকস কে, সেটা আর জানতে চাইবার ইচ্ছা হলো না শ্যাডোর। বরঞ্চ বলল, 'দেখুন, ওয়েনসডে যখন কথা বলতে গেলেন, তখনও কিন্তু শান্তিচুক্তির অধীনেই গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ।'

'আমরা এখন যাচ্ছি ওদের কাছ থেকে ওয়েনসডের লাশ ফিরিয়ে আনার জন্য। সেটাও শান্তিচুক্তির অধীনে।'

'হ্যাঁ।'

'আমরা এটাও জানি, ওরা আমাকে খুন করে পথের কাঁটা দূর করতে চায়।'

'শুধু তোমাকে না, আমাদের সবাইকেই খুন করতে চায়।' বলল ন্যান্সি।

'তাহলে এবার যে ওরা কথা রাখবে, সেটার নিশ্চয়তা কী?'

'যেন রাখে,' জানাল চেরনোবোগ। 'সেজন্যই আমরা কেন্দ্রে ওদের সাথে দেখা করছি। জায়গাটা...' ভ্রূ কুঁচকাল সে। 'শব্দটা বলতে পারছি না। পবিত্রের বিপরীত।'

'অপবিত্র।' কিছু না ভেবেই বলল শ্যাডো।

'না,' বলল চেরনোবোগ। 'আমি বোঝাতে চাইছি, ওটা এমন জায়গা যেখানে মন্দির বানানো যায় না। যেখানে মানুষ আসতেই চায় না, আর এলেও চলে যেতে চায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এমন এক জায়গা যেখানে একান্ত বাধ্য না হলে কোন দেবতাও পা রাখবে না।'

'জানি না,' বলল শ্যাডো। 'এমন অর্থের কোন শব্দ আছে বলে মনে হয় না।'

'পুরো আমেরিকা জায়গাটাই কিছুটা এমন।' বলল চেরনোবোগ। 'এই জন্য আমাদেরকে এখানে কেউ থাকতে দিতে চায় না। কিন্তু কেন্দ্র...ওই জায়গাটা আরও বাজে। মাইন বিছানো মাঠ বলতে পারো। শান্তিচুক্তি যেন কোনক্রমেই না ভাঙে, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে আমাদের।'

গাড়ির কাছে পৌঁছে গিয়েছে ওরা। শ্যাডোর হাতে চাপড় দিল চেরনোবোগ। 'চিন্তা করো না, আমি ছাড়া আর কেউ তোমাকে খুন করার সুযোগ পাবে না। কেউ না।'

সেদিন সন্ধ্যাতেই আমেরিকার কেন্দ্রে উপস্থিত হলো শ্যাডো, রাত তখনও নামেনি পুরোপুরি। লেবাননের উত্তর-পশ্চিমে, একটা ছোট টিলা বলা যায় জায়গাটাকে। পার্কের চারপাশে একবার ঘুরে এলো ও, ছোট একটা চ্যাপেল আর পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ নজরে এলো প্রথমেই। যখন ১৯৫০ সালে নির্মিত এক তলা মোটেলটা দেখতে পেল, তখন মন খারাপ হয়ে গেল ওর। দালানটার সামনে

একটা কালো হামভি পার্ক করা। দেখে মনে হয় যেন প্রচণ্ড কুৎসিত আর প্রায় অহেতুক কোন আর্মার্ড গাড়ি। মোটেলে জ্বলছে না কোন আলো।

দালানটার পাশেই পার্ক করল ওরা। ঠিক সেই মুহূর্তেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো শোফারের উর্দি পরিহিত এক লোক। শ্যাডোদের গাড়ির হেডলাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল লোকটাকে। মাথায় পরা শোফারের ক্যাপ একবার স্পর্শ করে অভিবাদন জানালো লোকটা, তারপর হামভি নিয়ে চলে গেল।

'বড় গাড়ি মানে...ছোট পুরুষাঙ্গ।' বলল মি. ন্যান্সি।

'এই আস্তাকুঁড়ে বিছানা আছে বলে মনে হয়?' প্রশ্ন করল শ্যাডো। 'অনেকদিন হলো বিছানায় শুয়ে ঘুমাই না। মোটেলটাকে দেখে তো মনে হচ্ছে যেকোন সময় ধ্বসে পড়বে!'

'টেক্সাসের কিছু শিকারি এটার মালিক,' বললেন মি. ন্যান্সি। 'বছরে একবার আসে। কী যে শিকার করে, তা কে জানে! তবে ওদের আসার জন্যই জায়গাটা এখনও ভেঙে ফেলা হয়নি।'

গাড়ি থেকে নেমে এলো ওরা। ওদের জন্য মোটেলের সামনে এক মহিলা দাঁড়িয়ে ছিল, চিনতে পারল না শ্যাডো। নিখুঁত মেক-আপ নিয়েছে মেয়েটা, দেখে খবর-পাঠিকা বলে মনে হলো ওর।

'এসেছ বলে খুব খুশি হয়েছি।' বলল মেয়েটা। 'তুমি নিশ্চয় চেরনোবোগ, অনেক শুনেছি তোমার কথা। আর তুমি আনানসি, সারাক্ষণ দুষ্টামিতে মেতে থাকো, তাই না? ভালো, ভালো। আর তুমি হচ্ছে শ্যাডো। অনেক ঘুরিয়েছ আমাদেরকে।' শ্যাডোর হাত আঁকড়ে ধরল সে, শক্ত করে চাপ দিয়ে চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমি মিডিয়া। অবশেষে দেখা হলো আমাদের। আশা করি আমাদের বিনিময় কোন ঝামেলা ছাড়াই শেষ হবে।'

মোটেলের সদর দরজা খুলে গেল। 'কেন জানি, টোটো,' লিমোতে দেখা সেই মোটা ছেলেটা বেরিয়ে এলো। 'মনে হচ্ছে আমরা আর ক্যানসাসে নেই।' ওযের জাদুকর বইটার বিখ্যাত সেই লাইনটা উচ্চারণ করল সে।

'ক্যানসাসেই আছি।' বলল মি. ন্যান্সি। 'সারাদিন সম্ভবত তার বুকের উপর দিয়েই গাড়ি চালিয়ে এসেছি।'

'এই মোটেলে নেই কোন বাতি, নেই কোন বিদ্যুৎ বা গরম পানির ব্যবস্থা।' মোটা ছেলেটা বলল। 'কিছু মনে করো না, তোমাদের গরম পানি খুব দরকার। গায়ের গন্ধে মনে হচ্ছে বছর খানেক ধরে ওই গাড়িতেই বাস করছ!'

'ওসব বলার কোন দরকার আছে বলে মনে হয় না,' নম্র কণ্ঠে বলল মেয়েটা। 'আমরা সবাই এখানে বন্ধু। ভেতরে এসো, তোমাদেরকে ঘর দেখিয়ে দেই। আমরা প্রথম চারটা ঘর নিয়েছি। তোমাদের মরহুম বন্ধু পঞ্চমটায় আছে।

বাকিগুলো খালি, নিজের ইচ্ছামতো বেছে নিতে পারো। ঠিক ফোর সিজনস না জায়গাটা, তবে করার আর কিছু নেই!'

দরজা খুলে শ্যাডোদেরকে মোটেলের লবিতে নিয়ে এলো সে। ছত্রাক, ধুলো আর পচনের গন্ধ ভেসে আসছে ভেতর থেকে।

লবিতে, প্রায় অন্ধকারে বসেছিল একজন পুরুষ। 'ক্ষুধার্ত?' জানতে চাইল সে।

'খাওয়ার জন্য আবার ক্ষুধার্ত হওয়া লাগে নাকি?' উত্তরে বললেন মি. ন্যান্সি।

'ড্রাইভারকে হ্যামবার্গার আনতে পাঠিয়েছি।' বলল লোকটা। 'জলদিই ফিরে আসবে।' মুখ তুলে তাকাল সে, অন্ধকারে কারও চেহারা পরিষ্কার বোঝা যাবার কথা না। তবুও বলল, 'বিশালদেহি তুমিই তো শ্যাডো, নাকি? যে হারামজাদা উডি আর স্টোনকে খুন করেছে?'

'না।' বলল শ্যাডো। 'ওই কাজটা করেছে অন্য একজন। তোমাকে চিনি আমি।' আসলেই তাই, এই লোকের মাথার ভেতরেই কিছুক্ষণ সময় কাটিয়েছিল ও। 'তুমি টাউন। তা উডের বিধবাকে বিছানায় নিতে পেরেছ এখনও?'

চেয়ার থেকে পরে গেল মি. টাউন। কোন সিনেমার দৃশ্য হলে হাসিতে ফেটে পড়ত সবাই। কিন্তু এখন চুপ করে রইল। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে শ্যাডোর কাছে চলে এলো সে। মাথা নিচু করে লোকটার চোখে চোখ রাখল শ্যাডো। বলল, 'যা শেষ করতে পারবে না, তা শুরু করতে যেও না।'

শ্যাডোর হাতে হাত রাখল মি. ন্যান্সি। 'শান্তিচুক্তি...ভুলে গেলে? আমরা এখন কেন্দ্রে আছি।'

মুখ ঘুরিয়ে নিল মি. টাউন। কাউন্টারের উপর ঝুঁকে তিনটা চাবি বের করে আনল সে। 'হলের শেষ মাথায় তোমাদের ঘর,' বলল লোকটা। 'এই যে চাবি।'

ন্যান্সিকে ওগুলো ধরিয়ে দিয়ে বিদায় নিল লোকটা, হারিয়ে গেল করিডরের ছায়াতে। মোটেলের একটা দরজা খোলার আওয়াজ শুনতে পেল ওরা, তারপর আবার সেটা বন্ধ হবার আওয়াজ হলো।

একটা চাবি শ্যাডোকে আর আরেকটা চেরনোবোগকে দিল মি. ন্যান্সি। 'গাড়িতে কোন ফ্ল্যাশলাইট আছে?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'না।' জানাল মি. ন্যান্সি। 'অন্ধকারকে ভয় পাও নাকি?'

'না, অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা মানুষকে ভয় পাই।'

'আঁধার আমার প্রিয়।' বলল চেরনোবোগ, মনে হচ্ছে না যে অন্ধকারে তার কোন সমস্যা হচ্ছে। অন্ধকার করিডর ধরে বিনা সমস্যাতেই এগিয়ে যাচ্ছে সে, তালা খুলতেও কোন অসুবিধা হলো না তার। 'আমি দশ নাম্বার ঘরে আছি।' ওদেরকে জানাল সে। 'মিডিয়া, ওর কথা আগেও শুনেছি মনে হয়। এই মহিলাই তার বাচ্চাদেরকে খুন করেছিল না?'

'নাহ, অন্য একজন।' বলল মি. ন্যান্সি। 'তবে একই রকম খারাপ।'

আট নাম্বার ঘরটা মি. ন্যান্সি নিল, বাকিটা জুটল শ্যাডোর ঘাড়ে। ঘরটা স্যাঁতস্যাঁতে, যেন বহুদিনের পরিত্যক্ত। তবে ভেতরে একটা বিছানার ফ্রেম আছে, তার উপরে আছে জাজিমও। তবে চাদর নেই কোন। জাজিমের উপরে বসল শ্যাডো, জানালা দিয়ে হালকা আলো ঢুকছে ঘরে। পা থেকে জুতা খুলে জাজিমে শুয়ে পড়ল ও। কয়েকদিন ধরে টানা গাড়ি চালাতে হচ্ছে তাকে।

হয়তো ঘুমালোও কিছুক্ষণ...

হাঁটছে ও।

ঠান্ডা বাতাসে উড়ছে ওর জামা-কাপড়। ছোট ছোট তুষারকণা ধূলার মতো উড়ে বেড়াচ্ছে বাতাসে।

বেশ কয়েকটা গাছ নজরে পড়ল ওর, তবে শীতের কারণে কোন পাতা নেই গাছে। ওর দুপাশেই উঁচু উঁচু পাহাড়। শীতের বিকাল এখনঃ আকাশ আর বরফ ঘন বেগুনি রঙ ধারণ করেছে। সামনে কোথাও-এই হালকা আলোতে কিছু বোঝা যাচ্ছে না পরিষ্কার করে-অগ্নিকুন্ডের আলো জ্বলছে...হলুদ, কমলা আলো।

ওর সামনে...বরফে হাঁটছে একটা ধূসর নেকড়ে।

দাঁড়িয়ে পড়ল শ্যাডো, দাঁড়াল নেকড়েও। ঘুরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল নেকড়েটা। ওটার একটা চোখে দেখা গেল হলদে-সবুজ আভা। শ্রাগ করে সামনে এগোল সে।

অগ্নিকুন্ডটা একটা বাগানের ঠিক মাঝখানে জ্বলছে। আশে পাশে প্রায় একশ গাছ, দুই সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলো থেকে ঝুলছে কিছু অবয়ব। গাছের সারির একদম শেষ মাথায় একটা দালান, দেখে মনে হয় যেন উল্টানো কোন নৌকা। কাঠের তৈরি দালানটায় খোদাই করা হয়েছে অগণিত পশুর চেহারা-ড্রাগন, গ্রিফিন, ট্রল, ভালুক। আলোতে যেন নাচছে ওগুলো। এদিকে অগ্নিকুন্ডটা এত তীব্র হয়ে জ্বলছে যে ওটার কাছেও যেতে পারছে না শ্যাডো। তবে নেকড়েটার অসুবিধা হচ্ছে না। আগুনকে ঘিরে পাক খাচ্ছে ওটা।

আগুনের ওপাশ থেকে নেকড়ের জায়গায় বেরিয়ে এলো এক মানুষ, হাতে ছড়ি ধরা।

'তুমি সুইডেনের উপশালায় আছো,' পরিচিত, রুক্ষ কণ্ঠে বলল লোকটা। 'প্রায় এক হাজার বছর আগের সময়ে।'

'ওয়েনসডে?' জিজ্ঞাসা করল শ্যাডো।

কথা বলতে থাকল লোকটা, যেন শ্যাডো নেই-ই ওখানে। 'প্রথম প্রথম প্রতি বছর পেতাম বলি। তারপর আস্তে আস্তে বেড়ে গেল মাঝখানের সময়টা...নয়েরএক বিশেষউৎসর্গ, আমার উদ্দেশ্যে বলি চড়ানো হতো এখানে। টানা নয়দিন...প্রতিদিন নয়টি করে পশু বলি দেয়া হতো। ওই গাছগুলোর ডাল থেকে ঝুলত তাদের দেহ, নয়টির মাঝে একটি অবশ্যই মানুষ হতো।'

আগুনের আলোয় গাছের দিকে হেঁটে গেল লোকটা, পিছু নিল শ্যাডো। গাছগুলোর কাছাকাছি হওয়া মাত্র আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে ধরা দিল দেহগুলো। মাথা নাড়ল শ্যাডো, গাছের ডাল থেকে একটা মহিষের দেহ ঝুলতে থাকাটা অদ্ভুত এক কষ্টের জন্ম দিচ্ছে ওর মনে। আবার দৃশ্যটা এমন অবাস্তব যে হাসিও পাচ্ছে। ঝুলতে থাকা একটা করে হরিণ, হাউন্ড, বাদামি ভালুক আর চেস্টনাট ঘোড়া পার হয়ে এলো সে। কুকুরটা এখনও বেঁচে আছে। কয়েক সেকেন্ড পরপর পা ছুঁড়ছে ওটা, কেঁউ কেঁউ করে উঠছে থেকে থেকে।

যে লোকটার পিছু অনুসরণ করছে শ্যাডো, সে তার হাতের ছড়িটা তুলে ধরল। প্রকৃতপক্ষে যে ওটা একটা বর্শা, তা এতক্ষণে টের পেল ও। বর্শাটা দিয়ে মৃতপ্রায় কুকুরটার পেট কেটে ফেলল লোকটা। রক্তাক্ত নাড়ি-ভুঁড়ি আছড়ে পড়ল তুষারের উপর। 'এই মৃত্যু...ওডিনের জন্য।' ঘোষণা করল যেন সে।

'ব্যাপারটাকে প্রতীকী বলতে পারো,' শ্যাডোর দিকে ফিরে বলল লোকটা। 'কিন্তু প্রতীকী এই আচরণই আসলে সবকিছু। সব কুকুরের মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে এই এক কুকুরের মৃত্যু। নয়জন মানুষকে উৎসর্গ করা হতো আমার উদ্দেশ্যে, কিন্তু লক্ষ্য ছিল সারা মানবজাতি। মাত্র নয়জনের রক্ত...তবে তার অর্থ সমগ্র দুনিয়ার সব ক্ষমতা। একদিন...আচমকা বন্ধ হয়ে গেল রক্তের প্রবাহ। রক্ত ছাড়া বিশ্বাসের ক্ষমতা আর কতটুকু, বলো?'

'আপনাকে মরতে দেখেছি আমি।' জানাল শ্যাডো।

'দেবতাদের ব্যাপারটাই আলাদা,' বলল লোকটা, শ্যাডো নিশ্চিত যে ওয়েনসডের সাথেই কথা বলছে। 'মৃত্যু তাদের সামনে অর্থহীন, পুনরুত্থানের আরেকটা সুযোগ ছাড়া আর কিছু নয়। আর যখন রক্ত প্রবাহিত হয়...' ঝুলতে থাকা পশু আর মানুষের দিকে ইঙ্গিত করল লোকটা।

ঝুলন্ত পশুর লাশ বেশি ভীতিপ্রদ, নাকি মানুষের-তা ঠিক বুঝতে পারল না শ্যাডো। মানুষগুলো অন্তত আগে থেকে নিজেদের ভবিষ্যৎ

জানত! লাশগুলো থেকে মদের গন্ধ আসছিল, সম্ভবত ওদেরকে ফাঁসিতে ঝোলাবার আগে ইচ্ছামতো মদ খাওয়ানো হয়েছে। অথচ ওই পশুগুলোর সেই সৌভাগ্য হয়নি, জীবিত অবস্থায় ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে ওদেরকে। লোকগুলোর চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল, এদের কারও বয়সই বিশের বেশি হবে না।

'আমি কে?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'তুমি কে?' উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করল লোকটা। 'তুমি একটা সুযোগ...একটা সম্ভাবনা। তুমি বিশাল এক প্রাচীন প্রথার অংশ। তবে হ্যাঁ, প্রথা হলেও ওটার জন্য মরতে আমাদের কারওই আপত্তি নেই। তাই না?'

'আপনি কে?' আবার জানতে চাইল শ্যাডো।

'জীবনের সবচাইতে কঠিন অংশ কোনটা জানো? বেঁচে থাকাটা।।' বলল লোকটা। আগুনের দিকে তাকিয়ে শ্যাডো উপলব্ধি করতে পারল, ওটার জ্বালানী হচ্ছে হাড়! পাঁজরের হাড়...মাথার খুলি আর পায়ের হাড় বেরিয়ে আছে আগুনের ভেতর থেকে। 'গাছে তিনদিন, অন্তপুরীতে তিনদিন আর ফিরে আসার জন্য তিনদিন।'

আচমকা এমন তীব্রভাবে জ্বলে উঠল আলো, যে মুখ ঘুরিয়ে নিতে হলো শ্যাডোকে। গাছের দিকে...অন্ধকারের দিকে তাকাল ও।

দরজায় নকের শব্দে চোখ খুলল শ্যাডো, এখন জানালা দিয়ে চাঁদের আলো ভেতরে ঢুকছে। আচমকা শব্দ হওয়ায় চমকে গিয়েছে ও, ঝটকা দিয়ে বসেছে। 'ডিনার দেয়া হয়েছে।' মিডিয়ার কণ্ঠ কানে এলো।

জুতা আবার পরে নিয়ে করিডরে পা রাখল সে, কে যেন কিছু মোম খুঁজে পেয়ে ওগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। মোমের হালকা হলদে আলোয় অন্ধকার কতটুকু দূর হয়েছে তা বলা মুশকিল। হামভির ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে রিসিপশন হলে, কার্ডবোর্ডের একটা ট্রে আর একটা কাগজের থলে ধরে আছে। লোকটার পরনে লম্বা, কালো কোট। মাথায় শোফারের ক্যাপ।

'দেরির জন্য দুঃখিত।' কর্কশ কণ্ঠে বলল সে। 'সবার জন্য একই খাবার-বার্গার, ফ্রাই, কোক আর পাই। আমারটা আমি গাড়িতে বসেই খেয়ে নেব।' খাবারগুলো নামিয়ে রেখে আবার বাইরে বেরোল লোকটা। লবি এখন ফাস্ট ফুডের গন্ধে ম ম করছে। কাগজের থলেটা তুলে নিয়ে সবার মাঝে খাবার, ন্যাপকিন আর কেচাপের প্যাকেট বণ্টন করে দিল শ্যাডো।

নীরবে খেয়ে চলল সবাই, শব্দ বলতে কেবল মোম গলার হিস হিস আওয়াজ।

টাউন যে ওকে চোখ ফুলিয়ে দেখছে, তা নজর এড়ালো না শ্যাডোর। চেয়ারটা একটু সরাল ও, যেন দেয়ালের দিকে পিঠ থাকে। মুখের কাছে ন্যাপকিন ধরে বার্গার খাচ্ছে মিডিয়া।

'হায়রে, বার্গার সব ঠান্ডা।' মোটা ছেলেটা বলে উঠল। এখনও চোখে রোদ-চশমা পরে আছে। রাতের বেলা রোদ এলো কোত্থেকে, তা বুঝতে পারল না শ্যাডো। তার উপর ঘরটাও অন্ধকার।

'সে জন্য দুঃখিত,' বলল টাউন। 'একদম কাছের ম্যাকডোনাল্ড'সটাও নেব্রাস্কায়!'

প্রায় ঠান্ডা হয়ে আসা হ্যামবার্গার আর ঠান্ডা ফ্রাই দিয়ে রাতের খাবার সারল সবাই। এরপর পাইয়ে কামড় বসাল মোটা ছেলে। সবকিছু ঠান্ডা হয়ে গেলেও, পাইয়ের ভেতরের অংশটুকু ঠিকই গরম আছে। 'আও,' পাইয়ের ভেতরের অংশ চিবুকে এসে পড়ায় আঁতকে উঠল সে। 'জ্বলছে! যে কোনদিন মামলা খেয়ে বসবে এর নির্মাতা।'

ছেলেটাকে আঘাত করার অদম্য এক ইচ্ছা পেয়ে বসল শ্যাডোকে। আসলে এখন না, সেই অনেক আগে লিমোতে যখন লোক দিয়ে ওকে পিটিয়েছিল মোটকু, তখন থেকেই হাত নিসপিস করছে ওর। তবে নিজেকে সামলে নিল। 'ওয়েনসডের দেহটা নিয়ে এখনই এখান থেকে চলে যাওয়া যায় না?' জানতে চাইল ও।

'ঠিক মাঝরাতে নেয়া যাবে।' একইসাথে বলে উঠল মি. ন্যান্সি আর মোটকু।

'এসব নিয়ম মেনে করতে হয়।' চেরনোবোগ জানাল।

'বুঝলাম,' শ্যাডোর বিরক্তি চাপা রইল না। 'কিন্তু এই নিয়মগুলো যে কী, তা-ই তো কেউ জানাচ্ছে না। নিয়ম...নিয়ম করে মুখে ফেনা তুলছে সবাই। অথচ কী খেলা যে খেলছি, আমি তাই জানি না।'

'আমার মনে হয়, নিয়মের পুরো ব্যাপারটাই বেহুদা।' বলল টাউন। 'তবে যদি এসব মানলে গ্রাহক খুশি হয়, তাহলে আমার এজেন্সিও খুশি। আমারও মানতে কোন আপত্তি নেই।' কোকে চুমুক দিল সে। 'ঠিক মাঝরাতে লাশ নিয়ে তোমরা বিদায় হবে। আমরা বিদায় জানাব হাত নেড়ে। তারপর ইঁদুরের বাচ্চার মতো খুঁজে বের করে তোমাদের প্রত্যেককে চুবিয়ে মারব।'

'ভালো কথা,' মোটকু শ্যাডোকে বলল। 'তোমার মনিবকে বলতে বলেছিলাম-সে এখন প্রাচীন এক ইতিহাস। বলেছিলে?'

'হ্যাঁ।' জানাল শ্যাডো। 'উত্তরে তিনি কী বলেছিলেন শুনবে? বলেছিলেন, ওই মোটা-হোঁতকাকে বোলো, আজকের ভবিষ্যৎ, আগামীর অতীত ছাড়া কিছু না।' ওয়েনসডে সত্যি সত্যি অমন কিছু বলেননি। তবে এই 'নতুন-দেবতারা' এসব বাক্য ভালো খায়।

মোটকু বলল, 'একেবারেই বাজে জায়গা এটা। বিদ্যুৎ নেই, ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক নেই। যেন সেই প্রস্তর-যুগে ফিরে এসেছি।' স্ট্র দিয়ে কোক টানল ছেলেটা, এরপর খালি কাপটা টেবিলে রেখে করিডর ধরে উধাও হয়ে গেল।

ময়লাগুলো এক করে থলের ভেতর রাখল শ্যাডো। 'আমেরিকার কেন্দ্র দেখতে যাচ্ছি,' ঘোষণা করল ও। উঠে দাঁড়িয়ে পা রাখল বাইরে, অন্ধকারের মাঝে। মি. ন্যান্সি সাথে এলো। একসাথে পার্কে ঘুরে বেড়াল ওরা, পাথরের স্মৃতিস্তম্ভের কাছে পৌঁছাবার আগে কেউ কিছু বলল না। বাতাস বইছে, কিন্তু ইতস্ততভাবে। একবার এদিক দিয়ে তো আরেকবার ওদিক। 'এখন কী?' জানতে চাইল শ্যাডো।

অন্ধকার আকাশে ভেসে আছে অর্ধ-চন্দ্র।

'এখন,' জানাল ন্যান্সি। 'তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাবে। দরজা বন্ধ করে চেষ্টা করবে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে। ঠিক মাঝরাতে আমরা লাশটা হাতে পাব। তারপর এখান থেকে সোজা বেরিয়ে যাব। কেন্দ্রে কারওই বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না।'

'আপনি যা বলেন।'

সিগারেল্লো ধরিয়েছে মি. ন্যান্সি। 'এমনটা হওয়াই উচিৎ হয়নি।' বলল সে। 'আমাদের মতো...আমরা আসলে অমিশুক। দলগতভাবে থাকতে পারি না, এমনকি আমিও না। বাক্কাসই বেশিদিন পারেনি। একা একা...অথবা নিজেদের ছোট্ট দলে সময় কাটাই আমরা। বড় একটা দলে টিকতে পারি না বেশিদিন। আমরা চাই, সবাই আমাদের প্রশংসা করুক, উপাসনা করুক। আমি চাই মানুষ আমাকে নিয়ে গল্প বলুক, আমার বুদ্ধিমত্তার কথা ছড়িয়ে দিক চারিদিকে। চারিত্রিক দুর্বলতা এটা, জানি আমি। আমরা চাই বড় কিছু হয়ে থাকতে, কিন্তু আজকের দিনে আমরা একেবারেই ক্ষুদ্রকায় অস্তিত্ব। নতুন দেবতারা জন্ম নেয়, আবার হারিয়ে যায় স্মৃতির অতলে। এই দেশটা আসলে বেশিক্ষণ কোন দেবতাকে সহ্য করতে পারে না। ব্রহ্মা সৃষ্টি করে, বিষ্ণু করে প্রতিপালন আর শিব করে ধ্বংস। ব্রহ্মার জন্য নতুন করে সব সৃষ্টি করার উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করে সে।'

'কী বলতে চাইছেন আপনি?' প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল শ্যাডো। 'যুদ্ধ শেষ? লড়াইয়ের এখানেই পরিসমাপ্তি?'

ঘোঁত করল মি. ন্যান্সি। 'পাগল হয়েছ? ওরা ওয়েনসডেকে হত্যা করেছে। শুধু তাই না, গর্ব করে প্রচারও করেছে সেটা। প্রতিটা চ্যানেলে...সবার চোখের সামনে দেখিয়েছে। না শ্যাডো, যুদ্ধের তো সবে কেবল শুরু।'

স্মৃতিস্তম্ভের পাদদেশের কাছে ঝুঁকল লোকটা, সিগারেল্লো নিভাল মাটিতে। রেখে দিল ওখানেই...ওভাবেই...

'আগে আপনি অনেক ঠাট্টা করতেন,' বলল শ্যাডো। 'এখন আর করেন না।'

'আজকাল কেন জানি ঠাট্টাটা আসে না। ওয়েনসডে মৃত। ভেতরে আসবে না?'

'আসব। আপনি যান, আমি আসছি।'

মোটেলের দিকে রওনা দিল ন্যান্সি। শ্যাডো হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল স্মৃতিস্তম্ভটাকে। এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা দিল ছোট চ্যাপেলটাকে লক্ষ করে। খোলা দরজা দিয়ে ওটার ভেতরে প্রবেশ করল ও। একদম কাছের বেঞ্চটাকে খুঁজে নিয়ে বসল ওতে, চোখ বন্ধ আর মাথা নিচু করে ভাবতে শুরু করল-লরার কথা, ওয়েনসডের কথা...বেঁচে থাকার কথা।

আচমকা পেছন থেকে একটা 'ক্লিক' শব্দ ভেসে এলো, সেই সাথে মাটিতে পা ফেলার আওয়াজ। উঠে বসে পেছনে ফিরল শ্যাডো, খোলা দরজার ওপাশে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদের আলো পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে ধাতব কিছু।

'গুলি করবে?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'হা যীশু, করতে পারলে খুশি হতাম।' বলল মি. টাউন। 'আত্মরক্ষার্থে খুন করা যায়। যাই হোক, প্রার্থনা করছ? নিশ্চয় ভাবছ, এরা সবাই দেবতা। ভুল করছ, এরা দেবতা নয়।'

'প্রার্থনা করছিলাম না,' বলল শ্যাডো। 'ভাবছিলাম।'

'আমার মনে হয়,' বলল টাউন। 'এরা আসলে মিউটেশন, বিবর্তনের পরীক্ষা। কারও হালকা-পাতলা সম্মোহিত করার ক্ষমতা আছে, সেই সাথে একটু জাদু-মন্ত্রের ভেক ধরে মানুষকে ধোঁকা দিতে চায়...এছাড়া আর কিছু না। হাজার হলেও, ওরা সাধারণ মানুষের মতোই মৃত্যুবরণ করে!'

'সব সময়ই করত।' বলে উঠে দাঁড়াল শ্যাডো। এক পা পিছিয়ে এলো টাউন। ছোট চ্যাপেলটা থেকে বেরিয়ে এলো ও, মি. টাউন রইল কিছু দূরেই। 'এই, তুমি কি লুইসি ব্রুকসকে চেন?'

'তোমার বন্ধু নাকি?'

'নাহ, অভিনেত্রী ছিল।'

একটু বিরতি নিল টাউন। 'মনে হয় নাম পরিবর্তন করেছে। এখন হয়তো লিয টেইলর বা শ্যারন স্টোন নামে পরিচিত।'

'হতে পারে,' মোটেলে ফিরে চলল শ্যাডো, তাল মিলিয়ে এগোল টাউনও।

'তোমার এই মুহূর্তে জেলে থাকা উচিৎ।' বলল লোকটা। 'ফাঁসিতে ঝোলা উচিৎ তোমার।'

'আমি তোমার সহকর্মীদেরকে খুন করিনি।' জানাল শ্যাডো। 'তবে তোমাকে একটা কথা বলি, জেলে থাকার সময় শুনেছিলাম। আর কখনও ভুলিনি।'

'বলো।'

'সারা বাইবেল ঘেঁটে এমন মাত্র একজনের নাম পাবে, যাকে যীশু স্বর্গে নেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। সেই লোক পিটার না, পল না। সে এক ছিঁচকে চোর, যাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হচ্ছিল। তাই মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তদের ছোট করে দেখ না।'

হামভির কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল চালক। 'শুভ রাত্রি, জেন্টেলমেন।' ওদেরকে দেখে বলল সে।

'শুভ রাত্রি,' উত্তরে বলল টাউন। এরপর শ্যাডোকে উদ্দেশ করে যোগ করল। 'ব্যক্তিগতভাবে এসবে আমার কিছু যায় আসে না। আমি তাই করি, যা আমাকে মিস্টার ওয়ার্ল্ড করতে বলেন। ব্যস, সবকিছু বড় সহজ হয়ে যায়।'

করিডর ধরে ওর ঘর, নয় নাম্বার রুমের সামনে এসে দাঁড়াল শ্যাডো।

তালা খুলে ভেতরে প্রবেশ করেই বলল, 'দুঃখিত। আমি মনে করেছিলাম এটা আমার ঘর।'

'ভুল করোনি,' বলল মিডিয়া। 'আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।' চাঁদের আলোয় মেয়েটার চেহারা, তার চুল-সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে শ্যাডো।

'আমি অন্য কোন খালি ঘর খুঁজে নিচ্ছি।'

'আমি বেশিক্ষণ থাকব না।' জানাল মেয়েটা। 'ভাবলাম, তোমাকে একটা প্রস্তাব দেবার এটাই উপযুক্ত সময়।'

'কী প্রস্তাব?'

'আরে...শান্ত হও।' মুচকি হেসে মিডিয়া বলল। 'দেখো, ওয়েনসডে আর নেই। তুমি কারও প্রতি আর দায়বদ্ধ নও। আমাদের দলে যোগ দাও।'

কিছুই বলল না শ্যাডো।

'আমরা চাইলেই তোমাকে বিখ্যাত বানাতে পারি, শ্যাডো। তোমাকে ক্ষমতাশালী করে তুলতে পারি। তুমি হতে পারো পরবর্তী ক্যারি গ্রান্ট। হতে পারো পরবর্তী বিটলস।'

'এর চাইতে লুসির দুধ দেখার প্রস্তাবটা ভালো ছিল।'

'আহ।'

'আমার ঘরটা ফেরত চাই। শুভ রাত্রি।'

'অবশ্য,' এমনভাবে বলল মিডিয়া যেন শ্যাডোর কথা শুনতেই পারেনি। 'চাইলেই তোমাকে ধ্বংস করে দিতে পারি। তোমাকে দেখলেই যেন সবাই হাসাহাসি করে, সে ব্যবস্থা করতে পারি। নাকি তোমাকে কোন পিশাচ বানিয়ে রেখে দেব সবার স্মৃতিতে? ম্যানসনের মতো, হিটলারের মতো পিশাচ?'

'আমি দুঃখিত, ম্যাম। তবে খুব ক্লান্ত হয়ে আছি।' বলল শ্যাডো। 'তুমি বিদায় নিলে প্রীত হই।'

'তোমাকে দিতে চেয়েছিলাম সারা বিশ্ব,' বলল মেয়েটা। 'যখন নর্দমায় পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে, তখন কথাটা ভেবে দেখ।'

'দেখব।'

মিডিয়া বিদায় নিলেও, তার সুগন্ধ ছেড়ে গেল ঘরটায়। নগ্ন জাজিমে শুয়ে লরার কথা ভাবল ও। মনে পড়ল লরার ফ্রিসবি খেলার দৃশ্য; রুট বিয়ার খেতে ভালোবাসত মেয়েটা, ভালোবাসত নিত্য-নতুন কেনা আন্ডারওয়্যার পরে ওকে দেখাতে। কিন্তু যে দৃশ্যটাই মনে ফুটে উঠুক না কেন, সবগুলো শেষ হয় একইভাবেঃ লরার মৃত্যুর মুহূর্তটায়। যে মুহূর্তে রবির পুরুষাঙ্গ মুখে নিয়েছিল মেয়েটা। প্রতিবার কষ্ট দিয়ে ভেঙে যায় ছবিটা।

তুমি মৃত নও,বলেছিল লরা। তাই বলে বাঁচছ, সেটাও আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না।

দরজায় নক হলো একটা। মোটকু ছেলেটা এসেছে। 'ওই হ্যামবার্গারগুলো,' বলল সে। 'খুব একটা ভালো না! বিশ্বাস হয়, প্রায় পঞ্চাশ মাইলের মাঝে কোন ম্যাকডোনাল্ড'স নেই? আমার ধারণাই ছিল না যে দুনিয়াতে এমনও কোন জায়গা আছে!'

'এই জায়গাটা আস্তে আস্তে গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনে পরিণত হচ্ছে।' বলল শ্যাডো। 'যাক গে, কেন এসেছ? আমাকে ইন্টারনেটের স্বাধীনতার লোভ দেখাতে?'

কাঁপছে মোটকু। 'নাহ, তোমার মৃত্যু লেখা হয়ে গিয়েছে। তুমি তো আসলে অতি-প্রাচীন হাতে লেখা একটা পাণ্ডুলিপি, চাইলেও তোমাকে ডিজিটালাইযড করা যাবে না। আমি আধুনিক...তুমি প্রাচীন...' শ্যাডোর মনে হলো, অদ্ভুত একটা গন্ধ আসছে ছেলেটার দেহ থেকে। জেলখানায় শ্যাডোর অপর পাশে আরেকজন কয়েদি ছিল। শ্যাডো তার নাম কখনও জানতে পারেনি। আচমকা একদিন, ঠিক মধ্য দুপুরে, কাপড়-চোপড় খুলে সবাইকে বলতে শুরু করলঃ ওর মতো যারা সত্যি সত্যি ভালো মানুষ, তাদেরকে স্পেস শিপে করে নিয়ে যাবার জন্য পাঠানো হয়েছে ওকে। এরপর আর কখনও লোকটাকে দেখেনি শ্যাডো। মোটকুর দেহ থেকে এই মুহূর্তে যে গন্ধটা আসছে, সেটা ওই একবারই, ওই পাগলের দেহে পেয়েছিল।

'কোন কাজ আছে তোমার?'

'কথা বলতে চেয়েছিলাম,' বলল হোঁতকা, তার কণ্ঠে করুণার আহ্বান। 'আমার ঘরটা কেমন যেন। এই আরকি। আমাকে তোমার সাথে এখানে কিছুক্ষণ থাকতে দেবে?'

'তোমার লিমোর বন্ধুদের কী হলো? যাদেরকে দিয়ে আমাকে পিটিয়েছিলে? তাদের কাউকে নিয়ে এসো।'

'আমরা এখন ডেড জোনে আছি, ওরা আসতে পারবে না।'

শ্যাডো বলল, 'মাঝরাতের দেরী আছে, ভোরের তো আরও অনেক। তোমার বিশ্রাম দরকার, আমারও তাই।'

মোটকু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর নড করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল শ্যাডো, শুয়ে পড়ল জাজিমে।

কয়েক মুহূর্ত পর আবার শুরু হলো আওয়াজ। কীসের আওয়াজ, সেটা বুঝতে কিছুক্ষণ সময় লাগল ওর। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে এলো হলওয়েতে। মোটকু ছেলেটা নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছে। মনে হচ্ছে যেন সে বড়-সড় কিছু একটা বারবার দেয়ালে ছুঁড়ে মারছে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে, ছেলেটা নিজেকেই ছুঁড়ছে।

'আমি...' সম্ভবত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ছেলেটা। নিশ্চিত হতে পারল না শ্যাডো।

'চুপ করো!' চেরনোবোগের ঘর থেকে একটা চিৎকার ভেসে এলো।

মোটেলের বাইরে চলে এলো শ্যাডো, ক্লান্ত লাগছে খুব।

চালক এখনও হামভির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। 'ঘুম ধরছে না, স্যার?' জানতে চাইল সে।

'না।' উত্তর দিল শ্যাডো।

'সিগারেট, স্যার?'

'নাহ, লাগবে না।'

'আমি ধরালে কিছু মনে করবেন?'

'একদম না।'

একটা ডিসপোজেবল লাইটার ব্যবহার করে আগুন ধরাল ড্রাইভার, সেই হালকা হলদে আলোতে লোকটার চেহারা দেখতে পেল শ্যাডো। চিনতে কষ্ট হলো না কোন, আস্তে আস্তে সব কিছু পরিষ্কার হতে শুরু করল ওর সামনে।

চিকন-চাকন চেহারাটা পরিচিত ওর। জানে, ক্যাপটা সরালেই ছোট করে কাটা কমলা চুল দেখতে পাবে। এ-ও জানে, হাসতে গেলেই লোকটার চেহারায় দেখা যাবে লক্ষ লক্ষ ক্ষত।

'দেখে তো মনে হচ্ছে ভালোই আছ!' বলল ড্রাইভার।

'লো কী?' প্রাক্তন সেলমেটের দিকে ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শ্যাডো।

জেলের বন্ধুত্ব বিশেষ কিছু; খারাপ সময় আর খারাপ স্থান থেকে রক্ষা করে তা। কিন্তু এমন বন্ধুত্বের শুরু যেখানে, শেষটাও সেখানেই-জেলের চার দেয়ালের ভেতর। বাইরের মুক্ত জীবনে এমন কোন বন্ধুর সাথে দেখা হোক, তা চায় না কেউ।

'হায় যীশু, লো কী লেস্মিথ।' বলল শ্যাডো, নিজের কানেই ধরা পড়ল ব্যাপারটা। 'লোকি। লোকি লাই-স্মিথ! মিথ্যার জনক লোকি!'

'মাথাটা একটু কম চলে তোমার,' বলল লোকি। 'তবে শেষ পর্যন্ত ধরতে পেরেছ।' হালকা হাসি খেলে গেল ওর মুখে।

শ্যাডোর ঘরে বসে আছে দুই প্রাক্তন সেলমেট। বিছানায়...জাজিমের দুই পাশে বসে আছে দুজন। মোটকুর ঘর থেকে আসা আওয়াজ এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

'তোমার কপাল ভালো, আমার সাথে এক সেলে ছিলে।' বলল লোকি। 'নইলে এক বছরও টিকতে না।'

'চাইলেই যে কোন মুহূর্তে জেল থেকে বেরোতে পারতে না?'

'তার চাইতে সময়টা জেলে কাটিয়ে দেয়াই ভালো ছিল।' একটু বিরতি দিয়ে যোগ করল লোকি। 'দেবতার ব্যাপার-স্যাপার বুঝতে হবে তোমাকে। ব্যাপারটা ঠিক জাদু নয়। ব্যাপারটা মানুষের বিশ্বাসের। চারপাশে যত বিশ্বাস আছে, সবগুলোকে এক করে ঘনত্ব বাড়াবার। যেন আমরা হতে পারি মানুষের চাইতেও বেশি কিছু।' আবার বিরতি দিল সে। 'তারপর একদিন...একেবারে আচমকা মানুষ তোমাকে ভুলে যাবে। কেউ আর বিশ্বাস রাখবে না তোমার উপর। উপাসনা, উৎসর্গ-এগুলো তো বাদই দিলাম। তারপর আর কি, আমাদেরকে ব্যস্ত হতে হয় ব্রডওয়ের কর্নারে বসে তাস পেটাবার কাজে।'

'তুমি আমার সেলে গেলে কেন?'

'কাকতালীয় ব্যাপার, আর কিছু না।'

'এখন বিপক্ষের হয়ে কাজ করছ।'

'চাইলে সে কথা বলতে পারো। লাইনের কোন পাশে দাঁড়িয়ে আছ, সেটার উপর নির্ভর করছে সবকিছু। আমার যা মনে হয় তা বলি-আমি বিজয়ী দলে আছি।'

'কিন্তু তুমি আর ওয়েনসডে, তোমরা দুজন তো একই...কী বলে ওটাকে-'

'নর্স দেবতা আমরা দুজনেই। এটাই তো বলতে চাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'তো?'

ইতস্তত করল শ্যাডো। 'এককালে নিশ্চয় বন্ধু ছিল তোমরা।'

'না। আমরা কখনওই বন্ধু ছিলাম না। লোকটা মারা গিয়েছে, তাতে আমার কোন আফসোস নেই। আমাদেরকে আটকে ধরে রেখেছিল সে। এখন যেহেতু ও নেই, তাই সামনের দিকে তাকাতে পারি আমরা। হয় আমাদেরকে পরিবর্তন মেনে নিতে হবে, আর নয়তো ধ্বংস হতে হবে। ওয়েনসডে নেই, যুদ্ধও নেই।'

বিভ্রান্ত চোখে লোকির দিকে তাকাল শ্যাডো। 'তুমি যে এতটা বোকা নও, তা আমি জানি।' বলল সে। 'ওয়েনসডের মৃত্যুতে কিছুই থামবে না। বরঞ্চ এখন সবাই এক হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে। গত কয়েকমাস খেটে-খুটে তিনি যা করতে পারেননি, তাকে মেরে ফেলে এক মুহূর্তেই তোমরা তা করে দেখিয়েছ!'

'হয়তো!' শ্রাগ করল লোকি। 'আমার তো মনে হয়, ঝামেলা সৃষ্টিকারী সরে গেলে সরে যাবে ঝামেলাও। আর তাছাড়া, এসব আমার মাথা ব্যথা না। আমি এক নগণ্য ড্রাইভার।'

'একটা প্রশ্নের উত্তর দাও,' প্রশ্ন করল শ্যাডো। 'আমাকে নিয়ে সবাই এত ব্যস্ত কেন। এমনভাব করছে সবাই যেন আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমার এত দাম কেন?'

'আমি কী জানি! তুমি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা ওয়েনসডের কাছে তোমার গুরুত্ব ছিল। আর তার কাছে কেন তোমার গুরুত্ব...তা এখন আর কোন দিনই জানা যাবে না। জীবনের এক অমীমাংসিত রহস্য ধরে নাও।'

'রহস্যে রহস্যে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

'তাই নাকি? আমার মনে হয়, রহস্য আসলে নুনের মতো, স্বাদ বাড়ায়।'

'নগণ্য এক ড্রাইভার বললে নিজেকে। সবার হয়েই গাড়ি চালাও?'

'যার আমাকে দরকার হয়, তার জন্যই চালাই। জীবিকা বলতে পারো।' চেহারার কাছে হাতঘড়ি তুলে একটা বোতাম চাপল লোকি। ডায়ালগুলোতে নরম নীল আলো জ্বলতে শুরু করল। 'মাঝরাতের আর পাঁচ মিনিট বাকি আছে। আসবে?'

বড় করে একটা শ্বাস নিল শ্যাডো। 'আসছি।'

অন্ধকার মোটেলের পাঁচ নম্বর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল দুজন।

পকেট থেকে একটা ম্যাচের বাক্স বের করে আগুন ধরাল লোকি, আচমকা জ্বলে ওঠা আলোয় চোখে ধাঁধাঁ লেগে গেল শ্যাডোর। একটা একটা করে মোমবাতি ধরাতে শুরু করল লোকি। বিছানার মাথায়, সিঙ্কে আর জানালার ধারে রাখা হয়েছে ওগুলো।

ঘরের বিছানাটা দেয়াল থেকে সরিয়ে ঠিক মাঝখানে নিয়ে আসা হয়েছে। ফলে চারদিকের দেয়াল থেকে ওটার দূরত্ব কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র কয়েক ফুটে। বিছানার উপর চাদর বেছান, মোটেলের পুরনো আর পোকায় কাটা চাদর। সেটার উপর শুয়ে আছেন ওয়েনসডে।

মৃত্যুর সময় যে হালকা রঙের স্যুটটা পরে ছিলেন, সেটাই পরা আছেন এখনও। তার চেহারার ডান দিকটা কেউ স্পর্শ পর্যন্ত করেনি, আগের মতোই আছে। কিন্তু বাঁ দিকটার অবস্থা খারাপ। বাম কাঁধ আর স্যুটের সামনের দিকটা

কালো দাগে ভর্তি। হাত দুটো দুপাশে ছড়ানো, চেহারার ভাবটাকে কোনভাবেই শান্ত বলা যায় না। যেন ব্যথা পেয়েছেন তিনি খুব; রাগ আর নিখাদ উন্মাদনায় ভরে আছে চেহারা। সেই সাথে কিছুটা সন্তুষ্টিও আছে ওখানে কোথাও।

মি. জ্যাকুয়েলের হাতে পড়লে, ওই ব্যথা আর রাগ মুছে যাবে নিমিষেই-ভাবল শ্যাডো। মৃত্যু তাকে যে সম্মানটা দেয়নি, সেটা দক্ষ হাতে দিতে পারত সে।

তবে হ্যাঁ, মৃত্যুও পারেনি দেহটাকে সংকুচিত করে তুলতে। তাছাড়া এখনও জ্যাক ড্যানিয়েল'সের হালকা গন্ধ ভেসে আসছে ওয়েনসডের কাছ থেকে।

বাতাস বাড়ছে, আমেরিকার কাল্পনিক কেন্দ্রকে ঘিরে উড়ে বেড়াচ্ছে তারা। জানালার সাথে থাকা মোমের আলো জানান দিচ্ছে বাতাসের উপস্থিতি।

হলওয়ে থেকে ভেসে আসা পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল শ্যাডো। কেউ একজন দরজায় নক করে বলল, 'তাড়াতাড়ি করো। সময় হয়েছে।' একে একে ঢুকতে শুরু করল সবাই।

প্রথমে এলো টাউন, তার পিছু পিছু মিডিয়া ও মি. ন্যান্সি আর চেরনোবোগ। একেবারে শেষে এলো মোটা-হোঁতকা। বিড় বিড় করে কী যেন বলছে সে, অথচ শব্দ বেরোচ্ছে না কোন। ছেলেটাকে দেখে করুণা বোধ করল শ্যাডো।

বিনাবাক্য ব্যয়ে, এবং কোন আনুষ্ঠানিকতার ধার না ধেরে লাশটাকে ঘিরে ধরল তারা। ছোট জায়গাটায় হাত বাড়ালেই পাশের জনকে ছোঁয়া যাবে, এমন অবস্থা। ঘরের আবহাওয়া ধার্মিকতায় পূর্ণ। এমনটা আগে কখনও দেখেনি শ্যাডো।

'আমরা এই দেবতাহীন জায়গায় একত্র হয়েছি,' মুখ খুলল লোকি। 'এই ব্যক্তির লাশ হস্তান্তরের জন্য, যেন তার শেষকৃত্য নিয়ম মেনে পালন করা সম্ভব হয়। কেউ যদি কিছু বলতে চান তো বলতে পারেন।'

'আমার কিছু বলার নেই।' বলল টাউন। 'জীবনে এর সাথে কোন বাক্য-বিনিময় হয়েছে বলেও মনে হয় না।'

চেরনোবোগ বলল, 'এসব কর্মকাণ্ডের মূল্য চুকাতে হবে তোমাদের, জানো তো? যা করেছ, তাতে কোন কিছু শেষ হয়ে যায়নি। বরং শুরু হয়েছে।'

মোটকু খিল খিল করে মেয়েদের মতো উচ্চ কণ্ঠে হাসতে শুরু করল আচমকা। সে বলল, 'বুঝতে পেরেছি।' তারপর একদম আচমকা শুরু করে দিল আবৃত্তিঃ

'ঘুরছে তো ঘুরছেই সবকিছু,
ঈগল অমান্য করছে পাখি-পালককে;
ধ্বসে পড়ছে সব; কেন্দ্র ধরে রাখতে পারছে না কিছুতেই...'

আচমকা আবার থমকে গেল ছেলেটা, ভ্রূ কুঁচকে গিয়েছে। বলল, 'ধুরো, আগে পুরোটাই মুখস্থ ছিল।' মুখ বিকৃত হয়ে গেল তার।

হঠাত সবাই তাকাল শ্যাডোর দিকে। বাতাস এখন চিৎকার করতে শুরু করেছে। যুবক বলল, 'পুরো ব্যাপারটাই ঘৃণিত। এখানে উপস্থিত তোমাদের অর্ধেক হয় তাকে খুন করেছ, নয়তো সেই ঘটনার সাথে সরাসরি সংযুক্ত ছিলে। এখন ওয়েনসডের দেহ ফিরিয়ে দিচ্ছ আমাদের? খুব ভালো। মানছি, লোক হিসেবে তিনি খুব একগুঁয়ে ছিলেন। তবে আমি ওর মীড পান করেছি, এখনও ওর হয়ে কাজ করি। আমার কথা শেষ।'

মিডিয়া মুখ খুলল এবার, 'এমন এক দুনিয়াতে আছি আমরা, যেখানে প্রতিদিন অনেক মানুষ মারা যায়। তাই একটা ব্যাপার মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের কাছ থেকে চলে যাওয়া মানুষের জন্য আমরা যতগুলো মুহূর্ত দুঃখ পাই, ততগুলো আনন্দের মুহূর্তই আমাদেরকে উপহার দেয় সদ্য জন্ম নেয়া কোন বাচ্চা। সেই প্রথম কান্না, জাদুময় একটা ব্যাপার নয় কি? হয়তো কথাটা খারাপ শোনায়, কিন্তু আনন্দ আর দুঃখ যেন দুধ আর কুকি। এরচেয়ে ভালো সম্পর্ক আর কিছু হয় না। ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের সবার ভাবা দরকার।'

গলা পরিষ্কার করল মি. ন্যান্সি। 'আর কেউ যেহেতু কথাটা বলছে না, তাই আমিই বলি। আমরা কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছিঃ এমন এক দেশের কেন্দ্রে, যেখানে কারও দেবতাদের নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। আর এইখানে...এই জায়গায় তো আরও না। শান্তিচুক্তিকে সম্মান দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই আমাদের। তোমরা আমাদেরকে আমাদের বন্ধুর লাশ দিয়েছ, সেটা আমরা নিচ্ছি। তবে শুনে রাখ, এর দাম চুকাতে হবে তোমাদের। রক্তের বিনিময়ে রক্ত, হত্যার বিনিময়ে হত্যা।'

'যত্তসব,' বলল টাউন। 'বাসায় গিয়ে মাথায় গুলি ঢুকিয়ে দাও, তাতে আমাদের অনেক সময় আর কষ্ট-দুটাই বাঁচবে।'

'চুলোয় যাও,' রাগে গর্জে উঠল চেরনোবোগ। 'তুমি, তোমার পরিবার সবাই চুলোয় যাও। যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার মৃত্যু হবে না, তোমার রক্ত ঝরাবে না কোন যোদ্ধা। নগণ্য এক মৃত্যু লেখা আছে তোমার কপালে। ঠোঁটে চুমু আর বুকে মিথ্যা নিয়ে মারা যাবে তুমি।'

'চুপ করো, বুড়ো।' বলল টাউন।

বাতাসের চিৎকার যেন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

'ঠিক আছে, লাশটা এখন তোমাদের।' বলল লোকি। 'আমাদের কাজ শেষ। বুড়োকে নিয়ে যেতে পারো।'

আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করল সে, সাথে সাথে টাউন, মিডিয়া আর মোটকু বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। শ্যাডোর দিকে তাকিয়ে হাসল ও। 'এ ভুবনে আসলে কেউ সুখী নয়, তাই না?' বলে সে নিজেও বিদায় নিল।

'এখন কী?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'এখন ওকে জড়িয়ে নিয়ে,' বলল আনানসি। 'আমরা বিদায় নেব।'

মোটেলের চাদরেই দেহটাকে জড়িয়ে নিল ওরা। বয়স্ক দুজন লাশটাকে নিয়ে গেল করিডর পর্যন্ত। তারপর শ্যাডো বলল, 'একটু দাঁড়ান।' হাঁটু ভাঁজ করে লাশটাকে কাঁধে তুলে নিল সে, এরপর একদম অল্প আয়াসে উঠে দাঁড়াল। 'আমি নিচ্ছি,' বলল ও। 'চলুন, গাড়িতে নিয়ে যাওয়া যাক।'

চেরনোবোগকে দেখে মনে মনে হলো যেন তর্ক করবে, কিন্তু মুখ খুলল না। ওয়েনসডের দেহ বেশ ভারী হলেও, খুব একটা কষ্ট হলো না শ্যাডোর। অবশ্য এছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। করিডর ধরে ফেলা প্রতিটা পদক্ষেপের সাথে ওয়েনসডের বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেল ওর, গলায় পেল মীডের স্বাদ। *আমার সুরক্ষা এখন তোমার হাতে। আমাকে বিভিন্ন জায়গায় আনা-নেয়া করবে, ছোট-খাটো কাজ করে দেবে। দরকার হলে...আবারও বলছি, দরকার হলে অবাধ্য কাউকে পোষও মানাতে হবে তোমার। আমি মারা গেলে, তুমি আমার হয়ে শোক পালন করবে।*

মি. ন্যান্সি ওর জন্য মোটেল লবির দরজা খুলে ধরল, তারপর দ্রুত এগিয়ে খুলল গাড়ির পেছনের দরজা। বিপক্ষের চারজন হামভির পাশে দাঁড়িয়ে আছে, যেন দাঁড়িয়ে আছে ওদের চলে যাবার অপেক্ষায়। লোকি এতক্ষণে মাথায় চড়িয়েছে ক্যাপটা।

আস্তে করে ওয়েনসডের দেহটা গাড়িতে নামিয়ে রাখল শ্যাডো। কাঁধে কারও টোকা টের পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। টাউন দাঁড়িয়ে আছে, ওর দিকেই হাত বাড়ান। কিছু একটা ধরে আছে সে।

'এটা,' বলল লোকটা। 'মিস্টার ওয়ার্ল্ড তোমাকে দিয়েছে।'

জিনিসটা ওয়েনসডের কাঁচের চোখ, মাঝখানে চির ধরেছে ওটার। সামনের কিছুটা অংশ ভেঙে গিয়েছে।

'মেসনিক হল পরিষ্কার করার সময় জিনিসটা পেয়েছি। সৌভাগ্যের জন্য দিচ্ছি তোমাকে। দরকার হবে সামনে।'

চোখটাকে আঁকড়ে ধরল শ্যাডো। কড়া কথা শোনাতে ইচ্ছা করছে ওর, কিন্তু টাউন আর দাঁড়িয়ে নেই। এরইমাঝে হামভিতে উঠে বসেছে সে।

পূর্ব দিকে এগোচ্ছে ওরা। সকালের আলো যখন নজরে পড়ল, তখন ওরা মিসৌরিরি প্রিন্সটনে। এরমাঝে এক মুহূর্তের জন্যও চোখ দুটো বন্ধ করেনি শ্যাডো।

ন্যান্সি বলল, 'তোমাকে কোথায় নামিয়ে দেব? তোমার জায়গায় আমি হলে নকল পরিচয়পত্র বানিয়ে কানাডা, নাহয় মেক্সিকো পালিয়ে যেতাম।'

'আমি আপনাদের সাথেই থাকব।' বলল শ্যাডো। 'ওয়েনসডে বেঁচে থাকলে সেটাই চাইতেন।'

'তুমি আর ওর হয়ে কাজ করো না। ওয়েনসডে মারা গিয়েছে। লাশটা জায়গামতো পৌঁছে দেয়ার পর তুমি স্বাধীন।'

'কী করব?'

'যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত মাথা নিচু করে থাকো।' বলল ন্যান্সি।

'সব ঝামেলা শেষ হলে,' যোগ করল চেরনোবোগ। 'আমার কাছে ফিরে এসো। আমি সব কিছুর ইতি টানব।'

'লাশটা কোথায় নিচ্ছি আমরা?' প্রশ্ন করল শ্যাডো।

'ভার্জিনিয়ায়, ওখানে একটা গাছ আছে।' জানাল ন্যান্সি।

'জীবন-বৃক্ষ নাম, নয় দুনিয়ার মাঝে সংযোগ করেছে এটা।' চেরনোবোগ বলল। 'আমার দেশেও ছিল, তবে ওখানে সেটা জন্মেছিল মাটির নিচে।'

'গাছের নিচে শুইয়ে দেব ওকে,' বলল ন্যান্সি। 'এরপর আমাদের কাজ শেষ, তোমারও। আমরা যাব দক্ষিণে, যুদ্ধ হবে। রক্ত বইবে, অনেকে মারা যাব। দুনিয়ায় আসবে পরিবর্তন, অল্প কিছুটা হলেও।'

'আমাকে আপনাদের পক্ষে যুদ্ধে চান না? আমি আকারে কিন্তু বেশ বড়! যোদ্ধা হিসেবেও মন্দ নই।'

শ্যাডোর দিকে তাকিয়ে হাসল ন্যান্সি। লাম্বার কাউন্টি জেল থেকে বেরোবার পর আর এমন হাসি হাসতে দেখা যায়নি লোকটাকে। 'যুদ্ধটা এমন এক জায়গায় হবে, যেখানে তুমি যেতেও পারবে না।'

'মানুষের মন আর হৃদয়ে।' বলল চেরনোবোগ। 'ওই গোলকের মতো।'

'মানে?'

'ক্যারোসেলের কথা বোঝাচ্ছে।'

'ওহ,' বলল শ্যাডো। 'দৃশ্যপটের পেছনে, তাই তো? বুঝতে পেরেছি।'

মাথা তুলে তাকাল মি. ন্যান্সি। 'হুম, আসল যুদ্ধটা সেখানেই হবে।'

'শোক পালনের ব্যাপারটা বলুন।'

'প্রথা একটা, কাউকে না কাউকে লাশের সাথে থাকতে হবে। আমরা খুঁজে নেব সেই কাউকে।'

'ওয়েনসডে চাইতেন, আমি সেই 'কেউ' হই।'

'না।' বলল চেরনোবোগ। 'খুব খারাপ বুদ্ধি, তুমি মারা পড়বে।'

'তাই? মারা পড়ব? একটা লাশের সাথে থাকতে গিয়ে?'

'আমার মৃত্যুর পর এধরনের শোক-পালন চাই না আমি।' বলল মি. ন্যান্সি। 'আমি চাই, আমাকে উষ্ণ কোন জায়গায় শুইয়ে দেয়া হবে। আর যখন সুন্দরী কেউ আমার কবরের উপর দিয়ে হেঁটে যাবে, হাত বাড়িয়ে তার গোড়ালি আঁকড়ে ধরব। ঠিক যেমনটা চলচ্চিত্রে দেখা যায়।'

'আমি অমন দৃশ্য কোন সিনেমায় দেখিনি।' বলল চেরনোবোগ।

'দেখেছেন, ওটার নাম ক্যারি। যাই হোক, কেউ একজন আমাকে এই শোক পালনের ব্যাপারটা খোলাসা করে বলুন।'

'তুমি বলো,' বললেন ন্যান্সি। 'আমি গাড়ি চালাচ্ছি।'

'আমি ক্যারি নামে কোন চলচ্চিত্রের কথা শুনিইনি। তাই তুমি বলো।'

মুখ খুলল ন্যান্সি। 'যে লোকটা শোক পালন করবে, তাকে গাছের সাথে বেঁধে রাখা হবে। যেভাবে ওয়েনসডে ঝুলে ছিল, সেভাবে তাকে ঝুলতে হবে নয় রাত আর নয় দিন। কোন খাবার পাবে না, কোন পানি পাবে না...একদম একা। যদি নয়দিন পরও লোকটা বেঁচে থাকে, তাহলে তাকে নামিয়ে নেয়া হবে। এই তো শোক পালন।'

চেরনোবোগ বলল, 'আলভিসস হয়তো ওর কাউকে পাঠাবে। বামনরা শক্ত-পোক্ত আছে, বাঁচলেও বাঁচতে পারে।'

'আমিই পালন করব।' বলল শ্যাডো।

'না।'

'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল দুই বৃদ্ধ। তারপর ন্যান্সি জানতে চাইল, 'কেন?'

'কেননা যেকোন জীবিত মানুষই কাজটা করতে চাইবে।' বলল শ্যাডো।

'তুমি উন্মাদ।'

'হয়তো। কিন্তু আমি ওয়েনসডের জন্য শোক পালন করব।'

তেল ভরার সময় ওরা থামলে চেরনোবোগ জানাল, অসুস্থ বোধ করছে সে। সামনে বসতে চায়। পেছনে বসতে আপত্তি নেই শ্যাডোর। হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল ও।

চুপচাপ চলল গাড়ি। শ্যাডোর মনে হলো যেন গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

'ওই, চেরনোবোগ,' বেশ কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল ন্যান্সি। 'মোটেলে টেকনিক্যাল বয়ের অবস্থা দেখেছ? ছেলেটাকে অসুস্থ বলে মনে হলো। সহ্য করতে পারবে না, এমন জিনিসে জড়িয়ে পড়েছে মনে হয়। আজকালকার বাচ্চা-কাচ্চাদের নিয়ে এটাই সমস্যা। তারা ভাবে, অনেক অভিজ্ঞতা জড়ো করে

ফেলেছে, জানে সবকিছু। ওদেরকে শেখাতে হলে কড়া পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

'সে-ই তো ভালো।' বলল চেরনোবোগ।

হাত-পা ছড়িয়ে পেছনের সিটে শুয়ে ছিল শ্যাডো, নিজেকে ওর দ্বৈত-সত্ত্বার কেউ বলে মনে হচ্ছে। ওর একটা অংশ আনন্দে উদ্বেল হয়ে আছে-কাজের মতো কাজ করছে একটা বলে ভাবছে। যদি লরার কথা সত্য হয় এবং ও আসলেই 'বাঁচছে না', তাহলে কিছুই করত না সে। কিন্তু না, কিছু একটা করেছে ও। শ্যাডোর আশা, এসব শেষ হবার পরেও বেঁচে থাকবে। তবে দরকার পড়লে মরতেও আপত্তি নেই।

ওর মনের আরেকটা অংশ, এখনও সব কিছুর অর্থ খুঁজে বের করতে চাইছে। 'লুকানো ইন্ডিয়ান।' উঁচু কণ্ঠে বলল সে।

'কী' চেরনোবোগ সামনের সিট থেকে বলল।

'বাচ্চা বয়সে আমরা ওসব ছবি নিয়ে খেলতাম। 'ছবির মাঝে লুকানো ইন্ডিয়ানকে দেখতে পাচ্ছ? ছবিতে দশজন ইন্ডিয়ান আছে, সবাইকে খুঁজে বের করতে পারবে?' এক নজরে সবাইকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সাবধানতার সাথে লুকিয়ে থাকে কোন ছায়ার ভেতরে...' হাই তুলল ও।

'ঘুমাও,' পরামর্শ দিল চেরনোবোগ।

'কিন্তু...' বলতে বলতেই ঘুমিয়ে পড়ল শ্যাডো, স্বপ্নে খুঁজতে শুরু করল লুকানো ইন্ডিয়ানদের।

ভার্জিনিয়ায় অবস্থিত গাছটা, লোকালয় থেকে অনেক দূরে; একটা পুরনো খামারের পেছন দিকে। ব্ল্যাক্সবার্গ থেকে এক ঘণ্টা দক্ষিণে গাড়ি চালাবার পর পৌঁছান যায় সেই খামারটায়। পেনিউইঙ্কল ব্রাঞ্চ আর রুস্টার স্পার নামক রাস্তা ধরে এগোতে হয়। বার দুয়েক পথ হারিয়ে ফেলল ওরা। মি. ন্যান্সি আর চেরনোবোগ রাগারাগি করল একে-অন্যের সাথে, একবার করে শ্যাডোর সাথেও।

পথ-নির্দেশনার জন্য ছোট একটা জেনারেল স্টোরের সামনে দাঁড়াল ওরা। ওটার সামনেই দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে রাস্তাটা। দোকানের পেছন থেকে এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে চেয়ে রইল ওদের দিকে। মি. ন্যান্সিকে একটা ন্যাপকিনের পেছনে মানচিত্র এঁকে দেখাল সে, এদিকে সেই সুযোগে এক পাত্র আচার দেয়া শুয়োরের পা কিনল চেরনোবোগ।

আবার পথে নামল ওরা। দশ মিনিট পর পৌঁছাল লক্ষ্যে। খামারটার দরজায় বড় বড় অক্ষরে লেখা-অ্যাশ।

গাড়ি থেকে নেমে সদর দরজা খুলল শ্যাডো। গাড়িটা ভেতরে প্রবেশ করলে পর আবার বন্ধ করে দিল। হাঁটতে শুরু করল ও, দেহটাকে নড়াবার সুযোগ পেয়েছে বলে ভালো লাগছে। গাড়িটা একটু বেশি সামনে এগিয়ে গেলে দৌড়ালও বার দুয়েক।

ক্যানসাস থেকে ফেরার পথে সময়ের হিসাব গুলিয়ে ফেলেছে শ্যাডো। দুই দিন পার হয়েছে? নাকি তিন? জানে না ও।

লাশটায় পচন ধরেনি একদম! এখনও কেবলমাত্র জ্যাক ড্যানিয়েল'সের হালকা একটা গন্ধ নাকে পাচ্ছে ও। সেই সাথে টক হয়ে যাওয়া মধুরও, তবে গন্ধটা খুব একটা মন্দ লাগছে না ওর। মাঝে-সাঝেই পকেট থেকে কাঁচের চোখটা বের করে দেখছে সে। ভেতরের কিছু একটা ভেঙে গিয়েছে, সম্ভবত বুলেটের আঘাতের জন্যই। তবে বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝা যায় না। স্যুভনির হিসেবে জিনিসটা খুব একটা ভালো না হলেও, শান্তি পাচ্ছে ও।

খামারের দালানটা অন্ধকার, বন্ধ। চারপাশের ক্ষেতটা আগাছা ভর্তি, দেখে পরিত্যক্ত বলে মনে হয়। দালানটার ছাঁদেও ভাঙন ধরেছে। প্লাস্টিকের শিট দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে জায়গাটা। আচমকা গাছটা দেখলে পেল শ্যাডো।

গাছটা খামার বাড়ির চাইতেও লম্বা, এত সুন্দর বৃক্ষ এর আগে দেখেনি শ্যাডো। একই সাথে পার্থিব আর অপার্থিব। দুপাশের ভারসাম্য একেবারে নিখুঁত। বড় পরিচিত মনে হলো ওটাকে, যেন আগে কোথাও দেখেছে। আচমকা মনে পড়ল ওর, ওয়েনসডে পিন হিসেবে এই গাছেরই একটা প্রতিকৃতি পরতেন সবসময়।

শ্যাডোদের গাড়িটা লাফাতে লাফাতে তৃণভূমি ধরে এগোচ্ছে, গাছটার প্রায় বিশ ফুট দূরে থামল বাহনটা।

গাছের পাশে তিনজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম দেখায় শ্যাডোর মনে হলো, ওরা যরিয়া বোনেরা। কিন্তু না, এই তিনজনকে চেনে না ও। ক্লান্ত আর বিরক্ত দেখাচ্ছে মহিলাদেরকে, যেন অনেকদিন ধরে দাঁড়িয়ে আছে তারা। প্রত্যেকেই ধরে আছে একটা করে কাঠের সিঁড়ি। সবচেয়ে বড় বোনটার হাতে আরও ধরে আছে একটা বাদামী থলে। দেখে মনে হচ্ছে যেন রাশিয়ান একদল পুতুল-একজন লম্বা, শ্যাডোর সমানই হবে; এক জন মাঝারী আকৃতির, আরেকজন এতটাই খাটো আর পিঠে কুঁজ যে দেখে ছোট বাচ্চা বলে মনে হয়েছিল শ্যাডোর। তিনজনের চেহারা এতটাই কাছাকাছি যে দেখেই বোঝা যায় তারা বোন।

গাড়িটাকে দেখে একদম খাটো মহিলা বাউ করল, অন্য দুজন চেয়ে রইল কেবল। একটাই সিগারেট টানছে তিনজন মিলে। ফিল্টার পর্যন্ত শেষ করে সেটা গাছের শিকড়ে পিষে নেভাল।

চেরনোবোগ গাড়ির পেছনটা খোলা মাত্র সবচেয়ে লম্বা মহিলা বোন ওদেরকে সরিয়ে এগিয়ে এলো। ওয়েনসডের লাশটা এমন স্বাভাবিকভাবে তুলে নিল সে যেন কোন ময়দার বস্তা তুলছে! গাছের প্রায় দশ ফুট সামনে দেহটাকে শুইয়ে দিল সে। এরপর বোনদের সাথে নিয়ে খুলে ফেলল ওয়েনসডেকে পেঁচিয়ে রাখা চাদর। দিনের আলোতে আরও বীভৎস দেখাচ্ছে লাশটাকে, মাত্র একবার তাকিয়েই নজর সরিয়ে নিল শ্যাডো। এদিকে মহিলারা ব্যস্ত দেহটাকে নিয়ে, স্যুটের ভাঁজ সোজা করল তারা। তারপর চাদরটার এক কোনায় শুইয়ে আবার মুড়িয়ে নিল।

এরপর তিনজনই এগিয়ে এলো শ্যাডোর দিকে।

-তুমিই সে? সবচেয়ে লম্বা মহিলা জানতে চাইল।

-যে শোক পালন করবে? মাঝের জনের প্রশ্ন।

-সর্ব-পিতার জন্য? ছোট জনের জিজ্ঞাসা।

নড করল শ্যাডো। সত্যি সত্যি মহিলাদের কণ্ঠ শুনেছে কিনা, সে ব্যাপারে পরেও কখনও নিশ্চিত হতে পারেনি সে। হয়তো শোনেনি, তাদের চোখের দৃষ্টি আর আচরণ দেখে ধরে নিয়েছে।

মি. ন্যান্সি বাথরুম ব্যবহার করার জন্য দালানে গিয়েছিল, এবার ফিরে এলো গাছের কাছে। সিগারেল্লো ঝুলছে তার মুখে, দেখে গম্ভীর মনে হচ্ছে।

'শ্যাডো,' বলল সে। 'আসলেই শোক পালন করার দরকার নেই তোমার। যোগ্য কাউকে খুঁজে নিতে পারব।'

'আমিই করছি শোক পালন।' গম্ভীর কণ্ঠ শ্যাডোরও।

'যদি তুমি মারা পড় তো?'

'তাহলে মারা পড়ব।'

রাগের সাথে সিগারেল্লোটা ফেলে দিল মি. ন্যান্সি। 'আগেই বলেছিলাম, তোমার মাথায় গোবর পোড়া, আবারও বলছি। মুক্তির পথ দেখাচ্ছি, বুঝতে পারছ না কেন?'

'আমি দুঃখিত।' শক্ত মুখে বলল শ্যাডো, আর কী বলবে বুঝে পেল না। ন্যান্সি ফিরে গেল গাড়ির কাছে।

শ্যাডোর পাশে এসে দাঁড়াল চেরনোবোগ, ওকেও খুব একটা সন্তুষ্ট বলে মনে হচ্ছে না। 'মরা যাবে না তোমার।' বলল সে। 'আমার জন্য হলেও নিরাপদে ফিরতে হবে।' শ্যাডোর কপালে আলতো করে টোকা দিল ও। 'ব্যাম!' যুবকের কাঁধে হালকা চাপড় দিয়ে ন্যান্সির সাথে গিয়ে বসল গাড়িতে।

সবচেয়ে বড় মহিলা, যার নাম হয়তো উর্থা আর নয়তো উডার, ইঙ্গিতে শ্যাডোকে নগ্ন হতে বলল।

'সব খুলে ফেলব?'

শ্রাগ করল মহিলা। টি-শার্ট আর নিচের আন্ডারওয়্যার বাদে সব খুলে ফেলল শ্যাডো। মেয়েরা সিঁড়িটাকে গাছের সাথে লাগিয়ে আবারও ইঙ্গিতে ওকে চড়ার নির্দেশ দিল।

নয় ধাপ উঠল ও। তারপর মেয়েটার নির্দেশে একটা নিচু ডালে পা রাখল।

মাঝারী আকৃতির মহিলা বাদামী থলেটা ধরল উপুড় করে, ভেতর থেকে কতগুলো দড়ি পড়ল মাটিতে। বয়সের ভারে বাদামী হয়ে গিয়েছে, মাটি আর কাদা লেগে আছে ওতে। ওয়েনসডের দেহের পাশে সাবধানে গিঁট খুলে দড়িটা শুইয়ে রাখতে শুরু করল।

কাজ শেষ হলে নিজেদের সিঁড়ি ব্যবহার করে গাছে উঠতে শুরু করল তিন বোন। প্যাঁচানো আর কঠিন সব গিঁট দিতে শুরু করল দড়িতে, তারপর শ্যাডোকে জড়িয়ে। এমনকি লজ্জাহীনভাবে যুবকের টি-শার্ট আর আন্ডারওয়্যারও খুলে ফেলল তারা, যেমন করে খোলে লাশ নিয়ে কাজ করা মানুষেরা। বাঁধন খুব বেশি আঁটসাঁট হলো না, তবে শক্ত হলো নিঃসন্দেহে। শ্যাডোর বগলের নিচে, ওর দুই পায়ের ফাঁকে, কব্জি, গোড়ালি আর বুকের উপর দিয়ে গেল দড়ি। ক্ষণিকের মাঝেই গাছের সাথে বাঁধা পড়ল শ্যাডো।

একেবারে শেষে হালকা করে ওর গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হলো দড়ি। প্রথম প্রথম কিছুটা অস্বস্তি হলো শ্যাডোর, কিন্তু এত দক্ষভাবে পেঁচানো হয়েছে যে দড়িটা কোথাও কেটে বসল না ওর মাংসে।

শ্যাডোর পা মাটি থেকে পাঁচ ফুট উপরে ঝুলছে। গাছটা বিশাল হলেও, পাতা নেই। আকাশের পটভূমিতে ডালগুলোকে কালো বলে মনে হচ্ছে। বাকলগুলো মসৃণ রুপালী।

সিঁড়িগুলো সরিয়ে নিল তিন বোন। ঝট করে কয়েক ইঞ্চি নিচে নেমে গেল শ্যাডোর দেহ, ভয় পেয়ে গেল ও। কিন্তু কোন শব্দ করল না।

ওয়েনসডের দেহটাকে গাছের গোড়ায় শুইয়ে দিল বোনেরা, বিদায় নিল এরপর...

...শ্যাডোকে একাকী রেখে।

অধ্যায় পনেরো

ঝুলাও আমায়, ফাঁসির কাষ্ঠে; মরে গিয়ে চলে যাব,
ঝুলাও আমায়, ফাঁসির কাষ্ঠে; মরে গিয়ে চলে যাব।
করব না রাগ, পার করেছি অনেক লম্বা সময়,
কবরে শুয়ে রয়েছি অনেক কাল।

–পুরনো গান

গাছের সাথে ঝোলার প্রথম দিনটায় কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেছিল কেবল শ্যাডো। আস্তে আস্তে সেটা রূপ নিল ব্যথার, ভয়ের আর মাঝে মাঝে একঘেয়েমি আর নির্লিপ্ততার মাঝামাঝি কোন এক অনুভূতিতে, যেন কিছু একটার অপেক্ষা।

ঝুলে রইল ও।

বাতাসও স্থির হয়ে আছে।

কয়েক ঘণ্টা পর, চোখে লাল আর সোনালী রঙের ঝলকানি দেখতে পেল সে। প্রতিটাই এমনভাবে নড়ছে যেন জীবন্ত!

আস্তে আস্তে হাত আর পায়ের ব্যথা হয়ে উঠল অসহ্য। নরম করলে, লগব্যাগ করে দুলতে শুরু করে ওর দেহ। শক্ত করলে চাপ পড়ে গলায়, কাঁপতে শুরু করে দুনিয়া। তাই গাছটার কাণ্ডের সাথে নিজেকে আটকে রাখল ও। বুকের ভেতর চাপ অনুভব করছে, হৃদপিণ্ড সম্ভবত ভুলে গিয়েছে তার কাজ। মাঝে মাঝেই মিস করছে হৃৎস্পন্দন...

চোখের সামনে এখন নেচে বেড়াচ্ছে নীলকান্তমণি, রুবি আর পান্না। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বলে লম্বা বিরতি নিচ্ছি দুই শ্বাসের মাঝখানে। পিঠে ঘষা লাগছে গাছের রুক্ষ বাকল। বিকালের শীতলতা কাঁপিয়ে দিচ্ছে শ্যাডোকে।

ব্যাপারটা একেবারেই সাধারণ, কেউ যেন ওর মনের ভেতরে বলে উঠল। হয় সহ্য করো, আর নয়তো মর।

ভাবনাটা কিছুটা হলেও স্বস্তি দিল ওকে, বারবার কথাটা আওড়াতে শুরু করল ও। মন্ত্র বানিয়ে নিল যেন।

ব্যাপারটা একেবারেই সাধারণ। হয় সহ্য করো, আর নয়তো মর।
ব্যাপারটা একেবারেই সাধারণ। হয় সহ্য করো, আর নয়তো মর।
ব্যাপারটা একেবারেই সাধারণ। হয় সহ্য করো, আর নয়তো মর।

ব্যাপারটা একেবারেই সাধারণ। হয় সহ্য করো, আর নয়তো মর।

সময় বয়ে চলল, সেই সাথে চলল মন্ত্র জপা। আচমকা শ্যাডোর মনে হলো, কেউ যেন শব্দগুলো পুনরুচ্চারণ করছে! যখন ওর মুখের ভেতরটা শুকিয়ে এলো, যখন জিহ্বা হয়ে গেল সাপের ছেড়ে যাওয়া খোলসের মতো কর্কশ, তখনই কেবল বন্ধ হলে সেই অন্য কারও মন্ত্র জপা। পা দিয়ে ধাক্কা মেরে নিজেকে গাছ থেকে সরিয়ে নেয়ার প্রয়াস পেল ও, প্রয়াস পেল বুক ভরে শ্বাস নেবার মতো সোজা হবার।

বেশ কিছুক্ষণ পর, আবার হাল ছেড়ে দিতে হলো ওকে। আর পারছে না। আবারও ঝুলতে শুরু করল ও গাছ থেকে।

খিটখিট শব্দ শুরু হলো আচমকা, মনে হলো যেন কেউ একসাথে তীব্র রাগ আর তীব্র আমোদে শব্দটার জন্ম দিচ্ছে। সাথে সাথে মুখ বন্ধ করে ফেলল শ্যাডো, বুঝতে পারছে যে শব্দটার উৎস ও নিজেই। কিন্তু না, তারপরেও বন্ধ হলো না ওটা। তাহলে এই বিশ্বই আমাকে নিয়ে হাসছে, ভাবল শ্যাডো। ওর মাথাটা কাত হয়ে গিয়েছে একপাশে। 'র‍্যাটাটস্ক,' হঠাত কেউ বলে উঠল ওর কানে। নামটা নিজে উচ্চারণ করতে চাইল শ্যাডো, কিন্তু জিহ্বা পারল না ওর আদেশ পালন করতে। আস্তে আস্তে মাথা ঘোরাল যুবক, চোখ পড়ল এক কাঠবিড়ালির ধূসর-বাদামি চোখে। নজরে এলো প্রানিটার চোখা দুই কান।

কাছ থেকে দেখলে যে কাঠবিড়ালির চেহারা খুব একটা দৃষ্টি-নন্দন নয়, সেটা সেদিন বুঝতে পারল সে। ইঁদুরের মতো দেখতে প্রানিটার আচরণে কেমন একটা প্রচ্ছন্ন হুমকির আভা, দাঁত দুটোও বেশ তীক্ষ্ণ মনে হয়। শ্যাডো ভাবল, এখন আমাকে খাবার বা হুমকি মনে না করলেই হয়। কাঠবিড়ালি মাংসাশী প্রাণী হবার কথা না...কিন্তু বিগত কিছু দিনের অভিজ্ঞতায় নিজের জ্ঞানের উপর ভরসা হারিয়ে ফেলেছে বেচারা...

ঘুমিয়ে পড়ল শ্যাডো।

পরবর্তী কয়েক ঘণ্টায় বেশ কবার ঘুম ভাঙ্গল ওর, প্রতিবার ব্যথার দমকে। অশুভ একটা স্বপ্নের মাঝখান থেকে যেন ওকে টেনে তুলল ব্যথা। সেই স্বপ্নে পুনর্জীবিত হয়েছিল মৃত বাচ্চারা, ওদের চোখগুলো ফোলা ফোলা...ঠিক ফুলে ওঠা মুক্তার মতো। শ্যাডোর কাছে এসে অনুযোগ করে বলছিল, ওদের প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে যুবক। একটা মাকড়সা ওর মুখের উপর হাঁটতে শুরু করায় আরেকবার ঘুম ভেঙে গেল ওরা। ওটাকে ঝটকা মেরে ফেলে দিয়ে, আবার ফিরে গেল স্বপ্নে। এবার দেখতে পেল হাতির মাথার এক স্ফীত উদরের লোক। সে বসে আছে একটা বিশালাকায় ইঁদুরের পিঠে, তার একটা গজদন্ত ভাঙ্গা। হাতি-মাথার লোকটা শুঁড় বাঁকিয়ে শ্যাডোকে বলল, 'তোমার এই যাত্রা শুরু করার আগে আমার সাহায্য চাইলে সম্ভবত কষ্ট কমাতে পারতাম।' বলেই

হাতে তুলে নিল সে ইঁদুরটাকে। অবাক হয়ে শ্যাডো খেয়াল করল, আকার পরিবর্তন না করেই প্রানিটা একেবারে ক্ষুদ্র হয়ে গিয়েছে। চারহাতি হাতি-মাথার দেবতা এক হাত থেকে অন্য হাতে নিয়ে লোফালুফি করতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর যখন সবগুলো হাত খুলে দেখাল, তখন একদম অবাক হলো না শ্যাডো...যদিও চারটি হাতই খালি! নিঃস্পৃহ চেহারায় শ্যাডোর দিকে তাকাল দেবতা।

'শুঁড়ের ভেতর আছে।' বলল শ্যাডো, মনোযোগ দিয়ে দেখছিল সবকিছু।

বিশাল মাথাটা নাড়াল হাতি-মাথা দেবতা। 'ঠিক ধরেছ, ট্রাঙ্কেই আছে। মন দিয়ে শোন, অনেককিছু ভুলে যাবে তুমি। অনেককিছু ফেলে যেতে হবে। তবে এই জিনিসটা কথাটা হারিও না।' ঠিক তখনই শুরু হলো বৃষ্টি। ঠান্ডা পানিতে ভেজা শ্যাডোর দেহ কেঁপে কেঁপে উঠল। গভীর ঘুম থেকে এক ঝটকায় পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল ও। আস্তে আস্তে কাঁপুনিটা এতটাই তীব্র আকার ধারণ করল যে ভয় পেয়ে গেল শ্যাডো। এমনভাবে যে কারও দেহ কাঁপতে পারে, তা ওর ধারণাতেই ছিল না। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি খাটিয়ে কাঁপুনি বন্ধ করার চেষ্টা করল সে, কিন্তু ব্যর্থ হলো। দেহটা যেন অবাধ্য হয়ে গিয়েছে, কোন কথাই মানছে না। কাঁপুনির সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে শুরু করল ব্যথা। যেন ছোট ছোট অগণিত ক্ষতের জন্ম দিচ্ছে একটা ছুরি। অসহ্য ব্যথা দখল করে নিল শ্যাডোর সত্তাকে।

হাঁ করে পড়ন্ত বৃষ্টির ফোঁটা মুখের ভেতরে নেবার চেষ্টা করছে শ্যাডো। ফেটে যাওয়া ঠোঁট আর শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া জিহ্বা কিছুটা হলেও শান্তি পেল তাতে। সেই সাথে ভিজে গিয়েছে ওকে বেঁধে রাখা দড়িও। আচমকা গর্জে উঠল আকাশ, বজ্রের আলোতে ঝলসে গেল শ্যাডোর চোখ। যেন কোন অদৃশ্য ইঙ্গিতে আগের চাইতে দ্বিগুণ বেগে পড়তে শুরু করল বৃষ্টি। বৃষ্টির আর রাতের আগমন টের পেয়েই হয়তো বিদায় নিল ছুরিটা, কমে এলো কাঁপুনি। এখন আর ঠান্ডা লাগছে না শ্যাডোর। উহু, ভুল হলো। ঠান্ডা এখন ওর অংশে পরিণত হয়েছে।

শ্যাডোকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে বজ্র। গুড়গুড় শব্দ এখন চিরস্থায়ী, বজ্রপাত উধাও হয়েছে। তবে একেবারে বিদায় নেয়নি, এখনও অনেকক্ষণ পরপর চিৎকার করে নিজের অবস্থান জানান দিচ্ছে সে। যুবকের দেহকে নিয়ে খেলছে এখন বাতাস, চাইছে ওকে গাছ থেকে টেনে নিচে নামাতে, চাইছে ওর চামড়া তুলে নিতে, হাড়গুলোকে করতে টুকরা টুকরা। শ্যাডোর অন্তরাত্মা বুঝতে পারল, এতক্ষণে শুরু হয়েছে প্রকৃত ঝড়।

অদ্ভুত এক আনন্দ দখল করে নিল ওর মন, হাসতে শুরু করল প্রানখুলে। এদিকে বৃষ্টি যেন প্রতি মুহূর্তে শ্যাডোর দেহকে স্পর্শ করবে বলে পণ করেছে। বজ্রের ইচ্ছা, শ্যাডোর হাসির আওয়াজকে ছাপিয়ে দেবে।

কিন্তু না, পারল না বজ্র।

আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল শ্যাডো। বাঁচছে ও, এর আগে কখনও এভাবে বাঁচেনি।

যদি মারাও যায়, ভাবল সে। যদি এভাবেই...এখানেই...এখনই মারা যায়, তাহলেও আর আফসোস থাকবে না কোন।

'ওই!' ঝড়কে চিৎকার করে জানাল সে। 'ওই! এই যে আমি! এখানে!'

ফাঁকা কাঁধ আর গাছের কাণ্ডের মাঝে কিছুটা পানি আটকে ফেলল শ্যাডো। এরপর মাথা বাঁকিয়ে পান করে নিল সেটুকু। প্রতিটা ঢোকের সাথে সাথে ওর হাসি আরও বিস্তৃত হচ্ছে। নাহ, পাগলামির হাসি নয় সেটা। আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের হাসি। একেবারে শক্তিহীন হবার আগ পর্যন্ত হেসেই চলল সে।

গাছের গোড়ায়, মাটিতে শুইয়ে রাখা চাদরটা ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আছে ওয়েনসডের মৃত, মলিন হয়ে আসা হাত। সেই সাথে ফুটে আছে তার মাথার অবয়ব। জ্যাকুয়েলের টেবিলে শুয়ে থাকা মেয়েটার কথা মনে পড়ে গেল শ্যাডোর। আচমকা উপলব্ধি করল, ঠান্ডা পরিবেশে থাকা সত্ত্বেও নিজেকে উষ্ণ মনে হচ্ছে ওর, গাছের বাকলকে মনে হচ্ছে তুলোর মতো নরম। আবার ঘুমাল শ্যাডো। এই ঘুমের মাঝে যদি স্বপ্ন দেখেও থাকে, সেটা আর মনে রইল না ওর।

পরের দিন সকালের কথা, ব্যথাটা আর কোন নির্দিষ্ট জায়গায় আটকে নেই। এখন সেটা ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেহ জুড়ে।

ক্ষুধা লেগেছে শ্যাডোর, পাকস্থলীকে থেকে থেকে খামচে ধরছে ব্যথা। মাথাটাও দপদপ করছে। মাঝে মাঝে যুবকের মনে হতো, বুঝি নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গিয়েছে ফুসফুস, হৃদপিণ্ড ভুলে গিয়েছে স্পন্দিত হতে। তখন দম বন্ধ করে ফেলত ও, হৃৎস্পন্দনের আওয়াজ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো কানে আঘাত না করা পর্যন্ত ছাড়ত না।

শ্যাডোর মনে হতে লাগল, গাছটা বুঝি নরক থেকে স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত। মনে হলো যেন চিরকাল ধরে গাছটা থেকে ঝুলছে ও। মাথার উপরে গাছটাকে কেন্দ্র করে উড়ে বেড়াচ্ছে বাদামি একটা বাজপাখি। ওর কাছেই, একটা ভাঙ্গা ডালে এসে বসল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর আবার উড়াল দিল পশ্চিম দিকে।

ভোরে বন্ধ হয়ে যাওয়া ঝড়টা আবার ফিরে এলো দিন গড়াবার সাথে সাথে। এদিক-ওদিক...দুই দিগন্তই দখল করে নিল ধূসর কালো মেঘ। শুরু হলো টিপটিপ বৃষ্টি দিয়ে। শ্যাডোর মনে হলো, গাছের নিয়ে শুইয়ে রাখা দেহটা যেন আস্তে আস্তে নিজে থেকেই কুঁচকে উঠছে।

কখনও জ্বলছে শ্যাডোর দেহ, কখনও ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে।

বজ্রপাতের শব্দকে ড্রামের আওয়াজ বলে মনে হলো শ্যাডোর। হৃদপিণ্ডে চলছে ছোট ড্রামের বাজনা আর মাথার উপরে বড় ড্রামের!

ব্যথাগুলোকে রঙ বলে কল্পনা করল ও, লাল-নীল-আর সবুজ। কাঠবিড়ালিটা গাছের কাণ্ড থেকে লাফিয়ে শ্যাডোর কাঁধে এসে নামল। 'রাটাটস্ক!' খিটখিটিয়ে বলল প্রানিটা। ওর জিহ্বাকে স্পর্শ করল কাঠবিড়ালির নাক। 'রাটাটস্ক।' আবার লাফিয়ে কাণ্ডে উঠল ওটা। শ্যাডোর মনে হচ্ছে যেন ওর ত্বকে কেউ ছোট ছোট পিন দিয়ে খোঁচা দিচ্ছে। অনুভূতিটা অসহ্য।

পুরো জীবন চোখের সামনে দেখতে পেল সে। আক্ষরিক অর্থেই যেন মাটিতে বিছিয়ে দিয়েছে কেউ। এই তো ওর মা নরওয়ের আমেরিকান অ্যাম্বাসিতে অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে; ওই যে লরা...বিয়ের পোশাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে...

শুষ্ক ঠোঁটে ফাটল ধরল, হাসছে শ্যাডো।

'হাসছ কেন, পাপি?' জানতে চাইল লরা।

'আমাদের বিয়ের দিনে,' উত্তর দিল যুবক। 'অর্গান-বাদককে ঘুষ দিয়েছিলে তুমি। লোকটা কনে হেঁটে আশার সময় সচরাচর যে সুর বাজানো হয়, সেটা না বাজিয়ে স্কুবি-ডুর সুর বাজিয়েছিল! মনে আছে?'

'অবশ্যই মনে আছে, প্রিয়।'

'তখন তোমাকে খুব ভালোবাসতাম।'

শ্যাডো টের পেল, লরার নরম আর ভেজা ঠোঁট চেপে বসেছে ওর ঠোঁটে। সাথে সাথে বুঝতে পারল, আরেকটা হ্যালুসিনেশন হচ্ছে ওর। 'তুমি আসলে এখানে নেই, তাই না?' প্রশ্ন করল সে।

'না,' উত্তর দিল মেয়েটা। 'কিন্তু শেষ বারের জন্য আমাকে ডাকছ তুমি। চিন্তা করো না, আসছি আমি।'

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এখন শ্যাডোর।

'ঘুমাও, পাপি।' বলল লরা। তবে কণ্ঠটা নিজের বলে মনে হলো ওর।

স্ত্রীর কথা শুনল সে, ঘুমিয়ে পড়ল।

ভারী আকাশে তারচেয়েও ভারী পয়সার মতো ঝুলে আছে সূর্য। শ্যাডো বুঝতে পারল, জেগে আছে ও। ঠান্ডা বাসা বেঁধেছে ওর শরীরে। মস্তিষ্কের যে অংশটা এখনও শক্ত আছে, সেটা যেন অনেকদূর থেকে ফিসফিস করে বলছে ওকে কিছু। সেই অংশটা বুঝতে পারছে, ওর মুখ আর গলা জ্বলছে...ব্যথায় হাল ছেড়ে দিতে চাইছে সবকিছু। দিনের আলোতেই আকাশ থেকে তারা খসে পড়তে দেখছে শ্যাডো। আবার মাঝে মাঝে দেখছে বিশালাকার কিছু পাখি, উড়ে

আসছে ওর দিকে। কিন্তু কোন কিছুই ওকে স্পর্শ করতে পারছে না, পারছে না প্রভাব ফেলতে।

'রাটাটস্ক, রাটাটস্ক।' খিটখিটে কণ্ঠে এখন রাগের ছাপ।

ধপ করে শ্যাডোর কাঁধে নামল কাঠবিড়ালিটা, তীক্ষ্ণ নখর গেঁথে বসল ওর মাংসে। এক দৃষ্টিতে ওর দিকেই তাকিয়ে রইল প্রানিটা। শ্যাডোর সন্দেহ হলো, সম্ভবত ভ্রম হচ্ছে ওর। কেননা কাঠবিড়ালি সামনের দুই থাবায় ধরে আছে একটা খেলনা কাপ। ওটাকে শ্যাডোর ঠোঁটের সাথে লাগিয়ে দিল সে। শ্যাডো টের পেল কাপের ভেতরে পানি রয়েছে! অবচেতন মনেই চুমুক দিল কাপে, পানিটুকু ফাটল ধরা ঠোঁট আর শুষ্ক জিহ্বা ভিজিয়ে নিল। অল্প যেটুকু বাকি রইল, সেটা গিলে ফেলল ঢক করে।

গাছে ফিরে গেল কাঠবিড়ালি। এরপর হয়তো সেকেন্ড...মিনিট...বা ঘণ্টা বাদে ফিরে এলো আবার। সময়টা ঠিক ধরতে পারল না শ্যাডো, ওর মনের ভেতরে থাকা ঘড়িটার কল-কব্জা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কাঠবিড়ালিটা আবার ফিরে এসেছে তার কাপটা নিয়ে, এবারের পুরোটা গিলে ফেলল ও।

কেমন যেন কাদাময়-ধাতব স্বাদ পেল মুখে, অথচ শান্ত হয়ে গেল তৃষ্ণা গলাটা। উন্মাদনা আর ক্লান্তিও যেন দূর হয়ে গেল অনেকটাই।

তৃতীয় কাপটা পান করার পর, তৃষ্ণা একেবারেই উধাও হয়ে গেল শ্যাডোর।

আচমকা নড়ে উঠল সে, চেষ্টা করল দড়ির বাঁধনটাকে ছিঁড়ে ফেলতে। ছিলে গেল শ্যাডোর দেহ, নিচে নামার...পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু না, পারল না।

বাঁধনগুলো বেশ দক্ষ হাতে বাঁধা হয়েছে, দড়িটা দেখে বোঝা যায় না ওটা কতটা শক্তিশালী। খুব দ্রুতই আবারও ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে।

আচ্ছন্ন অবস্থায় নিজেকে গাছ বলে ভ্রম হলো শ্যাডোর। মাটির অনেক গভীরে চলে গিয়েছে তার শিকড়, গভীরে গিয়েছে সময়েরও...লুক্কায়িত কয়েকটা ঝর্ণায় গিয়ে শেষ হয়েছে। উর্দের ঝর্ণার পানির স্বাদ অনুভব করতে পারছে সে, সেটাকে অতীতের ঝর্ণাও বলে হয়। মহিলা বিশালাকৃতি, মেয়ে-দানো। সে যে ঝর্ণাটাকে পাহারা দিয়ে রেখেছে, তাকে 'কালের জলধারাও বলা হয়'। আরও শিকড় আছে ওর, সেগুলো শেষ হয়েছে অন্যান্য ঝর্ণায়। এদের মাঝে অনেকগুলোই গোপন। তৃষ্ণা পেলেই শিকড় ব্যবহার করে পানি তুলে নেয়।

একশটা হাত আছে ওর, প্রতিটা আবার ভাগ হয়েছে শত-সহস্র আঙুলে। সবগুলোই আকাশের দিকে ইঙ্গিত করছে। সারা আকাশের ভার তার কাঁধে।

ব্যথা একেবারে মিলিয়ে গিয়েছে বলা যাবে না, কিন্তু ব্যথাটা ওকে ভোগাচ্ছে না। ভোগাচ্ছে ওর সাথে ঝুলতে থাকা দেহটাকে। এই মুহূর্তে উন্মাদ শ্যাডো

গাছে ঝুলতে থাকা মানুষটার চাইতে অনেক বড় কিছু। যুবক এখন নিজেই ওই গাছ, সেই সাথে ওটার ডালের ফাঁকে ফাঁকে বয়ে চলা বাতাসও। কালো মেঘের ভারে ক্লান্ত আকাশ? সেটাও শ্যাডো। রাটাটস্ক নামের কাঠবিড়ালি, যেটা বারবার আসা-যাওয়া করছে, সেটাও শ্যাডো। একেবারে উপরের ভাঙা ডালে বসে থাকা পাগলাটে বাজ পাখিটাও সে নিজে। গাছের একেবারে হৃদয়ে আবাস গেঁড়ে বসা পোকাটাও শ্যাডো ছাড়া আর কিছু নয়।

আকাশের তারাগুলো নড়তে শুরু করেছে। শত হাতের সবগুলো উজ্জ্বল তারার দিকে বাড়িয়ে দিলে ও। হারিয়ে গেল সেগুলো ঔজ্জ্বল্য...

উন্মাদনা আর ব্যথার মাঝে এলো সুস্থতার একটা মুহূর্ত। শ্যাডো জানে, এই মুহূর্তটা দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে। সূর্যের আলো ওর চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। চোখ মুদল সে, যদি লাভ হয়...

বেশিক্ষণ বাকি নেই তার, শ্যাডো নিজেও জানে ব্যাপারটা।

চোখ খুলে দেখতে পেল, এক যুবক ওর ডালে বসে আছে।

ছেলেটার ত্বক গাঢ় বাদামী। কপাল উঁচু, কালো চুলগুলো কোঁকড়ানো। মাথা কাত করে যুবকের দিকে তাকিয়ে রইল শ্যাডো। বুঝতে পারল, ছেলেটা বদ্ধ উন্মাদ।

'তুমি নগ্ন।' ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে বলল পাগল। 'আমি নগ্ন।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।' কোনক্রমে বলল শ্যাডো।

পাগলটা কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওর দিকে, তারপর নড করে মাথাটা বার বার ঘোরাতে লাগল। অনেকক্ষণ এই কাজ করার পর আচমকা জানতে চাইল, 'আমাকে চেন?'

'না।' উত্তর দিল শ্যাডো।

'আমি তোমাকে চিনি, কায়রোতে দেখেছি। আমার বোন তোমাকে পছন্দ করে।'

'তুমি...' নামটা ভুলে গেল শ্যাডো। যে গাড়ি চাপা পড়া জন্তু খায়...মনে পড়েছে। 'হোরাস।'

নড করল পাগল। 'হোরাস। আমি সকালে শ্যেন, বিকালে বাজপাখি। আমি তোমার মতোই...সূর্য। আমি জানি রা-এর প্রকৃত নাম। আমার মা বলেছিলেন।'

'ভালো তো।' নম্র কণ্ঠে বলল শ্যাডো।

পাগল যুবক তীব্র মনোযোগের সাথে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল, বলল না কিছুই। তারপর আচমকা গাছ থেকে নেমে পড়ল।

পাথরের মতো টুপ করে ডাল থেকে পড়ল বাজপাখিটা, একেবারে শেষ মুহূর্তে ছড়িয়ে দিল ডানা। উড়ে এসে বসল শ্যাডোর কাছের একটা ডালে, তীক্ষ্ণ নখর থেকে একটা খরগোশের বাচ্চা ঝুলছে।

'তুমি ক্ষুধার্ত?' জানতে চাইল পাগল।

'না,' বলল শ্যাডো। 'হওয়া উচিৎ, তবে আমি ক্ষুধার্ত নই।'

'আমার ক্ষুধা লেগেছে।' বলে দ্রুত খরগোশটাকে খেয়ে ফেলল সে। কিছুক্ষণের মাঝেই প্রানিটার হাড় আর চামড়া ছাড়া কিছু বাকি রইল না। খাওয়া শেষে শ্যাডোর দিকে এগিয়ে এলো পাগল, বসল মাত্র এক হাত দূরত্বে। ওর চোখে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল প্রথমে, এরপর সেখানে স্থান করে নিল সাবধানতা আর যত্ন। পাগলটার থুতনিতে রক্ত লেগে আছে, সেই সাথে বুকেও। হাতের চেটো ব্যবহার করে ওগুলো মুছল হোরাস।

শ্যাডোর মনে হলো, কিছু একটা বলা দরকার ওর। 'হেই।'

'হেই,' বলল পাগলটাও। ডালের উপর উঠে দাঁড়াল সে, এরপর অন্য দিকে ঘুরে প্রস্রাব করল। তলপেট খালি করল ছেলেটা অনেক সময় ধরে। কাজ শেষ করে আবার শ্যাডোর দিকে ঘুরে বসল।

'তোমার নাম কি?' জানতে চাইল সে।

'শ্যাডো।'

নড করল পাগল। 'তুমি শ্যাডো। আমি আলো। সবকিছুরই শ্যাডো, মানে ছায়া আছে। ভালো কথা, দ্রুতই লড়তে শুরু করবে ওরা। ওদেরকে আসতে দেখেছি।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ছেলেটা বলল, 'তুমি মারা যাচ্ছ, তাই না?'

শ্যাডোর আর জবাব দেবার উপায় নেই। বাতাসে ভাসল বাজপাখি, আস্তে আস্তে উপরে উঠে হারিয়ে গেল মেঘের আড়ালে।

চাঁদের আলো।

কাশির দমকে কেঁপে উঠল শ্যাডোর অবয়ব, বুকে আর গলায় তীব্র ব্যথা অনুভব করছে সে। শ্বাস টানতে পারছে না।

'হাই, পাপি।' পরিচিত একটা কণ্ঠ বলল।

নিচের দিকে তাকাল শ্যাডো।

চাঁদের আলোয় রুপালী লাগছে চারপাশ। তবে পূর্ণিমা বলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে চারপাশটা। মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল শ্যাডো, দেখতে পেল মেয়েটার মলিন চেহারা।

'হাই, পাপি।' আবারও বলল সে।

কথা বলতে চাইল শ্যাডো, কিন্তু শব্দের পরিবর্তে বেরিয়ে এলো কফ। বেশ অনেকক্ষণ ধরে কাশল বেচারা।

'শুনে তো খুব একটা ভালো লাগছে না।' বলল মেয়েটা।

'হ্যালো, লরা।' কোনক্রমে মুখ থেকে বের করল বেচারা।

মৃত চোখজোড়া তাকাল ওর চোখের দিকে, হাসি ফুটে উঠলে মেয়েটার মুখে।

'আমাকে খুঁজে পেলে কী করে?' জানতে চাইল ও।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে রইল লরা। তারপর মুখ খুলল, 'জীবনের কাছাকাছি বলতে একমাত্র তুমিই আছ আমার। তুমিই আমার শেষ আস্থার স্থান, তুমিই একমাত্র রঙিন অংশ। আমাকে চোখ বেঁধে কোন সাগরের গভীরে ফেলে দিলেও, ঠিকই তোমাকে খুঁজে বের করতে পারব। শত শত মাইল মাটির নিচে কবর দিলেও জানব তুমি কোথায় আছ।'

মেয়েটার দিকে তাকাল শ্যাডো, অশ্রু বেরিয়ে এলো চোখে।

'তোমাকে কেটে নামাব?' কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল লরা। 'তোমাকে উদ্ধার করতেই আমার অনেক সময় বয়ে যায়, তাই না?'

আবারও কাশল যুবক। 'নাহ, আমাকে এভাবেই রেখে যাও। আমাকে কাজটা শেষ করতেই হবে।'

ওর দিকে মুখ তুলে চাইল লরা। মাথা নেড়ে বলল, 'তুমি আসলে পাগল। মরার জন্য এখানে ঝুলে আছ! বেঁচে থাকলেও, পঙ্গু হবে নিশ্চিত।'

'হয়তো। কিন্তু বাঁচছি বটে।'

'হুম,' এক মুহূর্ত পর বলল লরা। 'তা বাঁচছ।'

'আমাকে একটা কথা বলে ছিলে, মনে আছে? গোরস্তানে?'

'কয়েক দিন আগের কথাও এখন অনেক বছর আগের কথা বলে মনে হয়, পাপি।' বলল লরা। 'এখানে আমার ভালো লাগছে, ব্যথা করছে না আগের মতো। আমার কথা বুঝতে পারছ?'

আচমকা বেড়ে গেল বাতাসের গতি, লরার গন্ধ নাকে এলো শ্যাডোরঃ পচে যাওয়া মাংস, অসুস্থতা আর ক্ষয়ের গন্ধ। বাজে, বিকৃত একটা ঘ্রাণ।

'আমার চাকরি চলে গিয়েছে,' বলল মেয়েটা। 'রাতের শিফটের কাজ ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ জানালো, মানুষ নাকি অভিযোগ দিচ্ছে। ওদের বললাম, আমি অসুস্থ। কিন্তু পাত্তা দিল না তারা। তৃষ্ণা পেয়েছে খুব।'

'ওই তিন বোনের কাছে,' মেয়েটাকে বলল শ্যাডো। 'পানি আছে। খামার বাড়িতে।'

'পাপি...' লরার কণ্ঠ ভয়ার্ত শোনাল।

'ওদেরকে বলো...আমি তোমাকে পানি দিতে বলেছি...'

মলিন চেহারাটা ওর দিকে তাকাল। 'আমি যাই।' বলেই মুখ কোঁচকাল লরা। ঘাসের উপর থুথুর সাথে কী যেন ফেলল। মাটিতে পড়ার সাথে সাথে জিনিসটা নড়তে শুরু করল।

শ্বাস নেয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে প্রায়। শ্যাডোর মনে হচ্ছে, ওর বুকের উপর যেন ভারী কিছু একটা বসে আছে।

'থাকো,' কোনক্রমে বলল ও।. কে জানে, মেয়েটা শুনতে পেয়েছে কিনা। 'দয়া করে যেও না,' আবারও কাশতে শুরু করল ও। 'রাতটা থেকে যাও।'

'কিছুক্ষণ থাকি নাহয়।' বলল লরা। তারপর এমন কিছু কথা যোগ করল, যেগুলো বাচ্চাকে শান্ত করতে মায়েরা বলে থাকে। 'আমি যতক্ষণ এখানেআছি, ততক্ষণ তুমি নিরাপদ,জানো তো?'

উত্তর দিতে গিয়ে কেশে ফেলল শ্যাডো। মাত্র এক মুহূর্তের জন্য চোখ মুদল ও, অন্তত নিজে সেটাই ভেবেছিল। কিন্তু যখন চোখ খুলল আবার, তখন চাঁদ বিদায় নিয়েছে।

একাকী হয়ে গিয়েছে সে...

দপদপানিটা এখন সহ্যের বাইরে চলে গিয়েছে। এই ব্যথার কাছে মাইগ্রেন কেন, অন্য কিছুই দাঁড়াতে পারবে না। চারপাশের সবকিছু যেন পরিণত হয়েছে ছোট ছোট প্রজাপতিতে।

লাশের সাথে জড়িয়ে থাকা চাদরটা পতপত করে উঠছে সকালের বাতাসে।

সময় যেন প্রবাহিত হতে ভুলে গিয়েছে, শ্বাস নেয়ার কোন দরকারবোধ করছে না শ্যাডো। অনুভব করতে পারছে না বুকের ভেতরে হৃদপিণ্ডের ধুকপুকানি।

এবার যে অন্ধকারের মাঝে প্রবেশ করল ও, সেটা গভীর। আলো বলতে একটা মাত্র তারার ঔজ্জ্বল্য।

এই অন্ধকার...সম্ভবত শেষ অন্ধকার।

অধ্যায় ষোলো

'আমি জানি পাতানো। কিন্তু এই শহরে যে আর কোন খেলা নেই!'
-কানাডা বিল জোনস

গাছটা নেই, সাথে করে নিয়ে গিয়েছে বিশ্বকেও, মাথার উপরে এতক্ষণ ধরে ঝুলে থাকা ধূসর আকাশও নেই। এখন ওটার রঙ মাঝরাতের মতো। অনেক উপরে একটা মাত্র শীতল তারকা আলো ছড়াচ্ছে। এক পা এগোল শ্যাডো, আরেকটু হলেই হোঁচট খাচ্ছিল।

নিচের দিকে তাকালো শ্যাডো। পাথরে ধাপ কাঁটা আছে, এত বড় বড় ধাপ যে দানো ছাড়া আর কারও পক্ষে তা কাঁটা সম্ভব না। নিশ্চয় ওই ধাপগুলো ব্যবহার করে অনেক দিন আগে নিচে নেমেছিল তারা।

কখনও লাফিয়ে...কখনও হাচড়ে-পাচড়ে নামতে শুরু করল ও। ব্যথায় আর্ত-চিৎকার করছে ওর দেহ, তবে এই ব্যথা অনেকদিন পর দেহকে ব্যবহার করার ব্যথা। গাছ থেকে ঝোলার ব্যথা নয়।

অবাক না হয়েই বুঝতে পারল, এখন পুরোপুরি পোশাক পরিহিত সে! জিনস আর সাদা টি-শার্ট আছে পরনে, অবশ্য পা খালি। দে জা ভ্যুর একটা অনুভূতি হলো ওরঃ যরিয়া পলুনোচনিয়ার সাথে কাটানো সেই রাতে এই পোশাকটাই পরে ছিল। মেয়েটা সে রাতে আকাশ থেকে ওর জন্য চাঁদকে তুলে এনেছিল।

এরপর কী হবে, তা পরিষ্কার বুঝতে পারল শ্যাডো, যরিয়া পলুনোচনিয়া এসে উপস্থিত হবে।

ধাপগুলোর নিচে ওর জন্যই অপেক্ষা করছিল মেয়েটা। আকাশে চাঁদ নেই আজ। কিন্তু তারপরও চাঁদের রুপালী আলো ঠিকরে পড়ছে ওর গায়ে। সাদা চুলগুলো চাঁদের মতোই মলিন দেখাচ্ছে। শিকাগোতে যেমন ঝালর দেয়া সুতির নাইটগাউন পরে ছিল, আজও তাই আছে।

শ্যাডোকে দেখে হাসল মেয়েটা। 'হ্যালো।'

'হাই,' বলল শ্যাডো।

'কেমন আছ?'

'বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে যেন অদ্ভুত আরেকটা স্বপ্ন দেখছি। জেল থেকে বেরোবার পর, আমার সব স্বপ্নই কেন যেন অদ্ভুত হয়।'

চাঁদের আলোয় রুপালী মনে হচ্ছে যরিয়ার চেহারা (যদিও আকাশে চাঁদের কোন চিহ্নও নেই। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে এখন, সেখান থেকে তারাও দেখা যাচ্ছে না), বড় দুর্বল আর ভঙ্গুর দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। বলল, 'চাইলে তোমার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। কিন্তু একবার সেগুলোর ব্যাপারে জ্ঞাত হলে, আর কখনও অজ্ঞাত হতে পারবেনা।'

যরিয়াকে পার হয়েও সামনে অনেকদূর এগিয়েছে রাস্তাটা, দু'ভাগে ভাগ হয়ে। যেকোন একটা বেছে নিতে হবে এখন, বুঝতে পারল ও। কিন্তু তার আগে অন্তত একটা কাজ করতে হবে শ্যাডোকে। জিনসের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল ও, লিবার্টি ডলারের পরিচিত ওজনটা টের পেতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আলতো করে সেটাকে বের করে আনল শ্যাডো, 'এটা তোমার।' বলল যুবক।

ঠিক তখন ওর মনে পড়ল, নিজের কাপড়গুলো সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা আছে গাছের গোড়ায়। যে থলে থেকে দড়ি বের করেছিল তিন বোন, সেই থলেতেই আবার রেখে দিয়েছে ওর পোশাক। এমনকি যেন বাতাসে উড়ে না যায়, সেজন্য সবচেয়ে বড় বোন সেটাকে পাথরচাপাও দিয়ে রেখেছিল। তাই বুঝতে পারল, বাস্তবের পয়সাটা এখনও ওখানেই আছে...পাথরের নিচে। অথচ পয়সা আছে ওর হাতেও। পাতালপুরীর প্রবেশ পথের সামনে দাঁড়িয়ে ওটাকে আঁকড়ে ধরে আছে এখন!

হাত বাড়িয়ে পয়সাটা নিল যরিয়া। 'ধন্যবাদ। দুবার তোমার জন্য লিবার্টি, মানে স্বাধীনতা বয়ে এনেছে এটা।' বলল সে। 'এখন তোমার জন্য অন্ধকারে আলো হবে।'

পয়সাটা আঁকড়ে ধরে রইল কিছুক্ষণ ও, তারপর যতটা সম্ভব উঁচু করে মাথার উপর তুলল হাত...খুলে ফেলল হাতের মুষ্টি। কী আশ্চর্য, পয়সাটা পড়ে গেল না নিচে! বরং শ্যাডোরও মাথার প্রায় এক ফুট উপরে উঠে ভেসে রইল। অবশ্য এখন আর ওটা রুপালী পয়সা নেই, পরিণত হয়েছে গ্রীষ্মের আকাশে রাতে দেখা চাঁদে।

সেই চাঁদের আলোয় সামনে দুই ভাগ হয়ে যাওয়া পথের দিকে তাকাল শ্যাডো। 'কোনটা ধরে এগোব?' প্রশ্ন করল ও। 'কোনটা নিরাপদ?'

'যেকোন একটা বেছে নিতে হবে,' উত্তরে জানাল মেয়েটা। 'কিন্তু সাবধান, দুই পথের কোনটাই নিরাপদ না। কোনটায় যেতে চাও-নিরেট সত্যের পথে? নাকি নরম মিথ্যার?'

'সত্যের,' উত্তর দিল শ্যাডো। 'অনেক কষ্ট করে এসেছি, আর মিথ্যা চাই না।'

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'তাহলে দাম চুকাও।'

'কী দিতে হবে?'

'তোমার নাম...আসল নাম।'

'কীভাবে দেব?'

'এই যে এভাবে,' বলে নিখুঁত হাতটা শ্যাডোর মাথার দিকে বাড়াল যরিয়া। শ্যাডো টের পেল নরম আঙুলগুলো ওর ত্বক স্পর্শ করছে। পরক্ষণে চামড়া ভেদ করে, খুলি ভেদ করে মাথার আরও গভীরে পৌঁছে গেল। শিরশির করে উঠল ওর খুলি, শিরদাঁড়া। বেশিক্ষণ হাত ভেতরে রাখেনি মেয়েটা, বের করে এনেছে। জ্বলন্ত ম্যাগনেসিয়াম যেমন আলো দেয়, ঠিক তেমন একটা শিখা দেখা গেল ওর তর্জনীর উপরে...নাচছে।

'ওটা আমার নাম?' জানতে চাইল ও।

হাত বন্ধ করে ফেলল যরিয়া, সাথে সাথে উধাও হয়ে গেল শিখা। 'ছিল,' বলল সে। এরপর হাত তুলে ডান দিকের পথটা দেখাল। 'এবার এদিকে যাও।'

নামহীন হয়ে, শ্যাডো চাঁদের আলোয় ধরল ডান দিকের পথ। একটু এগিয়ে যখন ধন্যবাদ জানাবার জন্য পিছু ফিরে তাকাল, তখন দেখতে পেল কেবল কালো অন্ধকার। এগিয়ে গেল ও। অচিরেই বাঁক পড়ল সামনে।

যদি এ-ই হয় মৃত্যুর পরের জীবন, বাঁক ঘুরতে ঘুরতে ভাবল শ্যাডো। তাহলে তা অনেকটাই দ্য হাউজ অন দ্য রকের মতো।

ওয়ার্ডেনের অফিসে জেলের পোশাক পরিহিত অবস্থায় নিজেকে দেখতে পেল ও। ভদ্রলোক ওকে লরার দুর্ঘটনার ব্যাপারে জানাচ্ছেন। নিজের অনুভূতিটাও দেখতে পেল, মনে হলো সে এমন এক লোক যাকে দুনিয়া পরিত্যাগ করেছে। নিজের চেহারায় ভয়ের ছাপ দেখে কষ্ট পেল শ্যাডো, তাই তাড়াতাড়ি পা বাড়াল। এরপর নিজেকে আবিষ্কার করল ঈগল পয়েন্টের ঠিক বাইরে অবস্থিত একটা ভি.সি.আর. রিপেয়ার স্টোরে। আজ থেকে তিন বছর আগের এক দৃশ্যে।

ও জানে, দোকানের ভেতরের শ্যাডো পিটিয়ে ল্যারি পাওয়ার্স আর বি.জে. ওয়েস্টের হাড়-মাংস এক করছে। অচিরেই দোকানটা থেকে বেরিয়ে আসবে সে, হাতে থাকবে বিশ ডলারের নোটে ভর্তি একটা বাদামী ব্যাগ। এই টাকাটা ওর ভাগের অংশ, ল্যারিরা কোনদিন কারও কাছে অভিযোগ জানাতে পারবে না। অবশ্য হ্যাঁ, ভাগের চাইতে কিছুটা বেশিই নিয়ে এসেছে শ্যাডো। ওটুকু ওকে আর লরাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করার জরিমানা। পুরো পরিকল্পনায় ওর ভূমিকা ছিল চালকের, নিজের কাজ যথাযথভাবেই সম্পন্ন করেছিল সে।

বিচারের সময় ব্যাঙ্ক ডাকাতির কথা উচ্চারণও করেনি কেউ, যদিও সবাই তা মনে মনে চাচ্ছিল। সমস্যা হলো, ওদের মাঝে কেউ মুখ না খুললে সেটা প্রমাণ করার কোন উপায় ছিল না কর্তৃপক্ষের হাতে। আর তিনজনের কেউই মুখ খোলার কথা কল্পনাও করেনি। বাধ্য হয়ে শারীরিক আক্রমণের অভিযোগটাকেই কেবল আনতে পেরেছিল উকিল। হাসপাতালে ভর্তি হবার সময় ল্যারি আর

ওয়েস্টের অবস্থা কী হয়েছিল, তার ছবি দেখিয়েছিল লোকটা। ঝামেলা এড়াতেআত্মপক্ষ খুব একটা সমর্থন করেনি শ্যাডো। এদিকে ল্যারি বা ওয়েস্ট, দুজনের কেউ ঝগড়ার কারণ নিয়ে মুখ খোলেনি। তবে সে-ই যে আক্রমণকারী একথা বলেছিল।

টাকার প্রসঙ্গও ওঠেনি তাই।

ওঠেনি লরার কথাও, শ্যাডো তাতেই খুশি ছিল।

শ্যাডোর একবার মনে হলো, এরচাইতে মিথ্যার পথ ধরে এগোলেই বুঝি বেশি ভালো হতো। দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল ও। এবার এসে উপস্থিত হলো শিকাগোর এক সরকারি হাসপাতালের ঘরে। মনে হলো, পেটের ভেতর থেকে সব কিছু যেন উগড়ে আসবে। থমকে দাঁড়াল সে, সামনের কিছু দেখতে চায় না। চায় না আর একটা পদক্ষেপও ফেলতে।

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আবার মারা যাচ্ছেন ওর মা, যেমন মারা গিয়েছিলেন শ্যাডোর ষোলো বছর বয়সের সময়। ওই যে বসে আছে শ্যাডো, মুখে ব্রণ নিয়ে মাথা নিচু করে এক মনে পেপারব্যাক বই পড়ছে। আসলে পড়ছে না বলে তাকিয়ে আছে বলাই ভালো। বইটার নাম কী, তা মনে করার প্রয়াস পেল বর্তমানের শ্যাডো। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল অতীতের শ্যাডোর কাছে। *গ্র্যাভিটি'স রেইনবো* পড়ছে ছেলেটা, মায়ের মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে আশ্রয় খুঁজছে লন্ডনের কাল্পনিক এক জগতে।

মরফিন দেয়া হয়েছে বলে আরামে ঘুমাচ্ছে ওর মা। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন, রোগটা তেমন বড় কিছু না। কিন্তু পরে আবিষ্কার হলো, আসলে তিনি লিম্ফোমা নামক ক্যান্সারে ভুগছেন। তা-ও একেবারে শেষ পর্যায়ে। ভদ্রমহিলার ত্বকে কেমন যেন হলদে-ধূসর একটা আভা চলে এসেছে। বয়স ত্রিশের শুরুর দিকে হলেও দেখতে আরও অনেক বেশি বয়স্ক মনে হয়।

তরুণ শ্যাডোকে ঝাঁকাতে ইচ্ছা হলো বর্তমানের শ্যাডোর। ইচ্ছা হলো মার সাথে কথা বলা বলার আদেশ দেয়। কিন্তু না, নিজেকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারল না ও। চুপচাপ তাকিয়ে দেখলঃ কীভাবে মায়ের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চুপচাপ বসে মোটা একটা বই পড়ছিল সে।

এরপর খুব একটা পড়া হয়নি ওর। কাল্পনিক গল্প পড়ে লাভ কী? ওগুলো জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না।

ঘরটা থেকে বেরিয়ে এলো শ্যাডো, ভূ-গর্ভস্থ সুড়ঙ্গ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল।

আবার সে দেখতে পেল মাকে। এমন কমবয়সী অবস্থায় দেখার কথা মনে নেই ওর, টেনেটুনে পঁচিশ হবে হয়তো। ওদের প্রাক্তন অ্যাপার্টমেন্টে দাঁড়িয়ে আছে এখন শ্যাডো। চারপাশে তাকাল একবার, যদি কবেকার ঘটনা দেখছে সে

ব্যাপারে কোন ধারণা পাওয়া যায়! নিজেকে আবিষ্কার করল সে মায়ের সাথে তর্করত অবস্থায়। ছোট-খাটো, বড় বড় চোখ আর কালো চুলের একটা বাচ্চা গলা ফুলিয়ে চিৎকার করছে। শ্যাডো জানে, এই ঝগড়ার বিষয়বস্তু কী। কেননা মায়ের সাথে আর কিছু নিয়ে কখনও ঝগড়া হয়নি ওর।

-কে আমার বাবা?

-মারা গিয়েছে। ওর ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন করো না।

-বুঝলাম, কিন্তু তার পরিচয়টা অন্তত বলো।

-ভুলে যাও লোকটাকে। যে মৃত, সে মৃত।

-আমি বাবার একটা ছবি দেখতে চাই।

-আমার কাছে নেই।

সাধারণত এই কথাটা বলার সময় মার কণ্ঠ তীক্ষ্ণ অথচ নিচু হয়ে যেত। শ্যাডো জানে এই কণ্ঠের অর্থ হলো, আরও প্রশ্ন করলে মারও খেতে হতে পারে। শ্যাডো এ-ও জানে, ওই বয়সে তা বোঝার ক্ষমতা ওর ছিল না। তাই এগিয়ে গেল সুড়ঙ্গ ধরে।

এঁকে-বেঁকে, ঘুরে-পেঁচিয়ে এগিয়ে গিয়েছে পথটা; সাপের খোলস আর গাছের শিকড়ের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে ওকে। বাঁ দিকে আচমকা একটা ডোবা দেখা গেল, সেই সাথে টপ টপ শব্দ। সম্ভবত সুড়ঙ্গের আরও সামনে কোথাও পানি ঝরছে উপর থেকে। হাঁটু ভাঁজ করে বসল ও, আঁজলায় তুলে পান করল পানি। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল শ্যাডো।

থামল যখন ডিস্কো ফ্লোরের মতো রঙ-বেরঙের আলোতে চারপাশ ভরে উঠেছে, তখন। মনে হচ্ছে ওর যেন মহাবিশ্বের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ও, সব গুলো তারা আর গ্রহ ওকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে। কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছে না শ্যাডো। নাহ, গানের সুরের কারণে বা চেঁচামেচির কারণে না। চোখের সামনে এক মেয়েকে দেখতে পাচ্ছে সে, মনে হচ্ছে মেয়েটা ওর মা। কিন্তু এত অল্প বয়সে কখনও মাকে দেখেনি বলে বুঝতে পারছে না...

...নাচছেন তিনি।

কার সাথে নাচছেন, সেটা দেখার জন্য ঘুরল শ্যাডো। লোকটাকে দেখামাত্র চিনতে পারল ও, অবাক হলো না এক বিন্দুও। গত তেপান্ন বছরে তার একটুও পরিবর্তন হয়নি।

মা যে মাতাল হয়ে আছেন, সেটা এক নজর দেখেই বুঝতে পারল শ্যাডো। বদ্ধ মাতাল নন; তবে মদ্যপানে অনভ্যস্ত কেউ একটু বেশি পান করলে তার যে অবস্থা হয়, তেমনটাইহয়ে আছেন। মার্গারিটা পান করছেন তিনি, তার ঠোঁটে লেগে আছে লবণ। লবণ লেগে আছে তার হাতের উল্টো পিঠেও।

ওয়েনসডের পরনে আজ অবশ্য স্যুট আর টাই নেই। কিন্তু গাছের আকৃতিতে বানান পিনটা শার্টের পকেটে লাগানো। বয়সের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকলেও, পাশাপাশিদুজনকে মানিয়েছে বেশ।

আস্তে আস্তে নাচছেন তারা, থাবার মতো একটা হাত দিয়ে মাকে আরও কাছে টেনে নিচ্ছেন ওয়েনসডে। অন্য হাতটা তার চিবুকে, ধীরে ধীরে উঁচু করে ধরছে। পরস্পরকে চুমু খেলেন দুজন।

এর কিছুক্ষণ পরেই বিদায় নিলেন তারা। ওয়েনসডের পিছু পিছু গেলেন ওর মা।

হাত দিয়ে চোখ ঢাকল শ্যাডো, ওদেরকে অনুসরণ করতে চায় না। কার ঔরসে আর কার গর্ভে জন্মেছে, সেটা জানতে পেরেই খুশি ও। গর্ভধারণ প্রক্রিয়াটা দেখতে চায় না।

কপাল ভালো ওর, দেখতে হলোও না। উধাও হয়ে গেল ডিস্কো ফ্লোরের আলো, এখন আলোক-উৎস বলতে কেবল মাথার উপর ঝুলে থাকা ছোট চাঁদটা।

হাঁটতে থাকল শ্যাডো। একটা বাঁকের কাছে এসে শ্বাস নেবার জন্য থমকে দাঁড়াল।

আচমকা পিঠে একটা নরম স্পর্শ টের পেল ও। 'হ্যালো,' পেছন থেকে কমনীয় একটা কণ্ঠ ভেসে এলো।

'হ্যালো,' ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল শ্যাডো।

মেয়েটার চুল বাদামী, ত্বক বাদামী; চোখ জোড়া টানা-টানা, মধুর মতো ঘন বাদামী। 'আমি কী তোমাকে চিনি?' বিভ্রান্ত শ্যাডো জানতে চাইল।

'ভালোভাবেই চেন।' মৃদু হাস্যের ফাঁকে বলল মেয়েটা। 'তোমার বিছানায় ঘুমাতাম, তোমার উপর নজর রেখেছে আমার লোকেরা।' সামনের পথের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'সামনে পথটা তিন ভাগে ভাগ হয়েছে। একটা তোমাকে জ্ঞানী বানাবে। একটা করবে সম্পূর্ণ, আর একটায় লেখা আছে তোমার মরণ।'

'আমার তো মনে হয়, আমার মৃত্যু হয়ে গিয়েছে।' বলল শ্যাডো। 'গাছে ঝোলা অবস্থায়।'

'মৃত্যু যেমন আছে,' ঠোঁট গোল করে বলল মেয়েটা। 'তেমনি আছে মরণ, আবার আছে মহাপ্রয়াণ। পুরোটাই আপেক্ষিক।' আবার হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে। 'চাও তো এ নিয়ে তোমাকে একটা কৌতুক শোনাতে পারি।'

'থাক,' বলল ও। 'লাগবে না।'

'তাহলে,' জানতে চাইল মেয়েটা। 'কোন পথে যাবে?'

'আমি জানি না।' মেনে নিল শ্যাডো।

এক দিকে মাথা কাত করল মেয়েটা, একদম বিড়ালের মতো। সাথে সাথে সেই স্বর্গীয় রাতের কথা মনে পড়ে গেল ওর, লাল হয়ে গেল লজ্জায়। 'আমাকে বিশ্বাস করো?' জানতে চাইল বাস্ট। 'করলে তোমার হয়ে বেছে দেব।'

'বিশ্বাস করি।' বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে বলল শ্যাডো।

'বিনিময়ে কী দিতে হবে, জানতে চাইলে না?'

'আমার নাম এরইমাঝে দিয়ে দিয়েছি।'

'নাম আসে, নাম যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বিনিময়ে যা পেয়েছ তা নিয়ে কী তুমি সন্তুষ্ট?'

'হয়তো, সম্ভবত। যা আমার সামনে উন্মোচিত হয়েছে, তা অনেকটাই ব্যক্তিগত।'

'সব ধরনের উন্মোচনই তাই। আর সেজন্যই উন্মোচন মানেই সন্দেহের বিষয়বস্তু।'

'তোমার কথা বুঝতে পারলাম না।'

'পারার কথাও না।' বলল বাস্ট। 'আমি তোমার হৃদয় নেব, পরে কাজে লাগবে।' হাত বাড়িয়ে শ্যাডোর বুকের ভেতরে ঢোকাল মেয়েটা, লালচে কিছু একটা বের করে আনল ক্ষণিকের মাঝেই। কবুতরের রক্তের মতো রঙ ওটার, নির্মিত হয়েছে নিখাদ আলো দিয়ে। মেয়েটার হাতে ধরা অবস্থাতেও স্পন্দিত হচ্ছে।

হাত মুষ্টি করল মেয়েটা, উধাও হয়ে গেল আলো।

'মাঝখানের রাস্তা ধরে এগোও।'

নড করে তাই করল শ্যাডো।

পথটা এখন পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছে। পাথরের উপরে জমেছে বরফ। মাথার উপরের চাঁদটার আলো ঝিক ঝিক করছে থেকে থেকে। বরফের কারণে আলো প্রতিফলিত হয়ে চাঁদটাকে ঘিরে শুরু হয়েছে অপূর্ব এক গোলকের। কিন্তু এতে দেখতে কষ্ট কচ্ছে শ্যাডোর। হাঁটতেও বেগ পেতে হচ্ছে।

তিন ভাগ যেখান থেকে শুরু হয়েছে, সেখানে এসে উপস্থিত হলো ও। প্রথম রাস্তাটা পরিচিত বলে মনে হলো, যেন কোন বিশাল এক চেম্বারে যাওয়া যাবে ওটা ধরে। অনেকটা অন্ধকার একটা জাদুঘরের মতো। জায়গাটা কি বুঝতে অসুবিধা হলো না ওর, কানে আসছে ছোট ছোট অনেক আওয়াজের প্রতিধ্বনি।

এই জায়গাটা স্বপ্নে দেখেছে শ্যাডো। মৃত্যুর পর যে রাতে লরা প্রথম ওর কাছে এসেছিল, সেই রাতে। ভুলে যাওয়া দেবতাদের আবাসস্থল এটা। এক পা পিছিয়ে এলো সে।

এবার তৃতীয় পথের সামনে এসে দাঁড়াল ও। করিডরটাকে দেখে মনে হয় যেন ডিজনীল্যান্ড থেকে তুলে আনা। এখানেও একটা আওয়াজ কানে এলো

ওর-ভারী, কম্পনের আওয়াজ। থমকে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাল একবার। দুই পথের একটাকেও সুবিধার লাগছে না। তাই মাঝখানের যে পথটার কথা ওকে বিড়াল-মানবী বলেছে, সেটা ধরেই এগোবার সিদ্ধান্ত নিল।

ছোট্ট চাঁদটা আস্তে আস্তে আলো হারাতে শুরু করেছে, যেন গ্রহণ লেগেছে তাতে। পথটা ধরে একটু এগোতেই নজরে এলো বিশাল একটা দরজা।

প্রায় অন্ধকারে ওটার দিকে এগিয়ে গেল শ্যাডো, বাতাসটা উষ্ণ। ভেজা ধূলার গন্ধ লাগছে নাকে। বসন্তের প্রথম বৃষ্টির পর, বড় শহরের রাস্তায় এই গন্ধ মেলে।

ভয় পাচ্ছে না ও।

গাছে থাকা অবস্থায় মরে গিয়েছে ওর ভেতরে ভয়টা, যেমন মরেছে সে নিজেও। এখন নেই কোন ভয়, কোন ঘৃণা, কোন ব্যথা। আছে কেবল নির্যাসটুকু।

দূরে কোথাও বিশালাকার কিছু একটা ঝাঁপ দিল পানিতে, তার আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চারপাশে। চোখ কুঁচকে তাকাল শ্যাডো, কিন্তু অন্ধকারে দেখতে পেল না কিছুই। আচমকা শব্দের উৎপত্তিস্থল থেকে ওর দিকে ধেয়ে এলো ভূতুড়ে আলো, নিজেকে সে উপস্থিত করল একটা গুহায়। সামনে পানি, তলটা আয়নার মতোই নিস্তরঙ্গ।

পানির শব্দ আস্তে আস্তে কাছে আসছে, সেই সাথে পাল্লা দিয়ে উজ্জ্বল হচ্ছে আলো। আসছে কিছু একটা, তীরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল শ্যাডো। দ্রুতই দেখতে পেল একটা নিচু আর সমতল নৌকা এগিয়ে আসছে, ওটার মাস্তুলে দপদপ করে ঝুলছে একটা সাদা লণ্ঠন। আরেকটা ঝুলছে তার একটু নিচে থেকেই। লম্বা একটা অবয়ব দাঁড় বাইছে। এতক্ষণ ধরে শুনতে পাওয়া আওয়াজটা আসলে দাঁড়ের ওঠা-নামার।

'হ্যালো!' ডাকল শ্যাডো। শব্দটা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল ওর চারপাশ ঘিরে। শ্যাডোর মনে হলো যেন অসংখ্য মানুষ ওকেই আবার সম্ভাষণ জানাচ্ছে।

কিন্তু দাঁড় বাইতে থাকা লোকটার মুখে কোন রা নেই।

লম্বা আর একদম কাঠির মতো শুকনো লোকটা। অবশ্য এতদূর থেকে ওটা আসলেই পুরুষ, নাকি মহিলা তা বোঝা যাচ্ছে না। সাদামাটা একটা সাদা রোব জড়িয়ে আছে দেহে, মাথাটা দেখে মনে হয় না ওটা কোন মানুষের। বরঞ্চ কোন মুখোশ হলেও শ্যাডো অবাক হবে না। ছোট ঘাড় আর লম্বা ঠোঁট-ওয়ালা কোন পাখির মতো বলে মনে হচ্ছে। আগেও এমন একটা অবয়ব দেখেছে যুবক, কোথায় তা একটু ভাবতেই মনে পড়ে গেল। হাউজ অন দ্য রকে যখন স্টলে পয়সা ঢুকিয়েছিল, তখন মাতালের পেছন দিকের একটা কবরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছিল এই অবয়ব।

দাঁড় থেকে পানি ঝরছে, আয়নার মতো জলধারার তলে সৃষ্টি হচ্ছে ছোট ছোট ঢেউ। নৌকাটা নলখাগড়ার তৈরি।

তীরের কাছে আসতে বেশিক্ষণ সময় নিল না ওটা, আস্তে আস্তে শ্যাডোর দিকে ঘুরে তাকাল মাঝি। 'হ্যালো,' পুরুষালী কণ্ঠে বলল লোকটা। শ্যাডোর এই সংক্ষিপ্ত 'মৃত্যু-পরবর্তী' জীবনের অন্য সব অস্তিত্বের মতো একেও পরিচিত লাগল ওর। 'উঠে পড়, অবশ্য পা ভিজে যাবে বলে মনে হয়। কিন্তু কিছু করার নেই। নৌকাটার বয়স অনেক, কাছে এলে তলায় ফাটল ধরতে পারে।'

জুতো খুলে পানিতে পা রাখল শ্যাডো, হাঁটু আর গোড়ালির মাঝামাঝি পর্যন্ত গভীর এখানকার পানি। বেশ উষ্ণই বলা চলে। নৌকাটার কাছে পৌঁছালে, মাঝি এক হাত দিয়ে ওকে উঠতে সাহায্য করল।

তীর থেকে দূরে সরে এলো নৌকা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছে শ্যাডো। ওর প্যান্ট থেকে ঝরে পড়ছে পানি।

'আমি চিনি তোমাকে।'

'তা চেন,' মাঝি বলল। আচমকা লাফিয়ে উঠল লণ্ঠনের আগুন। নির্গত ধোঁয়ার দমকে কেশে ফেলল শ্যাডো। 'তুমি আমার হয়ে কাজ করেছ। তবে তোমাকে ছাড়াই আমাদের লিলা গুডচাইল্ডকে কবর দিতে হয়েছে।'

চোখ দিয়ে পানি ঝরছে শ্যাডোর, হাত দিয়ে মুছে ফেলল ফোঁটাগুলো। ধোঁয়া ভেদ করে এক পলকের জন্য দেখা গেল স্যুট পরিহিত লম্বা এক লোককে। কিন্তু ধোঁয়া কেটে যেতেই উধাও হয়ে গেল সে।

'মিস্টার আইবিস?'

'আবার দেখা হয়ে ভালো লাগছে,' বলল মাঝি, অবিকল মি. আইবিসের কণ্ঠে। 'সাইকোপম্প কাকে বলে জানো।'

শব্দটা শুনেছে বটে যুবক, কিন্তু অনেক আগে। তাই মাথা নেড়ে না করল।

'এস্কর্টের আরেকটা গালভরা নাম।' জানাল ওকে মি. আইবিস। 'আমাদের প্রত্যেকেরই অগণিত দায়িত্ব, বেঁচে থাকার অগণিত উপায়। নিজেকে আমি লেখক বলে ভাবি, যে কিনা নিজের ছোট ছোট গল্পের দ্বারা এমন এক অতীতকে তুলে ধরে যার হয়তো কোনদিন অস্তিত্বও ছিল না। আবার দায়িত্বের কারণে আমি একজন সাইকোপম্প-জীবিতকে মৃতের দুনিয়ায় নিয়ে যাই।'

'আমি তো ভেবেছিলাম, এটাই মৃতদের দুনিয়া।' বলল শ্যাডো।

'ঠিক তা না। বলতে পারো, ওই দুনিয়ায় যাবার আগের ধাপ এটা।'

ডোবাটার উপর দিয়ে বিনাবাধায় এগিয়ে যাচ্ছে নৌকা। আচমকা মি. আইবিস তার ঠোঁট না নাড়িয়েই বললেন, 'এমনভাবে তোমরা জীবিত আর মৃত নিয়ে কথা বলো, যেন দুটো পুরোপুরি আলাদা। যেন এমন কোন নদী পাওয়া যাবে না যেটা আবার রাস্তাও! এমন কোন গান নেই যেটা রঙও!'

'আছে নাকি?'

'তোমার মনে রাখতে হবে,' ধীরে ধীরে বললেন আইবিস। 'জীবন আর মৃত্যু আসলে একই পয়সার এপিঠ-ওপিঠ।'

'যদি আমার কাছে দুই নাম্বার পয়সা থাকে, যার দুটো পিঠই এক?'

'ওমন কিছু কারও কাছে নেই।'

কালো পানির দিকে তাকিয়ে গা শিউরে উঠল শ্যাডোর, মনে হচ্ছে যেন এখনই ভেসে উঠবে শত শত বাচ্চার চেহারা। যারা একদৃষ্টিতে অনুযোগের চোখে তাকিয়ে থাকবে ওরই দিকে।

'আমি তাহলে মৃত।' ভাবনাটা খুব একটা পোড়াল না শ্যাডোকে। 'নয়তো মরতে চলেছি।'

'আমরা যাচ্ছি মৃতদের হলঘরে। অনুরোধ করেই তোমাকে নিতে এসেছি আমি।'

'কেন?'

'কঠোর পরিশ্রমী কর্মী ছিলে তুমি। কেন আসব না?'

'কেননা...' মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিল শ্যাডো। 'কেননা আমি কখনও তোমাদেরকে বিশ্বাস করিনি। মিশরীয় দেব-দেবীদের ব্যাপারে আমি কিছু জানিই না। কেননা, আমি এসব আশা করিনি। ভেবেছিলাম, সেইন্ট পিটারের সাথে দেখা হবে মৃত্যুর পর।'

দুপাশে মাথা ঝাঁকাল পাখির মতো অবয়বটা। 'আমাদের উপর বিশ্বাস রেখেছ কিনা, তাতে কিছু যায় আসে না।' গম্ভীর কণ্ঠে জানাল সে। 'আমরা তোমার উপর বিশ্বাস রাখি।'

অন্য পাশে পৌঁছে গিয়েছে নৌকা, পানিতে নেমে পড়ল মি. আইবিস। শ্যাডোকেও তাই করতে বলল। নিজে মাস্তুলের দড়ি ধরে শ্যাডোকে বলল লণ্ঠনটা নিতে। হেঁটে তীরে পা রাখল ওরা, দড়িটাকে একটা ধাতব আঙটার সাথে বাঁধল মি. আইবিস। এরপর শ্যাডোর হাত থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে মাথার উপরে ধরে এগিয়ে গেল।

'ভয় পাচ্ছ?' জানতে চাইল সে।

'খুব একটা না।'

'নিজের আত্মার জন্য ভয় পাবার চেষ্টা করো, যে পরিস্থিতিতে আমরা আছি তা বেশ গুরুতর।'

একদম ভয় লাগছে না শ্যাডোর, বরঞ্চ কৌতূহল হচ্ছে। অন্ধকারের ভয় নেই এখন ওর, মারা গিয়েছে তো হয়েছে কি? এমনকী পথের যে কুকুরটা একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তাকেও ভয় লাগছে না।

'শ্যাডো,' বলল কুকুরটা, কণ্ঠ শুনে শিহরণ জাগল ওর দেহে। 'বিচারের সময় সমাগত।'

'মি. জ্যাকুয়েল?' চিনতে পারল ও।

আইবিসের বড় বড় হাতগুলো যেন পুতুলের মতো তুলে নিল শ্যাডোর দেহ, নামিয়ে রাখল জ্যাকুয়েলের কাছে।

উজ্জ্বল আর ঝকঝক করতে থাকা চোখ দিয়ে শ্যাডোকে পরখ করল ওটা, ঠিক যেমন টেবিলে শুয়ে থাকা মেয়েটার দেহ পরখ করেছিল মি. জ্যাকুয়েল। শ্যাডো বুঝতে পারছিল, ওর সব ভুল, সব অপরাধ, সব ব্যর্থতা বের করে মাপা হচ্ছে। মনে হচ্ছিল, ওকেও যেন খণ্ড-বিখণ্ড করছেন জ্যাকুয়েল।

নিজের ব্যর্থতা বা নিজের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পায়, এমন সব ঘটনা আর কৃত কার্য-কালাপ মনে রাখি না আমরা। হয় সেগুলোকে ঢেকে দেই মিথ্যার চাদরে, আর নয়তো মুছে ফেলি মন থেকে। শ্যাডো জীবনে এমন অনেক কিছু করেছে, যেগুলো নিয়ে ও নিজেই গর্বিত নয়। এমন অনেক ইচ্ছা ছিল ওর, যা পূরণ করতে পারেনি। সেসবই এখন দখল করে নিল ওর মন। অপরাধবোধে, অনুতাপ আর লজ্জায় ছোট হয়ে গেল যেন। লাশের টেবিলে শুয়ে থাকা দেহের মতোই নগ্ন মনে হচ্ছে নিজেকে। শিয়াল দেবতা আনুবিস এই মুহূর্তে ওর উকিল, ওর বিচারক, ওর জল্লাদ।

'থামো,' কাতর কণ্ঠে বলে উঠল সে। 'দয়া করে থামো।'

কিন্তু থামাল না পরীক্ষা। এক জীবনে যত মিথ্যা বলেছে, যত জনকে কষ্ট দিয়েছে, যা কিছু চুরি করেছে-সব ছোট বড় অপরাধকে বের করে নিয়ে এলো আনুবিস।

কাঁদতে শুরু করল শ্যাডো। সেই ছোটবেলায় ফিরে গিয়েছে যেন, নিজেকে অসহায় আর শক্তিহীন বলে মনে হচ্ছে।

তারপর আচমকা, কোন পূর্ব-নির্দেশনা ছাড়াই, শেষ হয়ে গেল আনুবিসের পরীক্ষা। একই সাথে হাঁপাচ্ছে আর ফোঁপাচ্ছে শ্যাডো। নাক দিয়ে ঝরতে শুরু করেছে পানি। এখনও অসহায় লাগছে নিজেকে।

'ওর হৃদয় কই?' গর্জে উঠল যেন আনুবিস।

'আমার কাছে,' গড়গড় করে উঠল একটা নারী কণ্ঠ। মুখ তুলে তাকাল শ্যাডো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে বাস্ট, হাতে শ্যাডোর হৃদয়।

'আমাকে দাও,' থোথ, আইবিস-মাথার দেবতা হাতে নিল হৃদয়টাকে। সে এগিয়ে আসতেই একটা স্বর্ণের দাঁড়িপাল্লা এগিয়ে দিল আনুবিস।

'এখন আমার ভাগ্য নির্ধারিত হবে?' বাস্টকে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল শ্যাডো। 'স্বর্গে না নরকে না প্রায়শ্চিত্তের স্থানে?'

'যদি তোমার হৃদয় আর পালকের ওজন সমান হয়,' ওকে জানাল মেয়েটা। 'তাহলে নিজের ইচ্ছামতো বেছে নিতে পারবে।'

'আর যদি না হয়?'

শ্রাগ করল বাস্ট, প্রসঙ্গটা ওকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। 'তাহলে তোমার হৃদয় আর আত্মা খেয়ে নেবে আমেমেত...'

'আশা করি একটা আনন্দময় সমাপ্তি পাব আমি।'

'সমাপ্তি বলেই যেখানে কিছু নেই,' উত্তরে জানাল মেয়েটা। 'সেখানে আনন্দময় সমাপ্তি পাবে কোত্থেকে?'

এক পাল্লায় তোলা হয়েছে শ্যাডোর হৃদয়, এবার অন্য পাল্লায় আলতো করে একটা পালক রেখে দিল আনুবিস। দাঁড়িপাল্লার নিচের অন্ধকারে হুটোপুটি করে ছুটে গেল কিছু একটা। ব্যাপারটা টের পেল বটে ও, কিন্তু সেটা কি তা দেখতে ইচ্ছা করল না।

আসলেই পালকটা খুব ভারী, কিন্তু শ্যাডোর হৃদয়ও হালকা নয়। তাই একবার এই পাল্লা নিচে নামে তো অন্যবার ওই পাল্লা।

শেষ পর্যন্ত সমান সমান হলো ওটা, অন্ধকারে থাকা প্রানিটা আওয়াজ করে অসন্তুষ্টি জানান দিল।

'তাহলে আর কি!' বলল বাস্ট। 'আমার আশা ছিল, জীবনে কিছু হলেও ভালো কাজ করেছ। যাক, কী আর করা।'

নীরবতা নেমে এলো হলঘরে, নিস্তব্ধতা যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে অন্ধকার আর পানিতে।

সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে শ্যাডো জানতে চাইল, 'আমি কোথায় যেতে চাই, সেটা বাছতে হবে এখন?'

'হ্যাঁ,' জানাল থোথ। 'অথবা তোমার হয়ে আমরাও বেছে দিতে পারি।'

'না। অসুবিধা নেই, আমিই পারব।'

'বলো তাহলে।' গর্জে উঠল আনুবিস।

'আমি বিশ্রাম চাই।' জানাল শ্যাডো। 'স্বর্গ চাই না, নরকও চাই না। চাই শুধু বিশ্রাম। চাই এসবের পরিসমাপ্তি ঘটুক।'

'তুমি নিশ্চিত?' থোথের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ।' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে শ্যাডো।

শ্যাডোর জন্য একটা দরজা খুলে ধরল মি. জ্যাকুয়েল। দরজার ওপাশে শূন্যতা। অন্ধকার না, বিস্মৃতি না...কেবলই শূন্যতা।

আনন্দের সাথে আগে বাড়ল শ্যাডো, এক মুহূর্তের জন্যও ইতস্তত করল না।

দরজা দিয়ে প্রবেশ করল দৃঢ় পায়ে।

অধ্যায় সতেরো

এই মহাদেশের সবই সুবিশাল। এর নদীগুলো দিগন্ত বিস্তৃত, আবহাওয়া হয় প্রচণ্ড গরম আর নয়ত তীব্র ঠান্ডা। এখানকার বজ্রপাত কানে তালা লাগিয়ে দেয়, এখানে যে কেউ গড়ে তুলতে পারে এক সুন্দর ভবিষ্যৎ। তাই এসবের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের ভুল, অন্যায় আচরণ, ক্ষতি, অপমান আর ধ্বংসও চরম পর্যায়ের।

–জর্জ সেলউইনকে লর্ড কার্লাইল, ১৭৭৮

আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্বের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটার কথা লেখা আছে জর্জিয়া আর টেনেসির সব প্রাচীন খামারের বার্নে। এসব বিজ্ঞাপন সেই কেন্টাকিতে পৌঁছাবার আগে গিয়ে শেষ হয়নি। প্যাঁচালো রাস্তা দিয়ে যে কেউ এগোলেই দেখতে পাবে সেই বিজ্ঞাপন। জীর্ণ হয়ে আসা যেকোন বার্নের ছাদের বড় বড় অক্ষরে লেখাঃ

পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য
রক সিটি দেখুন

সেই সাথে কাছের কোন ধ্বসে পরতে বসা দুধ দোয়াবার ঘরে সাদা বড় হাতের অক্ষরে লেখা থাকবেঃ

রক সিটিতে দাঁড়িয়ে দেখুন সাতটা রাজ্য
পৃথিবীর আর কেউ এমনটা নেই

এসবের ফলে ড্রাইভারের ধারণা হয়, রক সিটি নিশ্চয় খুব কাছেই। অথচ প্রকৃতপক্ষে সম্ভবত সেটায় যেতে হলে গাড়ি চালাতে হবে আরও একদিন। জর্জিয়া রাজ্যে একদম সীমানাতেই, টেনেসির চাট্টানুগার কিছুটা দক্ষিণ-পশ্চিমে, লুকআউট পাহাড়ে অবস্থিত ওটা।

লুকআউট পাহাড় কেবল নামেই পাহাড়, উচ্চতায় ওটা বড়-সড় কোন টিলার সমান হবে হয়তো। সাদারা যখন এখানে পা রাখে, তখন চেরোকি ইন্ডিয়ানদের একটা গোত্র, চিকামাউগা বাস করত পাহাড়ে। ওরা অবশ্য একে ডাকত

চোয়াট্রোটনোগী বলে। আক্ষরিক অর্থ করলে যার অর্থ দাঁড়ায়-একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বড় হওয়া পাহাড়।

১৮৩০ সাল, অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের ইন্ডিয়ান পুনর্বাসন আইনের আওতায় পরে যায় বলে আদি নিবাস ছাড়তে হয় তাদের। চকতো, চিকামাউগা, চেরোকি আর চিকাস-ইউ.এস. সেনাদের পাল্লায় পড়ে সবাইকে প্রায় এক হাজার মাইল হেঁটে নতুন আবাস গাড়তে হয় বর্তমান ওকলাহোমায়। পুরো ব্যাপারটাকে ঠান্ডা মাথায় খুন বললেও অত্যুক্তি হবে না। হাজার হাজার নারী-পুরুষ-বাচ্চা প্রাণ হারায় পথে। যুদ্ধে জয় মানে যুদ্ধে জয়, তারপর যা-ই করা হোক না কেন-তাতে কিছু যায় আসে না।

জায়গাটা দখলের কারণও ছিল। যার অধীনে থাকবে লুকআউট পাহাড়, সেই নিয়ন্ত্রণ করবে পুরো এলাকাটা-অন্তত কিংবদন্তি তা-ই বলে। জায়গাটা ইন্ডিয়ানদের কাছে পবিত্র, আবার একই সাথে আশেপাশের মাঝে সবচেয়ে উঁচুও। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় এখানে রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধ হয়েছিল। প্রথম দিনের যুদ্ধটা হয়েছিল মেঘের উপরে, তারপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে যুদ্ধে জিতে গিয়েছিল ইউনিয়ন আর্মি। এরপর কোন ধরনের অর্ডার ছাড়াই মিসৌরি রিযটাও নিয়ে এসেছিল নিজেদের দখলে। উত্তর দখল করেছিল লুকআউট পাহাড়, আর উত্তরই জিতেছিল যুদ্ধে।

পাহাড়ের গভীরে রয়েছে অগণিত সুড়ঙ্গ আর গুহা, এদের মাঝে অনেকগুলোকে প্রাচীন বলা চলে। এখন অবশ্য প্রায় সবগুলোই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অবশ্য স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষকতায় কিছুদিন আগেই আবিষ্কার হয়েছে ভূ-গর্ভস্থ একটা ঝর্ণা। লোকটা সেই ঝর্ণার নাম দিয়েছে রুবি ফলস। এলিভেটর ব্যবহার করে যাওয়া-আসা করতে হয়। পর্যটকরা আসে ঝর্ণাটা দেখতে, তবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আসে পাহাড়ের শীর্ষে অবস্থিত রক সিটি দেখতে!

রক সিটির শুরু হয়েছিল পাহাড়ের পাদদেশে একটা শখের বাগান হিসেবে। নানা ধরনের পাথরের ভেতর আর উপর দিয়ে তখন পর্যটকরা ঘুরে বেড়াত। কখনও পাশের এনক্লোজারে থাকা হরিণের দিকে ছুঁড়ে দিত ভুট্টা, পথের মাঝে ঝুলন্ত সেতু দেখতে পেয়ে হতো আনন্দে আত্মহারা। তবে এখানকারসবচেয়ে বড় আকর্ষণ নিঃসন্দেহে কোয়ার্টার ডলার খরচ করে বিনকিউলারে চোখ রাখা, আশেপাশের সাতটা রাজ্য দেখা যায় এই একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে। তবে অবশ্যই, রৌদ্রজ্জ্বল দিন হলে কেবল তবেই। এখানেই অবশ্য পথের শেষ না, সামনে অপেক্ষা করে আছে গুহা। প্রতি বছর লাখ-লাখ পর্যটককে নিয়ে সেগুলো চলে যায় পাহাড়ের গভীরে। সেখানে তারা দেখে পুতুল আর নানা রূপকথার

আদলে তৈরি চিত্রকর্ম। ফেরার পথে আচ্ছন্ন থাকে সবাই। কেন এসেছে, কী দেখেছে বা দেখে সন্তুষ্ট হয়েছে কিনা-কোন বিষয়েই নিশ্চিত থাকে না।

যুক্তরাষ্ট্রের আনাচ-কানাচ থেকে দলে দলে এসে তারা জড়ো হয়েছে লুকআউট পাহাড়ে। তবে এই তারা কিন্তু সাধারণ কোন পর্যটক নয়। গাড়িতে, বাসে, বিমানে, ট্রেনে...এমনকী পায়ে হেঁটেও এলো তারা। কেউ কেউ এলো উড়ে, তবে অবশ্যই রাতের আঁধারে। কয়েকজন আবার পাতালে চলাচল করতে জানে, তারা এলো সেভাবেই। ট্রাক ড্রাইভার বা মোটরিস্টদের কাছে লিফট নিয়েও এলো অনেকে।

তবে প্রায় সবার মাঝেই একটা মিল আছে-ক্লান্তিতে ভেঙে পড়া ধুলা-ভরা দেহে সবাই উপস্থিত হয়েছে লুকআউট পাহাড়ের পাদদেশে। আসা শুরু হয়েছে সেই ভোরে, মাঝখানে কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আরেকটা বড় দল এসেছে সকাল বেলা। তবে সবাই আসতে আসতে কয়েকদিন সময় লেগে গেল।

জীর্ণ আর বহু ব্যাবহারে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত একটা ইউ-হল ট্রাকে করে এলো বেশ কজন ভিলা আর রুসালকা। এই মেয়েদের চেহারা অস্থির তথৈবচ, মেক-আপ শোচনীয়।

পাদদেশের কয়েক গাছের কাছে দাঁড়িয়ে বয়স্ক এক ওয়াম্পির একটা মার্লবোরো সিগারেট ধরিয়ে এগিয়ে দিল বানরের মতো আরেক প্রানির দিকে। প্রানিটার সাদা দেহ ঢেকে আছে কমলা পশমে। কৃতজ্ঞতার সাথে সিগারেটটা নিল সে।

পাহাড়ে ওঠার রাস্তার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে একটা টয়োটা প্রিভিয়া। সাতজন চাইনিজ নারী-পুরুষ নামছে ওটা থেকে। ওদেরকে দেখে কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্নই মনে হচ্ছে, পরনে তাদের কালো স্যুট। একজনের হাতে ক্লিপবোর্ড। গাড়ি থেকে নামানো জিনিসগুলো দেখে দেখে বোর্ডে টিক দিচ্ছে। অনেককিছুই নামলঃ তলোয়ার ভর্তি একটা ব্যাগ, বাঁকানো লাঠি আর অনেকগুলো আয়না। অস্ত্রগুলো বন্টন করা শেষ হলে, ক্লিপবোর্ডে সই করে দিল লোকটা।

এক বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা, যাকে বিশ্ব সেই ১৯২০ সাল থেকেই মৃত বলে জানে, জং ধরা একটা গাড়ি থেকে নেমেই দেহের কাপড় খুলতে শুরু করল। লোকটার পা অবিকল ছাগলের মতো। লেজটা ছোট, দেখতে সেটাও ছাগলের লেজের মতো।

হাসিমুখে এসে উপস্থিত হয়েছে চারজন মেক্সিকান। তার প্রত্যেকের চুল কালো আর উজ্জ্বল। নিজেদের মাঝে একটা বোতল চালাচালি করছে তারা। ওতে আছে চকলেট গুঁড়া, মদ আর রক্তের মিশ্রণে তৈরি পানীয়। অন্যদের নজর এড়াবার জন্য একটা বাদামী কাগজের থলের ভেতরেই রেখে হাত-বদল করছে।

তারা আসছে তো আসছেই। ক্যাব ভাড়া করে এসে উপস্থিত হলো ভারতীয় উপমহাদেশের নামকরা দানব-রাক্ষসের দল। মামা-জীকে খুঁজে পাবার আগ পর্যন্ত নীরবে চক্কর খেল সবাইকে ঘিরে। মামা-জী তখন চোখ বন্ধ করে প্রার্থনায় মগ্ন, ঠোঁটগুলো নড়ছে শুরু নীরবে। এই রাক্ষসগুলো তাকে ছাড়া আর কাউকে চেনে না। অথচ তা-ও, পুরাতন যুদ্ধগুলোর কথা মনে করেবৃদ্ধার কাছে যেতে ভয় পাচ্ছে। আচমকা গলায় ঝুলতে থাকা খুলির মালায় হাত বুলালেন তিনি। আস্তে আস্তে তার বাদামী চামড়া ধারণ করল কালো বর্ণ; ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল, লম্বা দাঁতগুলো হয়ে উঠল তীক্ষ্ণ। চোখ খুলে তিনি আদেশ করলেন রাক্ষসদের কাছে আসার। আদেশ পালিত হলে এমনভাবে তাদের আলিঙ্গন করলেন যেন ওরা তার নিজের সন্তান।

গত কয়েকদিন উত্তর আর পুবে বৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু পরিবেশে বিদ্যমান চাপ এক বিন্দু কমেনি তাতে। স্থানীয় আবহাওয়াবিদরা বারবার সাবধান করে দিয়েছেন, সামনে টর্নেডো আসতে পারে। দিনের বেলা তাপমাত্রা বেশ বেশি থাকে, তবে রাতে পড়ে ঠান্ডা।

অনানুষ্ঠানিক ভাবে দল গঠন করে সময় কাটাতে লাগল তারা। জাতীয়তা, গোত্র, মানসিকতা আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রজাতির ভিত্তিতে ভাগ করা হলো দলগুলোকে। ক্লান্ত দেখাচ্ছে সবাইকে, সেই সাথে চিন্তিতও।

এদের মাঝে কেউ কেউ আলাপচারিতায় ব্যস্ত, একদম অল্প হলেও হাসি-ঠাট্টার আওয়াজ ভেসে আসছে। বিয়ারের ফোয়ারা বইছে যেন।

স্থানীয় অনেককেই দেখা যাচ্ছে ওখানে। ওদের নড়া-চড়া, কথা-বার্তা বলা- সবই কেমন যেন আড়ষ্ট...অস্বাভাবিক। যখন তারা কথা বলছে, তখন মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে ওদের দেহকে দখল করে রাখা লোয়োর কণ্ঠ।

বয়স বোঝা মুশকিল, এমন দুজন চিকামাউগা মহিলা, তেলের দাগওয়ালা নীল জিন্স আর জীর্ণ চামড়ার জ্যাকেট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সবার মাঝে। যুদ্ধের জন্য নেয়া প্রস্তুতি দেখছে তারা, মাঝে মাঝে কিছু একটা দেখিয়ে মাথা নাড়ছে। আসন্ন লড়াইতে তাদের অংশ নেবার কোন ইচ্ছা আছে বলে মনে হচ্ছে না।

পূর্ব আকাশে উঁকি দিল চাঁদ, পূর্ণিমার এখনও এক দিন বাকি। আকাশ যত বড়, চাঁদটাকেও ততটাই বড় বলে মনে হচ্ছে। পাহাড়ের উপর থেকে লালচে-কমলা পোশাক পরে ওটা তাকিয়ে আছে যেন ওদেরই দিকে। তবে আকাশে নিজের জায়গায় স্থির হবার পর, ওটাকে বেশ ক্ষুদ্র আর মলিন বলেই মনে হলো।

চাঁদের আলোয় বসে, লুকআউট পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল তারা।

তেষ্টা পেয়েছে লরার।

মাঝে মাঝে জীবিত মানুষদের উপস্থিতি মোমের আগুনের মতোই কোমলভাবে টের পায় ওর মন। আবার অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়, উপস্থিতিটা মশালের আগুনের মতো তীব্র। অবশ্য পরেরটা হলে সুবিধা ওরই। এড়ানো সহজ হয়ে যায়, সহজ হয় প্রয়োজনে খুঁজে পাওয়াটাও। তবে শ্যাডোর আলোটা অদ্ভুত, গাছে ঝুলতে থাকা ওর দেহটাকে থেকে আসছে।

হাত ধরে হাঁটার সময় লরা কিন্তু একবার বকুনি দেয়েছিল শ্যাডোকে। আশা ছিল, ওর ভেতরে অন্তত একটু হলেও জান্তব অনুভূতির আগুন দেখবে। স্মৃতিটা এখন মনে পড়ে যাচ্ছে তার। ইস, শ্যাডো যদি ওর কথার আসল অর্থটা বুঝতে পারত!

অথচ গাছে ঝুলতে থাকা অবস্থায় যখন মারা যাচ্ছে, তখন যেন আরও বেশি করে বাঁচছে শ্যাডো। জীবন যখন আস্তে আস্তে ছেড়ে যাচ্ছে লোকটাকে, তখন আরও বেশি আসল...আরো বেশি পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠছে সে। সারা রাত লরাকে থাকার জন্যও বলেছে। নিশ্চয় ক্ষমা করে দিয়েছে ওকে...অন্তত লরার সেটাই আশা। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। শ্যাডো আগের চাইতে বেশি করে বাঁচছে, এটা জানাই যথেষ্ট।

খাবার বাড়িতে ওকে আসতে বলেছিল শ্যাডো। পান করার মতো পানি নাকি পাওয়া যাবে এখানে। বাড়িটা একেবারে অন্ধকার, আলো জ্বলছে না কোন। কারও উপস্থিতি টেরও পাচ্ছে না লরা। কিন্তু শ্যাডো বলেছে, তিন বোন আছে এখানে। লরার চাহিদা মেটাবে। ঠেলা দিয়ে খামারের দরজা খুলল মেয়েটা, তীব্র ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে আপত্তি জানাল জং-ধরা দরজাটা। লরার বাঁ ফুসফুসের ভেতর নড়ে উঠল কিছু একটা, কেশে ফেলল ও।

একটা সরু হলওয়েতে নিজেকে আবিষ্কার করল লরা, ধুলো পড়া এক পিয়ানো ওর রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। খামার বাড়ির ভেতর থেকে স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ আসছে একটা। পিয়ানোর ফাঁক দিয়ে কোন রকমে পার হলো লরা, ওপাশের দরজা খুলে পা রাখল একটা প্রায় ধ্বংস-প্রাপ্ত বসার ঘরে, জীর্ণ আসবাব দিয়ে ভর্তি ঘরটা। ম্যান্টেলপিসে একটা তেলের বাতি জ্বলছে, ফায়ারপ্লেসে জ্বলছে কয়লার আগুন। বাইরে থেকে অবশ্য ধোঁয়ার গন্ধ পায়নি লরা, চিমনী দিয়ে ধোঁয়া উঠতেও দেখেনি। আগুনে অবশ্য লাভ হচ্ছে না কিছু, ঘরের ভেতরে ঠান্ডাটা দূর হয়নি একদম। অবশ্য সেটার দোষ হয়তো ঘরটাকে পুরোপুরি দেয়া যায় না।

মৃত্যু ওকে কষ্ট দিয়েছে। সেই কষ্টগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু একটা না থাকার কষ্ট। এই যেমন সর্বদা উপস্থিত এক তেষ্টা যা ওর শরীরের প্রতিটা কোষকে যেন শুকিয়ে ফেলে; হাড়ের ভেতর এমন শীতলতা যা এক মুহূর্তের জন্য

রেহাই দেয় না ওকে। মাঝে মাঝে নিজেকে লরা আবিষ্কার করে আগুনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে। অবাক হয়ে টের পায় ওর ভাবনা-আচ্ছা, চিতার আগুনে আমার শরীর গরম হবে তো? মাঝে মাঝে ভাবে-সমুদ্রের পানি গিলে ফেললেও কী আমার তেষ্টা যাবে না?

ঘরটায় সে একা নেই, আচমকা উপলব্ধি করতে পারল মেয়েটা।

একটা কাউচে বসে আছে তিনজন মহিলা, দেখে মনে হচ্ছে কোন অদ্ভুত শিল্প-কলার অংশ হিসেবে ওদেরকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। ওর দিকেই তাকিয়ে আছে মহিলা তিনজন, কিন্তু কারও মুখে রা নেই।

এমনটা আশা করেনি লরা।

আচমকা ওর নাকের ছিদ্র থেকে ঝরে পড়ল কিছু একটা। একটা টিস্যু বের করে এনে নাক ঝাড়ল মেয়েটা। এরপর সেটাকে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল আগুনের ভেতর। আগুনে শূককীটটাকে জ্বলতে দেখল একমনে।

কাজ শেষে ফিরল কাউচে বসে থাকা মহিলাদের দিকে। ও ভেতরে পা রাখার পর এক বিন্দুও নড়েনি তারা। শুধু চুপচাপ এক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে।

'হ্যালো। খামারটা আপনাদের?' জানতে চাইল লরা।

সবচেয়ে বড় মহিলা নড করল। মহিলার হাতগুলো লাল, চেহারায় নিঃস্পৃহ একটা ভাব।

'শ্যাডো, মানে গাছে লটকে আছে যে লোকটা, আমার স্বামী। আমাকে বলল, আপনাদের কাছে পানি চাইতে। জানাতে বলল যে ও দিতে বলেছে।' ওর পেটের ভেতর এক মুহূর্তের জন্য নড়ে উঠল কিছু একটা, তারপরই আবার শান্ত হয়ে গেল।

একেবারে ছোট-খাটো মহিলাটা এবার কাউচ ছেড়ে উঠল, মহিলা এতই ছোট যে তার পা এতক্ষণ ঝুলছিল বাতাসে। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

দরজা খোলা-বন্ধ হবার আওয়াজ পেল লরা। তারপর বাইরে হওয়া কিছু শব্দ, প্রতিটা শব্দের সঙ্গী হয়ে ভেসে এলো পানির আওয়াজ।

ছোট-খাটো মহিলাটা ফিরে এলো অচিরেই; হাতে একটা বাদামী, মাটির তৈরি জগ ধরে রেখেছে। সাবধানে সেটাকে টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে ফিরে গেল কাউচে।

'ধন্যবাদ,' বলে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল লরা। চারপাশে খুঁজেও কোন কাপ বা গ্লাস পেল না। তাই জগটাকেই তুলে নিল ও, দেখে মন হয়নি এতটা ভারী হবে। ভেতরের পানিটুকু একেবারে পরিষ্কার।

ঠোঁটের কাছে তুলে পান করতে শুরু করল ও।

এত ঠান্ডা যে কোন পানি হতে পারে, তার কল্পনাও করতে পারেনি লরা। মেয়েটা জিহ্বা, দাঁত আর তালু, সব যেন জমে যাচ্ছে। তারপরেও পান করতে

থাকল সে, আসলে থামতে পারছে না। অনুভব করতে পারছে যে পানিটা ওর পাকস্থলী, অন্ত্র, হৃদয়, শিরা-সব জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে। যেন তরল বরফ ছুটতে শুরু করেছে ওর দেহ জুড়ে।

আচমকা অবাক হয়ে লক্ষ করল, জগের সব পানি শেষ করে ফেলেছে ও!

মহিলা তিনজন নিঃস্পৃহ চোখেই এতক্ষণ ধরে দেখছিল তাকে। মৃত্যুর পর লরা দুনিয়া হয়ে গিয়েছিল সাদা-কালো। উপমার কোন স্থান ছিল না এখানে। কিন্তু এখন, ওই তিন মহিলাকে দেখার পর ওর মনে হলো-একদল জুরির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। নিজেকে মনে হলো ল্যাবে আটকা পড়া কোন প্রাণী। আর ওই তিনজন যেন বৈজ্ঞানিক।

আচমকা প্রচণ্ড কাঁপতে শুরু করল লরা। টেবিল ধরে নিজেকে একটু সুস্থির করার প্রয়াস পেল সে, কিন্তু টেবিলটা যেন জীবন্ত। কিছুতেই ধরা দিতে চাইছে না ওর হাতে। কোনরকমে ওটাকে ধরে বমি করতে শুরু করল লরা। মুখ থেকে বেরোতে শুরু করল পিত্ত, ফরমালিন, শূককীট আর পোকা। তারপর টের পেল, একই সাথে মল ত্যাগ আর প্রস্রাব করতে শুরু করে দিয়েছে সে। দেহের ভেতর থেকে যেন বেরিয়ে আসছে সবকিছু। সম্ভব হলে হয়তো চিৎকার করত। কিন্তু এতটাই আচমকা আর এতটাই দ্রুত মেঝেটা উপরে উঠে আসতে শুরু করল যে তা আর পারল না।

সময় যেন ধেয়ে এলো ওকে লক্ষ্য করে, গিলে নিল পুরোপুরি। হাজারো স্মৃতি একই সাথে এসে কড়া নাড়ল লরার মনে। এক ক্রিসমাসের এক সপ্তাহ আগে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে হারিয়ে গিয়েছিল লরা। আশেপাশে কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না ওর বাবাকে। পরক্ষণেই আবার চিচি'র বারে বসে আইসক্রিম খেতে খেতে সেদিনে ডেট, এক বিশালদেহি 'খোকাবাবু' আড়চোখে পরখ করে দেখার স্মৃতি মনে পড়ে গেল। পরক্ষণেই লরা নিজেকে আবিষ্কার করল একটা গাড়িতে। প্রচণ্ড দুলছে ওটা, এদিকে রবি চিৎকার করছে গলা ফাটিয়ে। একটা ধাতব পোস্টে বাড়ি খেয়ে থেমে গেল গাড়িটার নড়া-চড়া। কিন্তু তার আরোহীদের সেই সৌভাগ্য হয়নি...

সময়ের-ব্যারি, যেটা ভাগ্যের কুপ বা উর্ডের কুপ থেকে এসেছে, জীবন-ব্যারি নয়। তবে হ্যাঁ, জীবন-বৃক্ষের পুষ্টি আসে এই পানি থাকে। তাই তা অনন্য।

জ্ঞান ফিরে এলো লরার, তখনও কাঁপছে ওর দেহ। তবে এখন ঠান্ডায়! এমনকী ওর নিঃশ্বাস পর্যন্ত বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে বাতাসে। হাত ছুলে গিয়েছে, ক্ষতে লেগে আছে রক্ত...

...তাজা রক্ত।

এবার যেতে হবে লরাকে। কোথায়, তা-ও সে জানে! সময়ের-বারি পান করেছে ও, যেটা এসেছে ভাগ্যের ঝর্না থেকে। মানস চোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে পাহাড়টাকে।

হাতের ক্ষতটা চাটল লরা, ওটার স্বাদ অনুভব করতে পেরে শিহরিত হয়ে উঠল। হাঁটতে শুরু করল পাহাড়ের দিকে।

মার্চের ভেজা একটা দিন, ঠান্ডাও পড়েছে বেশ। বিগত কয়েকদিনের ঝড় দক্ষিণের স্টেটগুলোতে ইচ্ছামতো চালিয়েছে ধ্বংসযজ্ঞ। রক সিটিতে তাই আছে হাতে-গোণা কয়েকজন মাত্র পর্যটক। ক্রিসমাসের সাজ-সজ্জা নামিয়ে নেয়া হয়েছে আগেই। বসন্তকালীন পর্যটকরা এখন আসা শুরু করেনি।

তাই বলে একেবারে পরিত্যক্ত নয় জায়গাটা। আজ সকালে একটা ট্যুর বাস এসে এক ডজন নারী-পুরুষকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছে। তাদের পরনে স্যুট, মুখে আশ্বস্থের হাসি। তাদেরকে দেখে মনে হয়, খবর পাঠক-পাঠিকা হিসেবেই বেশি মানায় তাদের। রক সিটির সামনের পার্কিং-লটে পার্ক করে রাখা হয়েছে একটা কালো হামভি।

নারী-পুরুষগুলো কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে রক সিটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বসার মতো ভালো একটা জায়গা খুঁজে পেতেই বন্ধ হলো ঘোরাঘুরি। নিজেদের মধ্যে গল্প করতে শুরু করল তারা।

এবার আসা পর্যটকদের মাঝে কিন্তু শুধু এরাই নেই। সেদিন রক সিটির রাস্তায় হাঁটলে দেখা পাওয়া যেত আরও কিছু লোককে। এদের অনেককেই দেখে সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রী বলে মনে হয়। আবার বেশ কয়েকজন যেন ভিনগ্রহের আগন্তুক। লম্বা লম্বা লিমোজিন, ছোট ছোট স্পোর্টস কার আর বিশালাকার এস.ইউ.ভি.তে চড়ে এসেছে তারা। কয়েকজনকে দেখে মনে হয়, চোখে সানগ্লাস গলানোটা যেন তাদের অভ্যাস, ঘরের ভেতরেও পরে থাকে। এরা নানা বয়সের, নানা আকারের, নানা মানসিকতার।

তবে সবার মাঝেই অন্তত দর্শনে হলেও মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে একটা। তাদের ভাবখানা এমন, আমাকে তুমি চেনা অন্তত চেনা উচিৎ। চলা-ফেরার...নড়া-চড়ার মাঝেই লুকিয়ে আছে তাদের বিশ্বাস-পৃথিবী আমাদেরকে ঘিরেই আবর্তিত হয়!

মোটকু ছেলেটা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের মাঝে। এমন এক নেতা বলে মনে হচ্ছে ছেলেটাকে, যার সাথে কর্মীদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। অথচ সফলতা লাভ করেছে যেন কীভাবে!ছেলেটা চেষ্টা করছে মানুষকে পটাবার!তার কালো কোটটা পতপত করে উড়ছে বাতাসে।

মাদার গুজ কোর্টের পানীয় স্ট্যান্ডের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কেউ বা কিছু একটা কেশে ওর দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পেল। বিশালদেহি সে, পা আগ আঙুল থেকে স্কালপেলে ব্যবহৃত ব্লেড বেরিয়ে আছে। চেহারাটা ক্ষতে ক্ষতে বিকৃত। 'কুরুক্ষেত্রে বাঁধবে।' লোভী কণ্ঠে বলল।

'কুরুক্ষেত্র টাইপ শব্দ,' বলল মোটকু। 'অতি প্রাচীন, কানে লাগে। বলো পালার পরিবর্তন হতে চলেছে।'

ক্ষতে ভর্তি চেহারাটা একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল মোটকুর দিকে। 'অপেক্ষা করছি।' বলল কেবল।

'যা মন চায় করো, আমি মি. ওয়ার্ল্ডকে খুঁজছি। দেখেছ ওকে?'

মাথা চুলকালো ব্লেড বেরিয়ে থাকা আঙুলগুলো। কিছুক্ষণ ভেবে একটা দিক দেখিয়ে বলল, 'ওই দিকে আছে।'

মোটকু ছেলেটা হাঁটা শুরু করল সেদিকে, ধন্যবাদ পর্যন্ত জানাল না। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সে এক মহিলাকে বলল, 'কুরুক্ষেত্র বাঁধবে।'

নড করল মহিলা, তারপর কাছে এসে জানতে শুরু করল, 'এ ব্যাপারে তোমার অনুভূতি কী?'

ফাঁক হয়ে গেল ক্ষতওয়ালা একজোড়া ঠোঁট, তারপর বলতে শুরু করল।

টাউনের ফোর্ড এক্সপ্লোরার গাড়িতে জি.পি.এস. লাগানো। ছোট একটা স্ক্রিন স্যাটেলাইট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য এনে ওর গাড়ির অবস্থান মানচিত্রে দেখাচ্ছে। কিন্তু তারপরও ব্ল্যাকসবার্গের দক্ষিণে এসে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে সে। স্ক্রিনের মানচিত্রের সাথে এখনকার গ্রাম্য রাস্তার কোন মিল আছে বলে মনে হচ্ছে না। অনেকক্ষণ পর গাড়ি থামাতে বাধ্য হলো লোকটা, জানালা নামিয়ে এক মোটা, সাদা মহিলার কাছে জানতে চাইল-অ্যাশট্রি খামারটা কোনদিকে?

মাথা নেড়ে কিছু একটা বলল মহিলা। কিন্তু কী বলল, তা বুঝতে পারল না টাউন। ঝামেলা না করে ধন্যবাদ জানাল ও, তারপর জানালা তুলে দিয়ে মহিলার দেখানো দিকে রওনা দিল।

আরও প্রায় চল্লিশ মিনিট গাড়ি চালাবার পর, আর সেই সাথে অগণিত গ্রাম্য রাস্তা পার হবার পর, আক্রোশে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল সে।

'এইসব কাজ আর বুড়ো হাড়ে সহ্য হয় না।' শব্দ করেই বলল।

টাউনকে খুব একটা বয়স্ক বলা যাবে না, পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই করছে বয়স। কর্মজীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে কেবল অক্ষর দিয়ে পরিচিত সরকারি প্রতিষ্ঠানে। প্রায় বারো বছর আগে চাকরি বদলিয়ে সে। কিন্তু সরকারি চাকরি ছেড়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নাম লিখিয়েছে কিনা-সেটা ও নিজেও জানে না।

কখনও মনে হয় হ্যাঁ, আবার কখনও না। অবশ্য একেবারে আম-জনতা ছাড়া আর কারও কাছে এই দুইটার মাঝে কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না ওর।

হাল ছেড়ে দিচ্ছে, এমন সময় সাইনবোর্ড আর সদর দরজাটা নজরে পরল টাউনের। হাতে আঁকা সাইনবোর্ডটা শুধু এক শব্দের, অ্যাশ। গাড়ি থেকে নেমে সদর দরজা খুলে ফেলল ও, তারপর আবার ফিরে এসে গাড়ি চালিয়ে ঢুকল ভেতরে।

আমার অবস্থার সাথে ব্যাঙ সিদ্ধ করার মিল আছে, ভাবল সে। ব্যাঙকে পানিতে ফেলে তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিলেই হবে। যতক্ষণে প্রানিটা টের পাবে কোন সমস্যা আছে, ততক্ষণে সে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। যে দুনিয়ায় টাউন কাজ করে, সেটা বড়ই অদ্ভুত। পায়ের নিচে মাটি থাকে না কখনওই, উল্টো মনে হয় যেন ফুটন্ত পানির পাত্রে ডুবে আছে!

অথচ প্রথম যখন ওকে এজেন্সিতে ট্রান্সফার করা হয়, তখন সবকিছু সোজা-সাপ্টা বলে মনে হয়েছিল। এখন সবকিছু...ঠিক জটিল না, তবে অনেক বেশি অদ্ভুত বলতে হবে। মি. ওয়ার্ল্ডের অফিসে একদিন রাত দুইটার সময় বসেছিল ও। কী করতে হবে, সেটা বুঝিয়ে বলছিল মি. ওয়ার্ল্ড। 'বুঝতে পেরেছ?' মি. ওয়ার্ল্ড একটা ছুরি ধরিয়ে দিয়ে জানতে চাইছিল। 'আমার জন্য একটা ডাল কেটে আনবে। বেশি বড় লাগবে না, কয়েক ফুট হলেই চলবে।'

'বুঝেছি।' বলেছিল টাউন। 'কিন্তু কাজটা করতে হবে কেন, স্যার?'

'কেননা, আমি তোমাকে বলেছি।' কেবল এতটুকুই বলেছিল মি. ওয়ার্ল্ড। 'গাছটা খুঁজে বের করে একটা ডাল কাটবে। তারপর চাট্টানুগাতে আমার সাথে দেখা করবে। একটুও সময় নষ্ট করবে না।'

'ব্যাপারটার সাথে কি ওই হারামজাদা জড়িত?'

'শ্যাডো? ওকে দেখলে অগ্রাহ্য করবে। স্পর্শ করারও দরকার নেই। আমি চাই না, তুমি ওকে শহীদ বানিয়ে দাও। এখনকার পরিকল্পনায় শহীদের কোন দরকার নেই।' তারপর হাসি দেখা গেল মি. ওয়ার্ল্ডের চেহারায়। লোকটা খুব অল্পেই মজা পায়, ব্যাপারটা আগেও টের পেয়েছে টাউন। এমনকি ক্যানসাসে মজা করেই শোফার হিসেবে গিয়েছিল সে।

'দেখুন-'

'কোন শহীদ চাই না আমি, টাউন।'

আর কিছু বলেনি টাউন, নড করে ছুরি নিয়ে নিয়েছিল।

শ্যাডো নামের লোকটা ওর জীবনের একটা অংশ হয়ে গিয়েছে বুঝতে পেরে তার উপর ঘৃণাটা আরও পোক্ত হয়েছে টাউনের। ঘুমাবার সময় লোকটার চেহারা ভেসে ওঠে ওর সামনে। তখনও শ্যাডোর চেহারায় থাকে তাচ্ছিল্যের হাসি। টাউনের ইচ্ছা হয়, হাতের মুঠোটা লোকটার পেটে প্রবেশ করিয়ে দেয়!

তৃণভূমির উপর দিয়ে ফোর্ড এক্সপ্লোরার চালিয়ে নিয়ে গেল সে, একটা পরিত্যক্ত খামার বাড়ি পড়ল কেবল পথে। অল্প একটা চড়াই পার হয়ে দেখতে পেল গাছটাকে। ওটা পার হয়েই নিজের গাড়িটা পার্ক করল টাউন। বন্ধ করে নজর দিল ড্যাশবোর্ডের ঘড়িটার দিকে। সকাল ছয়টা আটত্রিশ বাজে। চাবি-টাবি সব গাড়িতেই রেখে নামল সে, এগোল গাছের দিকে।

বিশাল একটা গাছ, যার উচ্চতা অন্য কিছুর সাথেই তুলনা করা সম্ভব না। বাকলগুলো দেখে মনে হয় যেন সিল্কের স্কার্ফ।

মাটির একটু উপরেই, গাছের ডাল থেকে দড়ি বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে একজন মানুষ। আর মাটিতে দেখা যাচ্ছে চাদর দিয়ে ঢাকা কিছু একটা। ওটা যে কী, তা বুঝতে পারছে টাউন। পা দিয়ে চাদর সরাতেই নজরে পড়ল ওয়েনসডের ক্ষত-বিক্ষত চেহারা।

গাছের দিকে এগোল টাউন, প্রথমে কাণ্ডটাকে ঘিরে চক্কর গেল একটু। খামার বাড়ি থেকে দেখা যাবে না, এমন জায়গায় এসে প্যান্ট খুলে পেশাব করল কাণ্ডে। এরপর বাড়িটার কাছে গিয়ে খুঁজে বের করল একটা কাঠের মই। ওটাকে গাছের কাছে নিয়ে এসে ঠেস দিল কাণ্ডের গায়ে। এরপর উপরে উঠতে শুরু করল।

দড়ি বাঁধা শ্যাডো গাছ থেকে ঝুলছে। লোকটা বেঁচে আছে বলে মনে হচ্ছে না ওর। উঠছে-নামছে না বুক। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না।

'হাই, হারামজাদা।' বলল টাউন, কিন্তু নড়ল না শ্যাডো।

মইয়ের একদম উপরের ধাপে পৌঁছাল টাউন, পকেট থেকে ছুরি বের করে ছোট-খাটো একটা ডাল কেটে নিল। আসলে অর্ধেক কেটে, ভেঙে ফেলল বাকিটুকু। প্রায় ত্রিশ ইঞ্চির মতো লম্বা হবে ওটা।

ছুড়িটা খাপে ভরে নিয়ে নিচে নামতে শুরু করল সে। শ্যাডোর মুখোমুখি এসে থমকে দাঁড়াল। 'ঈশ্বর, তোকে আমি ঘৃণা করি।' ইচ্ছা হচ্ছিল বন্দুক বের করে গুলি করে মারে লোকটাকে। কিন্তু জানে, তা পারবে না। তাই ডালটা দিয়েই শ্যাডোর পেটে খোঁচা মারল, নিজেকে প্রবোধ দিল ওটাকে বর্শা ভেবে।

'অনেক হয়েছে।' নিজেকেই বকলো সে। 'এবার কাজে নাম।' একদম নিচের কয়েকটা ধাপ লাফিয়ে নেমে হাতের দিকে তাকাল ও। হাতে ধরা ডালটা দেখে নিজেকে ছোট বাচ্চা বলে মনে হচ্ছে ওর। বাচ্চারা যেমন ডালকে বর্শা বা তলোয়ার ভেবে ধরে থাকে, টাউন নিজেও তাই করছে। অন্য কোন গাছ থেকে কাটলেও এমন কোন ক্ষতি ছিল না। ভাবল ও। এই গাছের ডাল না হলেই বা কী? কে টের পেত?

পরক্ষণেই ভাবল, মি. ওয়ার্ল্ড পেতেন।

খামার বাড়িতে গিয়ে আবার রেখে এলো মইটা। মনে হলো যেন কিছু একটা নড়ছে ভেতরে। মইটা বাইরেই পেয়েছিল, তাই ভেতরে ঢুকতে হয়নি ওকে। এখন কৌতূহলী হয়ে তাকাল জানালা দিয়ে। প্রায় ভেঙে পড়া একগাদা আসবাব দিয়ে সাজানো একটা অন্ধকার ঘর পড়ল নজরে। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো যেন ভেতরে তিনজন মহিলা বসে আছে।

একজন উল বুনছে, একজন চেয়ে আছে সরাসরি ওরই দিকে। বাকি জন ঘুমাচ্ছে। ওর দিকে তাকিয়ে থাকা মহিলার চেহারা বিকৃত হয়ে গেল আস্তে আস্তে। ওটা যে হাসি, তা টের পেয়ে কিছুক্ষণ সময় লাগল টাউনের। একটা আঙুল তুলে নিজের গলায় ঠেকাল মহিলা, তারপর গলা কাটার ভঙ্গি করে টান দিল।

ওই এক মুহূর্তে এসবই দেখেছে বলে মনে হলো ওর। পরের মুহূর্তেই দেখতে পেল, ঘরটা খালি...

...কেউ নেই ভেতরে।

চোখ কচকালো টাউন।

গাড়ির কাছে ফিরে এলো সে। ভেতরে বসে ডালটাকে সাদা চামড়ায় মুড়িয়ে প্যাসেঞ্জার সিটের উপর রাখল। চাবি একবার ঘোরাতেই চালু হলো এঞ্জিন। ড্যাশবোর্ডের ঘড়িতে বাজে ছয়টা আটত্রিশ! ভ্রূ কুঁচকে হাতঘড়ির দিকে তাকাল সে, ওটার মতে এখন সময় দুপুর একটা আটান্ন।

দারুণ, ভাবল টাউন। হয় গাছে আমি আট ঘণ্টা কাটিয়েছে। নয়তো গাছে উঠে ফিরে গিয়েছি এক মিনিট অতীতে। ভাবতে ভাবতেই উপলব্ধি করল, সম্ভবত দুটি ঘড়িই কাকতালীয় ভাবে একই সাথে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

এদিকে গাছে ঝুলতে থাকা শ্যাডোর দেহ থেকে টপটপ করে ঝরতে শুরু করেছে রক্ত। ক্ষতটা ওর পাশে। আস্তে আস্তে ঝরতে থাকা রক্তটা ঘন, গুড়ের মতো কালো।

লুকআউট পাহাড়ের শীর্ষ দখল করে নিয়েছে মেঘ।

পাহাড়ের পাদদেশে, অন্যদের থেকে অনেকটা দূরে বসে আছেন ইস্টার। পাহাড়ের ওপাশ থেকে উদীয়মান সূর্য দেখছেন একমনে।

আরেকটা রাত এলো আবার চলেও গেল। এখন স্থবির হয়ে আছে সবাই। দলের সবার আসা এখনও শেষ হয়নি। তবে এখন একজন-দুজন করে আসছে। গত রাতে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে এসেছে কিছু প্রাণী। তাদের মাঝে আপেল গাছ আকৃতির দুজন বাচ্চা ছেলেও আছে।

কেউ বিরক্ত করছে তাদেরকে। বাইরের দুনিয়ার কেউ ওদের উপস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বলেও মনে হচ্ছে না। রক সিটির পর্যটকদের যেন

মানসচোখে দেখতে পেলেন ইস্টার-কোয়ার্টার ঢুকিয়ে এদিকেই তাকাচ্ছে তারা বিনকিউলার দিয়ে। অথচ গাছ, ঝোপ আর পাথর ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

রান্না করার জন্য জ্বালানো আগুনের গন্ধ পাচ্ছেন তিনি। ক্যাম্পের ওপাশে কেউ একজন বাজাচ্ছে হারমোনিকা। সুরটা শুনে অবচেতন মনেই একসাথে হাসলেন আর কেঁপে উঠলেন তিনি। ব্যাকপ্যাকে একটা পেপারব্যাক বই নিয়ে এসেছেন তিনি, আলো ফোঁটার অপেক্ষা করছেন এখন।

আকাশে দুটো বিন্দু দেখা যাচ্ছে, একটা ছোট আর অন্যটা বড়। সকালের বাতাসে ভেসে আসা এক বিন্দু জল তার চেহারায় এসে পড়ল। নগ্ন পদে এক মেয়ে এগিয়ে এলো মহিলার দিকে। একটা গাছের পাশে থেমে পেট খালি করে নিল। ইস্টার হাত নেড়ে ডাকলেন মেয়েটাকে।

'শুভ সকাল, মহামান্যা,' বলল মেয়েটা। 'অচিরেই যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে।' ওর গোলাপি জিহ্বা স্পর্শ করল লালচে ঠোঁট। কাঁধে একটা কালো কাকের পাখা বেঁধে রেখেছে। গলায় ঝুলিয়েছে আরেকটা কাকের পা।

'তুমি জান কীভাবে?'

হাসল মেয়েটা। 'আমি মরিগানদের একজন, মাচা নাম আমার। যুদ্ধের আগেই তার গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়ায়, আমি সেই গন্ধ পাই। আমাকে যুদ্ধের দেবী বলে ডাকা হয়, আমি ঘোষণা করছি-আজকে রক্ত ঝরবে।'

'তাই নাকি,' অন্যমনস্ক ইস্টার বললেন। আকাশের দিকেই মন তার। কিছুক্ষণ আগে মেঘের নিচে দেখতে পাওয়া ছোট বিন্দুটা নিক্ষিপ্ত পাথরের মতো নিচে নামতে শুরু করেছে!

'আমরা লড়ব, একজন একজন করে খুন করব শত্রুপক্ষকে।' বলল মেয়েটা। 'তাদের কাঁটা মুণ্ডু নিয়ে করব উল্লাস, তাদের চোখ আর লাশ খুবলে খাবে কাক।' অনেক কাছে চলে এসেছে ফোঁটাটা, ওটা যে পাখি তা বুঝতে পারলেন ইস্টার।

এক পাশে মাথা কাত করে বললেন, 'যুদ্ধ দেবীরা গোপন জ্ঞান পায় নাকি? কারা জিতবে, কারা হারবে, এসব?'

'না,' জানাল মেয়েটা। 'আমি কেবল যুদ্ধের গন্ধ পাই। কিন্তু আমরা জিতবই, জিততে আমাদেরকে হবেই। সর্ব-পিতাকে ওরা যেভাবে খুন করেছে, তা আমি দেখেছি। হয় আমরা থাকব, নয়তো ওরা।'

'হুম,' বললেন ইস্টার। 'তা বটে।'

আবারও হাসল মেয়েটা, আধা-আলোতে ফিরে গেল ক্যাম্পে। বসেই রইলেন ইস্টার, হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলেন মাটি থেকে বেরিয়ে থাকা একটা সবুজ পাতা। তার স্পর্শ পাওয়া মাত্র বড় হতে শুরু করল ওটা, কিছুক্ষণের মাঝেই

পরিণত হলো একটা সবুজ, টিউলিপের মাথায়। সূর্য গরম হলে আত্মপ্রকাশ করবে ওটা।

বাজ পাখির দিকে তাকালেন ইস্টার। 'তোমাকে কোনভাবে সাহায্য করতে পারি?' জানতে চাইলেন তিনি।

ইস্টারের মাথার প্রায় পনেরো ফিট উপরে ডানা ঝাপটাতে লাগল বাজ পাখি। তারপর আস্তে করে নেমে পড়ল মাটিতে। উন্মাদ চোখে তাকাল তার দিকে!

'হ্যালো, সুদর্শন।' বললেন ইস্টার। 'তোমার আসল রূপ দেখাবে না?'

ওর দিকে এগিয়ে এলো বাজ পাখি, বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে। পরক্ষণেই দেখা গেল, ওখানে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক। একবার ইস্টারের দিকে তাকিয়েই আবার নজর ফেরাল মাটিতে। 'তুমি?' প্রশ্ন করল সে। ও তাকাচ্ছে ঘাসের দিকে, তাকাচ্ছে আকাশ আর ঝোপের দিকে। কিন্তু ভুলেও ইস্টারের দিকে নজর ফেলছে না।

'আমি,' বললেন মহিলা। 'আমি কী?'

'তুমি।' আবার থেমে গেল যুবক। মনে হচ্ছে যেন কী বলবে তা খুঁজে পাচ্ছে না। নানা ধরনের অনুভূতি খেলা করে গেল যুবকের চেহারায়।

পাখি হিসেবে একটু বেশিই সময় কাটিয়ে ফেলেছে ছেলেটা, ভাবলেন তিনি। কীভাবে মানুষের মতো কথা বলতে হয় তা আর মনে নেই। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি। অনেকক্ষণ পর যুবক বলল, 'আমার সাথে আসবে?'

'হয়তো। কোথায় নিতে চাও?'

'গাছে ঝোলা মানুষটার তোমার সাহায্য দরকার। ব্যথা পেয়েছে, রক্ত ঝরছিল। এখন বন্ধ। মনে হয় মৃত।'

'যুদ্ধ চলছে একটা, আমি চাইলেই পালিয়ে যেতে পারি না।'

নগ্ন যুবক বলল না কিছুই, কেবল দেহের ওজন এক পা থেকে অন্য পায়ের ওপর চাপাল। ইস্টারের মনে হলো, লোকটা বাতাসে উড়তে যতটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত, মাটিতে ততটাই অস্বস্তি বোধ করছে। তারপর আচমকা বলল, 'যদি লোকটা চিরদিনের জন্য চলে যায়, তাহলে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'কিন্তু যুদ্ধ-'

'লোকটা মারা গেলে, যুদ্ধে কে জিতল আর কে হারল তাতে কিছু যায় আসে না।'

'কোথায় যেতে হবে? জায়গাটা কি ধারে-কাছে কোথাও?'

টিউলিপের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যুবক। মাথা নেড়ে বলল, 'অনেক দূরে।'

'হুম,' বললেন ইস্টার। 'আমাকে এখানে দরকার হবে। চাইলেই উধাও হয়ে যেতে পারি না। তাছাড়া, দূরে হলো আমি যাবই বা কীভাবে? তোমার মতো আমি উড়তে পারি না, বুঝেছ?'

'জানি,' বলল হোরাস। 'তুমি উড়তে পারো না।' তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকাল। বড় বিন্দুটা নামতে শুরু করেছে। ওদিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'কিন্তু ও পারে।'

আরও কয়েক ঘণ্টা বেহুদা গাড়ি চালাবার পর টাউনের মনে হলো, জি.পি.এস. সিস্টেমটাকে সে শ্যাডোর চাইতেও বেশি ঘৃণা করে। খামার বাড়ি থেকে, ওই গাছটা থেকে ফেরার রাস্তা খুঁজে বের করা, ওগুলো খুঁজে পাওয়ার থেকেও বেশি কঠিন বলে মনে হচ্ছে এখন। যেদিকেই যাক না কেন ও, যে রাস্তাই নেক না কেন, ঘুরে ফিরে উপস্থিত হচ্ছে হাতে আঁকা অ্যাশ্ সাইনবোর্ডের সামনেই।

কী আশ্চর্য! যে পথে এসেছে, তার উল্টো পথে ফিরে গেলেই তো হয়, তাই না?

সমস্যা হলো, গতবার সে তাই করেছে। আসার পথে যেখানে বাঁ দিকে গাড়ির নাক ঘুরিয়েছে, এবার সেখানে ঘুরিয়েছে ডান দিকে। কিন্তু তারপরও, ঘুরে ফিরে উপস্থিত হয়েছে ঠিক সেই খামার বাড়ির সামনেই! ঘন কালো মেঘ ভিড় জমিয়েছে আকাশে, খুব দ্রুতই অন্ধকার হয়ে আসছে চারপাশ। সকাল বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে রাত নেমেছে। লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে। এভাবে চললে বিকালের আগে চাট্টানুগায় পৌঁছান অসম্ভব হয়ে যাবে।

সেল ফোন থেকে বার বার নো সার্ভিস লেখা ভেসে আসছে। গাড়িটার গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে রাখা মানচিত্রটায় প্রধান রাস্তা আর হাইওয়ে পরিষ্কারভাবে আঁকা হয়েছে। কিন্তু আর কিছু নিয়ে সেই মানচিত্রেরমাথা ব্যথা নেই!

রাস্তায় থেমে যে কাউকে জিজ্ঞাসা করবে, সেই উপায়ও নেই। কাউকে দেখা যাচ্ছে না চারপাশে। বাড়ি আছে অনেকগুলোই, কিন্তু কোনটাতেই বাতি জ্বলছে না। এদিকে ফুয়েল ট্যাঙ্কের অবস্থাও খারাপ, প্রায় শেষের দিকে। দূরে কোথাও হওয়া বজ্রপাতের আওয়াজ ভেসে এলো ওর কানে। সেই সাথে উইন্ডশীল্ডে এসে আঘাত হানল এক ফোঁটা বৃষ্টি।

রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলা মেয়েটাকে দেখা মাত্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে টাউন বলল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।' মেয়েটার একদম পাশে এসে থামাল গাড়ি। 'ম্যাম, আমি দুঃখিত। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। এখান থেকে হাইওয়ে এইট্রি-ওয়ানে যাব কীভাবে, বলতে পারেন?'

প্যাসেঞ্জারের দিকের জানাল দিয়ে ওর দিকে তাকাল মেয়েটা। 'আসলে আপনাকে বলে বোঝানো সম্ভব না। তবে চাইলে দেখিয়ে দিতে পারি।' মলিন চেহারা তার, চুলগুলো লম্বা আর কালো।

'উঠে পড়ুন,' বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে বলল টাউন। 'তবে আগে গ্যাস ভরতে হবে।'

'ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞতা জানাল মেয়েটা। 'আমার গাড়ির দরকার ছিল।' উঠে বসল সে। 'এই সিটে একটা ডাল দেখতে পাচ্ছি।' অবাক হয়ে বলল সে।

'পেছনের সিটে রেখে দিন। যাচ্ছেন কোথায়?' জানতে চাইল টাউন। 'যদি কোন গ্যাস স্টেশন আর ফ্রি-ওয়েটা দেখিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আপনার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতেও কোন আপত্তি থাকবে না!'

মেয়েটা আবার ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'আমি সম্ভবত আপনার গন্তব্যের চাইতেও দূরে যাচ্ছি। আমাকে ফ্রি-ওয়ে পর্যন্ত এগিয়ে দিলেই হবে। তারপর কোন ট্রাকে লিফট নিব নাহয়।' হাসল মেয়েটা। এই হাসিতেই পটে গেল টাউন।

'ম্যাম,' বলল লোকটা। 'ট্রাকের চাইতে আমার গাড়িতেই বেশি আরামে থাকবেন।' নাকে মেয়েটার গন্ধ এসে লাগছে ওর। গন্ধটা ভারী, ম্যাগনোলিয়া বা লাইলাকের মতোই কড়া। তবে সমস্যা হচ্ছে না টাউনের।

'আমি জর্জিয়ায় যাচ্ছি।' জানাল মেয়েটা। 'অনেক দূরের রাস্তা।'

'আমি চাট্টানুগায় যাচ্ছি। তত দূর পর্যন্ত আপনাকে নিয়ে যেতে পারব।'

'উম,' বলল মেয়েটা। 'আপনার নাম কী?'

'বন্ধুরা আমাকে ম্যাক বলে ডাকে।' জানাল মি. টাউন। বারে যখন মেয়েদের সাথে কথা বলে, তখন যোগ করে-আর যারা ভালোভাবে চেনে, তারা ডাকে বিগ ম্যাক বলে। কিন্তু আপাতত তার দরকার আছে বলে মনে হলো না। রাস্তাটা অনেক লম্বা, পরস্পরের সাথে পরিচিত হবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। 'আপনার নাম?'

'লরা।'

'হুম, লরা।' বলল টাউন। 'আশা করি আমরা ভালো বন্ধু হব।'

মি. ওয়ার্ল্ডকে রেইনবো রুমে খুঁজে পেল মোটকু। রেইনবো রুমটা রক সিটির রাস্তায় একটা ঘের দেয়া ঘর ওটা। লাল, সবুজ আর হলদে রঙের পাতলা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে ওটার কাঁচের জানালাগুলো। ভেতরে অস্থির ভঙ্গিতে হাঁটছে মি. ওয়ার্ল্ড। লোকটার পরনে একটা বারবেরি বর্ষাতি।

কাশল মোটকু, চোখ তুলে তাকাল মি. ওয়ার্ল্ড।

'উম, মিস্টার ওয়ার্ল্ড?'

'বলো? কোন সমস্যা? সবকিছু সময় মেনে হচ্ছে তো?'

মোটকুর গলা শুকিয়ে এসেছে। ঠোঁট ভেজাল সে। 'সবকিছু ঠিক আছে। তবে হেলিকপ্টার আসবে কিনা, তার কোন নিশ্চয়তা পাইনি।'

'দরকারের সময় ঠিকই পাওয়া যাবে ওগুলো, দুশ্চিন্তা করো না।'

'তাহলে তো ভালোই,' বলে চুপচাপ জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল মোটকু। না আর কিছু বলল, আর না বিদায় নিল! ছেলেটার মাথায় একটা ক্ষতের দাগ।

কিছুক্ষণ পর মি. ওয়ার্ল্ড জানতে চাইল, 'আর কিছু?'

ক্ষণিকের নীরবতার পর হোঁতকা ঢোক গেলে বলল, 'হ্যাঁ।'

'একা একা বলতে চাও?'

নড করল ছেলেটা।

মোটকুকে সাথে নিয়ে অপারেশন্স সেন্টারে চলে এলো মি. ওয়ার্ল্ড। জায়গাটা আসলে স্যাঁতস্যাঁতে একটা গুহা। বাইরে একটা সাইনবোর্ড টাঙিয়ে পর্যটকদের জানানো হয়েছে-মেরামতের জন্য আপাতত বন্ধ আছে জায়গাটা। ওটার সামনে প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে আছে দুইজন মানুষ।

'বলো, কী বলবে?' জানতে চাইল মি. ওয়ার্ল্ড।

'হুম, বলছি। দুটি জিনিস। প্রথম প্রশ্ন, কীসের জন্য অপেক্ষা করছি আমরা? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন, এইটা একটু কঠিন। আমাদের বন্দুক আছে। তাই না? আছে আরও অস্ত্র-শস্ত্র। ওদের কী আছে? তলোয়ার, ছুরি, হাতুড়ি আর পাথরের কুঠার। আমাদের আছে স্মার্ট বোমা!'

'ওটা কিন্তু ব্যবহার করা যাবে না।' মি. ওয়ার্ল্ড মনে করিয়ে দিল।

'জানি, আগেও বলেছেন। আমি জানি, অসুবিধা নেই। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে, এল.এ. তে ওই মাগীকে সরিয়ে দেবার পর...আমি কেন জানি...' থেমে গেল সে। চেহারা বিকৃত হয়ে গেল তার, আর বলতে চাচ্ছে না কিছু।

'উৎকণ্ঠায় ভুগছ?'

'হ্যাঁ। শব্দটা আমার পছন্দ হয়েছে, উৎকণ্ঠায় ভুগছি।'

'কী নিয়ে?'

'আমরা লড়ব, আর লড়বে জিতব অবশ্যই।'

'তোমার উৎকণ্ঠার কারণ কী এই চিন্তাটাই? আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা গৌরবের।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওরা তো এমনিতেও মরা যাবে। যেমনটা গিয়েছে ডাকবাহী পায়রা আর থায়লাসিনরা। তাই না? কিন্তু যুদ্ধ শুরু হলে তো রক্তক্ষয় হবে।'

'আহ,' মি. ওয়ার্ল্ড নড করলেন।

লোকটা বুঝতে পারছে, ভাবল মোটকা। তারপর যোগ করল, 'দেখুন, শুধু আমি একাই এসব ভাবছি না। রেডিও মর্ডানের ক্রুদের সাথে আলোচনা করেছি

এটা নিয়ে। ওরাও শান্তিপূর্ণ সমাধান চায়। অন্য অনেকেও তেমনটাই বলছে। বুঝতেই পারছেন।'

'তা পারছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জানাতে চাই, এমন অনেক তথ্য আমার কাছে আছে যা তুমি জানো না।' এরপর যে হাসিটা দেখা গেল মি. ওয়ার্ল্ডের চেহারায়, তাকে হাসি না বলে ক্ষতওয়ালা একটাকে বিকৃত চেহারা বলাই ভালো।

পিট পিট করে তাকাল ছেলেটা। 'মি. ওয়ার্ল্ড, আপনার ঠোঁটের কী হয়েছে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওয়ার্ল্ড। 'সত্যিটাই বলি,' বলল সে। 'অনেকদিন আগে একজন এই দুটোকে সেলাই করে লাগিয়ে দিয়েছিল।'

'আয়-হায়,' বলে উঠল হোঁতকা। 'পুরো ওমের্তার কাহিনি দেখি।'

'হ্যাঁ, আমাদের অপেক্ষার কারণ জানত চাইছ? জানতে চাইছ, কেন কাল রাতে আক্রমণ করলাম না?'

নড করল হোঁতকা, ঘামছে কুল কুল করে।

'আমরা এখনও আক্রমণ করিনি, কারণ একটা ডালের অপেক্ষা করছি।'

'ডাল?'

'ঠিক শুনেছ, একটা ডাল। ওটা দিয়ে কী করব, শুনবে?'

মাথা নাড়ল ছেলেটা। 'হ্যাঁ, কী করবেন?'

'তোমাকে বলতে পারি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল মি. ওয়ার্ল্ড। 'কিন্তু তাহলে তোমাকে হত্যা করতে হবে।' বলে চোখ টিপল সে। সাথে সাথে হালকা হয়ে গেল ঘরের আবহাওয়া।

খিল খিল করে হাসতে শুরু করল মোটকু। 'ঠিক আছে।' বলল সে। 'হি হি। ঠিক আছে, আমি বুঝতে পেরেছি।'

মাথা নাড়ল মি. ওয়ার্ল্ড। মোটকুর কাঁধে হাত রাখল সে। 'সত্যি জানতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'যেহেতু আমরা বন্ধু, তাই বলছি। আমি ডালটা নেব। এরপর সেটা ছুঁড়ে দেব আমাদের দিকে আক্রমণ করতে আসা সেনাদলের দিকে। আমি ছুঁড়ে দেয়া মাত্র ডালটা পরিণত হবে একটা বর্শায়। যখন ওটা সেনাদলের উপরে পৌঁছাবে, তখনও চিৎকার করে বলল 'এই যুদ্ধটাকে আমি ওডিনের নামে উৎসর্গ করলাম।''

'হাহ! কেন?'

'ক্ষমতা...,' চিবুক চুলকাতে চুলকাতে বলল মি. ওয়ার্ল্ড। 'আর টিকে থাকার জন্য। আসলে এই যুদ্ধের ফলাফলে কিছুই যায় আসে না। আমাদের দরকার বিশৃঙ্খলা আর খুনোখুনি।'

'আমি বুঝতে পারছি না।'

'দেখাচ্ছি, তোমাকে।' বলল মি. ওয়ার্ল্ড। 'মন দিয়ে খেয়াল করো!' এই বলে তার বারবেরির বর্ষাতির পকেট থেকে একটা শিকারির ছুরি বের করে আনল সে। তারপর দক্ষ হাতে সেটাকে ঢুকিয়ে দিল মোটকুর থুতনির নিচে, চাপ দিয়ে মগজে ঢুকিয়ে দিল ওটার ফলা। 'এই মৃত্যুকে ওডিনের জন্য উৎসর্গ করলাম।' বলল সে।

লোকটার হাতের উপরে এসে পড়ল কিছুটা তরল, তবে রক্ত না ওটা। মোটকু ছেলেটার চোখের পেছন থেকে ভেসে এলো স্পার্কের শব্দ। বাতাস ভারী হয়ে আছে পোড়া তারের গন্ধে। কয়েকবার কেঁপে উঠল মোটকু ছেলেটার দেহ, তারপর আছড়ে পড়ল মেঝেতে। হোঁতকার চেহারার ভাবটাকে বিভ্রান্তি আর দুঃখ বলা চলে। 'ওই দেখ,' বাতাসকে উদ্দেশ্য করে বলল যেন মি. ওয়ার্ল্ড। 'দেখে মনে হচ্ছে, চোখের সামনে শূন্য আর এককে পায়রা হয়ে উড়ে যেতে দেখেছে!'

খালি করিডর থেকে উত্তর এলো না কোন।

কাঁধের উপর তুলে নিল সে দেহটাকে, এমন ভঙ্গিতে যেন ওটার কোন ওজনই নেই। এরপর একটু গোপন একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে ঢেকে রাখল কাপড় দিয়ে। সন্ধ্যায় লাশটার একটা গতি করা যাবে। যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝে একটা লাশ ফেলে দেয়া আর এমনকী ব্যাপার! কে দেখবে? আর দেখলেই বা কী?

কিছুক্ষণ নীরবতা বজায় রইল জায়গায়। তারপর ভরাট আর কর্কট একটা কণ্ঠ, যেটা মি. ওয়ার্ল্ডের না, বলে উঠল, 'দারুণ শুরু।'

অধ্যায় আঠারো

> সৈন্যদের পথ আটকাতে চেয়েছিল ওই দুজন। কিন্তু গুলি ছুঁড়ে উভয়কেই হত্যা করা হয়। গানে ওদের কারাবাসের কথা বলা হয়েছে কেবল কাব্যের খাতিরে। সত্যি ঘটনাগুলোকে সবসময় অবিকৃত রেখে কাব্যে তুলে ধরা যায় না। ওই পঙক্তিগুলোতে যথেষ্ট জায়গা নেই।
>
> –দ্য ব্যালাড অফ স্যাম ব্যাসের প্রসঙ্গে, আ ট্রেজারি অফ আমেরিকান ফোকলোর।

হয়তো এসব বাস্তব হতেই পারে না। প্রিয় পাঠক, যদি এই আখ্যান পড়ে আপনার মাঝে অস্বস্তির জন্ম নেয়, তাহলে পুরোটাকেই রূপকার্থে লেখা বলে ধরে নিন। হাজার হলেও, ধর্মের সবকিছুই তো রূপক। ঈশ্বর নানা রূপে আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হন-কখনও স্বপ্নে, কখনও আশায়, কখনও কোন নারী রূপে, কখনও যাজকের বেশ ধরে। তাকে কখনও পাওয়া যায় কোন শহরে, কখনও কোন অমূল্য বস্তুর ভেতরে। তিনি এমন একজন, যিনি আপনাকে ভালোবাসেন। যিনি কেবল আপনারই খাতিরে, আপনার পছন্দের ফুটবল দলের প্রতি সুনজর দেন। আপনার জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে রয়েছে যার আশীর্বাদ।

ধর্ম তাই এমন এক বেদি, যেখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পাওয়া যায় জীবনটাকে।

তাই এই গল্প অবাস্তব ধরে নিন। এসব প্রকৃতপক্ষে ঘটতেই পারে না। এই আখ্যানের আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করা যাবে না এক বিন্দুও। তারপরও, যেহেতু একসাথে এতদূর চলেই এসেছি। তাই বাকিটুকুও শোনাই আপনাকেঃ

লুকআউট পাহাড়ের পাদদেশে, একটা ছোট অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে বসে আছে একদল নারী-পুরুষ। বৃষ্টি পড়ছে অঝোর ধারায়। কপাল ভালো, গাছ ছিল এক গাদা। নইলে আর আগুন জ্বালাতে হতো না! তর্কে লিপ্ত সবাই।

কালি মা, এখন যার ত্বক কয়লার চাইতেও কালো আর দাঁত দুধের চাইতেও সাদা, বললেন, 'সময় হয়েছে।'

আনানসি, রুপালী চুল ভর্তি মাথা দুলিয়ে জানালেন আপত্তি। 'এখনও অপেক্ষা করা সম্ভব।' বললেন তিনি। 'আর যেহেতু অপেক্ষা করা সম্ভব, তাই অপেক্ষা করাই শ্রেয়।'

অসন্তোষের রোল উঠল উপস্থিতদের মাঝে।

'ঠিক বলেছে, আনানসি।' আরেক বৃদ্ধ বলে উঠল আচমকা। তার নাম চেরনোবোগ, হাতে একটা ছোট স্লেজহ্যামার শোভা পাচ্ছে। 'শত্রুপক্ষ আমাদের চাইতে উঁচু অবস্থানে আছে। পানির প্রবাহও আমাদের বিপরীতে। এখন যুদ্ধ করা চরম পাগলামি ছাড়া আর কিছু হবে না।'

কিছুটা মানুষ আর কিছুটা নেকড়ের মতো দেখতে একটা কিছু মাটিতে থুথু ফেলল। 'তাহলে আক্রমণটা করব কবে শুনি? যখন আবহাওয়া পরিষ্কার হবে আর ওরা অস্ত্র হাতে তৈরি থাকবে, তখন? আমি তো বলি, আক্রমণটা এখনই হোক।'

'আমাদের আর ওদের মাঝখানে মেঘ আছে এখনও,' হাঙ্গেরিয়ান ইস্টেন মনে করিয়ে দিল। লোকটার গোঁফ জাঁকালো, মাথায় একটা ধুলো-ধূসরিত কালো হ্যাট।

দামী স্যুট পরিহিত এক লোক চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। এবার আলোতে এসে কীসব বলল। উপস্থিত সবার ঘনঘন মাথা দোলানো দেখে মনে হলো, লোকটার কথা পছন্দ করেছে তারা।

মরিগান নামধারী তিন রমণীর একজন মুখ খুলল এবার, 'সময় সঠিক বা বেঠিক, তাতে কী যায় আসে? এখন সময় হয়েছে, সেটাই বড় কথা। ওরা আমাদেরকে এক এক করে খুন করছে। তাই আমি বলি কী, একসাথে মরাই ভালো। মৃত্যু বরণ করতে হলে আক্রমণ করে, দেবতার মতো বরণ করাই কী শ্রেয় নয়? নাকি সেলারে আটকা পড়া ইঁদুরের মতো মৃত্যু চাও তোমরা?'

এবার প্রায় সবাই মাথা দোলাল। সবার মনের কথা যেন মেয়েটা একাই বলে দিয়েছে। এখনই সময়।

'প্রথম মুণ্ডুটা আমার।' অস্বাভাবিক লম্বা এক চাইনিজ ভদ্রলোক ঘোষণা করল। তার গলায় ছোট ছোট করোটির একটা মালা। আস্তে আস্তে, কিন্তু উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে পাহাড় ধরে উঠতে শুরু করল সে। তার এক হাতে অর্ধ-চন্দ্র আকৃতির একটা বাঁকানো অস্ত্র।

কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়, এমনকী শূন্যতাও নয়।

সেখানে হয়তো দশ মিনিট ছিল মাত্র শ্যাডো, হয়তো ছিল দশ হাজার বছর। অবশ্য তাতে কী যায় আসে? সময় এমন একটা ধারণা, যার কোন প্রয়োজন আর নেই ওর।

নিজের নামটাও ভুলে গেছে যুবক। নিজেকে একই সাথে শূন্য আর পবিত্র বলে মনে হচ্ছে।

কোন আকার নেই তার, এখন ও অন্তঃসার শূন্য।

এখন সে...নিজেই শূন্যতা।

সেই শূন্যতার মাঝেই কথা বলে উঠল কেউ, 'হো-হোকা, ভাই আমার। এসো, কথা বলি।'

একদা যে শ্যাডো নামে পরিচিত ছিল, সে জানতে চাইল, 'হুইস্কি জ্যাক?'

'হ্যাঁ,' অন্ধকারেই উত্তর দিল হুইস্কি জ্যাক। 'তোমাকে খুঁজে পাওয়া বড় কষ্ট। মারা যাবার পর যেখানে যেখানে যাবে বলে ভেবেছিলাম, সেসব জায়গার কোথাও পাইনি তোমায়। যাই হোক, নিজ গোত্রকে খুঁজে পেয়েছিলে?'

ডিস্কোতে নৃত্যরত নারী আর পুরুষের কথা মনে পড়ে গেল ওর। 'নিজের পরিবারকে পেয়েছি, কিন্তু গোত্রকে পাইনি।'

'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।'

'আমাকে একা থাকতে দাও, যা চেয়েছিলে তা তো পেয়েছই।'

'প্রাণ ফিরিয়ে দিতে তোমার কাছে আসছে দেবতারা।' জানাল হুইস্কি জ্যাক।

'কিন্তু আমি তো তা চাই না।' বলল শ্যাডো। 'সব শেষ হয়ে গিয়েছে।'

'সব শেষ হয়ে গিয়েছে? ওমনটা কখনওই হয় না।' যুবককে দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দিল হুইস্কি জ্যাক। 'চলো, আমার বাড়িতে চলো। বিয়ার দেব?'

বিয়ার হলে মন্দ হয় না, ভাবল শ্যাডো। 'অবশ্যই।'

'আমার জন্যেও একটা আনো তাহলে। দরজার বাইরের রাখা আছে।' ইঙ্গিত করে দেখাল হুইস্কি জ্যাক। এখন তার কুঁড়েতেই আছে দুজন।

একটুও আগে হাত বলতে কিছু ছিল না শ্যাডোর, এখন একজোড়া হাত দিয়ে দরজা খুলে ফেলল। বাইরেই একটা প্লাস্টিকের কুলার দেখা যাচ্ছে। ওটার ভেতরে নদীর পানি ব্যবহার করে বানান বরফ, সেই বরফের মাঝে নাক উঁচু করে ভাসছে এক ডজন বাডওয়াইজার। একজোড়া ক্যান নিয়ে বের করে দোরগোড়ায় বসল ও, তাকাল উপত্যকার দিকে।

পাহাড়ের একদম শীর্ষে বসে আছে ওরা, কাছেই একটা ঝর্ণা থেকে পানি ঝরার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

'আমরা কোথায়?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'গতবার যেখানে এসেছিলে,' জানাল হুইস্কি জ্যাক। 'আমার বাড়িতে। গরম হবার পর বিয়ার দেবে নাকি?'

উঠে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধের দিকে একটা ক্যান বাড়িয়ে ধরল শ্যাডো। 'গতবার তো এই ঝর্ণাটা ছিল না।'

কিছুই বলল না হুইস্কি জ্যাক। ক্যানটা খুলে এক ঢোকে খালি করে ফেলল অর্ধেকটা। 'আমার ভাতিজা, হেনরি হ্যারি ব্লুজের কথা মনে আছে? কবি ছেলেটা? ওই যে, তোমাদের উইনিব্যাগোটা যার বুইকের সাথে বদলা-বদলি করলে?'

'হ্যাঁ। তবে জানতাম না যে সে কবিতাও লেখে।'

থুতনি তুলে চাইল হুইস্কি জ্যাক, গর্ব ঝরে পড়ছে কণ্ঠে। 'আমেরিকার সেরা কবি ও।' বিয়ারের বাকিটুকু শেষ করে ঢেকুর তুলল লোকটা। তারপর আরেকটা ক্যান তুলে নিয়ে বসল বাইরে। শ্যাডোও যোগ দিল তার সাথে। সকালের মিষ্টি রোদ পোহাতে পোহাতে আর ঝর্ণার দৃশ্য দেখতে দেখতে ক্যানে চুমুক দিল দুজন।

'হেনরি ডায়াবেটিক ছিল,' বলেই চলছে হুইস্কি জ্যাক। 'তোমরা আমেরিকায় এলে। আমাদের আখ, আলু আর ভুট্টা কেড়ে নিয়ে আবার আমাদের কাছেই বিক্রি করলে পটেটো চিপস, পপকর্ন! এসবের ফলে অসুস্থ হলাম কারা? এই আমরাই।' গলা শুকিয়ে আসায় আবার চুমুক দিল সে ক্যানে। 'কবিতার জন্য কয়েকটা পুরস্কারও পেয়েছে হেনরি। মিনেসোটার কয়েকজন তো ওর কবিতার বইও প্রকাশ করতে চেয়েছিল। যেদিন মারা যায়, সেদিন একটা স্পোর্টস কারে করে যাচ্ছিল ওই ব্যাপারে কথা বলতে। তোমাদের ব্যাগোটা বদলে একটা হলদে মিয়াটা নিয়েছিল। ডাক্তারদের মতে, গাড়ি চালাতে চালাতেই ও কোমায় চলে যায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি ধাক্কা খেয়ে বসে তোমাদের লাগানো সাইনবোর্ডে। একদম অলস তোমরা। আকাশ দেখে, মেঘ আর পাহাড় দিয়ে রাস্তা চেনার ক্ষমতা তোমাদের সেই। প্রতিটা রাস্তার মোড়ে সাইনবোর্ড ঝোলাতেই হবে? যাই হোক, মারা গেল হেনরি ব্লুজে। নেকড়ের সাথে বাস করার জন্য চলে গেল চিরতরে। তাই ভাবলাম, আমাকে আটকে রাখার মতো আর কেউ নেই লাকোটা এলাকায়...চলে এলামউত্তরে। এখানে মাছ ধরা পড়ে খুব।'

'আমার সমবেদনা গ্রহণ করুন।'

'যাই হোক, সাদা মানুষের রোগ এখানে আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কেউ সাদা মানুষের সাইনবোর্ড দেখে সাদা মানুষের রাস্তায় চলে আসতে পারবে না এখানে।'

'শুধু সাদা মানুষের বিয়ার আসলেই চলবে?'

ক্যানের দিকে তাকাল হুইস্কি জ্যাক। 'যখন তোমরা আমাদের দেশ ছেড়ে পাততাড়ি গোটাবে, তখন বাডওয়াইজারের কারখানাগুলো রেখে যেতে পারো।'

'আমরা কোথায় আসলে?' জানতে চাইল শ্যাডো। 'আমি কি এখনও গাছ থেকে ঝুলছি? আমি কি মৃত? আমি কি সত্যি সত্যি এখানে? এসব বাস্তব?'

'হ্যাঁ।' জানাল হুইস্কি জ্যাক।

''হ্যাঁ!' এটা আবার কেমনতর উত্তর?'

'সত্যি জবাব, যথার্থও।'

'আপনি নিজেও কি দেবতা?' এবার শ্যাডোর প্রশ্ন।

মাথা নাড়ল হুইস্কি জ্যাক। 'আমাকে দেবতা না বলে, কিংবদন্তী বলতে পারো। আমাদের আর দেবতাদের অবস্থা একই। পার্থক্য হলো, আমাদের কেউ উপাসনা করে না। সবাই আমাদের নামে ফোলানো-ফাঁপানো গল্প বলে কেবল। তা-ও শুধু সেগুলোই, যেগুলোতে আমরা বোকা প্রতিপন্ন হই!'

'বুঝলাম।' কিছুটা হলেও, আসলেই বুঝতে পেরেছে ও।

'দেখ, দেবতাদের জন্য এই দেশটা একদম উর্বর নয়। আমরা, ইন্ডিয়ানরা তা আরও আগেই টের পেয়েছিলাম। এমন অনেক আত্মা আছেন, যারা স্রষ্টা...যারা এই দুনিয়াকে বানিয়েছেন। কিন্তু ভেবে দেখ, সুস্থ মস্তিষ্কের কে কয়োটের উপাসনা করবে? বেচারা যখন কোন পাথরের সাথে ঝগড়া করে, তখন তাতে জয় হয় সেই পাথরের!

তাই আমরা সেই স্রষ্টাকে বা স্রষ্টাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েই সন্তুষ্ট। আমরা এখানে কোনদিন মন্দির বানাইনি, দরকারই পড়েনি। এই দেশের পুরোটাই তো আমাদের মন্দির...এই দেশটা আমাদের ধর্ম। এখানে যে মানবজাতি পা রেখেছে, তার চাইতেও বয়স্ক আর জ্ঞানী সে। সে-ই আমাদেরকে দিয়েছে স্যামন মাছ, ভুট্টা আর মহিষ। দিয়েছে ভাত আর সবজি। তরমুজ আর টার্কি কি এই মাটিরই দান না? আমরা ছিলাম এই দেশের...এই মাটির সন্তান।'

দ্বিতীয় ক্যানটাও শেষ করে ফেলল বৃদ্ধ। এরপর ইঙ্গিতে দেখাল নিচের দিকে। ঝর্ণাটা ওখানে এক নদীর সাথে গিয়ে মিশেছে। 'যদি ওই নদী ধরে কিছুদূর এগোও, তাহলে একটা হ্রদ পাবে। ওটার ধারে দেখতে পাবে বুনো ধান। যখন ওই বুনো ধান যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যেত, তখন মানুষ বের হতো ক্যানুতে চড়ে। ইচ্ছামতো ধান তুলে সেটাকে রেঁধে খেত। অথবা সিদ্ধ করে জমিয়ে রাখত পরবর্তী কোন সময়ের জন্য। এই মাটির একেক এলাকায় জন্মাত একেক

ধরনের খাবার। উত্তরে যাও তো পাবে লেবুর বাগান, কমলার বাগান, পাবে সবুজ সবুজ...কী যেন-'

'অ্যাভোকাডো?'

'হ্যাঁ, অ্যাভোকাডো।' সন্তুষ্ট হলো হুইস্কি জ্যাক। 'ওসব কিন্তু এদিকে ফলে না। এই এলাকা, বুনো ধানের এলাকা। মুজের এলাকা। যাই হোক, যেটা বলতে চাচ্ছি তা হলো-আমেরিকা এমনই। দেবতাদের জন্য উর্বর ভূমি না একেবারেই। উদাহরণ চাইলে বলব, তার হচ্ছে এমন অ্যাভোকাডো, যারা বুনো ধানের এলাকায় শিকড় বসাতে চাইছে।'

'হতে পারে,' আচমকা মনে পড়ে গেলে শ্যাডোর। 'কিন্তু তারা তো যুদ্ধে জড়াতে চলেছে।'

এই প্রথম আর শেষবারের জন্য হুইস্কি জ্যাককে হাসতে দেখল শ্যাডো। হাসি না বলে গর্জন বলাই মনে হয় ভালো হবে। 'আচ্ছা শ্যাডো,' আচমকা হাসি থামিয়ে জানতে চাইল সে। 'তোমার বন্ধুরা যদি পাহাড় থেকে ঝাঁপ দেয়, তাহলে তুমিও দেবে?'

'দিতেও পারি।' ভালো বোধ করতে শুরু করেছে শ্যাডো। এর আগে কবে নিজেকে এতটা জীবন্ত মনে হচ্ছিল, তা খেয়াল করতে পারছে না।

'যুদ্ধ হবে না।'

'তাহলে কী হবে?'

হাতের চাপে ক্যানটাকে একদম সমান করে ফেলল হুইস্কি জ্যাক। 'দেখ,' এবার ঝর্ণার দিকে ইঙ্গিত করল বৃদ্ধ। সূর্য আকাশে অনেকটাই উপরে উঠে এসেছে। ঝর্ণার পানির সাথে মিলে রঙধনুর জন্ম দিয়েছে সে।

'রক্তের বন্যা বইবে।' সরাসরি বলে ফেলল হুইস্কি জ্যাক।

ঠিক তখনই পুরো ব্যাপারটা খোলাসা হয়ে গেল শ্যাডোর কাছে, সবকিছু বুঝতে পারল সেই এক মুহূর্তে। প্রথমে মাথা নাড়ল একবার, তারপর ফিক করে হেসে ফেলল। কিছুক্ষণের মাঝেই সেটা পরিণত হলো অট্টহাসিতে।

'তুমি ঠিক আছ?'

'একদম।' বলল শ্যাডো। 'লুকিয়ে থাকা ইন্ডিয়ানটাকে ধরে ফেলেছি মনে হচ্ছে।'

'ওই ব্যাটা মনে হয় হো চাঙ্ক। কখনওই ঠিকমতো লুকাতে পারত না।' সূর্যের দিকে তাকাল হুইস্কি জ্যাক। 'ফেরার সময় হয়েছে।' বলে উঠে দাঁড়াল সে।

'দুই মানুষের প্রতারণা,' বলল শ্যাডো। 'যুদ্ধ কেবল নামেই, তাই না?'

ওর হাতে আলতো করে চাপড় দিল হুইস্কি জ্যাক। 'দেখে যতটা মনে হয়, ততটা বোকা নও তুমি।'

কুটিরে ফিরে এলো দুজন। দরজা খুলল হুইস্কি জ্যাক। ইতস্তত করতে লাগল শ্যাডো। 'আপনার সাথে থাকতে পারলেই খুশি হতাম। জায়গাটাকে ভালো মনে হচ্ছে।'

'ভালো জায়গার অভাব নেই,' বলল লোকটা। 'শোন, যখন দেবতাদের সবাই তাদেরকে ভুলে যায়, তখন মৃত্যু হয় তাদের। মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা খাটে। কিন্তু দেশ, ভূমি, মাটির কোন মৃত্যু নেই। জায়গা ভালো হোক বা মন্দ, মাটি থাকবে এখানেই। থাকব আমিও।'

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল শ্যাডো। কিছু একটা যেন টানছে ওকে। অন্ধকারে আবার নিজেকে একা আবিষ্কার করল ও। কিন্তু এখন সেই অন্ধকার আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হতে শুরু করেছে...

...অচিরেই যা রূপ নিল জ্বলন্ত সূর্যে।

সেই সাথে শুরু হলো তীব্র ব্যথা।

তৃণভূমি ধরে হেঁটে যাচ্ছেন ইস্টার, তার পায়ের স্পর্শ পাওয়া মাত্র মাটিতে ফুটছে বসন্তের ফুল।

অনেক অনেক দিন আগে এই ভূমিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল একটা খামার বাড়ি। এখন তার খুব অল্পই অবশিষ্ট আছে, আগাছা দখল করে নিয়েছে বাকিটুকু। বৃষ্টি পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়। মাথার উপরে নিচু হয়ে ভাসছে মেঘের দল।

খামার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ যেখানে, সেখান থেকে একটু সামনে এগোলেই একটা বিশাল, ধূসর-রুপালী গাছ। দেখে মনে হয় মৃত, পাতা নেই ডালে। ওটার সামনের ঘাসে যেন মড়ক লেগেছে, কাপড় দিয়ে স্তূপ করে রাখা আছে কিছু একটা।

মুখ তুলে উপরের দিকে চাইলেন ইস্টার। মৃত দেহটাকে ঝুলতে দেখে হাসলেন একটু। 'আস্তে আস্তে খোলার মাঝেই তো আসল মজা।' বললেন তিনি। 'তা কোন পুরুষের কাপড়ই হোক, অথবা উপহারের বাক্সই হোক।'

মহিলার পাশেই হাঁটতে থাকা যুবক যেন এতক্ষণে নিজের নগ্নতা টের পেল। সে বলল, 'পলক না ফেলে আমি সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি!'

'খুব ভালো!' উৎসাহ দিলেন ইস্টার। 'এখন দেহটাকে গাছ থেকে নামাও।'

শ্যাডোকে বেঁধে রাখা ভেজা রশিগুলো আরও আগেই পচে গিয়েছে। দুই জনের টান সহ্য করতে না পেরে এবার ছিঁড়ে গেল। পড়ন্ত দেহটাকে লুফে নিলেন ইস্টার আর হোরাস। এমন আয়াসে যে শ্যাডোকে বিশালদেহি বলে মনেই হলো না। ধূসর তৃণভূমিতে শুইয়ে দিল দেহটাকে।

শ্বাস পড়ছে না দেহটার, একপাশে জমাট বাঁধা রক্ত কালো বর্ণ ধারণ করেছে।

'এখন?'

'এখন,' জানালেন মহিলা, 'আমরা দেহটাকে আস্তে আস্তে উষ্ণ করে তুলব। তোমার কী করতে হবে, তা তুমি জানো।'

'জানি। কিন্তু করতে পারব না।'

'সাহায্য করতে না চাইলে, আমাকে ডেকে আনলে কেন?'

সাদা একটা হাত বাড়িয়ে হোরাসের কালো চুল স্পর্শ করলেন ইস্টার। মহিলার দিকে তাকিয়ে পলক ফেলল হোরাস। তারপর চেয়ে রইল অখণ্ড মনোযোগে।

উড়তে শুরু করল হোরাস, কিছুক্ষণের মাঝেই উঠে গেল আকাশে। সূর্যকে ঘিরে রেখেছে মেঘ, সেটাকে কেন্দ্র করে উড়ছে সে। প্রথমে বাজ পাখিটাকে দেখে মনে হলো যেন একটা বিন্দু। তারপর ধুলা, কিছুক্ষণের মাঝেই নগ্ন চোখে আর দেখা গেল না তাকে। আস্তে আস্তে উধাও হয়ে যেতে শুরু করল মেঘ, সূর্য উঁকি দিচ্ছে আড়াল থেকে। অতি দ্রুতই দেখা গেল, আকাশে আর মেঘ নেই! গ্রীষ্মের সূর্যকে যেন হার মানাবে বলে পণ করেছে।

সূর্যের উজ্জ্বলতা ভাসিয়ে দিচ্ছে মৃত দেহটাকে। এবার কাজে নামলেন ইস্টার।

ডান হাতের আঙুল দিয়ে আলতো করে শ্যাডোর বুকে আঁচড় দিলেন তিনি। মনে হলো, মরদেহটার বুকে কীসের যেন স্পন্দন টের পাচ্ছেন। নাহ, হৃৎস্পন্দন নয়। তবে হাতটা সরালেন না তিনি, রেখে দিলেন হৃদপিণ্ডের ঠিক উপরেই।

শ্যাডোর ঠোঁটে ঠোঁট নামিয়ে আনলেন তিনি, ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে তুললেন ওর ফুসফুস। আচমকা দেখা গেল, শ্যাডোকে চুম্বন করতে শুরু করেছেন তিনি। নম্র চুম্বন তার, স্বাদে বসন্তের বৃষ্টি আর তৃণভূমির ফুলের মতো।

রক্ত বইতে শুরু করল লাশটার পাশ দিয়ে, তাজা রক্ত বেরোতে শুরু করল ক্ষত থেকে। সূর্যের আলোতে সেটাকে রুবি পাথর বলে মনে হচ্ছে। হঠাৎ করে যেমন রক্তপাত শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে গেল।

শ্যাডোর গাল আর কপালে চুমু খেলেন ইস্টার। 'সময় হয়েছে,' বললেন তিনি। 'উঠে দাঁড়াও। ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে, এখন শুয়ে থাকলে চলবে?'

পিট পিট করে উঠল শ্যাডোর চোখ, তারপর একদম আচমকা খুলে গেল। ধূসর চোখ জোড়া একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল ইস্টারের দিকে।

মুচকি হাসলেন তিনি, হাত সরিয়ে নিলেন বুকের উপর থেকে।

'আমাকে ফিরিয়ে এনেছেন,' আস্তে আস্তে বলল শ্যাডো, নতুন করে কথা বলা শিখতে হচ্ছে যেন ওকে। কিছুটা ব্যথা আর কিছুটা বিভ্রান্তির সুর কণ্ঠে।

'হ্যাঁ।'

'আমি মুখোমুখি হয়েছি শেষ বিচারের। সবকিছু **শেষ হয়ে** গিয়েছিল। কিন্তু আপনি ফিরিয়ে আনলেন। কেন আনলেন?'

'আমি দুঃখিত।'

'আপনার তা হওয়াই উচিৎ।'

আস্তে আস্তে উঠে বসল শ্যাডো। মুখ কুঁচকে স্পর্শ করল দেহের যেখানে ক্ষত ছিল, সেখানে। কী আশ্চর্য, রক্ত লেগে আছে চামড়ায়! অথচ তার নিচে কোন ক্ষত নেই!

এক হাত বাড়িয়ে দিল সে, সেই হাত ধরে ইস্টার টেনে তুললেন তাকে। এমন দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল শ্যাডো, যেন সবকিছু নতুন করে দেখছে! মনে হলো নাম ভুলে গিয়েছে সবকিছুর-ঘাসের ভেতর থেকে মাথা তুলে তাকানো ফুল, ধ্বংস-প্রায় খামার বাড়ি, জীবন-বৃক্ষ...সব।

'মনে আছে?' প্রশ্ন করলেন ইস্টার। 'কী কী দেখেছ সে সব?'

'যা মনে পড়ে-আমি আমার নাম খুইয়ে ফেলেছিলাম, হারিয়ে ফেলেছিলাম আমার হৃৎপিণ্ড। আপনি আমাকে ফিরিয়ে এনেছেন।'

'আমি দুঃখিত,' বললেন মহিলা। 'অতিসত্বর লড়তে শুরু করবে সবাই। নতুন আর পুরাতন দেবতাদের মাঝে যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে।'

'আপনি চান, আমি আপনাদের হয়ে লড়াই করি? তাহলে বলব, সময় নষ্ট করছেন।'

'তোমাকে ফিরিয়ে এনেছি তার কারণ, তোমাকে ফিরিয়ে আনাটাই ছিল আমার দায়িত্ব।' বললেন ইস্টার। 'এখন তোমার দায়িত্ব কী, সেটা নিজেই ঠিক করে নাও।'

মেঘ আর বৃষ্টির মাঝে নড়াচড়া করছে অগণিত ছায়া।

সবুজ জ্যাকেট পরিহিত লালচুলো একদল লোকের পাশে হাঁটছে সাদা শিয়াল। এক মিনেটরের পাশে উড়ছে এক ড্যাকটিল। পাহাড়ের ধার ধরে হেঁটে

হেঁটে উঠছে একটা শুয়োর, এক বানর আর এক তীক্ষ্ণ দাঁতধারী ঘুল। উপরে উঠছে নীল ত্বকের এক লোকও, হাতে তার একটা জ্বলন্ত ধনুক।

হেড্রিয়ানের প্রেমিক, সুদর্শন অ্যানটিনোস হাঁটছে একদল রানির সামনে। প্রত্যেকেই সশস্ত্র, বর্ম পরিহিত।

ধূসর ত্বকের এক লোক, তার এক চোখ দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে একদল পুরুষের মিছিল। এই লোকগুলোর প্রত্যেকের চেহারাতেই রুক্ষ একটা ভাব, নিঃস্পৃহ চেহারা গুলো অ্যাজটেকদের আঁকা মানুষের চেহারার সাথে একদম মিলে যায়!

পাহাড়ের একদম উপর থেকে এক স্নাইপার খুব সাবধানতার সাথে নিশানা করল, তার লক্ষ্য সাদা শেয়ালটা। বড় করে একটা দম নিয়ে গুলি ছুঁড়ল সে। বিস্ফোরণের আওয়াজের সাথে বাতাসে ছড়িয়ে গেল কর্ডাইট আর গান পাউডারের গন্ধ। যেখানে একটু আগে একটা সাদা শেয়াল হাঁটছিল, সেখানে দেখা গেল একজন যুবতী জাপানিজ মেয়ের দেহ। আস্তে আস্তে উধাও হয়ে যেতে শুরু করল লাশটা।

আস্তে আস্তে পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল সবাই। কেউ চারপায়ে হেঁটে, কেউ দুই পায়ে...আবার কেউ পা ছাড়াই!

ঝড় না থাকলে টেনেসির পাহাড়ি পথ ধরে গাড়ি চালানোটা অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা। আবার যখন বৃষ্টি শুরু হয়, তখন এর চাইতে বাজে অভিজ্ঞতা আর হয় না!

পুরো রাস্তাটা গল্প করেই কাটিয়েছে লরা আর টাউন। মেয়েটার সঙ্গের জন্য কৃতজ্ঞ সে। ওর মনে হচ্ছে অনেকদিন পর এক পুরনো বন্ধুর সাথে সময় কাটাচ্ছে সে। ইতিহাস, গান আর সিনেমা নিয়ে আলোচনা করেছে ওরা। দ্য ম্যানুস্ক্রিপ্ট ফাউন্ড ইন সারাগোসা নামের একটা বিদেশি সিনেমা দেখেছিল টাউন, তা-ও অনেক আগে। এতদিনে এই প্রথম একজনকে পেল, যে নিজেও ছবিটা দেখেছে! (অবশ্য টাউনের ধারণা ছিল, ছবিটা স্প্যানিশ। লরার মতে ওটা পোলিস।) বেচারার তো সন্দেহই হতে শুরু করেছিল, ছবিটা বোধ হয় সত্যি সত্যি দেখেনি ও। কল্পনা ছিল কোন।

রক সিটিতে আসুন লেখা সাইনবোর্ডটা দেখাল লরা। টাউন মুচকি হেসে জবাব দিল, ওখানেই যাচ্ছে সে। অবাক হলো মেয়েটা। জানাল, সে নিজেও যেতে চায় রক সিটির মতো জায়গাগুলোতে। কিন্তু সময় করে উঠতে পারে না। এই জন্যই রাস্তায় নেমেছে ও, অভিযানের উদ্দেশ্যে।

নিজের পেশার কথাও জানাল মেয়েটা, বলল-ও একজন ট্রাভেল এজেন্ট। আপাতত স্বামীর কাছ থেকে একটু বিরতি নিয়েছে। তবে ভবিষ্যতেও কখনও একত্রিত হতে পারবে বলে মনে হয় না। দোষটা যে ওর নিজেরই, সেটাও জানাল।

'আমার তা বিশ্বাস হয় না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেয়েটা। 'কথাটা সত্যি, ম্যাক। যে মেয়েটাকে আমার স্বামী বিশ্বাস করেছিল, আমি আর সেই মেয়েটি নেই!'

সময়ের সাথে পরিবর্তন আসে সব মানুষের মাঝেই, জানাল ম্যাক। এরপর নিজের অজান্তেই যেন মুখ খুলে গেল ওর। উডি আর স্টোনারের ব্যাপারে, ওদের একসাথে সময় কাটানোর ব্যাপারে সব খুলে বলল লোকটা। বলল ওই দুজনের খুন হবার কথাও।

সান্ত্বনার ভঙ্গিতে লোকটার হাতে হাত রাখল মেয়েটা। হাতটা এতটাই ঠান্ডা যে গাড়ির তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিল টাউন।

লাঞ্চের সময় নক্সভিলে থামল ওরা। জাপানিজ খাবার দিয়ে পেট ভরালো দুজন। খাবারটা খুব একটা ভালো না। মিসো স্যুপটা ঠাণ্ডা, সুশি আবার গরম। তবে এসবের কোন কিছুই টাউনকে বিরক্ত করতে পারল না। মেয়েটা যে ওর সাথে আছে, একসাথে অভিযানে বের হয়েছে, এতেই টাউন খুশি।

'আসলে,' এবার নিজের গোপন কথা বলতে শুরু করল লরা। 'এক জায়গায় আটকা পড়াটা আমার সহ্য হচ্ছিল না। যেখানে ছিলাম, সেখানে থাকতে থাকতে যেন পচন ধরেছিল আমার মধ্যে। তাই গাড়ি আর ক্রেডিট কার্ড ছাড়াই বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। অপরিচিত মানুষের দয়ার উপর নির্ভর করছি পুরোপুরি।'

'তুমি ভয় পাও না?' জানতে চাইল টাউন। 'অনেক কিছুই তো হতে পারে। ছিনতাইকারী সামনে পড়তে পারো! আবার হয়তো কোনদিন কোনদিন খাওয়াই মিলবে না!'

মাথা নাড়ল মেয়েটা। তারপর হাসল ইতস্তত করে। 'তোমার সাথে দেখা হলো তো, তাই না?' বলার মতো কিছু পেল না টাউন।

খাওয়া শেষ হলে, মাথার উপর জাপানিজ খবরের কাগজ ধরে দৌড়ে গাড়ির দিকে এগোল ওরা। নিজেদেরকে মনে হলো কমবয়সী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, হাসি ফুটে উঠল দুজনের মুখেই।

'তোমাকে কতদূর নিয়ে যাব?' গাড়িতে ফিরে এলে জানতে চাইল লোকটা।

'তুমি যতদূর যাচ্ছ, ম্যাক।' লাজুক হাসি হাসল লরা।

নিজেকে বিগ ম্যাক বলে পরিচয় দেয়নি বলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাল সে। এই মেয়েটা এক রাতের সঙ্গী হবার মতো নয়। পঞ্চাশ বছর লেগেছে একে খুঁজে বের করার জন্য। কিন্তু এই জাদুময়ী মেয়েটা অবশেষে এসেছে ওর জীবনে।

এ প্রেম নয়তো কী?

'দেখ,' চাট্টানুগার কাছাকাছি পৌঁছে বলল টাউন। উইন্ডশীল্ডের উপর আছড়ে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা। 'আজ রাতের জন্য তোমাকে একটা মোটেল খুঁজে দেব? চিন্তা করো না, আমি টাকা দেব। আর আমার কাজ শেষ হলে...যদি তুমি চাও...তাহলে নাহয় একসাথে গরম পানিতে গোসল করব আমরা!'

'দারুণ পরিকল্পনা।' জানাল লরা। 'কাজ কী তোমার?'

'ওই যে,' মুচকি হেসে জানাল লোকটা। 'পেছনের সিটে যে ডালটা আছে, সেটা বিশেষ একজনের কাছে পৌঁছে দেয়া!'

'ঠিক আছে,' গাল ফোলাল মেয়েটা। 'বোলো না।'

লরাকে রক সিটির পার্কিং লটে অপেক্ষা করতে বলল টাউন। জানাল, ডালটা পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসবে। গাড়ি চালিয়ে লুকআউট পাহাড়ের পাশে চলে এলো ওরা, গতি ঘণ্টায় ত্রিশ মাইলে ধরে রেখেছে।

পার্কিং-লটে গাড়ি থামাল টাউন, ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল ও।

'ওই, ম্যাক। গাড়ি থেকে নামার আগে আমাকে একবার আলিঙ্গন করবে না?' জানতে চাইল লরা, মুখে হাসি।

'অবশ্যই,' বলে দুই হাত দিয়ে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরল টাউন। মেয়েটার চুলের গন্ধ নাকে আসছে ওর। সুগন্ধির গন্ধ ছাপিয়ে আসছে পচা একটা গন্ধ। অবশ্য যেকোন ভ্রমণেই এই সমস্যা হয়। ওই গরম পানির গোসলটা দুজনের জন্যই জরুরী-ভাবল সে। মুখ তুলে চাইল লরা, মেয়েটার হাত আলতো করে স্পর্শ করে আছে ওর ঘাড়।

'ম্যাক...একটা কথা জানতে চাই। তোমার দুই বন্ধুর সাথে আসলে কী হয়েছিল, তুমি কি তা সত্যি সত্যি জানতে চাও?' প্রশ্ন করল লরা। 'উডি আর স্টোনের কথা বলছি।'

'হ্যাঁ,' মেয়েটার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবাতে ডুবাতে বলল টাউন। 'অবশ্যই চাই।'

টাউনের মনের আশা পূরণ করল লরা।

আস্তে আস্তে হাঁটছে শ্যাডো, গাছটাকে কেন্দ্র করে। একেকবারে বড় করে আনছে বৃত্তটাকে। মাঝে মাঝে থেমে একটা ফুল, একটা পাতা অথবা একটা নুড়ি পাথর

তুলে আনছে ও। মনযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছে ওগুলোর দিকে, যেন জীবনে এই প্রথমবারের মতো দেখছে!

ইস্টার মন দিয়ে দেখছেন শ্যাডোকে, কথা বলার সাহস হচ্ছে না। এই মুহূর্তে সেটা উচিতও হবে না। তাই চুপচাপ তাকিয়ে আছেন কেবল।

গাছের শিকড় থেকে প্রায় বিশ ফুট দূরে, ঘাসের মাঝখান থেকে শ্যাডো তুলে নিল একটা ক্যানভাসের ব্যাগ। ওটা খুলে ভেতর থেকে কাপড় বের করে আনল সে। পুরনো হলেও, কাজ চলবে। একটা একটা করে পরে নিল সবগুলো।

সব পরা শেষে, পকেটে হাত ঢোকালো ও। হাত বের করে আনল যখন, তখন ওর চেহারায় বিভ্রান্ত একটা ভাব। ইস্টারের দিকে তাকিয়ে অবাক স্বরে বলল, 'পয়সা নেই!' অনেকক্ষণ পর এই প্রথম কথা বলল শ্যাডো।

'পয়সা নেই?' শ্যাডোর শব্দগুলোই আবার উচ্চারণ করলেন ইস্টার।

মাথা নাড়ল যুবক। 'পয়সা থাকলে হাতগুলোকে ব্যস্ত রাখা যায়।' জুতা পরতে পরতে বলল সে।

পোশাক পরিহিত শ্যাডোকে স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। গম্ভীর হলেও, বেশ স্বাভাবিক। কে জানে, কতদূর গিয়েছিল বেচারা-ভাবলেন ইস্টার। ফিরে আসতে কী কী হারাতে হয়েছে, তা-ই বা জানে কে! তবে আগেও অনেককে মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরিয়ে এনেছেন তিনি। তাই জানেন, স্মৃতি সত্বর আবার আগের মতো হয়ে যাবে যুবক। ফিরে পাবে আগের জীবনের স্মৃতি। তবে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় যা যা দেখেছে, তা হারিয়ে ফেলবে পুরোপুরি।

ওকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে চললেন ইস্টার। যেটার পিঠে করে এসেছেন, সেটা এখনও ওখানেই আছে।

'আমাদের দুজনকে বহন করতে পারবে না ও,' জানালেন তিনি। 'তুমি যাও, আমি কোন একটা উপায় বের করে নেব।'

নড করল শ্যাডো। ভাবখানা এমন যেন সে কিছু একটা মনে করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আচমকা মুখ খুলল ও, ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো আনন্দের একটা চিৎকার।

থান্ডারবার্ডটা তার ক্রূর ঠোঁট খুলে পালটা চিৎকার দিয়ে বরণ করে নিল শ্যাডোকে।

শকুনের সাথে অনেকটাই মিল আছে পাখিটার। ওটার পালক কালো, সেই সাথে একটা বেগুনি আভাও আছে। গলার কাছে সাদা একটা দাঁত। ঠোঁটগুলো কালো আর ক্রূর-মাংস ছিঁড়ে খাওয়াই যার একমাত্র উদ্দেশ্য। মাটিতে বসে থাকা অবস্থায় ওটা আকারে একটা কালো ভালুকের সমান, লম্বায় শ্যাডোর কাছাকাছি।

গর্বের সাথে জানাল হোরাস, 'আমি ওকে নিয়ে এসেছি। এরা পাহাড়ে বাস করে।'

নড করল শ্যাডো। 'একবার স্বপ্নে দেখেছিলাম এদের। ওটার চাইতে বাজে স্বপ্ন জীবনে দেখেনি!'

থান্ডারবার্ডটা ঠোঁট খুলে হালকা আওয়াজ করল, ক্রুরু? 'তুমিও আমার স্বপ্ন শুনেছ?' প্রশ্ন করল শ্যাডো।

এক হাত বাড়িয়ে পাখির মাথায় বুলিয়ে দিল শ্যাডো। পাখিটাও আদরের উত্তরে মাথা দিয়ে চাপ দিল ওর হাতে। ইস্টারের দিকে ফিরল শ্যাডো। 'আপনি এর পিঠে চড়ে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ,' বললেন তিনি। 'এবার তোমার ওর পিঠে চড়ে ফিরে যাবার পালা। অবশ্য তোমাকে অনুমতি দেয় কিনা, সেই প্রশ্ন ভিন্ন।'

'আপনি কীভাবে চড়লেন?'

'একদম সোজা,' জানালেন ইস্টার। 'বজ্রের পিঠে চড়ার মতো। পড়ে না গেলেই হলো।'

'আপনি ফিরে যাবেন ওখানে?'

মাথা নাড়লেন ইস্টার। 'আর না, সোনামণি। যথেষ্ট হয়েছে। তুমি যাও, যা করার তা করো। আমি ক্লান্ত। তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি।'

মাথা ঝাঁকাল শ্যাডো। 'হুইস্কি জ্যাকের সাথে দেখা হয়েছে। আমি মারা যাবার পর, আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন তিনি। একসাথে বিয়ার পান করেছি দুজন।'

'হুম,' বললেন ইস্টার। 'খুব ভালো।'

'আপনার সাথে আর কখনও দেখা হবে?' প্রশ্ন করল শ্যাডো।

সবুজাভ চোখ দিয়ে ওর চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মহিলা। তারপর আচমকা মাথা নেড়ে বললেন, 'আমার সন্দেহ আছে।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পাখিটার পিঠে বসল শ্যাডো। নিজেকে একটা ইঁদুরের মতো মনে হচ্ছে ওর। মুখে পাচ্ছে ওজোন গ্যাসের স্বাদ। আচমকা বজ্রপাতের আওয়াজ ভেসে এলো ওর কানে। থান্ডারবার্ডটা ছড়িয়ে দিল তার পাখনা, ঝাপটাতে শুরু করল।

বাতাসে ভাসতে শুরু করল ওরা। আপ্রাণ চেষ্টায় পাখিটার পিঠে বসে রইল শ্যাডো।

মনে হচ্ছে যেন, বজ্রের পিঠে চড়াও হয়েছে সে।

গাড়ির পেছন সিট থেকে ডালটা বের করে আনল লরা। মি. টাউনের লাশটাকে রেখে দিল গাড়ির সামনের সিটেই। গাড়ি থেকে বেরিয়ে বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে হাঁটতে শুরু করল রক সিটির উদ্দেশ্যে। টিকিট বিক্রির বুথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে আগেই। তবে গিফট শপের দরজা খোলা, ওটা দিয়েই দুনিয়ার অষ্টমাশ্চার্যে পা রাখল মেয়েটা।

কী আশ্চর্য, কেউ থামাল না ওকে! যদিও পথে বেশ কয়েকজন নারী-পুরুষ পড়ল বটে। ওদের অনেককেই দেখতে কৃত্রিম বলে মনে হয়। আবার কয়েকজনকে প্রায় অদৃশ্য। ঝুলন্ত একটা সেতু পার হলো লরা, তারপর পার হলো সাদা হরিণের বাগান, হাঁটল দুই পাথুরে দেয়ালের মাঝখানের পথ দিয়ে।

সামনে পড়ল চেইন লাগানো একটা প্রবেশ পথ। ওটার সাথে ঝুলানো সাইনবোর্ড জানাচ্ছে, আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে জায়গাটাকে। তবে পাত্তা দিল না লরা। ওটা টপকে প্রবেশ করল একটা গুহায়। গুহামুখের ঠিক সামনেই একটা প্লাস্টিকের চেয়ার। এক লোক বসে আছে চেয়ারটাতে, ছোট একটা বৈদ্যুতিক লণ্ঠনের আলোয় মন দিয়ে পড়ছে ওয়াশিংটন পোস্ট। লরাকে দেখে কাগজটা ভাঁজ করে রাখল সে, এরপর উঠে দাঁড়িয়ে বাউ করল। লোকটা লম্বা, উপলব্ধি করতে পারল মেয়েটা, মাথায় কমলা রঙের ছোট ছোট করে কাটা চুল।

'মি. টাউনের নাম নিশ্চয় আর জীবিতদের খাতায় নেই?' বলল লোকটা। 'স্বাগতম, বর্শা-বাহক।'

'ধন্যবাদ। ম্যাকের দুর্গতির জন্য আমি দুঃখিত।' উত্তরে জানাল লরা। 'তোমরা বন্ধু ছিলে?'

'নাহ, একদম না। তবে ওর আসলে বেঁচে থাকা উচিৎ ছিল। একদম সহজ একটা কাজ দিয়েছিলাম। যাই হোক, বর্শাটা এখন তোমার হাতে।' চোখ তুলে মেয়েটার দিকে চাইল সে, অদ্ভুত এক আভা খেলা করছে সে চোখের তারায়। 'অন্য ভাবে বলতে গেলে, তুরুপের তাস এখন তোমার মালিকানায়...আমাকে এখানকার সবাই মিস্টার ওয়ার্ল্ড নামে ডাকে।'

'আমি শ্যাডোর স্ত্রী।'

'ওহ, সুন্দরী লরা তুমি?' বলল মি. ওয়ার্ল্ড। 'আমার তোমাকে চেনা উচিৎ ছিল। জেলে থাকার সময় বিছানার উপর তোমার অনেকগুলো ছবি লাগিয়ে রাখত শ্যাডো। আমরা সেলমেট ছিলাম। আরেকটা কথা বলি, কিছু মনে করো না। যে রকম উচিৎ ছিল, তার চাইতে অনেক বেশি সুন্দরী লাগছে তোমাকে। এতক্ষণে তো পচন ছড়িয়ে যাওয়া উচিৎ ছিল, তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ।' নিঃস্পৃহ কণ্ঠে বলল লরা। 'কিন্তু খামারের ওই তিন বোন আমাকে তাদের কূপ থেকে পানি এনে দিল। তারপর থেকেই...'

'উর্ডের কূপ থেকে?' ভ্রূ কুঁচকে ফেলল লোকটা। 'অসম্ভব!'

নিজের দিকে ইঙ্গিত করল লরা। ওর ত্বক মলিন, চোখের নিচে কালি পড়ে গিয়েছে। কিন্তু কোথাও পচনের কোন চিহ্ন নেই। জিন্দা-লাশ হতে পারে ও, তবে মৃত্যুটা বেশিক্ষণ আগে হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

'বেশিক্ষণ এই অবস্থা থাকবে না,' জানালেন মি. ওয়ার্ল্ড। 'নর্নদের কাছ থেকে অতীতের একটু স্বাদ পেয়েছ কেবল তুমি। দ্রুতই তা বর্তমানে সাথে মিলে-মিশে যাবে। তখন ওই সুন্দর নীল চোখ দুটো গলে বেয়ে পড়তে থাকবে গালের উপর দিয়ে। সৌন্দর্যের লেশমাত্রও অবশিষ্ট থাকবে না ওই কোমল চেহারায়। যাই হোক, আমাকে আমার ডাল দিয়ে দাও।'

পকেট থেকে এক প্যাকেট লাকি স্ট্রাইকস সিগারেট বের করে, একটা ধরাল সে।

'একটা দেবে?' অনুরোধ করল লরা।

'অবশ্যই। একটা ডাল দাও, একটা সিগারেট নাও।'

'এই ডালের দাম যে ওই সিগারেটের চাইতে অনেক বেশি, তা তুমিও জানো।'

কিছুই বলল না লোকটা।

'আমি অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব চাই।' দাবী জানাল লরা।

একটা সিগারেট ধরিয়ে মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিল মি. ওয়ার্ল্ড। জ্বলন্ত শলাকাটা নিয়ে বুক ভরে টান দিল লরা। 'এবার,' হাসল ও। 'নিকোটিনের স্বাদটা যেন পেয়েই গিয়েছিলাম প্রায়!'

'আচ্ছা,' আচমকা জানতে চাইল মি. ওয়ার্ল্ড। 'খামার বাড়ির ভেতরে...ওই তিন বোনের কাছে গিয়েছিলে কেন?'

'শ্যাডোর কথা শুনে,' জানাল লরা। 'ও-ই বলেছিল যেতে।'

'জেনে-শুনে কাজটা করেছে বলে মনে হয় না।' বলল মি. ওয়ার্ল্ড। 'তবে যাই হোক, মরে গিয়েছে, ভালোই হয়েছে। ও যে আর দৃশ্যপটে নেই, সেটা ধরে নিয়েই এগোতে পারছি।'

'তুমি আমার স্বামীর সাথে প্রতারণা করেছে। অথচ শ্যাডো ভালো মানুষ, সেটা জানো?'

'হ্যাঁ, জানি।' বলল মি. ওয়ার্ল্ড। 'এসব যখন শেষ হবে, তখন একটা মিসেলটোর লাঠি নিয়ে নাহয় ওর চোখটার ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দেব। খুশি হবে তো তাতে? এবার আমার ডাল দাও।'

'ওটা দরকার কেন?'

'স্যুভনির বলতে পারো, এই বাজে ব্যাপারটার একটা স্মৃতি।' জানাল মি. ওয়ার্ল্ড। 'ভয় পেও না, জিনিসটা মিসেলটো নয়। ওটা আসলে একটা বর্শার প্রতীক। আর এই জঘন্য দুনিয়ায়-প্রতীকই সবকিছু।'

বাইরে থেকে আস্তে আস্তে জোরাল আওয়াজ ভেসে আসছে।

'তুমি কার পক্ষে?' জানতে চাইল লরা।

'এসব কোন একটা পক্ষের বিজয়ের জন্য হচ্ছে না। তবে জানতে যখন চাইলে তখন বলি, আমি জয়ী পক্ষে। সবসময় তা-ই ছিলাম।'

নড করল লরা, বুঝতে পেরেছে। তবে হাত থেকে ডালটা ছাড়ল না। লোকটার দিকে পিঠ দিয়ে ফিরল ও। অনেক নিচে, কিছু একটা স্পন্দিত হচ্ছে...জ্বলছে...নিভছে। চিৎকারও যেন ভেসে এলো একটা, তবে মিলিয়ে গেল ক্ষণিকের মাঝেই।

'ঠিক আছে, ডালটা আমি তোমাকে দেব।' বলল লরা।

'ভালো মেয়ে,' ঠিক ওর পেছন থেকেই ভেসে এলো মিস্টার ওয়ার্ল্ডের কণ্ঠ। ওটা কানে ঢোকা মাত্র যেন কেঁপে উঠল বেচারি।

কিন্তু নড়ল না, স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কাছে আসতে দিতে হবে লোকটাকে, এতটাই কাছে যেন লোকটার নিঃশ্বাস ওর কানে অনুভূত হয়।

তারপর নাহয়...

সফরটাকে উত্তেজনাকর বললে কম বলা হয়ে যায়, অনুভূতিটাকে পুরোপুরিভাবে প্রকাশ করার মতো ভাষা শ্যাডোর জানা নেই।

বিজলির মতো এঁকে-বেঁকে ঝড়ের ভেতর দিকে এগোল ওরা। যেন সওয়ার হয়েছে কোন হারিকেনের মাথায়। এমন ভ্রমণের কথা কল্পনাও করা যায় না। নাহ, এক মুহূর্তের জন্যও ভয় পায়নি শ্যাডো। পেয়েছে শুধু ওড়ার আনন্দ, পেয়েছে ঝড়কে কাঁচকলা দেখিয়ে এগিয়ে যাবার উল্লাস।

থান্ডারবার্ডটার পালক আঁকড়ে ধরে আছে শ্যাডো। স্থির বিদ্যুতের প্রভাবে খাড়া হয়ে আছে ওর হাতের লোমগুলো। বৃষ্টির ফোঁটা এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে ওর মুখমণ্ডল।

'অসাধারণ,' ঝড়ের চিৎকার ছাপিয়ে উঠল ওর কণ্ঠের হুঙ্কার।

পাখিটা যেন বুঝতে পারছে ওর উল্লাস। তাই আরও উপরে উঠতে শুরু করল সে। ওটার ডানার প্রতি ঝাপটানির সাথে যেন বজ্র ঝলকাচ্ছে। পরক্ষণেই আবার ডাইভ দিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে কালো মেঘের ভেতরে।

'স্বপ্নে তোমার পিছু নিয়েছিলাম আমি।' বলল শ্যাডো। 'একটা পালক হলেও পাবার আশায়।'

জানি৷ স্থির বিদ্যুতের ঝির ঝির শব্দ যেন পাখিটার বলা বাক্য পরিবহন করছে। অনেকেই আমাদের কাছে পালকের জন্য আসে৷ নিজেদের পৌরুষ প্রমাণ করতে চায়৷ আমাদের মাথা কাটতে চায় তারা, আমাদের জীবন উপহার দিতে চায় তাদের মৃত ভালোবাসাকে৷

মনের ভেতর একটা ছবি খেলে গেল শ্যাডোর। এক মেয়ে থান্ডারবার্ড, অন্তত পাখিটার বাদামী পালক দেখে তাই মনে হলো ওর, একটা পাহাড়ের পাশে মরে পড়ে আছে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে এক মহিলা। চকমকি পাথরের কুঠার ব্যবহার করে ওটার খুলি টুকরা টুকরা করছে। মগজ আর হাড়ের রাজ্য ভেদ করে অবশেষে একটা মসৃণ পাথর খুঁজে পেল মেয়েটা। রঙ ওটার গাঢ় লাল, ভেতর থেকে যেন ফুলকি বেরোচ্ছে। এটাই তাহলে ঈগল স্টোন, ভাবল শ্যাডো। কী করে যেন বুঝতে পারল, তিনদিন আগে মারা যাওয়া মৃত ছেলের জন্য ওই পাথরটা নিচ্ছে মহিলা। ঠান্ডা হয়ে আসা বুকটার উপর রাখবে ওটাকে, সকাল হতেই আবার বেঁচে উঠবে ওর ছেলে। হাসবে...খেলবে। আর পাথরটা তার সব রঙ হারিয়ে হয়ে যাবে বিবর্ণ...মৃত।

'আমি বুঝতে পেরেছি,' পাখিটাকে জানাল শ্যাডো।

মাথা হেলিয়ে চিৎকার করে উঠল পাখিটা। কী আশ্চর্য, ওর সেই চিৎকারই আসল বজ্রপাত!

অদ্ভুত কোন স্বপ্নের মতো বয়ে যেতে লাগল নিচের দুনিয়া।

ডালটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল লরা, অপেক্ষা করতে লাগল মি. ওয়ার্ল্ড নামধারী লোকটা কাছে আসার। এখনও গুহার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে ও। দেখছে ঝড়...দেখছে নিচের সমবেত জনতাকে।

এই জঘন্য দুনিয়ায়, ভাবল ও। প্রতীকই সবকিছু৷ একদম ঠিক৷

ডান কাঁধের উপর একটা স্পর্শ অনুভব করল লরা।

খুব ভালো৷ মিস্টার ওয়ার্ল্ড আমাকে চমকে দিতে চায় না৷ সে নিশ্চয় ভয় পাচ্ছে যে আমি ডালটাকে ঝড়ের মাঝে ছুঁড়ে দেব৷ তাহলে হারিয়ে ফেলবে সে ওটাকে৷

পেছন দিকে একটু হেলান দিল লরা, পিঠে লোকটার বুকের স্পর্শ পেতে থেমে গেল। এদিকে মি. ওয়ার্ল্ড থেমে নেই। তার ডান হাত জড়িয়ে ধরেছে লরাকে। বাঁ হাতটা লরার সামনে। দুই হাত দিয়ে শক্ত করে ডালটা ধরল ও, দম ছেড়ে মনঃস্থির করে নিল।

'আমার ডালটা দাও, প্লিয।' ওর কানে ফিসফিস করে অনুরোধ করল লোকটা।

'এই নাও,' বলল লরা। তারপর অর্থ না বুঝেই, যেন অবচেতন মনে যোগ করল, 'এই মৃত্যু আমি শ্যাডোর নামে উৎসর্গ করলাম।' প্রাণপণ শক্তিতে ডালটাকে নিজের বুকের ভেতর ঢুকিয়ে দিল ও। অনুভব করতে পারল, ওটা তার হাতেই রূপান্তরিত হয়ে একটা বর্শা হয়ে গিয়েছে!

মৃত্যুর পর থেকে ব্যথা নামের অনুভূতিটা যেন হারিয়ে ফেলেছে লরা। তাই কেবল বুঝতে পারল, বর্শার ফলাটা ওর বুক-পিঠ ভেদ করে আরেকটা দেহে বাঁধা পেয়েছে। চাপ বাড়াল ও, এবার বুঝতে পারল-মি. ওয়ার্ল্ডের দেহেও গেঁথে গিয়েছে ফলাটা। ঘাড়ের উপর সে টের পেল লোকটার বিস্মিত চিৎকার। ব্যথায় আর চমকে কুঁকড়ে গিয়েছে যেন লোকটা।

লোকটার উচ্চারিত শব্দগুলো বুঝতে পারল না লরা। কোন দেশি ভাষা, তা-ও না। তবে থামল না ও। বর্শার ফলাটা মি. ওয়ার্ল্ডের পিঠ দিয়ে বের না হওয়া পর্যন্ত ঠেলতে লাগল।

'হারামজাদী,' ইংরেজিতে বলল মি. ওয়ার্ল্ড। 'হারামজাদী, মাগি।' লোকটার কণ্ঠে তারল্য চলে এসেছে। ফলাটা ওর কোন একটা ফুসফুস ফুটো করে দিতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে হলো লরার।

নড়ে উঠল মি. ওয়ার্ল্ড, মানে নড়ার প্রয়াস পেল আরকী। আর তার সাথে সাথে নড়তে শুরু করল লরার দেহও। দুইজনের দেহ এখন বর্শার হাতলে একসাথে বিঁধে আছে। লোকটার হাতে উঠে এসেছে একটা ছোরা। এলোপাথাড়ি ওটা দিয়ে লরার বুকে আর স্তনে আঘাত করতে শুরু করল মি. ওয়ার্ল্ড।

তাতে অবশ্য লরার কিছু যায় আসে না। এক জিন্দা-লাশের কাছে আরও কয়েকটা ক্ষত এমনকি দাম রাখে?

শক্ত হাতে লোকটার ছোরা ধরা হাতের কব্জিতে আঘাত হানল ও, সাথে সাথে নিচে পড়ে গেল ওটা। লাথি দিয়ে সরিয়ে দিল লরা।

এখন একই সাথে কাঁদছে আর চিৎকার করছে মি. ওয়ার্ল্ড। লোকটার চোখ থেকে টপটপ করে গরম অশ্রু এসে পড়ছে লরার ঘাড়ে...উষ্ণ রক্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে ওর পিঠ।

আচমকা হুমড়ি খেল মি. ওয়ার্ল্ড, সেই সাথে লরা নিজেও। পিচ্ছিল রক্তে পা পড়ে আছাড় খেল ওরা দুজনই।

রক সিটির পার্কিং লটে এসে নামল থান্ডারবার্ড। বৃষ্টি এখন অঝোর ধারায় পতিত হচ্ছে। অনেক কষ্টে সামনের কয়েক ফুট কেবল দেখতে পাচ্ছে শ্যাডো। পাখিটার পিঠ থেকে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নামল সে।

আচমকা বজ্রপাতের সাথে ঝলসে উঠল সারা দুনিয়া। আলো যখন কমে গেল, তখন শ্যাডো তাকিয়ে দেখে-আশেপাশে নেই কোন পাখি!

পার্কিং-লটটাকে প্রায় খালিই বলা চলে। প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে গেল শ্যাডো। পথে একটা ফোর্ড এক্সপ্লোরার পড়ল, দেয়ালের পাশে পার্ক করে রাখা। ওটাকে কেন যেন পরিচিত বলে মনে হলো তার! ভেতরে বসে থাকা লোকটার উপর চোখ পড়ল পর মুহূর্তে। এমনভাবে লোকটা স্টিয়ারিং হুইলের উপর ঝুঁকে আছে, যেন ঘুমাচ্ছে!

দরজাটা খুলল শ্যাডো।

মি. টাউনকে ও শেষ দেখেছিল আমেরিকার কেন্দ্রের ওই মোটেলে। লোকটার চেহারায় বিস্ময় দেখা যাচ্ছে। দক্ষতার সাথে কেউ ঘাড় মটকে দিয়েছে বেচারার। লোকটার চেহারা স্পর্শ করল শ্যাডো। এখনও গরম আছে।

গাড়ির ভেতর থেকে সুগন্ধির গন্ধ ভেসে আসছে। একদম হালকা একটা গন্ধ, কিন্তু সাথে সাথেই চিনতে পারল ও। ধরাম শব্দে দরজা বন্ধ করে এগিয়ে গেল সে।

হাঁটছে, এমন সময় দেহের পাশে এক মুহূর্তের জন্য একটা তীক্ষ্ণ ব্যথার অনুভূতি হলো ওর।

টিকিট বুথটা ফাঁকা, কর্মচারীর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এক মুহূর্তের জন্যও না থেমে রক সিটির বাগানের দিকে অগ্রসর হলো সে।

গর্জে উঠল মেঘ, সেই আওয়াজে কেঁপে উঠল গাছের ডাল। বৃষ্টি যেন পণ করেছে, সবকিছু ভাসিয়ে নেবার আগে থামবে না। এখনও সন্ধ্যা হয়নি, তবে চারপাশের ঘন অন্ধকার দেখলে কে বলবে সে কথা?

দূর থেকে ভেসে এলো একটা পুরুষ কণ্ঠ। আবছাভাবে শুনতে পেল শ্যাডো। পুরোটা বুঝতে না পারলেও, কয়েকটা শব্দ ঠিক আলাদা করতে পারল, '...ওডিনের উদ্দেশ্যে!'

তাড়াতাড়ি এগোতে শুরু করল শ্যাডো, একবার পিছলা খেয়ে পড়েও গেল। পাহাড়টাকে ঘিরে ভেসে আছে ঘন মেঘের একটা স্তর।

যেখান থেকে আওয়াজ এসেছিল বলে মনে হলো, ঠিক সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো শ্যাডো। কিন্তু, কী আশ্চর্য! কেউ নেই ওখানে! নেই কোন আওয়াজও!

চিৎকার করে ডাকল যুবক, মনে হলো যেন কেউ উত্তর দিচ্ছে। আবার হাঁটতে শুরু করল সে।

নেই...কেউ নেই...কিচ্ছু নেই...কেবল একটা গুহা দেখতে পেল। ওটার সামনে একটা চেইন, দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিষেধ বোঝাচ্ছে।

চেইনটা টপকালো শ্যাডো, উঁকি দিল ঘন-কালো অন্ধকারের ভেতরে।

হাতের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গিয়েছে উত্তেজনায়।

আচমকা ওর পেছন থেকে ভেসে এলো একটা কণ্ঠ। প্রায় শোনা যায় না, এমন কণ্ঠে বলল, 'আমাকে কখনও হতাশ করো না তুমি।'

ঘুরল না শ্যাডো। 'ব্যাপারটা অদ্ভুত। নিজেকে নিয়ে আমি হতাশ। সব সময়ই ছিলাম।'

'আরে না,' বলল কণ্ঠটা। 'তোমার যা যা করণীয় ছিল, তা তা করেছ। শুধু তাই নয়, আরও বেশি করেছ। সবার নজর নিজের দিকে কেড়ে নিয়েছিলে। তাই আসলে পয়সাটা কোথায় আছে, তা কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারেনি। একেই বলা বিভ্রান্ত করা। আর তাছাড়া, নিজের সন্তানের উৎসর্গ পিতার জন্য অন্য রকম এক ক্ষমতা বয়ে আনে। খেলার শেষ পর্যায় শুরু করার জন্য সেটুকু যথেষ্ট। সত্যি বলতে কি, তোমাকে নিয়ে আমি গর্বিত।'

'খেলাটা,' বলল শ্যাডো। 'প্রথম থেকেই পাতানো ছিল, তাই না? এখানে কোন যুদ্ধ হতে যাচ্ছে না। হতে যাচ্ছে যজ্ঞ...হত্যাযজ্ঞ!'

'বিলকুল ঠিক,' ছায়ার ভেতর থেকে ওয়েনসডের কণ্ঠ ভেসে এলো। 'পাতানো ছিল খেলাটা। কিন্তু শহরে যে খেলা এই একটাই!'

'আমি চাই লরাকে,' জানাল শ্যাডো। 'সেই সাথে লোকিকেও। ওরা কোথায়?'

উত্তরে পেল কেবল নীরবতা। বৃষ্টির ঝাপটা এসে ভিজিয়ে দিল শ্যাডোকে। ধারে কাছেই কোথাও গর্জে উঠল বজ্র।

এগিয়ে গেল শ্যাডো।

লোকি লাই-স্মিথ মেঝেতে বসে আছে, পিঠ ঠেকিয়ে রেখেছে একটা খাঁচায়। কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে ওকে, শুধু হাত আর চেহারা বাইরে বেরিয়ে আছে। পাশেই একটা চেয়ারে রাখা হয়েছে বৈদ্যুতিক লণ্ঠন। ওটার ব্যাটারিও প্রায় শেষের দিকে, তাই হলদে একটা আবছা আলো বেরচ্ছে কেবল।

মলিন দেখাচ্ছে বেচারাকে, ভঙ্গুর।

কেবল চোখ দুটো বাদে। এখনও আগুন জ্বলছে ওই চোখ জোড়ায়। চেয়ে চেয়ে শ্যাডোকে দেখছে।

লোকির কয়েক পা দূরে এসে থমকে দাঁড়াল শ্যাডো।

'দেরী করে ফেলেছ।' বলল লোকি, ফিসফিস করে। 'আমি বর্শাটা ছুঁড়ে দিয়েছি, উৎসর্গ করেছি যুদ্ধটাকে। শুরু হয়েছে...হত্যাযজ্ঞ।'

'ঠাট্টা করছ না তো?' বলল শ্যাডো।

'নাহ, করছি না। তাই এখন তুমি যা ইচ্ছা, তাই করতে পারো। কিছু যায় আসে না।'

থমকে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবল শ্যাডো। তারপর বলল, 'যুদ্ধটা শুরু করার জন্য তোমার এই বর্শা ছুঁড়ে দেয়াটা জরুরী ছিল। ঠিক ওই উপশালার ব্যাপারটার মতো। এই যুদ্ধ থেকেই শক্তি পাচ্ছ, ঠিক বলেছি না?'

চুপ করে রইল লোকি।

'মোটামুটি ধরতে পেরেছি সব,' বলল শ্যাডো। 'ঠিক কখন পারলাম, তা বলতে পারি না। সম্ভবত যখন গাছে ঝুলছিলাম, তখন। ওয়েনসডে ক্রিসমাসের সময় আমাকে একটা কথা বলেছিলেন।'

চুপচাপ ওর দিকে তাকিয়ে রইল লোকি, বলল না কিছুই।

'প্রতারণাটা করতে দুইজন দরকার,' বলল শ্যাডো। 'যেমন ওই ফিডল গেম। যেমনটা ছিল ওই বিশপ আর পুলিশের প্রতারণা। দুই পক্ষে দুই জন, অথচ তাদের উদ্দেশ্য এক!'

ফিসফিস করে উঠল লোকি, 'বোকার মতো কথা বলছ।'

'তা হবে কেন? তুমি মোটেলে যে অভিনয় করেছিলে, সেটার প্রশংসা করতেই হয়। ওখানে তোমার থাকাটা ছিল জরুরী, সবকিছু পরিকল্পনা মোতাবেক চলছে তা নিশ্চিত করার জন্য। আমি তোমাকে দেখেছিলাম, কেন তুমি ওখানে তা সম্ভবত বুঝতেও পেরেছিলাম। কিন্তু তুমিই যে মিস্টার ওয়ার্ল্ড, সেটা একদম বুঝতে পারিনি।'

একটু উঁচু কণ্ঠে বলল এবার শ্যাডো। 'বেরিয়ে আসুন। যেখানেই থাকুন না কেন, আমার সামনে এসে দাঁড়ান।'

গুহামুখ দিয়ে ভেতরে ভেসে এলো বাতাস, সাথে করে নিয়ে এলো বৃষ্টির পানি। কেঁপে উঠল শ্যাডো।

'আর ঘুঁটি হতে চাই না আমি,' বলল শ্যাডো। 'নিজের চেহারা দেখান। আমি দেখতে চাই আপনাকে।'

গুহার ভেতরের ছায়ায় কাঁপন উঠল। 'তুমি একটু বেশিই জেনে ফেলেছ, বাছা।' ওয়েনসডের পরিচিত কণ্ঠটা শুনতে পেল শ্যাডো।

'তাহলে আপনি মারা যাননি!'

'গিয়েছি,' ছায়ার ভেতর থেকে বললেন ওয়েনসডে। 'নইলে এসব কিছুতেই সম্ভব হতো না।' প্রায় মিলিয়ে গেল তার কণ্ঠ। 'কালি, মরিগান আর ওই বালের আলবেনিয়ানরা কোনদিন এক হতো না। আমি ছিলাম বলির পাঁঠা, আমার মৃত্যুই সবাইকে যুদ্ধে নাম লেখাতে বাধ্য করেছে।'

'নাহ,' বলল শ্যাডো। 'আপনি বলির পাঁঠা নন, আপনি বিশ্বাসঘাতক পাঁঠা।'

কালো ছায়ায় আবার কাঁপন উঠল যেন। 'একদম না। তোমার কথার অর্থ দাঁড়ায়, আমি নতুন দেবতাদের জন্য পুরনো দেবতাদের সাথে দুই নম্বুরি করছি। তেমন কিছুই হচ্ছে না এখানে।'

'একদম না।' ফিসফিস করে সম্মতি জানাল লোকি।

'তা তো আমিও বুঝতে পারছি না,' বলল শ্যাডো। 'তোমরা একপক্ষকে ধোঁকা দিচ্ছ না, উভয় পক্ষকে দিচ্ছ!'

'হুম, সেরকমই কিছু একটা।' গর্বিত কণ্ঠে বললেন ওয়েনসডে।

'আপনাদের আসলে দরকার রক্তক্ষয়...চাই উৎসর্গ। আর সেজন্য বেছে নিয়েছেন দেবতাদের।'

তীব্র বেগে বইছে বাতাস, গুহার সামনে যেন চিৎকার করে নাচন-কুদনে লিপ্ত তারা।

'ক্ষতি কী? এই জঘন্য দেশে আমি প্রায় বারো শ বছর ধরে বন্দী। আমি ক্ষুধার্ত, আমি তৃষ্ণায় কাতর...রক্ত ছাড়া এই ক্ষুৎপিপাসা মেটার নয়।'

'মৃতদের রক্ত-মাংস ভোগ করে নিজেকে ক্ষমতাশালী করে তোলেন আপনি।'

ওয়েনসডেকে যেন এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে শ্যাডো। প্রতিটা মুহূর্তে নিরাকার থেকে সাকার হচ্ছে তার অবয়ব। তবে কেবলমাত্র আড়চোখে তাকালেই তা বুঝতে পারছে ও। 'আমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত মৃত্যুই কেবল আমাকে শক্তিশালী করে তোলে।'

'যেমন গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় আমার মৃত্যু।' বলল শ্যাডো।

'ওটা আলাদা,' জানালেন ওয়েনসডে। 'বিশেষ কিছু।'

'তুমিও মৃত্যু চাও?' লোকির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল শ্যাডো।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে এপাশ-ওপাশ মাথা দোলাল লোকি।

'তুমি ক্ষমতা পাও বিশৃঙ্খলা থেকে।' উপলব্ধি করতে পারল শ্যাডো।

কথা শুনে হাসল লোকি, ক্লিষ্ট হাসি। কমলা রঙের ফুলকি খেলে গেল ওর চোখে।

'তোমাকে ছাড়া এসব কিছুই সম্ভব হতো না।' বললেন ওয়েনসডে। 'অনেক নারীর সাথে শুয়েছি আমি...'

'আপনার একজন সন্তান দরকার ছিল।' ধরতে পারল শ্যাডো।

'আমার তোমাকে দরকার ছিল বাছা। হ্যাঁ, আমার ঔরসজাত সন্তান। আমি জানতাম, তোমার মার গর্ভে তুমি এসেছ। কিন্তু দেশ ছেড়ে চলে যায় তোমার মা। আমাদের অনেক সময় লেগেছে তোমাকে খুঁজে বের করতে। যখন সফল হলাম, তখন তুমি জেলে! তোমার ব্যাপারে জানতে হতো আমাদের। কী তোমাকে আনন্দ দেয়? কোন জিনিসটা স্থবির করে তোলে? তুমি আসলে কে?' নিজের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট মনে হলো লোকিকে। 'জানতে পারলাম, ঘরে তোমার ফেরার অপেক্ষায় আছে একজন স্ত্রী। তাই পুরো কাজটা কঠিন হয়ে গেল। কঠিন হলেও, অসম্ভব নয়!

মেয়েটা তোমার যোগ্য ছিল না,' যোগ করল লোকি। 'ওকে ছাড়াই তুমি ভালো আছ।'

'অন্য কোনভাবে যদি কাজটা করা সম্ভব হতো...' বললেন ওয়েনসডে, এবার শ্যাডো বুঝতে পারল তার বাক্যের উদ্দেশ্য।

'শালার বেটি মরেও মরল না।' হাঁপাতে শুরু করেছে লোকি। 'উড আর স্টোনের মতো কর্মচারী সহজে মেলে না। ট্রেন ডাকোটা পার হলেই, তোমাকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেয়া হতো।'

'লরা কোথায়?' জানতে চাইল শ্যাডো।

মলিন একটা হাত তুলে গুহার পেছন দিকে ইঙ্গিত করল লোকি।

'ওদিকে গিয়েছে,' বলেই সামনের দিকে ঝুঁকে গেল ওর দেহ।

কম্বলটা এতক্ষণ রক্তের একটা ছোট-খাটো ডোবাকে ঢেকে রেখেছিল। সেই সাথে লোকির বুকের-পিঠের ক্ষতও। 'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল ও।

উত্তর দিল না লোকি।

লোকটা আর কোনদিন কথা বলবে না।

'ব্যাপার হচ্ছে-তোমার স্ত্রী।' ওয়েনসডের কণ্ঠ বলল। কেন যেন আস্তে আস্তে আবার উধাও হয়ে যেতে শুরু করেছেন তিনি। 'তবে এই যুদ্ধের কারণে আবার ফিরে আসবে ও। সেই সাথে চিরতরে ফিরব আমিও। আমি একটা ভুত, আর লোকি লাশ। কিন্তু সেই পর্যন্ত জিত আমাদেরই। পাতানো খেলা, বুঝলে?'

'পাতানো খেলাগুলোই,' শ্যাডো ওয়েনসডের কথা ওয়েনসডেকেই শুনিয়ে দিল। 'জেতা সবচাইতে সহজ।'

কিন্তু উত্তর পেল না কোন। বন্ধ হয়ে গিয়েছে ছায়ার কাঁপুনি।

'বিদায় পিতা।' বলল শ্যাডো।

বাইরে বেরিয়ে এলো ও, পুরো এলাকা নিশ্চুপ। নেই কোন চিৎকার-চেঁচামেচি। নেই কোন তলোয়ারের আওয়াজ। একেবারেই একা এখানে সে।

নাহ, ভুল হলো।

এই জায়গার নাম রক সিটি। এই সেই জায়গা যেখানে প্রতি বছর লাখো লাখো লোক বিস্মিত হতে আসে। এখানে বাস্তবতার পর্দা পাতলা। শ্যাডো বুঝতে পারল, আসল যুদ্ধটা কোথায় হচ্ছে।

ক্যারোসেলে চড়ার সময় যে অনুভূতি হয়েছিল, সেটাকে আবার নিজের মাঝে তুলে আনার প্রয়াস পেল শ্যাডো। মনে করার চেষ্টা করল উইনিব্যাগোর আচমকা উধাও হয়ে যাবার মুহূর্তটাকে-

আর তারপর, একেবারে মাখনের মতো মসৃণ আয়াসে, নিখুঁতভাবে ঘটল ঘটনাটা...

...মঞ্চের পেছনে এসে উপস্থিত হলো ও।

এখনও একটা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সে, এই ব্যাপারটার কোন পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু বাকি সবকিছুই পরিবর্তিত। এই পাহাড়টা সবকিছুর কেন্দ্রে। এর সামনে লুকআউট পাহাড় আসলে কিছুই না।

এটাই ঘটনাস্থল।

চারপাশের পাথুরে দেয়ালগুলো একটা প্রাকৃতিক অ্যাম্ফিথিয়েটারের কাজ করছে। ওগুলোর ভেতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে এগিয়ে যাওয়া পথগুলো জন্ম দিয়েছে কিছু সেতুর।

আর আকাশ...

আকাশের রঙ ঘন কালো। তবে আলো জ্বলছে ওখানে, সেই আলোতে নিচের দুনিয়াকে দেখাচ্ছে সবুজাভ-সাদা। কালো আকাশ, তবে আলোটা যেন সূর্যের চাইতে উজ্জ্বল।

ওটা আসলে বজ্রপাতের আলো, বুঝতে পারল শ্যাডো। বিজলি চমকাবার মুহূর্তটাকে জমিয়ে রাখা হয়েছে অনন্তকালের জন্য।

মানুষ বিশ্বাস করে, ভাবল শ্যাডো। এটাই মানুষের কাজ। তারা বিশ্বাস করে। কিন্তু সেই বিশ্বাসের দায়-দায়িত্ব নিতে চায় না। কল্পনা করে, কিন্তু সেই কল্পনা বাস্তব হয়ে সামনে এসে দাঁড়ালে আর তাতে ভরসা রাখতে পারে না। মানুষ শূন্যতাকে ভরিয়ে তোলে ভূত, দেবতা আর ইলেকট্রনের গল্পে। মানুষ ভাবে, মানুষ বিশ্বাস করে। আর সম্ভবত...খুব সম্ভবত...সেই বিশ্বাসের কারণেই মিলে বস্তু।

পাহাড়ের শীর্ষ এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, সেটা সাথে সাথেই বুঝতে পারল শ্যাডো। দুই পাশে জড়ো হয়েছে দুই সেনাদল।

আকারে সেনাদের প্রত্যেকেই বিশাল, আসলে আমেরিকা জায়গাটাই এমন...যেখানে সবকিছুই বেশি বেশি।

পুরাতন দেবতারা ভিড় করেছে এক পাশে। পুরাতন মাশরুমের মতো বাদামী চামড়ার দেবতা, আবার সদ্য ছাল ছাড়ানো মুরগীর মতো গোলাপি ত্বকের দেবতাও আছে। কেউ কেউ পাগল, আবার কেউ কেউ সুস্থ। পুরাতন দেবতাদের চিনতে পারল শ্যাডো। ওদের অনেকের সাথেই পরিচয় হয়েছে ওর। তাদের মাঝে আছে ইফ্রিত আর পিস্কিরা, আছে বামন আর দৈত্যরা। রোড আইল্যান্ডের অন্ধকার ঘরে দেখা হওয়া সেই মহিলাও আছে, তার চুলের জায়গায় কিল-বিল করছে সাপ। মামা-জীকেও দেখতে পেল ও। সবাইকে চিনতে পারছে শ্যাডো।

এমনকী চিনতে পারছে নতুন দেবতাদেরও।

একজনকে দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার, সে রেলরোড ব্যারন না হয়ে যায়ই না। আছে বিমানের দেবতা, গাড়ির দেবতারাও বাদ যায়নি। ওদের কালো গ্লাভসে লেগে আছে রক্ত, ক্রোমের দাঁতগুলো খিচিয়ে আছে। অ্যাযটেকদের পর আর কেউ এমন মনুষ্য বলি পায়নি।

সবার জন্য করুণা বোধ করল শ্যাডো।

নতুন দেবতাদের মাঝে অহংকার দেখতে পেল ও, সেই সাথে অজানা এক ভয়ও। তাদের ভয়-সদা পরিবর্তনশীল দুনিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে, দুনিয়াকে নিজের মতো বা নিজেকে দুনিয়ার মতো সাজাতে না পারলে, স্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে হবে!

বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুই সেনাদল। উভয়ের কাছেই বিপক্ষ দল অশুভ...ওরা রাক্ষস...দানব।

প্রাথমিক লড়াই এরইমাঝে হয়ে গিয়েছে, পাথরের উপরে পড়ে থাকা রক্ত দেখে তা বুঝতে পারল শ্যাডো।

সত্যিকারের যুদ্ধের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করছে তারা। এখনই যা করার করতে হবে ওকে। নয়তো অনেক বেশি দেরী হয়ে যাবে।

আমেরিকায় সবকিছু যেন চিরকাল ধরে চলতে থাকে। ওর মনের ভেতর কে জানি বলে উঠল। *১৯৫০ সাল টিকে ছিল হাজারও বছর। কে বলেছে তোমার সময় নেই? তাড়াহুড়ো করছ কেন?*

কিছুটা হেঁটে, কিছুটা হোঁচট খেতে খেতে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগোল শ্যাডো।

সবার দৃষ্টি নিজের উপর অনুভব করতে সক্ষম হলো ও। কিছু নজর চোখের, আবার কিছু নজর চোখ বাদে অন্য কিছুর। কেঁপে উঠল যুবক।

মহিষ-মানব কথা বলে উঠল ওর মনে। যা করছ, ঠিকভাবেই করছ।

শ্যাডো ভাবল। অবশ্যই ঠিকভাবে করছি। আজ সকালে মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরে এসেছি আমি। তার তুলনায় সবকিছুই একদম...জলবৎ তরলং।

'বুঝলে তোমরা,' এমনভাবে শুরু করল শ্যাডো যেন গল্প করছে। 'একে যুদ্ধ বলা চলে না। শুরু থেকে কখনওই কোন যুদ্ধ হবার পরিকল্পনা ছিল না। কেউ যদি ভাব যে লড়তে এসেছ, তাহলে বোকার স্বর্গে বাস করছ রে ভাই।' উভয় পক্ষ থেকেই হৈ-হল্লার আওয়াজ আসতে শুনল শ্যাডো। বুঝতে পারল, ওর কথা শুনে কেউ খুশি হচ্ছে না।

'আমরা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়ছি।' এক মিনেটর বলে উঠল।

'আমরা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়ছি।' অন্য পাশ থেকে বলে উঠল আরেকজন।

'এই দেশ...এই জমি, দেবতাদের জন্য অনুর্বর।' বলল শ্যাডো। শুরু হিসেবে কালজয়ী না হলেও, আপাতত এতেই কাজ চালিয়ে নিতে হবে। 'তোমরা সবাই সম্ভবত সেটা নিজেদের মতো করে বুঝতে পেরেছ। পুরাতন দেবতাদের সবাই অগ্রাহ্য করে। নতুনদেরকে ভুলে যায় তারা পুরনো হবার আগেই। এখানে উপস্থিত সবাই হয় ভুলে যাওয়া হয়েছে, নয়তো ভুলে যাওয়া হবে-এই ভয়ের ভেতর বাস করছে।'

কমে এসেছে হল্লা। এমন কিছু কথা শ্যাডো বলেছে, যেগুলোর সাথে সবাই একমত। এখন ওর কথা মন দিয়ে শুনবে তারা।

'অনেকদূরের এক দেশ থেকে এদেশে এসেছিল এক দেবতা। এখানকার মানুষ-জন আস্তে আস্তে তার উপর থেকে বিশ্বাস হারাতে শুরু করল। সেই সাথে কমতে শুরু করল সেই দেবতার ক্ষমতাও। উৎসর্গ আর বলির মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করত সেই দেবতা। বিশেষ করে যুদ্ধ আর মৃত্যু থেকে। যুদ্ধে যারা মারা যেত, তাদের মৃত্যুকে তার উদ্দেশ্যে ভেট হিসেবে পাঠান হত।

'অনেক পুরাতন এক দেবতা তিনি। ধারণা করা হয়, সবচেয়ে ধূর্তও সেই তিনিই। আরেক দেবতার সাথে মিলে কাজ করতেন, দ্বিতীয় সেই দেবতা হলেন বিশৃঙ্খলা আর প্রতারণার দেবতা। একসাথে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে সর্বস্বান্ত করে ফেলতেন।

'পঞ্চাশ কী একশ বছর আগে, বিশেষ এক পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করতে শুরু করেন তারা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতার অভূতপূর্ব এক উৎস নির্মাণ করা, এমন

এক উৎস যেখান থেকে দরকার মতো শক্তি নিতে পারবেন। এমন কিছু, যেটা তাদের কল্পনার চাইতেও শক্তিশালী করে তুলবে। হাজার হলেও, বলি হিসেবে দেবতাদের লাশের চাইতে শক্তিশালী আর কী হতে পারে?

'বুঝতে পারছ আমার কথা?

'এই যে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছ তোমরা, তার ফলাফলে ওদের কিছুই যায় আসে না। তাদের দরকার যথেষ্ট সংখ্যক দেবতার মৃত্যু। তোমাদের মৃত্যু শক্তি যোগায় সেই বিশেষ দেবতাকে।'

আচমকা চিৎকারের আওয়াজ ভেসে এলো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। আওয়াজের উৎসের দিকে তাকাল শ্যাডো। বিশালদেহি এক লোককে দেখতে পেল সে। লোকটার ত্বক মেহগনি রঙা; নগ্ন বুক আর মাথায় একটা হ্যাট পরে আছে। মুখে ঝুলছে সিগার। কবরের মতো গভীর কণ্ঠে ব্যারন সামেডি বলল। 'বুঝলাম, কিন্তু ওডিন...ওডিন তো মারা গিয়েছেন। শান্তি আলোচনার সময় এই হারামজাদারা ওকে খুন করেছে। আমি মৃত্যুকে চিনি, এই ব্যাপারে আমাকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব না।'

শ্যাডো বলল, 'সত্যি সত্যি না মরলে কি এই যুদ্ধ হতো? যখন এটা শেষ হবে, তখন আগের চাইতে শক্তিশালী হয়ে ফিরবেন তিনি।'

'তুমি কে?' জানতে চাইল কেউ একজন।

'আমি তার...তার পুত্র।'

নতুন দেবতাদের একজন বলল, 'কিন্তু মিস্টার ওয়ার্ল্ড বলেছিল...'

'মিস্টার ওয়ার্ল্ড বলে কেউ নেই...কেউ ছিলও না কখনও। ওই হারামজাদা তোমাদেরকে ধোঁকা দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল।'

শ্যাডোর কথা বিশ্বাস করল সবাই। 'আমার কি মনে হয় জানো?' মাথা নেড়ে বসল ও। 'দেবতা হবার চাইতে, মানুষ হওয়া ভালো। আমাদের কারও বিশ্বাসের দরকার হয় না। আমরা ওসব ছাড়াও জীবন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।'

নীরবতা নেমে এলো পাহাড়ের শীর্ষে।

তারপর আচমকা, বিকট আওয়াজ করে, পাহাড়ের উপর আছড়ে পড়ল বিজলী। অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ।

তবে জ্বলতে শুরু করল উপস্থিত অনেকে।

শ্যাডোর মনে হলো, এরা বুঝি ওর সাথে ঝগড়া শুরু করবে। অথবা মেরে ফেললেও ফেলতে পারে। যাই হোক না কেন, অপেক্ষা করতে লাগল ও।

আচমকা টের পেল, জ্বলতে থাকা অস্তিত্বগুলো আস্তে আস্তে উধাও হয়ে যেতে শুরু করেছে। দেবতা বিদায় নিচ্ছে জায়গাটা থেকে, প্রথমে কয়েকজন কয়েকজন করে...তারপর একসাথে অনেকে।

রটওয়াইলার আকারের একটা মাকড়শা এগিয়ে এলো ওর দিকে। অসুস্থ বোধ হলেও, দাঁড়িয়ে রইল শ্যাডো।

কাছাকাছি এসে মি. ন্যান্সির কণ্ঠে প্রানিটা বলল। 'ভালো কাজ দেখিয়েছ বাছা, আমি গর্বিত।'

'ধন্যবাদ।'

'তোমাকে এখান থেকে বের করে নেয়া দরকার। বেশি সময় থাকলে অসুস্থ হয়ে পড়বে।' বলতে বলতেই নিজের একটা বাদামি পা দিয়ে ওর কাঁধ স্পর্শ করল প্রানীটা...

...পরক্ষণেই নিজেকে ও আবিষ্কার করল লুকআউট পাহাড়ে। মি. ন্যান্সি শ্যাডোর কাঁধে হাত রেখে কাশছে। বন্ধ হয়ে গিয়েছে বৃষ্টিপাত। পেটের এক পাশ হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে মি. ন্যান্সি। কোন সমস্যা হয়েছে কিনা, জানতে চাইল শ্যাডো।

'আরে না,' জানাল মি. ন্যান্সি। 'আমি শক্ত-পোক্ত মানুষ।' তবে কণ্ঠ শুনে তা মনে হলো না, মনে হলো যেন সে প্রচন্ড ব্যথায় সংকুচিত হয়ে আছে।

অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে আশেপাশে, বসেও আছে কেউ কেউ। কম-বেশি আহত সবাই।

আকাশে একটা গুঞ্জনের মতো শব্দ শুনতে পেল শ্যাডো, দক্ষিণ দিক থেকে আসছে। 'হেলিকপ্টার?' মি. ন্যান্সির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল ও।

নড করল মি. ন্যান্সি। 'তবে ভয়ের কিছু নেই। ওরা সবকিছু আগের মতো করে গুছিয়ে দিয়ে বিদায় নেবে।'

'ঠিক আছে।'

শ্যাডো জানে, সবকিছু আগের মতো করার আগে একটা জিনিস দেখতে চায় ও। ধূসর চুলো এক লোকের কাছ থেকে ফ্ল্যাশ লাইট ধার নিয়ে খুঁজতে শুরু করল তাই।

লরাকে খুঁজে পেল একটা পার্শ্ব-গুহার মেঝেতে। রক্তে আঠা-আঠা হয়ে আছে মেঝেটা। কাত হয়ে শুয়ে আছে মেয়েটার দেহ। একটা হাত মুঠো করে ধরে আছে বুকে, খুব নাজুক দেখাচ্ছে লরাকে। সেই সাথে মৃতও। তবে এতদিনে শ্যাডোর তা সয়ে গিয়েছে।

চারজানু হয়ে মেয়েটার পাশে বসল শ্যাডো, হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল গাল। আলতো করে ডাকল নাম ধরে। চোখ খুলে গেল লরার, মাথাটা একটু বাঁকিয়ে সরাসরি শ্যাডোর চোখের দিকে তাকাল সে।

'হ্যালো, পাপি।' ক্ষীণ কণ্ঠে বলল লরা।

'হাই, লরা। এখানে কী হয়েছে?'

'তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। ওরা জিতেছে?'

'যুদ্ধ শুরু হবার আগেই আমি থামিয়ে দিয়েছি।'

'আমার চালাক পাপি,' বলল লরা। 'ওই মিস্টার ওয়ার্ল্ড লোকটা বলল, তোমার চোখে গেঁথে দেবে একটা ডাল ব্যবহার। আমার লোকটাকে একদম পছন্দ হয়নি।'

'মারা গেছে, সোনামণি। তুমি ওকে খুন করেছ।'

'ভালো।' বলে চোখ মুদল লরা।

মেয়েটার ঠান্ডা হাত নিজের হাতে নিল শ্যাডো, বসে রইল চুপচাপ। অনেকক্ষণ পর আবার চোখ খুলল লরা।

'আমাকে আবার জীবিত করার উপায় খুঁজে পেয়েছ?' জানতে চাইল ও।

'বলতে পারো। অন্তত একটা উপায় আমি জানি।'

'খুব ভালো,' আলতো করে চাপ দিল লরা শ্যাডোর হাতে। 'আর উল্টোটা চাই যদি?'

'উল্টোটা?'

'হ্যাঁ,' ফিসফিস করে বলল লরা। 'আমার মনে হয়, ওটা এখন আমার প্রাপ্য।'

'আমি যে চাই না।'

কিছুই বলল না লরা, অপেক্ষা করল চুপ করে।

অনেকক্ষণ পর শ্যাডো বলল, 'ঠিক আছে।' মেয়েটার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রাখল তার ঘাড়ে।

'এই না হলে আমার স্বামী।' গর্ব খেলে গেল লরার কণ্ঠে।

'ভালোবাসি, সোনামণি।' বলল শ্যাডো।

'আমিও, পাপি।' লরার উত্তর।

মেয়েটার ঘাড়ের সাথে ঝুলতে থাকা সোনালী পয়সা আঁকড়ে ধরল শ্যাডো। শক্ত করে টান দিতেই ছিঁড়ে গেল মালা। সোনালি কয়েনটা তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলির মাঝে নিয়ে ফুঁ দিতেই, উধাও হয়ে গেল ওটা।

এখনও খোলা আছে লরার চোখ দুটো, কিন্তু নড়ছে না।

নিচু হয়ে ঠান্ডা গালে চুমু গেল শ্যাডো, কিন্তু লরার তরফ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। দেখা যাবে, তেমনটা আশাও করেনি শ্যাডো। উঠে দাঁড়িয়ে গুহামুখের দিকে এগিয়ে গেল ও।

ঝড় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাতাস তাজা আর পরিষ্কার।

আগামীকাল, কোন সন্দেহ নেই, ভাবল শ্যাডো। দারুণ এক দিন হতে চলেছে।

পর্ব চার

মৃতরা লুকিয়ে রেখেছে...

অধ্যায় উনিশ

একটা গল্পের সেরা ব্যাখ্যা সেই গল্পটা নিজেই। যেভাবে কেউ নিজে গল্পটা পড়ে আর সারা বিশ্বকে তা শোনায়-তারচেয়ে ভালোভাবে সেটাকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। বলতে গেলে এতে তৈরি হয় একটা ভারসাম্য। একটা মানচিত্রের কথা ধরা যাক। একটা এলাকার মানচিত্র যত ওই এলাকাটার মতো হয়, তত বেশি নিখুঁত হতে থাকে। তাই বলা যায়, সবচাইতে নিখুঁত মানচিত্র আসলে ওই এলাকাটাই। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, মানচিত্রের দরকার কী?

তাই গল্প হচ্ছে মানচিত্র, যেটা আসলে ওই এলাকাটাই।

এটা মনে রাখতে হবে।

-মি. আইবিসের লেখা থেকে

আই-৭৫ রাস্তা ধরে ফ্লোরিডার দিকে যাচ্ছে ওরা দুজন। সেই সকাল থেকে গাড়ি চালাচ্ছে শ্যাডো, প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছে ন্যান্সি। মাঝে মাঝে চেহারা কুঁচকে উঠছে তার, তারপরও গাড়ি চালাবার প্রস্তাব দিয়েছে কয়েকবার। প্রত্যেকবারই মানা করে দিয়েছে শ্যাডো।

'তুমি কি খুশি?' একেবারে আচমকা জানতে চাইল মি. ন্যান্সি। অনেকক্ষণ ধরে শ্যাডোর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল সে।

'খুব একটা না,' জানাল শ্যাডো। 'তবে বেঁচে আছি যে এখনও, তাই হয়তো...'

'মানে?'

''মৃত্যুর আগে কাউকে সুখী বলার ভুল করো না,' হেরোডেটাসের বাণী।'

সাদা ভ্রূ কুঁচকে ফেলল মি. ন্যান্সি। 'আমি এখনও মারা যাইনি, কিন্তু আমি তো দারুণ সুখী।'

'হেরোডেটাসের কথার অর্থ এই না যে মৃত মানেই সুখী।' বলল শ্যাডো। 'এর অর্থ, কেউ মারা না যাওয়া পর্যন্ত তার জীবন নিয়ে পর্যালোচনা চলে না।'

'আমি তো মারা যাবার পরেও কারও জীবন নিয়ে পর্যালোচনা করি না।' জানাল মি. ন্যান্সি। 'আর তাছাড়া সুখের অনেক প্রকারভেদ আছে, ঠিক যেমন আছে মৃত্যুর। আমি খাও, দাও, ফুর্তি করো নীতিতে বিশ্বাসী।'

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল শ্যাডো। 'মৃত আর আহতদের নিতে আসা হেলিকপ্টারগুলো...'

'হুম, কী?'

'ওগুলো পাঠায় কে? কোত্থেকে আসে?'

'ওসব নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। ধরে নিতে পারো, হেলিকপ্টারগুলো ভ্যালকিরি অথবা শকুনের মতো। ওদের আসতেই হবে, তাই আসে।'

'আপনি যা বলেন।'

'মৃত আর আহতদের যত্ন নেয়া হবে। সামনের কয়েকমাস খুব ব্যস্ত সময় কাটবে জ্যাকুয়েলের। যাই হোক, একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো বাছা।'

'বলুন।'

'এসব থেকে কিছু শিখেছ?'

শ্রাগ করল শ্যাডো। 'জানি না। গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় যা যা শিখেছিলাম, তার অধিকাংশই ভুলে গিয়েছি। যতদূর মনে হয়, সম্ভবত কয়েকজনের সাথে দেখা হয়েছিল। কিন্তু নিশ্চিত নই। অনেকটা এমন কোনো স্বপ্নের মতো, যা মানুষের মাঝে পরিবর্তন নিয়ে আসে। স্বপ্নের কিছু অংশ মনে থাকে, কিছু অংশ অবচেতন মন স্মরণে রাখে। কিন্তু বিস্তারিত কিছুই স্মরণে থাকে না।'

'ঠিক বলেছ,' একমত বলো মি. ন্যান্সি। 'তুমি আসলে অতোটা বোকাও নও।'

'হয়তো না,' বলল শ্যাডো। 'কিন্তু জেল থেকে বের হবার পর, মনে হচ্ছে যেন সবকিছু খুইয়ে বসেছি।'

'অথবা,' মি. ন্যান্সি। 'অনেক কিছুই তোমার সাথে আছে। তুমি বুঝতে পারছ না।'

'মনে হয় না।'

সীমানা পার হয়ে ফ্লোরিডায় প্রবেশ করল ওরা। একদম প্রথমেই একটা তাল গাছ দেখতে পেল শ্যাডো। কে জানে, হয়তো ইচ্ছা করেই ওটা সেখানে লাগানো হয়েছে। যেন সবাই বুঝতে পারে, ফ্লোরিডার শুরু ওখান থেকে।

নাক ডাকাতে শুরু করল মি. ন্যান্সি। লোকটার দিকে তাকাল শ্যাডো। বৃদ্ধকে আজ স্বাভাবিকের চাইতেও বেশি ধূসর দেখাচ্ছে, শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে তার।

শ্যাডোর মনে হলো, লড়াই করতে গিয়ে ফুসফুসে চোট পায়নি তো বেচারা? ঐদিও চিকিৎসা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে মি. ন্যান্সি।

ফ্লোরিডাকে ভাবনার চাইতে একটু বেশিই বড় বলে মনে হলো শ্যাডোর। অনেক রাতে ফোর্ট পিয়ার্সের বাইরে একটা ছোট, এক-তলা কাঠের বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল ও। বিগত পাঁচটা মাইল ন্যান্সি শ্যাডোকে পথ বলে দিয়েছে। এবার রাতটা ওর সাথে কাটাবার আমন্ত্রণ জানাল।

'মোটেল আছে, রুম পাওয়া যাবে।' বলল শ্যাডো। 'অসুবিধা নেই।'

'আমি কষ্ট পাব তাতে। তবে কিছু বলব না, বুঝতেই পারছ।' মি. ন্যান্সি জানাল। 'তার চাইতে ভালো হয় আজ রাত এখানেই থাকলে।'

ঘরের ভেতরে ঢুকে, জানালা খুলে দিল মি. ন্যান্সি। সোদা আর স্যাঁতস্যাঁতে একটা গন্ধ বাড়ির ভেতরে, সেই সাথে হালকা একটা মিষ্টি গন্ধও আছে। শ্যাডো মনে হচ্ছিল, এই বাড়িতে বোধ হয় কুকি বিস্কুটের ভূত আস্তানা গেড়েছে!

রাজি হলো শ্যাডো, তবে অনীহার সাথে। আরও অনীহার সাথে মি. ন্যান্সির সঙ্গী হয়ে এগিয়ে গেল রাস্তার শেষ মাথায় অবস্থিত বারে। রাতে ঘুমাবার আগে একটা ড্রিঙ্ক দরকার।

'চেরনোবোগকে দেখেছ?' জানতে চাইল মি. ন্যান্সি। রাতের বাতাসে পোকা উড়ে বেড়াচ্ছে। মাটিতেও আছে অনেকগুলো। একটা সিগারেল্লো ধরাল মি. ন্যান্সি, টান দিয়েই কাশতে শুরু করল। তবে ফেলল না জিনিসটা।

'গুহা থেকে যখন বেরোই, তখন ছিলেন না।'

'ঘরে চলে গেছে মনে হয়, তোমার জন্য অপেক্ষা করছে কিন্তু।'

'জানি।'

আর কোন কথা না বলে বারে এসে পৌছাল ওরা।

'প্রথম দুইটা বিয়ারের দাম আমি দেব।' বলল মি. ন্যান্সি।

'দুইটা? আমরা তো একটা বিয়ার পান করতে এসেছি!' শ্যাডো অবাক।

'কঞ্জুসি করছ কেন?' ঠাট্টার ছলে জানতে চাইলেন মি. ন্যান্সি।

প্রথম দুটো কিনলেন মি. ন্যান্সি, পরেরবার শ্যাডো। আতঙ্ক নিয়ে লক্ষ্য করল, মি. ন্যান্সি বারম্যানকে ক্যারিওকি চালু করার জন্য রাজি করে ফেলেছেন! তবে বৃদ্ধ লোকটার গানের গলা ভালো। শুনে মজাই পেল ও। বারে বেশি লোকজন ছিল না। যারা ছিল, তারাও হাততালি দিয়ে অভিবাদন জানাল মি. ন্যান্সিকে।

বারে যখন ফিরে এসেছে সে, তখন তার চেহারা থেকে অসুস্থ ভাবটা অনেকটাই কেটে গিয়েছে। ত্বকের ধূসর ভাবটাও আর নেই। 'এবার তোমার পালা।' বলল বৃদ্ধ।

'অসম্ভব।' সরাসরি মানা করে দিল শ্যাডো।

কিন্তু মি. ন্যান্সি সে কথা শুনলে তো। বিয়ারের অর্ডার দিয়ে ইতিমধ্যেই শ্যাডোর হাতে ধরিয়ে দিয়েছে একগাদা প্রিন্ট করা কাগজ। 'যে গানটা জানো, সেটাই বেছে নাও।'

'ভালো হচ্ছে না কিন্তু,' বলল শ্যাডো। ওর দুনিয়াটা আস্তে আস্তে কাঁপতে শুরু করেছে, তর্ক করার শক্তি পাচ্ছে না। মি. ন্যান্সি আক্ষরিক অর্থেই ঠেলে ওকে তুলে দিল স্টেজে। একটা গানের প্রথম কয়েকটা শব্দ গাইল শ্যাডো। কেউ ওর দিকে কিছু ছুঁড়ে মারছে না দেখে সাহস পেল কিছুটা। এরপর উৎসাহ নিয়ে শেষ করল পুরো গান।

কাউচটা দেখিয়ে দিলেন মি. ন্যান্সি, শ্যাডোর আকারের তুলনায় ছোটই ওটা। তাই ও ঠিক করল, মেঝেতে শোবে। কিন্তু সিদ্ধান্তটা পুরোপুরিভাবে নেয়ার আগেই, ঘুমের অতলে হারিয়ে গেল।

প্রথম কিছুক্ষণ আরামদায়ক অন্ধকারে কেটে গেল শ্যাডোর। তারপর শুরু হলো স্বপ্ন। অন্ধকারে দেখা গেল জ্বলন্ত একটা অগ্নিকুণ্ড। আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে গেল শ্যাডো।

'ভালো কাজ দেখিয়েছ,' ঠোঁট না নাড়িয়েই বলল মহিষ-মানব।

'কী যে করেছি, তা তো নিজেই বুঝতে পারছি না!' জানাল শ্যাডো।

'শান্তি স্থাপন করেছ।' মহিষ-মানব জানাল। 'আমাদের শব্দগুলো নিয়ে নিজের বাক্য সাজিয়েছ তুমি। ওই দেবতারা এখানে কেন এসেছে, তা-ই বুঝতে পারেনি কখনও। ওদের যারা উপাসনা করে বা করেছে, তারাও পারেনি। ওরা এখানে এসেছে, কারণ ওদের উপস্থিতি আমাদের দরকার ছিল। তবে চাইলে এখনও আমরা আমাদের মন পরিবর্তন করতে পারি। কে জানে, হয়তো করবও।'

'তুমি কি দেবতা?' জানতে চাইল শ্যাডো।

মাথা নাড়ল মহিষ-মানব। শ্যাডোর মনে হলো, ওর প্রশ্নে সে বোধ হয় আমোদ পেয়েছে। 'আমিই এই দেশ।' উত্তর দিল মহিষ-মানব।

হয়তো স্বপ্নটা সেখানে শেষ হয়ে গিয়েছিল, হয়তো আরও কিছু দেখেছিল শ্যাডো। কিন্তু ওর আর মনে নেই।

সকালে যখন ঘুম থেকে ওঠে, তখন মাথাটা প্রচন্ড ধরেছে শ্যাডোর। চোখের পেছনে কেউ যেন দুম দুম করে বসাচ্ছে হাতুড়ির ঘা।

মি. ন্যান্সি উঠেছে আরও আগেই, সকালের নাস্তা বানিয়েও ফেলেছে সে। প্যানকেকের স্তূপ, বেকন, ডিম আর কফি সাজিয়ে অপেক্ষা করছে। আহত বলে মনে হচ্ছে না তাকে।

'মাথা ব্যথা করছে।' জানাল শ্যাডো।

'পেট পুরে নাস্তা খাও, নিজেকে নতুন একজন মানুষ বলে মনে হবে।'

'নতুন মানুষ হতে হবে না, আগের মানুষটাকে দিয়েই কাজ চলবে। শুধু নতুন একটা মাথা দরকার।'

'খাও।'

খেল শ্যাডো।

'কেমন লাগছে এখন?'

'মাথা ব্যথা আছে, সেই সাথে পেট ভরে আছে খাবারে। মনে হচ্ছে সব উঠে আসবে।'

'আমার সাথে এসো।' শ্যাডো যে কাউচে ঘুমিয়েছে, তার পাশেই কম্বল দিয়ে ঢাকা রয়েছে একটা ট্রাঙ্ক। কালো কাঠের তৈরি জিনিসটাকে দেখে গুপ্তধনের বাক্স বলে মনে হয়। পেল্লাই একটা তালা ঝুলছে সামনে। মি. ন্যান্সি ওটাকে খুলে, ডালা উপরে ধরল। ভেতরে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে আরও কয়েকটা বাক্স। ওগুলোর ভেতরে কী যেন খুঁজতে শুরু করল সে। 'প্রাচীন এক আফ্রিকান ওষুধ। উইলো ছাল আর কী কী গুঁড়ো করে বানান হয়েছে।'

'অ্যাসপিরিনের মতো?'

'হ্যাঁ।' বলল মি. ন্যান্সি। 'একদম অ্যাসপিরিনের মতো।' বলতে বলতেই জিনিসটা খুঁজে পেল সে। বের করে আনল একটা অ্যাসপিরিনের বোতল। ওটার ভেতর থেকে কয়েকটা পিল বের করে এগিয়ে দিল। 'এই নাও।'

'ট্রাঙ্কটা সুন্দর।' বলল শ্যাডো। তেতো পিলগুলো হাতে নিয়ে গিলে ফেলল।

'আমার ছেলে পাঠিয়েছে,' জানাল মি. ন্যান্সি। 'ছেলেটা ভালো। তবে আরও বেশি দেখা-সাক্ষাত হলে খুশি হতাম।'

'আমি ওয়েনসডের অভাব বোধ করি।' স্বীকার করল শ্যাডো। 'এতকিছু হওয়া সত্ত্বেও মনে হয়, এই বুঝি এলেন তিনি।' এক দৃষ্টিতে ট্রাঙ্কের দিকে তাকিয়ে রইল শ্যাডো।

'তুমি ওয়েনসডের অভাব বোধ কর? এতকিছুর পরেও!'

'হ্যাঁ।' বলল শ্যাডো। 'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়? তিনি ফিরে আসবেন?'

'আমার মনে হয়,' বলল মি. ন্যান্সি। 'যেখানেই দুই প্রতারক এক হয়ে অন্য একজনের কাছে বিশ ডলারের ভায়োলিন দশ হাজার ডলারে বেচার চেষ্টা করবে, সেখানেই উপস্থিত থাকবে লোকটা।'

'কিন্তু-'

'রান্নাঘরে যাই, চলো।' শক্ত মুখে বলল মি. ন্যান্সি। 'ধোয়া-মোছা করতে হবে।'

ধোয়ার কাজ সারল মি. ন্যান্সি, মোছারটা শ্যাডো। আস্তে আস্তে কমতে শুরু করেছে মাথা ব্যথা। কাজ শেষে বসার ঘরে ফিরে এলো তারা।

পুরনো ট্রাঙ্কটার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল শ্যাডো, কীসের কথা যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে ওটা। 'চেরনোবোগের কাছে না গেলে,' বলল সে। 'কী হবে?'

'যেতে তোমাকে হবেই,' সরাসরি বলল মি. ন্যান্সি। 'হয়তো সে তোমাকে খুঁজে বের করবে। হয়তো নিজের কাছে টেনে নেবে তোমাকে। তবে দেখা তোমাদের হবেই হবে।'

নড করল শ্যাডো। আচমকা যেন সবকিছু ওর কাছে পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। এক স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। 'আচ্ছা,' জানতে চাইল ও। 'হাতি-মাথা বিশিষ্ট কোন দেবতা আছে?'

'গণেশের কথা বলছ? হিন্দুদের দেবতা। যাত্রাপথ থেকে প্রতিবন্ধকতা সরায়, রান্নাও ভালোই করে।'

আচমকা চোখ তুলে চাইল শ্যাডো। 'ট্রাঙ্কে আছে!' বলল সে। 'বুঝতে পেরেছি। তখন ধরেছিলাম, গণেশ তার শুঁড়ের কথা বলেছে, অথবা গাছের ট্রাঙ্ক, মানে কাণ্ডের কথা। কিন্তু ওর কথার উদ্দেশ্য তা ছিল না, তাই না?'

ভ্রূ কুঁচকে ফেললেন মি. ন্যান্সি। 'বুঝতে পারছি না।'

'ট্রাঙ্কে আছে,' সত্যটা উপলব্ধি করতে পারছে শ্যাডো। শুধু উপলব্ধি না, নিশ্চিত!

উঠে দাঁড়াল ও। 'আমার যেতে হবে, এখুনি।'

'তাড়াহুড়ো কীসের?'

'বরফ গলতে শুরু করেছে যে।' কেবল এতটুকুই বলল শ্যাডো।

অধ্যায় বিশ

ভাড়া করা গাড়িটা নিয়ে যখন বন থেকে বের হলো শ্যাডো, তখনও ঘড়িতে সকাল সাড়ে আটটা বাজে। ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইল গতিতে চলছে গাড়ি, তিন সপ্তাহ আগে চিরতরে ছেড়ে আসছে বলে ভাবা শহরটায় আবার প্রবেশ করল ও।

শহরের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এগোল সে, বিগত কয়েক সপ্তাহে জায়গাটার কোন পরিবর্তন আসেনি বললেই চলে। হ্রদের দিকে চলে গিয়েছে যে রাস্তাটা, সেটার মাঝামাঝি এসে গাড়ি পার্ক করল শ্যাডো, নেমে পড়ল বাহনটা থেকে।

জমাট বদ্ধ লেকের উপরে এখন আর মাছ-শিকারিদের ভিড় নেই। আশেপাশে নেই কোন এস.ইউ.ভি.। হ্রদটা যেন রূপ পরিবর্তন করেছে, এতদিন সাদা সাজে সেজেছিল। এখন বরফের উপরে পানির স্তর জমেছে, নিচেও আছে পানি। কালচে রঙটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পাতলা বরফের আস্তরণের নিচে। ধূসর আকাশের নিচে প্রায় বিরান হ্রদটা।

প্রায় বিরান...

একটা মাত্র গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে বরফের উপরে, ব্রিজের প্রায় সরাসরি নিচে পার্ক করা আছে ওটা। শহরে যেই প্রবেশ করুক না কেন, ওটা দেখতে পাবেই। রঙটা সবুজ, ময়লাটে। এই ধরনের গাড়ি সাধারণত পার্কিং-লটে ফেলে যায় মানুষ, আর কখনও নিতে আসে না। ভেতরে ইঞ্জিন নেই ওটার, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে বরফের উপরে। ওটা কখন ডুবে যাবে, তারই অপেক্ষা করছে সারা শহর।

রাস্তাটার মাঝখানে একটা চেইন দিয়ে দর্শনার্থীদের সাবধান করে দেয়া হয়েছে। বরফে পাতলা-লেখা সাইনবোর্ড ঝুলছে একটা ওটার সাথে। তার নিচে হাতে আঁকা ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটা গাড়ি, একজন মানুষ আর একটা স্নো-মোবিলের ছবি।। বোঝানো হচ্ছে, এদের কেউ যেন ভুলেও নিকটবর্তী না হয়।

সাবধানবাণী উপেক্ষা করে এগিয়ে গেল শ্যাডো। পিচ্ছিল হয়ে আছে পথটা। বরফ এরইমধ্যে গলতে শুরু করেছে। কাদা-কাদা হয়ে আছে মাটি। বাদামি ঘাস বলতে গেলে কোন সাহায্যই করছে না। সাবধানে এগিয়ে গেল ও, পথ থেকে নেমে পা রাখল বরফে।

বরফের উপরে পানির একটা হালকা আস্তরণ, সেটাও বরফগলা পানিই। উপর থেকে দেখে গলিত বরফকে যতটা গভীর মনে হয়েছিল, পা রেখে বোঝা গেল যে গভীরতা তার চাইতেও বেশি। পানির স্তর জমেছে বলে স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশি পিচ্ছিল হয়ে আছে বরফ স্তর। হাঁটতে বেশ কষ্টই হচ্ছে শ্যাডোর। ঠান্ডা পানিতে বারবার ভিজে যাচ্ছে ওর বুট আর বুটের ফিতা। যেখানে যেখানে পানির সাথে স্পর্শ লাগছে চামড়ার, জমে যাচ্ছে যেন। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে ওর। মনে হচ্ছে নিজেকেই বুঝি দেখছে দূর থেকে। যে কোন ছবির নায়ক ও, কোন এক দুঁদে গোয়েন্দা!

ক্ল্যাংকারের দিকে এগিয়ে গেল শ্যাডো। বুঝতে পারছে, যেকোন সময় বরফ ভেঙে যেতে পারে। এই পানিতে একবার পড়লে আর দেখতে হবে না, জমে যাবে একেবারে সাথে সাথেই। তবুও এগোতে থাকল ও। বরফ আগের চাইতেও অনেক বেশি পিচ্ছিল হয়ে আছে, কয়েকবার তো আছাড়ই খেল বেচারা।

রাস্তা থেকে যতটা মনে হচ্ছিল, ক্ল্যাংকারটা এখন তার চাইতেও বেশি দূরে বলে মনে হচ্ছে। হ্রদের দক্ষিণ দিক থেকে বরফ ভাঙার আওয়াজ ভেসে এলো। সেই সাথে তাল মিলিয়ে যেন গুঙিয়ে উঠল এদিককার বরফও। তারপরও এগিয়ে চলল শ্যাডো।

আত্মহত্যা করবে নাকি? ওর সুস্থ মস্তিষ্ক প্রশ্ন করে উঠল। *বাদ দাও না।*

'না,' নিজেকেই শোনাল সে। 'আমার জানতেই হবে।'

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর ক্ল্যাংকারের কাছে এসে পৌঁছল শ্যাডো। অবশ্য আগেই বুঝে গিয়েছে, ভুল হয়নি ওর। গাড়িটাকে ঘিরে ধরে আছে কেমন একটা অশুভ বাতাস, সেই সাথে বাজে একটা হালকা গন্ধ। গাড়িটার পেছনে চলে গেল ও। ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখে, সিটগুলোও খুলে ফেলা হয়েছে। দরজা খোলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হতে হলো। এবার নজর দিল ট্রাঙ্কের দিকে। ওটাও বন্ধ।

একটা ক্রো-বার আনলে মন্দ হতো না, ভাবল ও।

গ্লাভসের ভেতরেই হাত মুঠো করল শ্যাডো, এক-দুই-তিন গুণে ড্রাইভারের দিকের জানালার কাছে ঘুষি বসিয়ে দিল।

হাতে ব্যথা পেল বেশ, কিন্তু জানালার কিছু হলো না।

একবার ভাবল, দৌড়ে এসে লাথি হাঁকায়। তবে কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। দৌড়াতে গিয়ে আছাড় খাবার সম্ভাবনাই বেশি। আর তাছাড়া বেশি নড়াচড়া করতে গেলে ক্ল্যাংকার বরফ ভেঙে ডুবেও যেতে পারে।

গাড়িটার দিকে ভালোমতো তাকাল শ্যাডো, তারপর হাত বাড়িয়ে খুলে নিল রেডিও অ্যান্টেনাটা। পুরনো দিনের গাড়ি, অ্যান্টেনাটা সামনেই। উপরে ওঠানো

আর নিচে নামানো যায়। তবে এই ক্ষেত্রে ওটা অনেকদিন হলো আটকে আছে এক জায়গায়। চাপ দিয়ে গোড়া থেকে ভেঙে নিল ওটাকে শ্যাডো। পাতলা মাথাটা ব্যবহার করে কাজ চালাবার মতো হুক বানাল একটা। সামনের জানালার ফাঁক ফলিয়ে ওটা ব্যবহার করে খুলে ফেলল দরজা। তবে একেবারে সহজ হলো না কাজটা, বার কয়েক চেষ্টার পর সফল হলো সে। দরজার লক খুলে হাত দিল হ্যান্ডেলে। কিন্তু না, খুলল না তা-ও।

নিশ্চয় বরফে জমে গিয়েছে দরজা।

শক্ত করে টান দিল এবার, কয়েকবার টানাটানি করতেই আচমকা খুলে এলো ওটা। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল বরফ।

অশুভ বাতাসটা গাড়ির ভেতরে আরও বেশি। রোগ আর পচনের গন্ধ বাতাসে, অসুস্থ বোধ করল শ্যাডো।

ড্যাশবোর্ডের নিচে হাত গলিয়ে কালো প্লাস্টিকের হ্যান্ডেলটা খুঁজে পেল ও, ওটা ব্যবহার করেই খুলতে হয় ট্রাঙ্ক। শক্ত করে টান দিল সে।

শব্দ করে খুলে গেল ট্রাঙ্ক।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে পেছন দিকে গেল শ্যাডো, পিছলা খেল এবারও। তবে গাড়ির দেহ ধরে সামলে নিল নিজেকে।

ট্রাঙ্কে আছে ওটা। ভাবল শ্যাডো।

এক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে আছে ট্রাঙ্ক। পুরোটা খুলল সে।

বাজে গন্ধ বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। তবে গন্ধটা আরও বাজে হতে পারত। ট্রাঙ্কের নিচটা এক ইঞ্চি মতো অর্ধ-গলিত বরফে ভরা বলেই হয়তো হলো না। একটা মেয়ে শুয়ে আছে ট্রাঙ্কে। তার পরনে লাল জামা। চুলগুলো বড় বড়, মুখ বন্ধ। তাই নীল রিবনগুলো দেখতে পাচ্ছে না শ্যাডো। তবে ওগুলো যে আছে জায়গা মতো, তা জানে। শীতে সংরক্ষিত হয়েছে মেয়েটার লাশ!

বড় বড় চোখগুলো যেন দেখছে শ্যাডোকে। মৃত্যুর সময় কাঁদছিল মেয়েটা। অশ্রু জমাট বেঁধে আছে গালে। এখনও গলতে শুরু করেনি।

'এখানেই ছিলে তুমি!' অ্যালিসন ম্যাকগভার্নের লাশকে উদ্দেশ করে বলল শ্যাডো। 'ব্রিজের উপর দিয়ে যাওয়া প্রত্যেক মানুষ দেখেছে তোমাকে। মাছ শিকারিরা হেঁটে গিয়েছে তোমার পাশ দিয়ে, অথচ কেউ জানত না!'

কথাটা উচ্চারণ করার সাথে সাথে ভুলটা ধরতে পারল ও।

একজন জানত। একদম শুরু থেকেই জানত।

সে-ই এখানে রেখে গিয়েছে লাশটা।

ট্রাঙ্কের ভেতর হাত গলিয়ে দিল শ্যাডো, অ্যালিসনকে বের করে আনতে চায়। ভেতরে একটু উবু হতে হলো ওকে, তাই শরীরের ভার গিয়ে পড়ল গাড়িতে। সেটাই হলো কাল।

সামনের চাকার নিচের বরফে ধরল ভাঙন, মুহূর্তের মাঝে কয়েক ফুট নিচে তলিয়ে গেল চাকাটা। খোলা দরজা দিয়ে হু হু করে ভেতরে ঢুকতে শুরু করল পানি। শক্ত বরফে দাঁড়িয়ে আছে ও, তবুও গোড়ালি পর্যন্ত পানি উঠে এলো নিমিষে। ভয়ার্ত চোখে চারপাশে তাকাল শ্যাডো, সরে যেতে হবে। কিন্তু পারল না, ভেঙে গেল বরফ। ট্রাঙ্কে থাকা অ্যালিসনের লাশ, গাড়ি আর শ্যাডো-সবাই পড়ে গেল পানিতে। দিনটা মার্চ মাসের তেইশ তারিখ, সময় নয়টা বেজে দশ।

পানিতে ডুবে যাবার আগে বুক ভরে শ্বাস নিতে পেরেছে শ্যাডো। চোখ বন্ধ করে ফেলল ও, কিন্তু হ্রদের পানির শীতলতা যেন এক ধাক্কায় ওর দেহ থেকে সব অক্সিজেন বের করে আনল!

ট্রাঙ্কের সাথে আটকে গিয়েছে ও, গাড়ির ওজনে ভারী পাথরের মতো টুপ করে তলিয়ে যেতে লাগল বেচারা।

হ্রদের বরফের নিচে আছে সে এখন, অন্ধকার আর শীত ঘিরে ধরেছে চারদিক থেকে। জামা-কাপড়, গ্লাভ, বুট-এসব ওজন বাড়ানো ছাড়া আর কিছুই করছে না। প্রতি মুহূর্তে বেড়েই চলছে ওগুলো ওজন।

তলাচ্ছে তো তলাচ্ছেই শ্যাডো, গাড়িটা থেকে দূরে সরে যেতে চাইল সে। কিন্তু যন্ত্রটা যেন আলিঙ্গন করে রেখেছে ওকে, সরতে দেবে না। আচমকা উপলব্ধি করতে পারল, হ্রদের একদম তলদেশে এসে পৌঁছেছে ও। বাঁ পায়ের গোড়ালি আটকা পড়েছে গাড়ির তলে।

ভয় পুরোপুরি গ্রাস করে নিল শ্যাডোকে।

চোখ খুলল যুবক, যদিও জানে যে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নজরে আসবে না।

তারপরও কেন যেন পরিষ্কার দেখতে পেল সব কিছু। দেখতে পেল ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে তাকিয়ে থাকা অ্যালিসন ম্যাকগভার্নের সাদা চেহারা। দেখতে পেল বিগত বছরের ক্ল্যাংকারগুলোও। হ্রদের মাটিতে কবর হয়ে আছে ওগুলোর।

প্রতিটার ট্রাঙ্কে যে একটা করে বাচ্চার লাশ আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই শ্যাডোর। সংখ্যায় ওগুলো অনেক। সারা দুনিয়ার সামনে চুপচাপ শুয়ে রয়েছে হ্রদের পানিতে!

এখানে খুঁজলেই পাওয়া যাবে লেমি হাউটালাকে। পাওয়া যাবে জেসি লোভাট, স্যান্ডি ওলসেন আর জো মিংকে। সারা লিন্ডকুইস্টও আছে এখানেই কোথাও। ঠান্ডা আর নিশ্চুপ পরিবেশে বিশ্রাম নিচ্ছে তারা...

বাঁ পাটা টানল শ্যাডো, কিন্তু না। এখনও আটকা পড়ে আছে। ফুসফুসের চাপটা আর সহ্য হচ্ছে না। অক্সিজেনের অভাবে কানে ব্যথা করতে শুরু করেছে। অল্প শ্বাস ছাড়ল ও, চেহারাটা ঢেকে গেল বুদবুদে।

দ্রুতই, ভাবল ও। আমাকে শ্বাস নিতে হবে।

নিচু হয়ে দুই হাত ক্ল্যাংকারটার বাম্পারে রাখল শ্যাডো, এরপর ঠেলতে শুরু করল সর্বশক্তিতে।

কিছুই হলো না।

গাড়ির খোলস বই কিছু নয় এটা, নিজেকে শোনাল ও। ইঞ্জিন নেই, ওটাই তো গাড়ির সবচেয়ে ভারী অংশ। আরেকবার চেষ্টা করো, পারবে।

আবার ঠেলা দিল শ্যাডো।

আস্তে আস্তে, একেকবারে এক ইঞ্চির ভগ্নাংশ পরিমাণ সরতে শুরু করল গাড়িটা। বাঁ পাটা বের করে আনতে সক্ষম হলো শ্যাডো। লাথি মেরে ভেসে ওঠার প্রয়াস পেল ও, কিন্তু নড়ল না এক বিন্দু। কোটটা, ভাবল সে। কোথাও আটকে গিয়েছে মনে হয়। অবশ হতে শুরু করা আঙুলগুলো জিপারে ছোঁয়াল যুবক, আপ্রাণ চেষ্টায় গা থেকে খুলে ফেলল কোটটা। মুক্ত হওয়া মাত্র গাড়ির কাছ থেকে সরে এলো সে।

উপরে উঠছে, না নিচে যাচ্ছে-তা টের পাচ্ছে না বেচারা। শুধু বুকে বোধ করছে তীব্র ব্যথা। মস্তিষ্ক সেই ব্যথা সহ্য করতে জানাচ্ছে অস্বীকৃতি। বুঝতে পারছে, আর কিছুক্ষণের মাঝেই শ্বাস নেবে ও। বুক ভরে যাবে ঠান্ডা পানিতে। মারা যাবে সাথে সাথে। যখন আর পারছে না, ঠিক তখন শক্ত কিছু একটার সাথে বাড়ি গেল মাথা।

বরফ। পানির উপরের স্তরে অবস্থিত বরফের সাথে ঠোকর খেয়েছে ওর মাথা। হাত মুঠো করে বরফে ঘুষি বসাল শ্যাডো, ভাঙার চেষ্টা করছে। কিন্তু হাতগুলোতে যে শক্তি নেই, পায়ের নিচে নেই শক্ত কোন অবলম্বন যে ঠেলে দেবে।

হাস্যকর মৃত্যু হতে যাচ্ছে আমার। ভাবল শ্যাডো।

আস্তে আস্তে সয়ে আসতে শুরু করছে শীতলতা। মারা যে যাচ্ছে তা বুঝতে পারল সে। এবারের উপলব্ধির সাথে মিশ্র রয়েছে রাগ। তীব্র ব্যথা আর রাগকে

শক্তি বানিয়ে শেষ বারের মতো চেষ্টা করল ও। ভেবেছিল, হাত দুটো বুঝি আর নাড়াতে পারবে না। কিন্তু না, পারল সে।

হাত দিয়ে ধাক্কা দিল শ্যাডো; টের পেল, বরফের একটা প্রান্ত উপরে উঠতে শুরু করছে। পরক্ষণেই বাতাসের স্পর্শ অনুভব করল হাতে। খাবলে ধরার চেষ্টা করল কিছু একটা, ঠিক সেই মুহূর্তে কেউ একজন আঁকড়ে ধরল ওর হাত। টেনে তুলল ওকে।

উঠতে গিয়ে মাথা বাড়ি খেল বরফের সাথে, চেহারা হয়ে গেল ক্ষত-বিক্ষত। পানির উপরে ওঠার পর দেখতে পেল, বরফের ভেতরে একটা গর্ত করে উঠে আসতে পেরেছে। প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত শ্বাস নেয়া ছাড়া অবশ্য আর কোন চিন্তা রইল না ওর মাথায়। চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না বলে মনে হচ্ছে, কেবল দিনের উজ্জ্বল আলো বাদে। কেউ একজন টানছে ওকে, পানির উপর উঠিয়ে আনছে। জমে মারা যাবে বা এই জাতীয় কিছু একটা বলল সেই কেউ একজন। হাচড়ে-পাচড়ে উঠে এলো শ্যাডো, কাশছে প্রচন্ডভাবে। সেই সাথে কাঁপছেও।

নাক, মুখ-সব দিয়েই একসাথে শ্বাস নেবার প্রয়াস পাচ্ছে ও। শুয়ে আছে বরফের উপর। বুঝতে পারছে, ভাববার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। কিছুক্ষণ পর আর শ্বাসও টানতে পারবে না।

'আমাকে এখানেই রেখে যাও,' বলার চেষ্টা করল সে। 'আমি ঠিক আছি।'

আসলেই তো তাই, একটু বিশ্রাম নিতে হবে। তারপর আবার উঠে দাঁড়িয়ে কাজে যাবে ও। বরফের উপর তো আর চিরটাকাল শুয়ে থাকতে পারবে না।

কেউ একজন ঝাঁকাচ্ছে শ্যাডোকে, বুকে দিচ্ছে পানির ঝাপটা। মাথাটা একটু উঁচু করে ধরে আছে সেই কেউ একজন। শ্যাডো টের পেল, বরফের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে। বাঁধা দেবার প্রয়াস পেল সে, বলতে চাইল-একটু বিশ্রাম নিতে দেয়া হচ্ছে না কেন? তাহলেই তো ঠিক হয়ে যাবে সব কিছু!

ঘুমিয়ে পড়েছে বলে মনে হলো না ওর। কিন্তু একটা বিশাল সমভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল নিজেকে। মহিষের মাথা আর কাঁধ বিশিষ্ট এক লোক দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, শকুন-মাথার এক মহিলাও আছে। দুই জনের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে হুইস্কি জ্যাক। ওর দিকে তাকিয়ে আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে উল্টো দিকে হাঁটা ধরল হুইস্কি জ্যাক। মহিষ-মানব শক্তি হলো তার। কিছুক্ষণ হাঁটল মেয়ে থান্ডারবার্ডটাও। তারপর উড়াল দিল আকাশে।

বুকটা যেন খালি হয়ে গিয়েছে শ্যাডোর। ওই তিনজনকে ডাকার প্রয়াস পেল ও, হতাশ না হবার অনুরোধ জানাল মনে মনে। কিন্তু পরক্ষণেই তরল হয়ে গেল দৃশ্যটা। চলে গেল সমভূমি, উধাও হলো হারিয়ে ফেলার বেদনা।

শূন্যতা গ্রাস করে নিল সবকিছুকে।

এমন তীব্র ব্যথা এর আগে কখনওই অনুভব করেনি শ্যাডো। ওর দেহের প্রতিটা কোষ, প্রতিটা স্নায়ু যেন গলে যাচ্ছে। নিজেদের উপস্থিতির প্রমাণ দিতে চাইছে তারা প্রচন্ড ব্যথার জন্ম দিয়ে।

ওর চুল ধরে আছে একটা হাত, আরেকটা হাত ওর থুতনির নিচে। চোখ খুলে চাইল যুবক, হাসপাতালে আছে বলে মনে হচ্ছে।

পা খালি শ্যাডোর, তবে পরনে এখনও জিন্সের প্যান্টটা আছে। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। বাতাস ঘোলা, বাষ্প ভাসছে। সামনের দেয়ালে একটা আয়না ঝুলছে, তার নিচেই একটা ছোট বেসিন। তাতে একটা নীল টুথব্রাশ বসে আছে।

আস্তে আস্তে দৃশ্যটার অর্থ ঢুকতে শুরু করছে ওর মাথায়।

জ্বলছে ওর আঙুল...জ্বলছে ওর পা।

ব্যথার চোটে কোঁকাতে শুরু করল বেচারা।

'আস্তে মাইক, আস্তে।' পরিচিত একটা কণ্ঠ নির্দেশ দিল।

'কী?' বলল শ্যাডো, অন্তত বলার চেষ্টা করল। 'হচ্ছে কী এখানে?' নিজের কানেই অপরিচিত শোনাল নিজের কণ্ঠ।

একটা বাথটাবে শুয়ে আছে এখন। পানিটা গরম, একদম গলা পর্যন্ত ডুবে আছে ও।

'জমতে বসা কোন লোককে আগুনের সামনে বসাবার মতো বোকামি আর হয় না। আরেকটা বোকার মতো কাজ হলো কম্বল দিয়ে তাকে আবৃত করে রাখা। কম্বল তাপ কু-পরিবাহী, না তাপ আসতে দেয়। আর না যেতে। আর আমার মতে তৃতীয় প্রকার বোকামি হলো তার দেহের সব রক্ত বের করে নিয়ে আবার গরম করে তারই শরীরে প্রবেশ করানো। আজকালকার ডাক্তাররা অবশ্য তা-ই করে। অর্থ, শ্রম আর সময়ের কি নিদারুণ অপচয়!' শ্যাডোর মাথার উপরে আর পেছন থেকে ভেসে এলো কণ্ঠটা।

'সবচেয়ে বুদ্ধিমানের মতো কাজ হলো, এরকম মানুষকে গরম পানির ভেতর চুবিয়ে রাখা। খুব গরম না, কুসুম গরম। ভালো কথা, তুমি কিন্তু মারাই গিয়েছিলে হ্রদে। এখন কেমন বোধ করছেন, হুডিনি সাহেব?'

'ব্যথা,' জানাল শ্যাডো। 'সারা দেহ ব্যথায় যেন চিৎকার করছে। আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।'

'হয়তো বাঁচিয়েছি। যাই হোক, এখন নিজে নিজে মাথা পানির উপরে তুলে রাখতে পারবে?'

'আশা করি।'

'আমি ছেড়ে দিচ্ছি, ভয় নেই। ডুবে যেতে শুরু করল আবার ধরব।'

হাতের চাপ কমে গেল ওর মাথা থেকে।

শ্যাডো টের পেল, ওর দেহটা টাবের সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দুই হাত বাড়িয়ে টাবটাকে আঁকড়ে ধরল সে। বাথরুমটা ছোট, বাথটাবটা ধাতব। এনামেলের অবস্থা ভালো না, আঁচড়ের দাগ অনেক।

এক বৃদ্ধ লোক ওর দৃষ্টির সীমার মাঝে চলে এলো আচমকা। দুশ্চিন্তা খেলা করছে বয়স্ক চেহারাটায়।

'এখন ভালো লাগছে?' জানতে চাইলেন হিনজেলমান। 'বিশ্রাম নাও। যখন কিছুটা সুস্থ বোধ করবে, তখন জানিও। একটা রোব ব্যবস্থা করে রেখেছি। ঠিক আছে তো মাইক?'

'ওটা আমার নাম না।'

'তুমি যা বলো,' অস্বস্তি খেলে গেল বৃদ্ধের চেহারায়।

কতটা সময় বসে ছিল বাথটাবে, সে ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই শ্যাডোর। ব্যথা বন্ধ হওয়া আর হাতে-পায়ে পুরোপুরি সাড় না ফেরা পর্যন্ত সেভাবেই বসে রইল ও। এরপর হিনজেলমানের সাহায্যে উঠে দাঁড়াল, বাথটাবের পাশে বসে দুজনের মিলিত প্রচেষ্টায় খুলে আনল জিন্সটা।

হিনজেলমানের এগিয়ে দেয়া রোবটা ছোটই হলো দেহে, তবে ওর আপত্তি করার প্রশ্নই ওঠে না। বৃদ্ধ লোকটার উপর ভর দিয়ে চলে এলো বসার ঘরে, গা এলিয়ে দিল একটা প্রাচীন সোফায়। ক্লান্ত, দুর্বল আর নিঃশেষিত মনে হচ্ছে নিজেকে। দেয়াল থেকে বেশ অনেকগুলো হরিণের মাথা আশ্চর্য চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

শ্যাডোর জিন্স নিয়ে উধাও হয়ে গেলেন হিনজেলমান। এর কিছুক্ষণের মাঝেই পাশের ঘর থেকে ড্রায়ারের ঘটাঘট শুনতে পেল শ্যাডো। ধূমায়িত একটা মগ নিয়ে তারও কিছুক্ষণ পর ভেতরে প্রবেশ করলেন বৃদ্ধ।

'কফি এনেছে।' বললেন তিনি। 'ভেতরে একটু মদও দিয়েছি, আগে যেমন দিতাম আমরা। এখনকার ডাক্তাররা অবশ্য মানা করে কাজটা করতে।'

দুই হাতে মগটাকে আঁকড়ে ধরল শ্যাডো। 'ধন্যবাদ।'

‘বন্ধুদের আবার ধন্যবাদ দেবার দরকার কী?’ বললেন হিনজেলমান। ‘একদিন তুমি আমার জীবন বাঁচাবে, দেখো!’

কফিতে চুমুক দিল শ্যাডো। ‘আমি তো ভেবেছিলাম যে মারা গিয়েছি।’

‘তোমার কপাল ভালো, আমি ব্রিজের উপরেই ছিলাম। কেন যেন মনে হচ্ছিল যে আজকেই ডুববে ক্ল্যাংকারটা। আমার মতো বয়স হলে বুঝতে পারবে, কী বোঝাতে চাইছি। যাই হোক, একটা পকেট ঘড়ি নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম ব্রিজের উপর। দেখি, তুমি ক্ল্যাংকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ! গলা ফাটিয়ে ডাকলাম তোমাকে, শোননি মনে হয়। গাড়িটাকে পানিতে তলিয়ে যেতে দেখে চলে গেলাম অকুস্থলে। ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম, জানো? প্রায় দুই মিনিট পানির নিচে ছিলে তুমি...’ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন তিনি। ‘তোমার কপাল ভালো যে আমাদের দুজনের ওজনে বরফ আবার নতুন করে ভেঙে যায়নি।’

মাথা নেড়ে সায় জানাল শ্যাডো।

‘অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।’ হিনজেলমানকে বলল সে। বৃদ্ধ লোকটার চেহারা যেন একশ ওয়াটের বাতির মতো জ্বলে উঠল!

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে ভাবতে শুরু করল শ্যাডো। আস্তে আস্তে চিন্তা করার ক্ষমতাটা ফিরে আসছে বলে মনে হচ্ছে। আচমকা অনেকগুলো প্রশ্ন জেগে উঠল ওর মনে।

এক বৃদ্ধ লোক, যে কিনা লম্বায় ওর অর্ধেক আর ওজনে ওর এক-তৃতীয়াংশের সমানও হবে না, ওকে টেনে আনলেন কী করে? অজ্ঞান শ্যাডোকে বরফের উপর দিয়ে টেনে ওকে শুধু বাড়িতেই আনেননি, বাথটাবেও শুইয়ে দিয়েছেন।

আগুনের কাছে গিয়ে একটা পাতলা কাঠ গুঁজে দিলেন হিনজেলমান।

‘কী করছিলাম জানতে চাইলেন না?’

উত্তরে শ্রাগ করলেন হিনজেলমান। ‘আমার জেনে কাজ নেই।’

‘একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না...’ বলল শ্যাডো। একটু ইতস্তত করে ভাবনাটুকু গুছিয়ে নিল। ‘আমার জীবন বাঁচাতে গেলেন কেন আপনি?’

‘আমাকে এভাবেই বড় করা হয়েছে।’ বললেন হিনজেলমান। ‘কাউকে বিপদগ্রস্ত দেখলে আমি-’

‘না,’ ওকে থামিয়ে দিল শ্যাডো। ‘আমি সেটা জানতে চাইনি। প্রতি শীতে আপনি একজন করে বাচ্চাকে খুন করেন। একমাত্র আমিই সেটা ধরতে পেরেছি। আপনি নিশ্চয় আমাকে ট্রাঙ্ক খুলতে দেখেছিলেন। তাহলে ডুবে মরতে দিলেন না কেন?’

মাথা কাত করলেন হিনজেলমান। ভাবুক ভঙ্গিতে নাক চুলকালেন কিছুক্ষণ। 'হুম,' অবশেষে বললেন তিনি। 'ভালো একটা প্রশ্ন করেছ। বলতে পারো, আমি একজনের কাছে ঋণী ছিলাম। সেই ঋণ শোধ করলাম।'

'ওয়েনসডের কাছে?'

'হ্যাঁ।'

'বিশেষ একটা কারণে আমাকে লেকসাইডে নিয়ে এসেছিলেন তিনি, তাই না? এখানে কেউ আমাকে খুঁজে পেত না। যদি না...'

হিনজেলমান চুপ করে রইলেন। দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা একটা পোকার-দন্ড তুলে নিয়ে খোঁচাতে শুরু করলেন ফায়ারপ্লেসের আগুন। 'এই শহর আমার বাড়ি।' দুষ্টুমি ভরা কণ্ঠে বললেন তিনি। 'জায়গাটা ভালো।'

কফি শেষ করল শ্যাডো। কাপটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল সে। এইটুকু কাজ করতেই যেন সব শক্তি ফুরিয়ে গেল বেচারার। 'কতদিন হলো এখানে আছেন আপনি?'

'অনেকদিন হলো।'

'হ্রদটা আপনিই বানিয়েছেন?'

অবাক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন হিনজেলমান। 'হ্যাঁ, আমিই বানিয়েছি। যেটাকে আজকে সবাই হ্রদ বলছে, সেটা তখন ছোট্ট একটা ঝর্ণা আর একটা ডোবা পুকুর ছিল কেবল।' একটু বিরতি নিলেন তিনি। 'আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এই দেশটা আমাদের জন্য উর্বর নয়। গিলে খেয়ে নেবে। আমি কারও খাবার হতে চাইনি। তাই একটা চুক্তি করলাম। আমি ওদেরকে দিলাম একটা হ্রদ...দিলাম সমৃদ্ধি...'

'বিনিময়ে নিলেন প্রতি শীতে একটা করে বাচ্চা?'

'সবগুলোই ভালো বাচ্চা,' জানালেন হিনজেলমান। 'যাকে পছন্দ হয়, কেবল তাকেই নেই আমি। শুধু সেই ১৯২৪...নয়তো ১৯২৫ সালে চার্লি নেলিগানকে গিয়েছিলাম। ছেলেটা বড় বদ ছিল। যাই হোক, তোমার প্রশ্নের উত্তর দেই। হ্যাঁ, সেরকমই চুক্তি হয়েছিল।'

'এই শহরের বর্তমান অধিবাসী,' জানতে চাইল শ্যাডো। 'ম্যাবেল, মার্গারিতা, চ্যাড-এরা জানে?'

হিনজেলমান কিছুই বললেন না। আগুনের ভেতর থেকে পোকারটা বের করে আনলেন তিনি। দন্ডটার প্রথম ছয় ইঞ্চি কমলা বর্ণ ধারণ করেছে। শ্যাডো জানে, প্রচন্ড গরম হয়ে আছে ওটা। কিন্তু হিনজেলমানের অসুবিধা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। আরও কিছুক্ষণ আগুন খুঁচিয়ে দন্ডটাকে ওখানেই রেখে দিলেন তিনি।

'ওরা জানে যে ভালো একটা জায়গায় বাস করছে। জানে যে এই কাউন্টির অন্য সব শহর...এমনকি এই স্টেটের অন্য সব শহর ধুঁকছে এখন। এসব ওরা জানে...বোঝে।'

'তার কৃতিত্ব যে পুরোটাই আপনার, সেটা জানে?'

'এই শহর,' বললেন হিনজেলমান। 'আমার খুব কাছের। আমি না চাইলে এখানে কিছুই হয় না। বুঝতে পেরেছ? আমি না চাইলে কেউ পা রাখতেও পারবে না শহরে। এজন্যই তোমার পিতা তোমাকে এখানে পাঠিয়েছিলেন।'

'আপনি তো তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন!'

'আমি করিনি! তোমার পিতা প্রতারক ছিল, কিন্তু আমি আমার ঋণ পইপই করে শোধ করি।'

'আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না।' জানাল শ্যাডো।

হিনজেলমানকে আহত দেখাল। কপাল ঘষতে শুরু করলেন তিনি। 'আমি কথা দিলে কথা রাখি।'

'আমার ক্ষেত্রে রাখেননি। লরা এসেছিল এখানে। বলছিল, কেউ বা কিছু একটা যেন ওকে ডেকে এনেছে। আর স্যাম ব্ল্যাক ক্রো ও অড্রি বার্টনের একই রাতে শহরে উপস্থিত থাকাকে আপনি কাকতালীয় বলবেন?'

'স্যাম ব্ল্যাক ক্রো আর অড্রি বার্টন। আমার আসল পরিচয় জানত এই দুইজন। এ-ও জানত, আমার পেছনে লোক লেগেছে। একজন ব্যর্থ হলেও, আরেকজন তো কাজে আসবে-এটাই ভেবেছিলেন নিশ্চয়ই? নইলে আর কাকে কাকে লেকসাইডে আনতেন, হিনজেলমান? আমার জেলের ওয়ার্ডেনকে? নাকি লরার মাকে?' শ্যাডো টের পেল, রেগে উঠতে শুরু করেছে ও। 'আপনি আমাকে শহর থেকে তাড়াতে চাইছিলেন। কিন্তু ওয়েনসডেকে রাগাতে চাননি।'

আগুনের আলোয় গার্গয়েলের মতো দেখাচ্ছে হিনজেলমানকে। 'শহরটা ভালো।' বললেন তিনি, চেহারায় হাসির আভাস মাত্র নেই। 'তুমি অনেক বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করছিলে। লেকসাইডের জন্য সেটা ভালো হতো না।'

'আপনার আসলে আমাকে বরফে রেখে আসা উচিৎ ছিল।' বলল শ্যাডো। 'ক্ল্যাংকারের ট্রাঙ্কটা আমি খুলেছি। এই মুহূর্তে ওখানে জমে শুয়ে আছে অ্যালিসন। কিন্তু বরফ গলতে শুরু করবে। অচিরেই ভেসে উঠবে লাশটা। তখন অনুসন্ধান শুরু হবে। বাকিদের লাশ খুঁজে পাওয়া তো এরপর কেবল সময়ের ব্যাপার।'

পোকারটা তুলে নিলেন হিনজেলমান, আগুন খোঁচাবার ভান ধরলেন না আর। এখন দন্ডটাকে তলোয়ারের মতো করে ধরে আছেন। ওটার কমলা আগা

বাতাসে শীষ কাটছে, ধোঁয়াও বেরচ্ছে। প্রায় নগ্ন, ক্লান্ত দেহটাকে যে সময়মতো নাড়াতে পারবে না, সেটা জানে শ্যাডো। তারপরও চেষ্টা করল। 'আমাকে খুন করতে চান?' প্রশ্ন করল ও। 'করে ফেলুন, এমনিতেও আমি মৃত একজন মানুষ। আপনি যে এই শহরের হর্তা-কর্তা-বিধাতা, তা আমি জানি। তবে ঘুণাক্ষরেও ভাববেন না যে আমাকে কেউ খুঁজতে আসবে না। আপনার স্বপ্নের পৃথিবী ভেঙে পড়তে শুরু করেছে, হিনজেলমান।'

উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ, পোকারের দন্ডটাকে ছড়ির মতো করে ব্যবহার করছেন। কার্পেট থেকে ধোঁয়া বেরতে শুরু করল তার ফলে। শ্যাডোর দিকে অশ্রু-সজল চোখে তাকিয়ে বললেন, 'আমি ভালোবাসি লেকসাইডকে। ভালোবাসি টেসিকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে, বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলতে।' দন্ডটার উত্তপ্ত আগা দিয়ে শ্যাডোর দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। এক ফুট দূর থেকেও সেই উত্তাপ টের পাচ্ছে ও।

'চাইলেই আমি তোমাকে খুন করতে পারি।' বললেন হিনজেলমান। 'ঠিক করে ফেলতে পারি সব। আগেও করেছি। তোমার আগেও অনেকে আমার রহস্য ধরতে পেরেছিল। চ্যাড মুলিগান বাবাও তাদের একজন। তাঁকে সামলেছি, তোমাকেও সামলাতে পারব।'

'তা হয়তো পারবেন,' বলল শ্যাডো। 'কিন্তু আর কতদিন চলবে এভাবে, হিনজেলমান? এক বছর? দশ বছর? এখন কম্পিউটারের যুগ। মানুষ আর বোকা নেই। প্রতি বছর একজন করে বাচ্চা উধাও হয়ে যাচ্ছে, সেটা কর্তৃপক্ষ ঠিক ধরে ফেলবে। আগে হোক বা পরে, গন্ধ শুঁকে শুঁকে তারা চলে আসবেই। আচ্ছা, বয়স কতো আপনার? বলুন তো।' সোফার কুশনটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে আছে শ্যাডো, দরকার হলেই মাথার উপর ধরবে। অন্তত প্রথম আঘাতটা তো এড়ান যাবে এতে।

হিনজেলমানের চেহারা নিঃস্পৃহ। 'রোমানরা ব্ল্যাক ফরেস্টে আসার আগে থেকেই বাচ্চাদের ভেট হিসেবে পেয়ে আসছি আমি। কোবোল্ড হবার আগে দেবতা ছিলাম।'

'যথেষ্ট হয়নি কি?' কোবোল্ড কী, জানে না শ্যাডো।

সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকাল হিনজেলমান। পোকারটা হাতে নিয়ে আবার ঠেলে দিল আগুনে। 'ব্যাপারটা এতো সহজ নয়। তোমাকে কে বলল যে চাইলেই আমি এই শহর ছেড়ে চলে যেতে পারি? আমি এই শহরেরই একটা অংশ। আমাকে সরিয়ে দিতে চাও, শ্যাডো? খুন করবে? আমাকে মুক্তি দিবে এই শহর থেকে?'

মেঝের দিকে তাকাল শ্যাডো। কার্পেট থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে। হিনজেলমান ওর দৃষ্টি অনুসরণ করলেন, পা দিয়ে নিভিয়ে দিলেন ওখানকার অঙ্গার। শ্যাডোর মনে হলো, একশও বেশি বাচ্চা যেন ওর দিকে ঘৃণা আর হতাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে।

ওদেরকে যে হতাশ করছে, তা বুঝতে পারছে শ্যাডো। কিন্তু কী করবে তা বুঝতে পারছে না। 'নাহ্, আমি আপনাকে খুন করতে পারব না। আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।'

এখন আর নিজেকে সিনেমার নায়ক বা কোন দুঁদে গোয়েন্দা বলে মনে হচ্ছে না তার। মনে হচ্ছে ব্যর্থ কোন মানুষ সে।

'একটা গোপন কথা শুনতে চাও?' আচমকা প্রশ্ন করলেন হিনজেলমান।

'অবশ্যই।' বলল শ্যাডো, গোপন কিছুই এখন আর ভালো লাগে না ওর।

'এই দেখ।'

হিনজেলমান যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখানে পর মুহূর্তেই দেখা গেল একটা বাচ্চাকে। ছেলে বাচ্চাটার বয়স টেনে-টুনে পাঁচ বছর হবে। তার চেহারা বাদামী, লম্বা। একেবারে নগ্ন সে, কেবল গলায় একটা চামড়ার ব্যান্ড পরে আছে। দুটো তলোয়ার বিঁধে আছে তার দেহে, একটা বুক ভেদ করে চলে গিয়েছে। অন্যটা কাঁধ দিয়ে ঢুকেছে, বের হয়েছে অন্য পাশের পাঁজরের নিচ থেকে। এখনও রক্ত ঝরছে দুই ক্ষত থেকে, যদিও তলোয়ার দুটো জং ধরা। অনেক পুরনো যে তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

শ্যাডোর দিকে তাকাল বাচ্চা, দু চোখে শুধু ব্যথা।

এভাবে খুব সহজেই জংলী গোত্ররা দেবতা বানাতে পারে, বুঝতে পারল শ্যাডো। কাউকে বলে দিতে হলো না।

একটা বাচ্চাকে আলাদা করে রাখতে হবে দীর্ঘদিনের জন্য। কাউকে দেখা করতে দেয়া যাবে না, কারও স্পর্শ যেন না পায় বাচ্চাটা-সেদিকে নজর রাখতে হবে। গ্রামের অন্য যেকারও চাইতে যেন খাবার বেশি পায় ও, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। যখন পাঁচটা শীত এসে বিদায় নেবে, যখন রাত দীর্ঘতম...তখন কোন এক রাতে বাচ্চাটাকে টেনে নিয়ে আসতে হবে বাইরে। অগ্নিকুন্ডের পাশে এনে লোহা আর তামার দুটো তলোয়ার ব্যবহার করে হত্যা করতে হবে তাকে। মৃতদেহটাকে কয়লার তাপ ব্যবহার করে একেবারে শুকিয়ে ফেলে জড়িয়ে ফেলতে হবে লোমাবৃত চামড়ায়। এক বসতি থেকে অন্য বসতিতে নিয়ে যাওয়া হবে লাশটা, তার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হবে অগণিত প্রাণী আর ছোট বাচ্চা। তাহলে অচিরেই সে পরিণত হবে গ্রাম আর গোত্রের সৌভাগ্যে। কিছুদিনের

মাঝেই যখন খসে পরতে শুরু করে মাংস, তখন হাড়গুলোকে রেখে দিতে হবে একটা বাক্সে। এরপর বাক্সটাই পরিণত হবে উপাসনার বস্তুতে। ওই ধরনের গোত্রগুলো অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, ভুলে যাওয়া হয়েছে বাচ্চা-দেবতাকে। এর ফলে সে পরিণত হয় এক কোবোল্ডে!

শ্যাডো ভাবল, আটলান্টিক পার হয়ে হিনজেলমানকে নিয়ে কে এসেছিল এই উইসকনসিনে?

পরক্ষণেই উধাও হয়ে গেল রক্তাক্ত বাচ্চা, সেই জায়গায় উপস্থিত হলো বৃদ্ধ লোকটা।

'হিনজেলমান?' দরজার কাছ থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এলো।

ঘুরে দাঁড়ালেন হিনজেলমান, সেই সাথে শ্যাডোও।

'তোমাকে বলতে এসেছিলাম যে,' চ্যাড মুলিগান বলল, কণ্ঠে ক্লান্তি। 'ক্ল্যাংকারটা বরফে ডুবে গিয়েছে।' হাতে একটা অস্ত্র ধরে আছে সে, তবে ওটার নল মেঝের দিকে।

'হাই, চ্যাড।' বলল শ্যাডো।

'হাই, মাইক।' উত্তরে বলল চ্যাড। 'আমাকে একটা নোট পাঠিয়ে জানানো হয়েছে, তুমি হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছ।'

'তাই নাকি! আমি তো দেখি নানা জায়গায়...নানা ভাবে মারা যাচ্ছি।'

'এদিকে এসো, চ্যাড।' আচমকা বলে উঠলেন হিনজেলমান। 'আমাকে মাইক হুমকি দিচ্ছে!'

'না,' জানাল চ্যাড। 'দিচ্ছে না। দশ মিনিট ধরে এখানেই দাঁড়িয়ে আছি আমি, হিনজেলমান। তোমার সব কথাই শুনেছি। আমার বাবার ব্যাপারে বলা কথা, হ্রদটার কথা।' ভেতরে চলে এলো পুলিশ অফিসার, তবে বন্দুক এখনও উঁচিয়ে ধরেনি। 'হায়, ঈশ্বর হিনজেলমান! হ্রদটা পুরো শহরের কেন্দ্রবিন্দু বলা চলে। এখন কী করব আমি?'

'মাইককে গ্রেফতার করো। আমাকে খুন করতে চাইছে ছেলেটা।' বললেন হিনজেলমান। 'তোমাকে এখানে দেখে ভয় কমে গিয়েছে।'

'নাহ,' আবারও বলল চ্যাড মুলিগান।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হিনজেলমান। নিচু হয়ে পোকারটা বের করে আনলেন তিনি।

'ওটা নামিয়ে রাখো, হিনজেলমান। আস্তে আস্তে, আর হাত দুটো উপরে তোল। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াও!'

বৃদ্ধ লোকটার চেহারায় নিখাদ ভয় ফুটে উঠল। শ্যাডোর আরেকটু হলে মায়াই হতো হিনজেলমানের জন্য, কিন্তু অ্যালিসন ম্যাকগভার্নের লাশের চেহারা মনে পড়ায় শক্ত হয়ে গেল সে। হিনজেলমান স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, পোকারটা এখনও ধরে আছেন তিনি। চ্যাডের কথা যেন শুনতেই পাননি। শ্যাডো আরেকটু হলেই হাত বাড়িয়ে পোকারটা নিয়ে নিত বৃদ্ধের হাত থেকে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই লোকটা পোকার-দন্ডটা ছুঁড়ে দিলেন মুলিগানের দিকে।

কিন্তু ছোঁড়াছুড়িতে সম্ভবত খুব একটা দক্ষ নন হিনজেলমান, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দন্ডটা ছুঁড়ে দিয়েই ছুটতে শুরু করলেন দরজার দিকে।

মুলিগানের বাঁ হাত স্পর্শ করে বেড়িয়ে গেল ওটা।

বৃদ্ধের ছোট ঘরটায় কান ফাটানো শোনাল বন্দুকের গর্জন।

একটা মাত্র গুলি ছোঁড়া হলো...

...আর দরকার হলো না।

মুলিগান বলল, 'তোমার পোশাক পরে নাও।' একঘেয়ে আর নিষ্প্রাণ শোনাল ওর কণ্ঠ।

নড করে সায় জানাল শ্যাডো, পাশের ঘরে গিয়ে ড্রায়ার থেকে বের করে আনল পোশাক। জিন্সগুলো এখনও ভেজা। কোটটা হ্রদের মেঝেতে পড়ে আছে, আর বুটগুলো খুঁজে পেল না। ওগুলো বাদে বাকি সব কিছু পরে নিল শ্যাডো। ততক্ষণে মুলিগান বেশ কয়েকটা জ্বলন্ত কাঠ ফায়ারপ্লেস থেকে বের করে এনেছে।

মুখ খুলল মুলিগান। 'পুলিশ হয়ে বেআইনিভাবে আগুন ধরানোটা কোন গর্বের কাজ না।' শ্যাডোর দিকে তাকাল সে। 'তোমার বুট দরকার।'

'কোথায় রেখেছে, জানি না।' জানাল শ্যাডো।

'ধুরো,' বলল মুলিগান। তারপর যোগ করল। 'আমি দুঃখিত, হিনজেলমান।' বৃদ্ধের লাশটার কলার আর বেল্ট ধরে ফায়ারপ্লেসে ছুঁড়ে দিল লাশটা। ধূসর চোখগুলো জ্বলতে শুরু করল পট পট করে, জ্বলন্ত মাংসের গন্ধে ভরে উঠল ঘর।

'খুন বলা যাবে না তোমার কাজটাকে, আত্মরক্ষাই বলতে হবে।'

'তা আমি জানি,' নিঃস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দিল মুলিগান। ওর নজর এখন ঘরের চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়া কাঠের দিকে। সোফার দিকে একটাকে ঠেলে দিল সে, এরপর দ্য লেকসাইড নিউজের একটা পুরাতন কপি নিয়ে কাঠের উপরে ফেলে দিল। কাগজে আগুন ধরতে বেশিক্ষণ লাগল না।

'বাইরে চলো।' কাজ শেষে বলল অফিসার।

বেরোবার পথে জানালাগুলো খুলে দিল সে, খালি পেয়ে হেঁটে বাইরে গিয়ে পুলিশের গাড়িতে উঠে বসল শ্যাডো। চ্যাড খুলে দেয়ায় সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে বসতে হলো ওকে। পা মুছে নিয়ে শুকিয়ে আসা মোজা পরে নিল সে।

'হেনিং'সের দোকান থেকে তোমার জন্য বুট কিনে নেয়া যাবে।'

'কতটুকু শুনেছ?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'যা শুনেছি, তা যথেষ্ট ।'

হেনিং-এর দোকানে যাওয়ার আগে আর কোন বাক্য-বিনিময় হলো না ওদের মাঝে। ওখানে পৌঁছাবার পর চ্যাড জানতে চাইল, 'তোমার পায়ের সাইজ কতো?'

শ্যাডো জানাল।

দোকানে ঢুকল মুলিগান। এক জোড়া মোটা উলের মোজা আর এক জোড়া বুট কিনে নিয়ে বেরিয়ে এলো সে। 'তোমার সাইজের আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। তাই এগুলোই আনতে বাধ্য হলাম।'

বুট আর মোজা পরে নিল শ্যাডো, মাপ ঠিকই আছে। 'ধন্যবাদ।'

'গাড়ি আছে সাথে?' জানতে চাইল মুলিগান।

'ব্রিজের কাছেই, রাস্তায় পার্ক করে রেখেছি।'

ইঞ্জিন চালু করল মুলিগান।

'অড্রির কী হলো?'

'তোমাকে নিয়ে যাবার একদিন পরের কথা।' মেয়েটা বলল, বন্ধু হিসেবেই কল্পনা করে আমাকে। প্রেমিক হিসেবে নয়। ঈগল পয়েন্টে চলে গেল তারপরেই, বলতে পারো-আমার হৃদয় ভেঙে!'

'হুম, বুঝতে পেরেছি।' জানাল শ্যাডো। 'তবে ব্যাপারটা আসলে তা না। হিনজেলমান তাকে চাননি।'

পথে পড়ল বৃদ্ধের বাড়ি, চিমনী দিয়ে পুরু সাদা ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

'অড্রি লেকসাইডে এসেছিল, কারণ হিনজেলমান ওকে চেয়েছিলেন। আমাকে শহর থেকে বের করে দেবার জন্য তার মেয়েটাকে দরকার ছিল।'

'আমার ধারণা ছিল, আমাকে পছন্দই করে অড্রি।'

শ্যাডোর ভাড়া করা গাড়ির কাছে চলে এসেছে ওরা। 'এখন কী করবে তুমি?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'জানি না।' মুলিগানের উত্তর। তবে লোকটার চেহারা প্রাণ ফিরে পাচ্ছে একটু একটু করে। সেই সাথে দুশ্চিন্তার ছায়াও ফুটে উঠেছে সেখানে। 'আমার সামনে মাত্র দুটো পথ খোলা আছে। হয়-' হাতের দুই আঙুল ব্যবহার করে পিস্তলের নল

বানাল ও, মুখের ভেতর পুরে দিল ওগুলো। পরক্ষণেই সরিয়ে যোগ করল, 'মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেব। আর নয়তো আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করব। বরফ গলে গেলে পায়ের সাথে কংক্রিটের একটা ব্লক বেঁধে লাফ দেব ব্রিজের উপর থেকে। আরেক পথ হিসেবে ঘুমের ওষুধও আছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

'তুমি হিনজেলমানকে খুন করোনি, চ্যাড। অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছিলেন তিনি। তা-ও এখান থেকে অনেক দূরের কোন এক জায়গায়।'

'কথাটা বলার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, মাইক। কিন্তু আমি ওকে খুন করেছি। ঠান্ডা মাথায় গুলি করেছি একজন মানুষকে, তারপর সেটা ধামা-চাপা দিয়েছি। যদি জানতে চাও কেন করলাম কাজটা, তাহলে বলতে পারব না।'

এক হাত বাড়িয়ে মুলিগানের হাতে আলতো করে চাপড় বসাল শ্যাডো। 'হিনজেলমান ছিলেন এই শহরের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। আমার মনে হয় না যে তুমি যা করেছ তা বুঝে-শুনেই করেছ। আমার ধারণা, তার ইচ্ছাতেই তুমি উপস্থিত ছিলে ওখানে। তার ইচ্ছাতেই শুনতে পেয়েছ সবকিছু। এসব তারই ইচ্ছা ছিল। এছাড়া এখান থেকে বেরোবার আর কোন উপায় ছিল না তার সামনে।'

মুলিগানের চেহারার পরিবর্তন হলো না এক বিন্দুও। শ্যাডো বুঝতে পারল, ওর কথা পুলিশ চীফের কানে ঢুকলেও মাথায় ঢোকেনি। লোকটা হিনজেলমানকে খুন করেছে, তারপর তার জন্য একটা চিতা সাজিয়েছে। এই বৃদ্ধের শেষ ইচ্ছা পূরণ করছে সে-আত্মহত্যার কথা ভাবছে!

চোখ বন্ধ করে ফেলল শ্যাডো। মনের ভেতর ফুটিয়ে তুলতে চাইল সেই অনুভূতিটা, যেটা বরফ নামাবার সময় ভর করে ছিল ওর ভেতরে, চ্যাডের মনে পাঠিয়ে দিতে চাইল অনুভূতিটুকু। 'চ্যাড, ভুলে যাও ব্যাপারটাকে।' লোকটার মনে মেঘ ভিড় করেছে, শ্যাডো যেন দেখতে পাচ্ছে ওটাকে। এবার কল্পনা করল, মেঘটা সরে যাচ্ছে। 'চ্যাড,' প্রবল কণ্ঠে বলল সে। 'এই শহরটা এখন পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে। মন খারাপ করা এলাকার মাঝে আশার আলো হয়ে ছিল এতদিন। এখন হতে চলেছে অন্য সবগুলোর মতো। ঝামেলা শুরু হবে অচিরেই। মানুষ-জন চাকরি হারাবে, শুরু হবে হাতাহাতি। গোলমাল-গন্ডগোল আসন্ন। দক্ষ কোন পুলিশ চীফ হাল না ধরলে, অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে অনেক।' কিছুক্ষণ বিরতি নিয়ে যোগ করল সে। 'মার্গারিতার দরকার হবে তোমাকে।'

আস্তে আস্তে হালকা হতে শুরু করেছে লোকটার মনের মেঘ, টের পাচ্ছে শ্যাডো। মার্গারিতা ওলসেনের ঘন কালো চোখ আর লম্বা চুল কল্পনা করল সে। তারপর সেই দৃশ্যটাকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেল চ্যাডের মনে। 'মার্গারিতা অপেক্ষা করছে তোমার জন্য,' কথাটা যে সত্যি সেটা নিজেও টের পাচ্ছে।

'মার্গি?' উচ্চারণ করল চ্যাড মুলিগান।

ঠিক সেই মুহূর্তে চ্যাডের মনের ভেতর প্রবেশ করল শ্যাডো। কীভাবে, তা বলতে পারবে না। মনে হয় না সেই কাজটা ভবিষ্যতে আর কোনদিন করতেও পারবে! বিকালের ঘটনাগুলো এক এক করে তুলে নিল ও, যেমন করে শকুন তুলে নেয় কোন মৃত প্রানির চোখ।

চ্যাডের কপাল থেকে মুছে গেল ভাঁজ, চোখের পাতা ফেলল সে।

'মার্গির সাথে দেখা করতে যাও,' আদেশ দিল যেন শ্যাডো। 'তোমাকে দেখে খুশি হলাম, চ্যাড। নিজের খেয়াল রেখো।'

'অবশ্যই,' হাই তুলল চ্যাড মুলিগান।

গাড়ির রেডিও কেশে উঠল খুক খুক করে, হ্যান্ডসেটের দিকে হাত বাড়াল চ্যাড। গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল শ্যাডো।

ভাড়া করা গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল সে, শহরের মাঝখানে অবস্থিত সমতল হ্রদের দিকে তাকিয়ে রইল। ওটার নিচে শুয়ে থাকা মৃত বাচ্চাদের কথা মনে পড়ে গেল তার।

দ্রুতই, অ্যালিসনের লাশ ভেসে উঠবে উপরে...

হিনজেলমানের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় সে খেয়াল করল, আগুন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। দূর থেকে ভেসে আসছে সাইরেনের আওয়াজ।

দক্ষিণে হাইওয়ে ৫১-এর দিকে রওনা দিল সে। আরেকজনের সাথে দেখা করা বাকি আছে। তবে তার আগে, ম্যাডিসনে থামতে হবে ওকে। বিদায় জানাতে হবে মেয়েটাকে।

সামান্থা ব্ল্যাক ক্রো'র সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে রাতের বেলা কফি হাউজের দরজা বন্ধ করার কাজ। মন একেবারে শান্ত হয়ে ওঠে তার। মনে হয় যেন দুনিয়াকে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে সাহায্য করছে এভাবে। প্রায়শই ইন্ডিগো গার্লসদের একটা সিডি বাজিয়ে নিজের মতো করে কাজ শুরু করে ও। প্রথমেই পরিষ্কার করে এসপ্রেসো মেশিন। তারপর শেষ একবার সবকিছু দেখে নেয়, রান্নাঘরে কোন কাপ বা থালা পড়ে আছে কিনা-সেটাও বাদ পড়ে না। সারাদিন

ধরে কফি হাউজে মানুষের ফেলে যাওয়া খবরের কাগজগুলো এক করে তুলে রাখে সদর দরজার সামনে।

জায়গাটাকে এক কথায় ভালোবাসে সামান্থা। পুরনো বইয়ের দোকানের সারির মাঝে একটা আলাদা পরিচিতি নিয়ে অবস্থিত ওটা।

চিযকেকের অবশিষ্ট স্লাইসগুলো ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখল ও, তারপর একটা কাপড় বের করে মুছে ফেলল ওগুলো রাখার ডিসপ্লে। একা একা থাকাটা উপভোগ করছে।

জানালায় হওয়া নকের আওয়াজটা বাস্তবে ফিরিয়ে আনল ওকে। দরজা খুলে ওরই বয়সী আরেক মেয়েকে ঢুকতে দিল ভেতর। মেয়েটার নাম ন্যাটালি।

'হ্যালো,' বলে স্যামকে গাল আর ঠোঁটের কোনায় চুমু খেল ন্যাটালি। এমন চুমু অনেক কিছু বুঝিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট। 'কাজ শেষ?'

'প্রায়।'

'সিনেমা দেখতে যাবে?'

'অবশ্যই। মিনিট পাঁচেক সময় দাও শুধু। দ্য অনিয়ন ম্যাগাজিনটা পড় নাহয়।'

'এই সপ্তাহেরটা আগেই পড়েছি।' দরজার কাছে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল ন্যাটালি। জমিয়ে রাখা খবরের কাগজগুলো থেকে একটা নিয়ে পড়তে শুরু করল। এদিকে স্যাম ব্যস্ত টাকা-পয়সা গুছিয়ে রাখার কাজে।

এক সপ্তাহ হলো প্রেম করছে দুজন। এই সম্পর্কটার জন্যই বুঝি সারাজীবন অপেক্ষা করছিল স্যাম। নিজেকে বোঝায়-ন্যাটালিকে দেখে খুশি হবার কারণ শুরু কিছু রাসায়নিক আর ফেরোমোন। হয়তো আসলেই ব্যাপারটা সত্যিই তাই। কিন্তু মেয়েটাকে দেখলেই যে ওর মুখে হাসি ফুটে ওঠে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'এই কাগজে আরেকটা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে,' বলল ন্যাটালি। 'আমেরিকা কি পরিবর্তনশীল?'

'কী লিখল।'

'তেমন কিছু লেখেনি। শুধু বলেছে, সম্ভবত হ্যাঁ। কিন্তু কীভাবে আর কোথায় হচ্ছে সেই পরিবর্তন, সেটা ধরতে পারছে না। হয়তো সত্যিকারে হচ্ছেই না।'

হাসল স্যাম। 'হুম, সব নৌকাতেই পা রাখছে আরকি!'

'তাই তো মনে হচ্ছে।' ভ্রূ কুঁচকে আবার খবরের কাগজে মন দিল ন্যাটালি।

'আমার মনে হয়, হচ্ছে।' মোছার কাপড়টা ভাঁজ করতে করতে বলল স্যাম। 'সরকারই কাজটা করুক বা অন্য কেউ, এখন সবকিছু আগের চাইতে ভালো

বলে মনে হয়। কে জানে, হয়ত লম্বা একটা শীতের পর বসন্ত আসতে শুরু করেছে বলে!'

'প্রবন্ধে লেখা,' একটু বিরতি দিয়ে বলল ন্যাটালি। 'অনেকেই নাকি রাতে অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখছে আজকাল। আমি অবশ্য অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি না।'

চারদিকে একবার নজর বুলিয়ে নিল স্যাম, কোন কিছু বাদ পড়ল কিনা! নাহ, ঠিকই আছে সব। অ্যাপ্রোন খুলে রান্নাঘরে ঝুলিয়ে রাখল ও, তারপর ফিরে এসে বাতি নেভাতে শুরু করল। 'আমি অবশ্য মাঝে মাঝে অদ্ভুত কিছু স্বপ্ন দেখি আজকাল। এতটাই অদ্ভুত যে একটা ডায়েরীতে লিখে রাখছি সব। ঘুম থেকে উঠেই লিখি, কিন্তু পরে যখন পড়ি তখন আর কিছু বুঝতে পারি না।'

রাস্তায় পরার কোট আর গ্লাভস দেহে-হাতে গলিয়ে নিল স্যাম।

'স্বপ্ন নিয়ে কিছু কাজ করেছিলাম একদা।' ন্যাটালি সবকিছু নিয়েই কাজ করেছে। অতিপ্রাকৃত থেকে শুরু করে ফেং-সুই আর জ্যাজ-কিছুই বাদ দেয়নি। 'বলো তো শুনি, হয়তো কিছু একটা ধরতে পারব।'

'বলছি।' দরজা খুলে অবশিষ্ট বাতিগুলোও নিভিয়ে দিল স্যাম। ন্যাটালিকে বের হতে দিয়ে তালা লাগাল কফি হাউজের দরজায়। 'মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখি, আকাশ থেকে মানুষ খসে পড়ছে, ঠিক তারার মতো। মাঝে মাঝে দেখি আমি পাতালপুরীতে, মহিষ-মানবীর সাথে কথা বলছি। মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখি গত মাসে চুমু খাওয়া এক ছেলেকে।'

ঘোঁত করে উঠল ন্যাটালি। 'আমাকে ওই ছেলের ব্যাপারে আর কিছু জানাতে চাও?'

'উহু। চুমুটা রোমান্টিক ধরনের কিছু ছিল না। ওখানে উপস্থিত না থাকলে বুঝতে পারবে না।'

ফুটপাতে শোনা যাচ্ছে ন্যাটালির পায়ের শব্দ। স্যাম হাঁটছে ওর পাশেই। 'ছেলেটার গাড়ি আমার কাছে আছে।'

'ওই বেগুনিটা?'

'হ্যাঁ।'

'কেন? এখন কই সে?'

'জানি না। হয়তো জেলে আছে, হয়তো মারা গিয়েছে।'

'মারা গিয়েছে?'

'আমার ধারণা,' একটু ইতস্তত করল স্যাম। 'কয়েক সপ্তাহ আগে পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম ছেলেটা মৃত। ইএসপির কারণে হয়তো। যাই হোক, আমি নিশ্চিত ছিলাম। এখন আর নিশ্চিত নই।'

'রেখে দেবে গাড়িটা?'

'অন্য কেউ এসে চাওয়ার আগ পর্যন্ত থাক। আমার মনে হয়, শ্যাডো তাই চাইত।'

স্যামের দিকে তাকাল ন্যাটালি। 'ওগুলো কোত্থেকে পেলে?'

'কোনগুলো?'

'ওই ফুলের তোড়া...যেগুলো তুমি ধরে আছ? তোমার হাতে এলো কোত্থেকে? কফি হাউজ থেকে নিয়ে বেরিয়েছ? তাহলে তো আমি দেখতে পেতাম!'

হাতের দিকে তাকাল স্যাম। হাসল তারপর, 'খুব দুষ্ট হয়েছ তুমি! আমার আসলে ধন্যবাদ জানান উচিৎ তোমাকে। দারুণ তোড়াটা, অনেক অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু লাল গোলাপ আনলেই আরও বেশি যুক্তিযুক্ত হতো না?'

ছয়টা সাদা গোলাপ দিয়ে বানানো একটা ফুলের তোড়া হাতে ধরে আছে সে।

'আমি দেইনি তোমাকে।' বলল ন্যাটালি। তারপর সিনেমা হলে পৌঁছাবার আগে দুজনের মাঝে আর কোন বাক্য-বিনিময় হলো না।

সে রাতে ঘরে ফিরে গোলাপগুলোকে একটা অস্থায়ী ফুলদানিতে রেখে দিল স্যাম। অন্য কাউকে ওগুলোর আসল গল্প শোনায়নি সে। তবে ক্যারোলাইন, যে ন্যাটালির পর এসেছিল ওর জীবনে, তাকে ভূতুড়ে তোড়ার গল্পটা বলেছিল। দুজনেই মাতাল হয়েছিল সে রাতে। ক্যারোলাইন একমত হয়েছিল যে গল্পটা আসলেই খুব রহস্যময়। কিন্তু সত্যিকার অর্থে তার একটা শব্দও মেয়েটা বিশ্বাস করেনি।

একটা পে-ফোনের পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়েছিল শ্যাডো। এরপর অপারেটরকে ফোন করে নিয়েছিল ওর নাম্বার।

তবে ওকে জানান হলো, এই মুহূর্তে সম্ভবত মেয়েটা বাড়িতে নেই। আছে কফি হাউজে।

যাবার পথে একটা ফুলের তোড়া নিয়েছিল শ্যাডো। কফি হাউজটাকে খুঁজে বের করতে কষ্ট হয়নি একদম। রাস্তার অপর পাশে একটা পুরাতন বইয়ের দোকানের সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল কিছুক্ষণ। দেখছিল তাকিয়ে তাকিয়ে।

দরজা বন্ধ হলো আটটায়। এর দশ মিনিট পর আরেক মেয়ের হাত ধরে রাস্তায় নেমে এলো স্যাম ব্ল্যাক ক্রো। কথা বলছিল দুজন। আসলে যা বলার তা বলছিল স্যামই। হাসছিল মেয়েটা।

রাস্তা পার হলো দুই মেয়ে। শ্যাডো যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তার সামনে দিয়েই হেঁটে গেল ওরা। স্যামের বান্ধবী হাঁটছিল সামনে সামনে। তাকিয়ে তাকিয়ে

দেখল শ্যাডো, ওর বুকের ভেতরে যেন কোন বীণা বিষণ্ন সুরে বাজতে শুরু করেছে।

চুমুটা দারুণ ছিল, ভাবল সে। কিন্তু স্যাম এখন যে নজরে তার বান্ধবীর দিকে তাকাচ্ছে, সেই নজরে যে কোনদিন ওর দিকে তাকাবে না, তা-ও পরিষ্কার।

'চুলোয় যাক দুনিয়া।' অস্ফুট কণ্ঠে বলল ও। 'আমাদের এল পাসো আর পেরুর স্মৃতি তো আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।'

দৌড়ে মেয়েটার পিছু নিল ও, কাছে গিয়ে ফুলের তোড়া গুঁজে দিল স্যামের হাতে। তারপর তাড়াতাড়ি সরে এলো, পাছে মেয়েটা নিতে অস্বীকার করে।

এরপর গাড়ির চড়ে রওনা দিল শিকাগোর দিকে। পুরো রাস্তা স্পিড লিমিটের একটু নিচে রাখল গতি।

আর একটা মাত্র কাজ করা বাকি আছে জীবনে।

তাড়াহুড়োর কিছু নেই।

রাতটা এক মোটেল সিক্সে কাটাল শ্যাডো। পরের দিন সকালে উঠে টের পেল, পরনের পোশাক থেকে দুর্গন্ধ আসছে। তবে গা না করে পরে নিল ওগুলোই। আর বেশিক্ষণ এসবের দরকার হবে না তার।

বিল চুকিয়ে চলে গেল বাদামী দালানটার দিকে। খুঁজে পেতে কষ্ট হলো না।

চুপচাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল ও। দ্রুতও না, আবার আস্তেও না। মৃত্যুর দিকে দৌড়ে যাবার কোন ইচ্ছা নেই ওর, আবার নিজের কাছে কাপুরুষ প্রতিপন্ন হতে চায় না। সিঁড়িটা পরিষ্কার করেছে কে যেন। ক্লোরিনের ঝাঁঝালো গন্ধ আসছে জায়গাটা থেকে।

সিঁড়ির একেবারে উপরে অবস্থিত লাল রঙ করা দরজা হাট করে খোলা। বাতাসে ভাসছে পুরাতন খাবারের গন্ধ। কিছুক্ষণ ইতস্তত করল শ্যাডো, তারপর ঘণ্টা বাজালো।

'আসছি!' চিৎকার করে জানালো এক নারী কণ্ঠ। বামনাকৃতির আর স্বর্ণকেশী যরিয়া উত্রেনেয়া রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো ওর দিকে, অ্যাপ্রোনে হাত মুছছে। মহিলাকে দেখে অন্যরকম লাগছে আজ, আনন্দিত বলে মনে হচ্ছে। গালগুলোতে রুজ লাগিয়েছে সে, চোখে কীসের যেন দীপ্তি। শ্যাডোকে দেখে হাঁ হয়ে গেল তার মুখ। 'শ্যাডো! তুমি আমাদের কাছে ফিরে এসেছ?' হাত বাড়িয়ে ওর দিকে এগিয়ে এলো সে। নিচু হয়ে মহিলাকে আলিঙ্গন করল করল। 'তোমাকে দেখে প্রীত হলাম!' জানাল যরিয়া উত্রেনেয়া। 'এবার পালাও!'

অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে পা রাখল শ্যাডো। সবগুলো দরজাই খোলা, কেবল যরিয়া পলুনোচনেয়ার ঘরেরটা বাদে। জানালাগুলোও খোলা, মৃদু বাতাস আসছে ভেতরে।

'পরিষ্কার করছেন নাকি?' জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ, অতিথি আসছে। এবার যাও। তবে যাবার আগে কফি খেয়ে যাও।'

'আমি চেরনোবোগের সাথে দেখা করতে এসেছি।' জানাল শ্যাডো। 'সময় হয়েছে।'

যরিয়া উত্রেনেয়া প্রবল বেগে মাথা নাড়ল। 'না, না। দেখা কোরো না ওর সাথে। বোকার মতো হবে কাজটা।'

'আমি জানি।' বলল শ্যাডো। 'তবে দেবতাদের সাথে ওঠা-বসা করে একটা ব্যাপার বুঝতে পেরেছি, চুক্তি চুক্তিই। ওরা নিজেদের ইচ্ছা-মতো চুক্তি ভাঙতে পারে। আমরা পারি না। আমি হাজার চেষ্টা করলেও পালাতে পারব না, আমার পা জোড়া ঘুরে-ফিরে এখানেই নিয়ে আসবে শেষ পর্যন্ত।'

নিচের ঠোঁট ফুলিয়ে বলল যরিয়া উত্রেনেয়া। 'তা সত্যি। কিন্তু আজকে যাও। কালকে এসো। তখন হয়তো চেরনোবোগ থাকবে না।'

'কে এসেছে?' করিডরের ওপাশ থেকে আরেকটা মহিলা কণ্ঠ ভেসে এলো। 'যরিয়া উত্রেনেয়া, কার সাথে কথা বলছ তুমি? আমি একা একা এই ম্যাট্রেস উল্টাতে পারব না তো!'

করিডর ধরে এগিয়ে গেল শ্যাডো। 'শুভ সকাল, যরিয়া ভেচেরনেয়া। আমি সাহায্য করি?' ওকে দেখে অবাক যরিয়া ভেচেরনেয়া হাত থেকে ফেলে দিল ম্যাট্রেস।

শোবার ঘরটা ধুলোয় ভর্তি। সবকিছু ঢেকে আছে ওতে। কাঠের আসবাব, গ্লাস-কিছুই বাকি নেই।

এই ঘরটার কথা মনে আছে ওর। যেবার এই অ্যাপার্টমেন্টে রাত কাটিয়েছিল, সেবার ওয়েনসডে ব্যবহার করেছিলেন ঘরটা। বিয়েলবোগের বেডরুম এটা!

অনিশ্চিত চোখে ওর দিকে তাকাল যরিয়া ভেচেরনেয়া। 'এই ম্যাট্রেসটা উল্টানো দরকার।'

'কোন অসুবিধা নেই।' বলে হাত বাড়াল শ্যাডো। বিনা আয়াসে উল্টে ফেলল।

'কেন এসেছ তুমি?' যরিয়া উত্রেনেয়ার কণ্ঠে বন্ধুত্বের ছাপ নেই কোন।

'আমি এসেছি,' শুরু করল শ্যাডো। 'কেননা গত ডিসেম্বরে এক যুবক চেকার্স খেলেছিল এক বৃদ্ধ দেবতার সাথে। সেই খেলায় পরাজয় হয়েছিল যুবকের।'

বৃদ্ধা মাথার উপরে খোঁপা করেছে। ঠোঁটে ঠোঁট চাপল মহিলা। 'আগামীকাল এসো, আজ যাও।'

'তা যে হবার নয়।'

'তাহলে মরো। যাও, ওই কোনায় চুপ করে বসে থাকো। যরিয়া উত্রেনেয়া কফি বানিয়ে দেবে তোমাকে। চেরনোবোগের আসতে বেশি বাকি নেই।'

বসার ঘরে ফিরে এলো শ্যাডো। যেমনটা আগেরবার দেখেছিল, তেমনটাই আছে ঘরটা। জানালা খোলা আছে কেবল। ধূসর বিড়াল ঘুমিয়ে আছে সোফার হাতলে। শ্যাডোর আগমন টের পেয়ে এক নজর কেবল তাকাল ও, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

এখানেই চেরনোবোগের সাথে চেকার্স খেলেছিল ও। এখানেই ধরেছিল নিজের জীবনের বাজি।

কিছুক্ষণ পর যরিয়া উত্রেনেয়া এসে ওকে এক কাপ কালো কফি দিয়ে গেল। সেই সাথে ছোট ছোট কয়েকটা চকলেট-চিপ কুকি।

'যরিয়া পলুনোচনেয়ার সাথে আরেকবার দেখা হয়েছিল আমার,' বলল সে। 'পাতালপুরীতে আমার সাথে দেখা করার জন্য এসেছিল ও। ওর জন্যই চাঁদের আলোতে পথটা দেখতে পেয়েছি। বিনিময়ে কিছু একটা নিয়েছে আমার কাছে, কিন্তু কী নিয়েছে তা মনে করতে পারছি না।'

'তোমাকে বেশ পছন্দই করে ও।' বলল যরিয়া উত্রেনেয়া। 'আমাদের সবাইকে রক্ষা করে। খুব সাহসী মেয়ে।'

'চেরনোবোগ কোথায়?'

'এই সব ধোয়া-মোছা নাকি ওর সহ্য হয় না। তাই বাইরে গিয়েছে। খবরের কাগজ আর সিগারেট কিনে নিশ্চয়ই কোন পার্কে গিয়ে বসবে। আজ আর ফিরবে বলে মনে হয় না। তোমার অপেক্ষা করার দরকার নেই। কাল এসো নাহয়।'

'আমি অপেক্ষা করব।' জানাল শ্যাডো। ওকে অপেক্ষা করার জন্য বাধ্য করছে না কোন জাদু। স্বেচ্ছায় কাজটা করছে সে। এটাই শেষ, এভাবেই সব কিছু শেষ হওয়া উচিৎ। এরপর আর কোন দায়বদ্ধতা রইবে না। রইবে না কোন রহস্য।

করিডর থেকে একটা গভীর পুরুষ-কণ্ঠ ভেসে এলো। সোজা হয়ে বসল শ্যাডো। হাত কাঁপছে না দেখে নিজের উপরেই সন্তুষ্ট হলো। খুলে গেল দরজা।

'শ্যাডো?'

'হাই।' বসে বসেই বলল শ্যাডো।

ঘরে প্রবেশ করল চেরনোবোগ। দ্য শিকাগো সান-টাইমসের একটা ভাঁজ করা কপি ধরে আছে হাতে। ওটা কফি টেবিলের উপর রেখে শ্যাডোর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। করমর্দন করল দুজন।

'আমি এসেছি,' জানাল শ্যাডো। 'আমাদের চুক্তি ছিল একটা। তুমি তোমার অংশ পালন করেছ, এবার আমি আমারটা করব।'

নড করল চেরনোবোগ। ভ্রূ কুঁচকে এসেছে। সূর্যের আলো ওর ধূসর চুল আর গোঁফে এসে পড়ছে, সোনালী দেখাচ্ছে ওগুলো।

'আজ...' বলল সে। 'আজ...' থেমে গেল আচমকা। 'আজ চলে যাও। এখন সময় হয়নি।'

'যত সময় লাগে তৈরি হবার জন্য, নিন নাহয়। আমি তৈরি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল চেরনোবোগ। 'তুমি বোকার হদ্দ, জানো?'

'হ্যাঁ।'

'বোকার হদ্দ তুমি পাহাড়ের চুড়ায় ভালো একটা কাজ করেছ।'

'আমি কেবল আমার কর্তব্য পালন করেছি।'

'হয়তো।' কাঠের সাইডবোর্ডের দিকে এগিয়ে গিয়ে ওটার নিচ থেকে একটা অ্যাটাশে কেস বের করে আনল চেরনোবোগ। ডালা খুলে ভেতর থেকে বের করে আনল একটা হাতুড়ি। স্লেজ হ্যামারের মতোই দেখতে, তবে আকারে ছোট। হাতলে রক্ত লেগে আছে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে চেরনোবোগ বলল। 'তোমার কাছে আমি ঋণী। কতটা তা নিজেও জানো না। তোমার জন্য আস্তে আস্তে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আমাদের মাঝে এসেছে সত্যিকারের বসন্ত।'

'আমার সামনে অনেকগুলো পথ খোলা ছিল না। তাই যা করার ছিল, তাই করেছি।' বলল শ্যাডো।

নড করল চেরনোবোগ। 'তোমাকে আমার ভাইয়ের ব্যাপারে আগে কখনও বলেছি?'

'বিয়েলবোগের ব্যাপারে?' কার্পেটের মাঝখান পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসল শ্যাডো। 'কেবল বলেছেন, তাকে অনেকদিন হলো দেখেন না।'

'হ্যাঁ।' হাতুড়ি তুলল বৃদ্ধ। 'অনেক লম্বা একটা শীত কাটালাম আমরা, বাছা। কিন্তু এখন তা শেষ হতে চলেছে।' মাথা নাড়ল সে, যেন আচমকা কিছু মনে পড়েছে। বলল, 'চোখ বন্ধ করো।'

তাই করল শ্যাডো, মাথা তুলে অপেক্ষা করে রইল আঘাতের।

স্লেজ হ্যামারটার মাথাটা ঠান্ডা, বরফের মতো। আলতো করে ওর কপাল স্পর্শ করল ওটা, যেন চুমু খাচ্ছে।

'কাজ শেষ,' বলল চেরনোবোগ। লোকটার মুখে আনন্দ আর স্বস্তির হাসি দেখতে পেল শ্যাডো, এর আগে তাকে ওভাবে হাসতে দেখেনি কখনও। অ্যাটাশে কেসে আবার বন্দী হলো হাতুড়ি।

'আপনিই চেরনোবোগ তো?' জানতে চাইল শ্যাডো।

'হ্যাঁ, আজ আমিই চেরনোবোগ। আগামীকাল থেকে শুরু হবে বিয়েলবোগের রাজত্ব।'

'তাহলে আমাকে হত্যা করলেন না কেন?'

পকেট থেকে ফিল্টার ছাড়া একটা সিগারেট বের করে আনল বৃদ্ধ। ম্যান্টেলপিস থেকে একটা ম্যাচের বাক্স এনে ধরলা ওটা। 'কারণ,' অনেকক্ষণ পর বলল সে। 'রক্তের দরকার আছে। তেমনি দরকার আছে কৃতজ্ঞতার। লম্বা এই শীতকে আমি পেছনে ফেলতে চাই।'

উঠে দাঁড়াল শ্যাডো। জিন্সের হাঁটুর জায়গায় ধুলো লেগে আছে, হাত দিয়ে ওগুলো পরিষ্কার করার প্রয়াস পেল সে। 'ধন্যবাদ।'

'তোমাকে স্বাগতম।' জানাল বৃদ্ধ। 'আবার যদি চেকার্স খেলতে ইচ্ছা হয়, তাহলে চলে এসো। তবে এবার কিন্তু আমি সাদা ঘুঁটি নেব!'

'ধন্যবাদ। হয়তো আসব। তবে অতি সত্বর নয়।'

বৃদ্ধ লোকটার উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে হাত মেলাল শ্যাডো, বিদায় শব্দটা উচ্চারণ করল না দুজনের কেউ।

বেরোবার পথে যরিয়া উত্রেনেয়ার গালে চুমু খেল শ্যাডো, চুমু খেল যরিয়া ভেচেরনেয়ার হাতের উল্টো পিঠে। একেকবারে দুটো করে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে গেল সে।

পরিশেষ

আইসল্যান্ডের রেকিয়াভিক শহরটা বেশ অদ্ভুত। অনেকেই অনেক অদ্ভুত শহর দেখেছে জীবনে। তাদের চোখেও জায়গাটাকে খুব একটা স্বাভাবিক বলে মনে হবে না! রেকিয়াভিক আগ্নেয় শহর-যেখানে পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে উঠে আসে উত্তাপ।

পর্যটক আছে, তবে সেই পরিমাণটা আশানুরূপ নয়। এমনকি জুলাইয়ের শুরুর দিকেও তাদের আনাগোনা নেই বললেই চলে। সূর্য জ্বলছে, তা-ও বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে। সকালের এক বা দুই ঘণ্টার জন্য অবশ্য বিশ্রামে গিয়েছিল।

বিশালাকার পর্যটক লোকটা রেকিয়াভিকের প্রায় পুরোটা এলাকা হেঁটেই পার করে ফেলেছে। বিগত এক হাজার বছরে খুব একটা পরিবর্তন আসেনি, এমন এক ভাষায় কথা বলছে লোকজন। স্থানীয়রা এমন সহজভাবে প্রাচীন গাঁথাগুলো বুঝতে পারে, যেন কাগজে ছাপা খবর পড়ছে! এই দ্বীপটা যেন অবিনশ্বর, আর সেটাই ভয় পাইয়ে দিচ্ছে পর্যটককে...আবার সান্ত্বনাও দিচ্ছে যেন। খুব ক্লান্ত লাগছে ওর, প্রায় সারাটা দিন সূর্য উঠে থাকে বলে ঘুমানোও সম্ভব হচ্ছে না। হোটেল রুমে বসে বসে একবার গাইডবুক আর আরেকবার ব্লিক হাউজ পড়ে কাটিয়ে দিয়েছে রাতগুলো। কখনও কখনও সময় কাটিয়েছে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে।

ঘড়ির কাটা জানান না দিলে বুঝতেই পারত না যে নতুন একটা দিন শুরু হয়েছে।

অগণিত ক্যান্ডির দোকানের একটিতে ঢুকে চকলেট বার কিনেছে বিশেষ এই পর্যটক। মাঝে মাঝে নাকে আসছে সালফারের পচা গন্ধ। মন চাইছে, পাতালে গিয়ে হেডিসকে তার পচা ডিমগুলো ফেলে দিতে বলে।

পথে অনেক সুন্দরী দেখতে পেল ওঃ পাতলা আর কিছুটা মলিন। ওয়েনসডে এই ধরনের মেয়েই পছন্দ করতেন। শ্যাডোর মাঝে মাঝেই মনে হয়, ওর মাকে কী দেখে পছন্দ করেছিলেন তিনি? দারুণ সুন্দরী ছিলেন মহিলা, সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু পাতলা বা মলিন, কোনটাই ছিলেন না।

সুন্দরীদের দিকে তাকিয়ে হাসল শ্যাডো, কেননা তারা যুবককে ওর পুরুষত্বের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। অবশ্য হাসি প্রায় লেগেই আছে ওর মুখে, ভ্রমণটা দারুণ উপভোগ করছে বলে।

শ্যাডোর উপর যে নজর রাখা হচ্ছে, সেটা কখন টের পেল বলতে পারবে না ও। মাঝে মাঝেই ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটার চেহারা দেখার চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই ধরতে পারেনি।

একটা ছোট্ট রেস্তোরাঁয় পা রাখল শ্যাডো। স্মোকড পাফিন আর ক্লাউডবেরি দিয়ে সারল খাবার। সেই সাথে ছিল সিদ্ধ আলু আর গলা ভেজাবার জন্য কোকাকোলা। আমেরিকার চাইতে এখানকার কোক অনেক বেশি মিষ্টি বলে মনে হলো।

বিল নিয়ে আসার পর ওয়েটার জানতে চাইল, 'ক্ষমা করবেন, স্যার। আপনি কি আমেরিকান?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে স্বাধীনতা দিবসের অভিনন্দন গ্রহণ করুক।' নিজের জ্ঞানের পরিধিতে বেশ তৃপ্ত মনে হলো ওয়েটারকে।

শ্যাডো বুঝতেই পারেনি যে আজ স্বাধীনতা দিবস। জুলাই মাসের চার তারিখ। বিলের টাকা আর কিছু টিপ টেবিলের উপরে রেখে বাইরে চলে এলো সে। আটলান্টিক থেকে ভেসে আসছে ঠান্ডা বাতাস। কোটের বোতাম লাগাতে বাধ্য হলো ও।

ঘাসের উপর বসে চারপাশের শহরের দিকে তাকাল শ্যাডো। ভাবল, একদিন না একদিন ওকে ঘরে ফিরতেই হবে। আর একদিন না একদিন ওকে এমন এক ঘর বানাতে হবে যেখানে ফিরে যাওয়া যায়।

আচমকা এক বৃদ্ধকে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখল সে। লোকটার পরনে ধূসর একটা আলখাল্লা, নিচের দিকটা ছেঁড়া। দেখে মনে হয়, চলার উপরেই থাকেন তিনি। মাথায় একটা নীল হ্যাট, ওটার কানা অনেক চওড়া। একদম উপরে সিগালের একটা পালক লাগান আছে। বয়স্ক হিপির মতো দেখাচ্ছে তাকে, ভাবল শ্যাডো। অবসর নেয়া বন্দুক-যোদ্ধাও হতে পারে। তবে একটা জিনিস মানতেই হয়, অস্বাভাবিক লম্বা বৃদ্ধ।

শ্যাডোর পাশে এসে বসলেন বৃদ্ধ। ওর দিকে চেয়ে একটু নড করলেন কেবল। এক চোখ জলদস্যুদের মতো কালো পট্টিতে বাঁধা, থুতনিতে সাদা দাড়ি ঝুলছে। শ্যাডোর সন্দেহ হলো, এই বুঝি লোকটা সিগারেট চেয়ে বসে।

'হেননগেন গেঞ্জুর? ম্যানস্টে কি ইফতেয়ার মরি?' বৃদ্ধ লোকটা জানতে চাইলেন।

'আমি দুঃখিত।' বলল শ্যাডো। 'আইসল্যান্ডের ভাষা জানি না।' ভাষা শিক্ষার বইটা বের করে নিয়ে ভাঙা ভাঙা ভাবে বলল, 'এখ টালা বারা এনস্কু।' আমি শুধু ইংরেজি জানি। সেই সাথে যোগ করল, 'আমেরিকান।'

বৃদ্ধ লোকটা আস্তে নড করল। বলল, 'আমার লোকরা এখান থেকে অনেক আগে আমেরিকায় গিয়েছে। আবার ফিরেও এসেছে। ওরা বলল, মানুষের থাকার জন্য জায়গাটা ভালো। কিন্তু দেবতাদের জন্য ভালো না। আর দেবতাদের ছাড়া ওদের খুব...একাকী লাগছিল।' চোস্ত ইংরেজিতে বলছেন তিনি, তবে মাঝে মাঝে ভুল জায়গায় বিরতি নিচ্ছেন। তার দিকে তাকাল শ্যাডো, কাছ থেকে দেখে অনেক বেশি বয়স্ক লাগে তাকে। চামড়ায় ভাঁজ পড়ে গিয়েছে।

বৃদ্ধ বললেন, 'আমি তোমাকে চিনি, বাছা।'

'তাই নাকি?'

'তুমি আর আমি, একই পথে হেঁটেছি। আমিও নয়দিন ধরে ঝুলেছি জীবন-বৃক্ষের ডালে। আমি নিজেকেই করেছি নিজের জন্য উৎসর্গ।'

'আপনি ওডিন।'

চিন্তামগ্ন ভাবে নড করলেন বৃদ্ধ। 'অনেক নামেই ডাকা হয় আমাকে। হ্যাঁ, আমি ওডিন, বোরের সন্তান।'

'আমি আপনাকে মরতে দেখেছি,' জানাল শ্যাডো। 'আপনার মরদেহের জন্য শোক পালন করেছি। ক্ষমতার জন্য সব কিছু ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিলেন আপনি।'

'আমি ওসব করিনি।'

'ওয়েনসডে করেছেন, আপনি ওয়েনসডে।'

'ওয়েনসডে আমার এক অবতার, কথা সত্যি। কিন্তু আমি ওয়েনসডে নই।' নাক চুলকালেন বৃদ্ধ। 'তুমি ফিরে যাবে আমেরিকায়?'

'ফিরে যাওয়ার কোন কারণ নেই।' বলল বটে শ্যাডো, কিন্তু জানে যে কথাটা মিথ্যা।

'অনেক কিছুই তোমার অপেক্ষায় আছে,' বললেন বৃদ্ধ। 'তবে তুমি না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।'

একটা সাদা প্রজাপতি উড়ে গেল ওদের সামনে দিয়ে। চুপ করে রইল শ্যাডো। এই দেব-দেবীদের গোলমাল এক জীবনের জন্য যথেষ্ট হয়েছে। ঠিক

করল, বিমানবন্দরে গিয়ে টিকিট পালটে নেবে। আগে কখনওই যায়নি, এমন কোন জায়গায় যাবে এবার।

'আপনার জন্য একটা জিনিস রেখেছি,' বলল শ্যাডো। হাত পকেটে ঢুকিয়ে তালুর ভেতর তুলে নিল ওটা। এরপর বলল, 'হাত বাড়ান।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। তারপর শ্রাগ করে ডান হাত বাড়ালেন। শ্যাডো এবার নিজের হাত বাড়াল। একটা একটা করে খুলে দেখাল যে ওগুলো খালি। তারপর একদম আচমকা বৃদ্ধের হাতের উপর ফেলে দিল কাঁচের চোখটা।

'কীভাবে করলে?'

'জাদু,' শক্ত মুখ করে জবাব দিল শ্যাডো।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন বৃদ্ধ, হাততালি দিতে শুরু করলেন। নকল চোখটার দিকে তাকিয়ে নড করলেন একবার, ওটা যে কী তা বুঝতে পেরেছেন। তারপর কোমরের সাথে ঝুলতে থাকা একটা চামড়ার ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলেন। 'অনেক ধন্যবাদ, আমি এর যত্ন নেব।'

'স্বাগতম,' বলে উঠে দাঁড়াল শ্যাডো, হাত দিয়ে ঝাড়ল প্যান্টে লেগে থাকা ঘাস।

'আরেকবার,' অ্যাসগার্ডের রাজা বাচ্চাদের মতো করে বললেন। 'আবার দেখাও খেলা।'

'আপনাদের লোভ কোনদিন মিটবে না,' বলল শ্যাডো। 'ঠিক আছে, দেখাচ্ছি। এটা এক মৃত লোক শিখিয়েছিল আমাকে।'

বাতাসে খামচি দিল শ্যাডো, শূন্য থেকে তুলে আনল একটা সোনার পয়সা। জাদুর কোন ক্ষমতা নেই ওটার। কিন্তু সোনার যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'এই আমার জাদু।' পয়সাটাকে দেখাল শ্যাডো। 'গল্পের সমাপ্তি।'

বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে পয়সাটা টস করল সে। বাতাসে ভাসল পয়সাটা, একদম উপরে উঠে যেন কিছুক্ষণ জায়গায় জমে রইল ওটা। মনে হলো যেন আর কখনও নিচে নামবে না। হয়তো আসলেই নামবে না! শ্যাডো তা দেখার জন্য অপেক্ষা করল না। হাঁটতে শুরু করল ও...

...হাঁটতে থাকল একবারও পিছু না ফিরে।

সংযুক্তি

নর্স দেবতাগণ:

ওডিন: নর্স পুরাণ অনুসারে সর্ব প্রথম দেবতা। সর্ব পিতা নামে খ্যাত। যুদ্ধের শুরুতে তার নাম নিয়েই শুরু করতে হয় আক্রমণ। জ্ঞানের উৎপত্তি তার থেকেই। জ্ঞানের জন্য নিজের এক চোখ উৎসর্গ করেন তিনি।

লোকি: অনর্থের দেবতা, মিথ্যার দেবতা। কখনও অন্যান্য নর্স দেবতাদের সাথে এক হয়ে, আবার কখনও তাদের বিরুদ্ধে কাজ করে।

তিন নর্ন বোন: নর্নরা তিন বোন, তারা সম্মিলিতভাবে সব দেবতা আর মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন। তাদের নাম-উর্ড, ভেরডান্ডি এবং স্কাল্ড। তবে তাদের নির্ধারিত ভাগ্য অখণ্ডনীয় নয়। তারা তিনজন অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্বও করেন না (যেটা গ্রিক পুরাণের তিন ভাগ্য দেবী করেন)। প্রকৃতপক্ষে নর্নের সংখ্যা অনেক। তবে এই তিনজনই সবচেয়ে বেশি নামকরা।

ইস্টার: ইস্টারের আসল নাম ওসটারা বা ইস্টোরে। তার সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায়নি। তবে পৌত্তলিক অ্যাংলো-স্যাক্সনেরা যে তার সম্মানে বিশেষ দিবস উদযাপন করত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইস্টারকে ধরা হয় ভোর এবং বসন্তের দেবী হিসেবে। পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সী এক রমণীর রূপ নয়ে হাজির হন তিনি। বর্তমান খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের পালিত উৎসব 'ইস্টার'-এর নাম এই দেবীর নাম থেকে এসেছে বলেই ধারণা করা হয়।

স্লাভিক দেবতাগণ:

চেরনোবোগ: চেরনোবোগের সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায়নি। তবে খ্রিষ্টান সাহিত্যিকদের মতে, স্লাভদের দুই প্রধান দেবতা ছিলেন। চেরনোবোগ তাদের একজন, অশুভ আর অন্ধকারের প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি।

বিয়েলবোগঃ চেরনোবোগের ভাই। তিনিও স্লাভদের প্রধান দেবতা। তবে তার ভাই যেখানে অশুভের প্রতিনিধিত্ব করেন, সেখানে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন শুভ আর আলোর।

যরিয়া বোনেরাঃ স্লাভিক পুরাণ অনুসারে, যরিয়া বোনেরা আসলে দুজন। বড় বোন, ভোরের তারা, যরিয়া উত্রেনেয়া। এবং ছোট বোন, সন্ধ্যা তারা, যরিয়া ভেচেরনেয়া। তাদের পিতা হলেন সূর্য-দেব ডাযবোগ। সকালে যরিয়া উত্রেনেয়া দরজা খুলে দিলে সূর্য দেব বের হন আর রাতে তিনি ফিরে আসার পর দরজা বন্ধ করেন যরিয়া ভেচেরনেয়া। তাদের আরেক দায়িত্ব হলো বিনাশ আনয়নকারী কুকুর, স্মারগেল যেন শিকল দ্বারা আবদ্ধ থাকে তা নিশ্চিত করা। আমেরিকান গডস বইতে নিল গেইম্যান ছোট বোন হিসেবে যরিয়া পলুনোচনেয়া বা রাতের তারাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

মিশরীয় দেবতাগণ:

হোরাসঃতার প্রতীক হলো বাজ পাখি। অধিকাংশ মিশরবিদের মতে-তিনিই মিশরের প্রধান দেবতা। তার মাথার মুকুট সমগ্র মিশরের উপরে তার রাজত্বের সাক্ষ্য দেয়।

থোথ (বইতে মি. আইবিস)ঃথোথ মিশরীয় জাদু, জ্ঞান ও চাঁদের দেবতা। হায়ারোগ্লিফ বা ভাষার লেখ্য-রূপ তার আবিষ্কার। একই সাথে তিনি লিপিকারদের দেবতা এবং ভারসাম্যের দেবতাও বটে। তার পবিত্র প্রাণী বেবুন। মিশরীয় সংস্কৃতির সাথে তাল মিলিয়ে তাকে কল্পনা হয় সারস (আইবিস) পাখির মাথা বিশিষ্ট মানুষ হিসেবে।

আনুবিস (বইতে মি. জ্যাকুয়েল)ঃ মৃতদের রক্ষাকর্তা ও এবং তাদের পাহারাদাতা হিসেবে মিশরীয় পুরাণে খ্যাত এই দেবতা। তবে আনুবিস তার গ্রিক নাম, মিশরীয় ভাষা অনুসারে তার নাম-ইনু বা আনু। শেয়াল-মুখো দেবতা হিসেবেও তিনি পরিচিত।

বাস্টঃ বাস্ট বা বাস্টেস্ট মিশরীয় যোদ্ধা দেবী। প্রাচীন মিশরিয় পুরাণ অনুসারে, তিনি ছিলেন মিশরের নিম্নভূমির রক্ষক। পরবর্তীতে মিশরীয় প্রধান

দেবতা রা-এর রক্ষক রূপে আবির্ভূত হন। মিশর দখল করার পর, গ্রিকরা তাকে চন্দ্রদেবী হিসেব বরণ করে নেয়। প্রথম প্রথম তাকে সিংহী-রূপে কল্পনা করা হলেও, পরবর্তীতে বিড়াল-রূপে চিত্রিত করা হতে থাকে।

আইরিশ দেবতাগণ:

ম্যাড সুইনিঃ বইয়ের ম্যাড সুইনি প্রকৃত পক্ষে কোন দেবতা নন। তিনি আইরিশ পুরাণের জনপ্রিয় এক রূপকথার প্রানি-লেপ্রিকন। তার বয়স তিন হাজারের বছরেরও বেশি। মধ্যযুগে সুইনি নামক এক রাজাকে অভিশাপ দেন সেন্ট রোনান। এরপর থেকে তিনি উন্মাদ হয়ে যাযাবরের জীবন বেছে নেন।

মরিগানঃ মরিগানেরা তিনজন। আইরিশ পুরাণ অনুসারে তারা একত্রে যুদ্ধ ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তাদের নাম-মাচা, নেমিয়ান ও বাড্ব। ধারণা করা হয়, দাঁড়কাকের রূপ নিয়ে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন।

অন্যান্য:

আনানসিঃ আফ্রিকান ফোকলোরে আনানসি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ধারণ করে আছেন। তাকে মাকড়সার রূপে চিত্রিত করা হয় এবং ধারণা করা হয়, বিশ্বের যাবতীয় গল্পের সূত্রপাত তার থেকেই হয়েছে। বর্তমান ঘানার আকান গোত্র থেকে তার উৎপত্তি। মাকড়সা হলেও তিনি মানুষের সামনে আসেন একজন বৃদ্ধ পুরুষ হিসেবে।

হুইস্কি জ্যাকঃ ইনি নেটিভ আমেরিকানদের কাছে জনপ্রিয় এক কাল্পনিক চরিত্র। লাকোটাদের কাছে ইকটমি এবং আলগোনকুইন ভাষীদের কাছে উইসাকেডজ্যাক নামে পরিচিত। নেটিভ আমেরিকান গাঁথা অনুসারে-তিনি মহাপ্লাবনের ব্যবস্থা করে দুনিয়াকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তারপর আবার নতুন করে তৈরি করেছেন বর্তমান পৃথিবী।

বিলকীসঃ বিলকীস চরিত্রটি ইসলাম, খ্রিষ্টান ও ইহুদি-তিনটি প্রধান আব্রাহামিক ধর্মেই উপস্থিত। তবে ইসলাম ধর্মে তাকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, অন্য দুই ধর্মে সেভাবে হয়নি। বাইবেল অনুসারে, বিলকীস প্রকৃতপক্ষে

অর্ধ-মানবী আর অর্ধ-জীন। সেবার রাণী হিসেবে বিখ্যাত বিলকীসকে আমেরিকান গডসে প্রেমের দেবী হিসেবেই দেখান হয়েছে। অন্যদের ভালোবাসা ও প্রেম তার শক্তির উৎস।

ইফ্রিত: ইফ্রিত জীনের একটি বিশেষ গোত্র। মধ্য-প্রাচ্যের সাহিত্যে ইফ্রিতদের দেখানো হয়েছে প্রধানত অশুভ এবং শয়তানের অনুসারী রূপে।

লোয়া: হাইতিয়ান ভুডো ও লুইজিয়ানা ভুডু অনুসারে, এরা প্রধান স্রষ্টা বন্ডি এবং মানবজাতির মাঝে সম্পর্ক স্থাপনকারী। তবে সন্ত বা দেবদূতের সাথে তাদের পার্থক্য রয়েছে। মানুষের মতোই এদের রয়েছে আলাদা পছন্দ, আলাদা ইচ্ছা ও আলাদা প্রেরণা। এরা নিজেরা দেবতা নন। লোয়াদের মাঝে সবচেয়ে নামকরা হচ্ছেন ব্যারন সামেডি। তিনি মৃতদের লোয়া। সাধারণত লম্বা কালো হ্যাট আর কালো পোশাক পরে থাকেন তিনি। তার নাকের ফুটো আটকানো থাকে তুলো দিয়ে। হাইতিয়ান রীতি অনুসারে মৃতদেরকে এভাবেই কবর দেয়া হয়। ভুডু অনুসারীদের কাছেও তিনি বিপদজনক একটা চরিত্র।